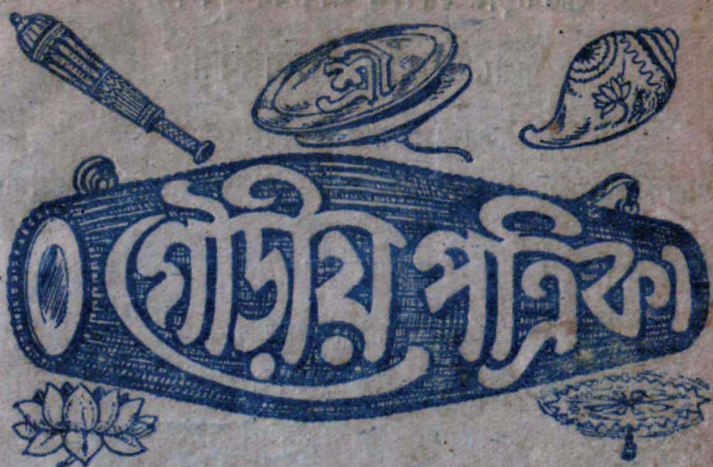


শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ ।



১ম বর্ষ

ফাল্গুন ১৩৫৫

১ম সংখ্যা



শ্রীল প্রভুপাদ

সম্পাদক— শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, তত্ত্বালোক ।

কার্যালয় :— শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী) ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

প্রথম বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগোরাঙ্গ ৪৬২ গোবিন্দ হইতে ৪৬৩ গোবিন্দ
বঙ্গাব্দ ১৩৫৫ ফাল্গুন হইতে ১৩৫৬ মাঘ
খ্রষ্টাব্দ ১৯৪৯ মার্চ হইতে ১৯৫০ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ন্ত্রামক

ত্রিদিগ্‌নামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্ত্যালোক

প্রকাশক

শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী

শ্রীউদ্বারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)

বার্ষিক ভিক্ষা—৪ মাত্ৰ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব মহারাজ

প্রচার-সম্পাদকদ্বয়

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীশ্রীমদ্ জগন্নাথবল্লভ বাবাজী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

মহোপদেশক

পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিকমল (সঙ্ঘপতি)

পণ্ডিত শ্রীযুত পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী

পণ্ডিত শ্রীযুত নামবৈকুণ্ঠ দাসাধিকারী

পণ্ডিত শ্রীযুত নিতাইদাস বিদ্যানিধি এম্, এ, বি, এল্

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকারণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্তিমগুপ

পণ্ডিত শ্রীযুত দীনানিহর ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

পণ্ডিত শ্রীযুত রাখানাথ দাসাধিকারী

পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরনারায়ণ দাসাধিকারী

পণ্ডিত শ্রীযুত হরিচরণ দাসাধিকারী

পণ্ডিত শ্রীসঙ্কনসেবক ব্রহ্মচারী

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণকারণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্তিমগুপ

শ্রীসঙ্কনসেবক ব্রহ্মচারী কর্তৃক চুঁচুড়া সহরস্থ শান্তি প্রেসে মুদ্রিত।

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অচ্যুতানন্দের নির্য্যাণ—শ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৫।১৬৭
২। অভক্তি মার্গ [শ্রীল প্রভুপাদ]	২।৪৩
৩। অভাব	১০।৩৮৯
৪। অযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য-ধাম পরিক্রমা ও শ্রীউজ্জ্বল—শ্রী	১২।৪৬২
৫। অযোধ্যা-ধাম পরিক্রমার বিরাট আয়োজন—শ্রীশ্রী [বিজ্ঞাপন]	৬।২৩৪
৬। অযোধ্যায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব	১০।৩৯৩, ১১।৪৩৬
৭। অর্থ ও অনর্থ [শ্রীল প্রভুপাদ]	৫।১৬৪
৮। অর্থপঞ্চক—শ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৩।৯০
৯। আমার প্রভু কে ?	৩।১০৯
১০। আচার্য্যদেব ও কৃষ্ণদাস	৬।২১৭
১১। আর্তি-নিবেদন [পত্ৰ]	১২।৪৫৪
১২। উত্তমা ভক্তি	৩।৯৫
১৩। উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের ত্রয়োদশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব—শ্রী	১১।৪২৩
১৪। উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবাসপূজা—শ্রী	১।২০
১৫। উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে নানয়াত্রা-মহোৎসব—শ্রী	৫।২০০
১৬। একখানি পত্ৰ	৫।১৯৯
১৭। ঐকান্তিকতা	৪।১৩২
১৮। কলি [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১১।৪১১
১৯। কামনা [পত্ৰ]	৫।১৭৮
২০। কৃষ্ণকৃপা—শ্রীশ্রী [পত্ৰ]	৯।৩৪২
২১। গুরু-কৃপা—শ্রী	২।৫৫
২২। গুরু-কৃপা-প্রার্থনা—শ্রীশ্রী	১১।৪২৭
২৩। গুরুদেব—শ্রী [পত্ৰ]	১।১৮
২৪। গুরুপাদপদ্ম—শ্রী [পত্ৰ]	৪।১৪৮
২৫। গুরু-স্বরূপ—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদ]	৭।২৪২
২৬। গুরুবৈষ্ণব [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-ঠাকুর-কৃত]	৩।৮১
২৭। গুরুবৈষ্ণব—শ্রী	৭।২৪১
২৮। গৃহী বৈষ্ণবের বৃত্তি—[শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১।৮
২৯। গোক্রম-কল্লাটবী—শ্রীশ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	

প্রথম ক্রম, দ্বিতীয় ক্রম, তৃতীয় ক্রম, ৭।২৫৫, ৭।২৫৯, ৭।২৬৩,
চতুর্থ ক্রম, পঞ্চম ক্রম ৭।২৬৮, ৭।২৭৩

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাক
৩০। গোড়মচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ—শ্রীশ্রী [শ্রীশ্রীল-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃতঃ]	৭১২৫০
৩১। গোড়মচন্দ্রভজনোপদেশের অনুবাদ—শ্রীশ্রী	৭১২৫২
৩২। গৌরকিশোরনমস্কারদশকম্—শ্রীশ্রীমং	১০১৩৬১
৩৩। গৌরকিশোর-নমস্কার-দশকের অনুবাদ—শ্রীমং	১০১৩৬২
৩৪। গোড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব	১১১০
৩৫। গোড়ীয় বেদান্ত সমিতির পূর্ব-অনুষ্ঠিত উৎসব তালিকা—শ্রী	১১৩৮
৩৬। চাতুর্মাশ-ব্রত	৫১১২০
৩৭। জগন্নাথষ্টকম্—শ্রীশ্রীল	১২১৪৪১
৩৮। ঠাকুর নরহরি [পত্ৰ]	২১৩৩২
৩৯। ঠাকুর সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ—শ্রীল	৫১১৭০
৪০। দয়িতদাসদশকম্—শ্রীশ্রী	২১৩২১
৪১। দয়িত-দাস-দশকের অনুবাদ—শ্রীশ্রী	২১৩২৩
৪২। দয়িত-দাস-প্রণতি-পঞ্চকম্—শ্রী	৬১২০১
৪৩। দয়িত-দাস-প্রণতি-পঞ্চকের অনুবাদ—শ্রী	৬১২০৩
৪৪। দামোদরাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	২১৩৪৫
৪৫। দামোদরাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	২১৩৪৫
৪৬। দামোদরাষ্টক সম্বন্ধে দুই একটি কথা—শ্রীশ্রী	২১৩৪৪
৪৭। দীক্ষায় উপবীতের আবশ্যকতা	৫১১৭৬
৪৮। দীনের প্রার্থনা [পত্ৰ]	১১১৪২৫
৪৯। দ্বারকাধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীউজ্জ্বল-ব্রত—শ্রীশ্রী	১১২৪
৫০। ধর্ম ও বিজ্ঞান [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	২১৪৮
৫১। নবদ্বীপধাম পরিক্রমা—শ্রী	২১৬৯
৫২। নবদ্বীপধাম পরিক্রমার নিমন্ত্রণপত্র—শ্রী [পরিক্রমা ও	
জন্মোৎসবপঞ্জীসহ] ২১৬৭-৬৮, ১২১৪৭৫-৭৬	
৫৩। নবদ্বীপের পুরাতত্ত্ব—শ্রীধাম [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১২১৪৪৩
৫৪। নাড়া [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৪১২৮
৫৫। নিত্যানন্দাভিলাঃ শ্রীশ্রীপ্রভুপাদাঃ—শ্রীশ্রী	৩১০০১
৫৬। পত্নিতের অশ্রু [পত্ৰ]	৩১০০৭
৫৭। পত্রিকা-প্রশস্তি	৪১১৫৫
৫৮। পরিপ্রশ্নমূলক পত্রদ্বয়	১০১৪০০
৫৯। পাঞ্চরাত্রিক অধিকার [শ্রীল প্রভুপাদ]	৮১২৮৩
৬০। প্রকাশকের নিবেদন	১১৪০, ১২১৪৭৮
৬১। প্রকৃত স্বজন [পত্ৰ]	৬১২১৫
৬২। প্রচার-প্রসঙ্গ	১১৩৩, ৪১১৫৬
৬৩। প্রতিকূল মতবাদ [শ্রীল প্রভুপাদ]	৪১২৪

ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ	ସଂଖ୍ୟା ଓ ପତ୍ରାଙ୍କ
୬୪ । ପ୍ରତିଷ୍ଠାଶା ପରିବର୍ଜନ [ଶ୍ରୀଳ ଠାକୁର ଭକ୍ତିବିନୋଦ]	୬।୨୦୮
୬୫ । ପ୍ରଭୁପାଦପଦ୍ମ-ସ୍ତବକ—ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ [ମାତୁବାଦ:]	୫।୧୨୧
୬୬ । ପ୍ରଭୁପାଦପଦ୍ମେ ନିବେଦନ—ଶ୍ରୀଳ [ପଦ୍ମ]	୨।୬୬
୬୭ । ପ୍ରଭୁପାଦାଷ୍ଟକମ୍—ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ	୫।୧୬୧
୬୮ । ପ୍ରଭୁପାଦାଷ୍ଟକେର ବଞ୍ଚାତୁବାଦ—ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ	୫।୧୬୨
୬୯ । ପ୍ରଭୁପାଦେର ଆରତି—ଶ୍ରୀଳ [ପଦ୍ମ]	୧।୨୭
୭୦ । ପ୍ରଭୁପାଦେର ପତ୍ର—ଶ୍ରୀଳ [ସ୍ବ-ହସ୍ତ-ଲିଖିତ ପତ୍ରର ଚିତ୍ର]	୧।୫
୭୧ । ପ୍ରଭୁପାଦେର ବିରହ—ଶ୍ରୀଳ	୧୦।୭୨୭, ୧୧।୫୧୨
୭୨ । ପ୍ରଭୁପାଦେର ବିରହ-ଗୀତି [ପଦ୍ମ]	୧୧।୫୩୦
୭୩ । ପ୍ରଭୁପାଦେର ମାଙ୍କର—ଶ୍ରୀଳ [ଚିତ୍ର]	୧।୧୭
୭୪ । ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପ୍ରାକୃତ [ଶ୍ରୀଳ ପ୍ରଭୁପାଦ]	୬।୨୦୫
୭୫ । ବନ୍ଧ, ତଟସ୍ଥ ଓ ମୁକ୍ତ [ଶ୍ରୀଳ ପ୍ରଭୁପାଦ]	୨।୩୨୫
୭୬ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମର ଆଲୋଚନା	୨।୩୩୬
୭୭ । ବର୍ଷଶେଷ [ଶ୍ରୀଳ ପ୍ରଭୁପାଦ]	୧୨।୫୫୨
୭୮ । ବର୍ଷାନ୍ତେ ନିବେଦନ	୧୨।୫୫୭
୭୯ । ବସନ୍ତ-ନିର୍ଗମ୍ଭ	୫।୧୫୨
୮୦ । ବିରହ-ମାଞ୍ଜଲ୍ୟ	୧।୨
୮୧ । ବିଶେଷ-ପଞ୍ଜୀ ଓ ଉପବାସ ତାଲିକା	୨।୩୬୦, ୧୦।୭୭୭, ୧୧।୫୫୦, ୧୨।୫୭୭
୮୨ । ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ [ଶ୍ରୀଳ ଠାକୁର ଭକ୍ତିବିନୋଦ]	୨।୩୨୮
୮୩ । ବେଦାନ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମାୟା	୨।୫୮
୮୪ । ବୈଷ୍ଣବବି ଶୁଦ୍ଧ ଶାକ୍ତ [ଶ୍ରୀଳ ପ୍ରଭୁପାଦ]	୧।୫
୮୫ । ବୋସ-ମାହେବେର ପତ୍ର ଓ ପ୍ରଶ୍ନ	୩।୧୧୬
୮୬ । ବୋସ-ମାହେବେର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର [ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭୟଚରଣ ଦେ]	୫।୧୮୬
୮୭ । ବୋସ-ମାହେବେର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର [ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀଭୂଦେବ ଶ୍ରୀତୀ ମହାରାଜ] ୬।୨୨୨, ୮।୩୦୧, ୨।୩୫୨, ୧୦।୭୮୭, ୧୧।୫୩୧, ୧୨।୫୫୭	
୮୮ । ବ୍ୟାସପୂଜା—ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ [ବିଜ୍ଞାପନ]	୧୨।୫୭୫
୮୯ । ବ୍ୟାସପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବକ୍ତୃତା—ଶ୍ରୀ	୧।୨୧
୯୦ । ବ୍ୟାସପୂଜାର ଆହ୍ୱାନ—ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ	୧।୧୨
୯୧ । ଭକ୍ତି-ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ [ପଦ୍ମ—ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହୋଦୟର ବିଜୟେ]	୨।୩୫୭
୯୨ । ଭକ୍ତି-ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି [ପଦ୍ମ—ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଦେବେର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ]	୮।୨୨୮
୯୩ । ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରେର ବିରହ-ସଂହାର—ଶ୍ରୀଳ	୬।୨୩୫
୯୪ । ଭକ୍ତିବିନୋଦବିରହଦଶକମ୍—ଶ୍ରୀମଦ୍	୧୧।୫୦୧
୯୫ । ଭକ୍ତିବିନୋଦବିରହଦଶକେର ଅଭୁବାଦ—ଶ୍ରୀ	୧୧।୫୦୩
୯୬ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗ—ଶ୍ରୀ [ଶ୍ରୀଳ ପ୍ରଭୁପାଦ]	୩।୮୩
୯୭ । ଭକ୍ତି-ସିଦ୍ଧାନ୍ତ-ସରସ୍ୱତୀ-ଦଶକ—ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ୍ [ପଦ୍ମ]	୧୦।୭୭୮

গ্রন্থের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৯৮। ভগবানের কথা	৩।১০৩, ৬।২২২, ১১।৪৩৩, ১২।৪৫০
৯৯। ভাগবত-গুরু-পরম্পরা—শ্রীশ্রী [সংস্কৃত]	২।৪১
১০০। ভ্রম-সংশোধন	৮।৩২০, ১১।৪৩৮
১০১। মধ্বমুনি চরিত—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদ]	১০।৩৬৪, ১১।৪০৫
১০২। মাননীয় চন্দ্র বাবুর পত্র	৮।৩১২, ৯।৩৫৭
১০৩। মাননীয় নারায়ণ বাবুর প্রশ্নাবলী	৬।২৪০
১০৪। রথযাত্রা উৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [উৎসব-তালিকাসহ]	৪।১৫৯-৬০
১০৫। রথযাত্রার তিথি-বিচার	৮।৩১১
১০৬। রথযাত্রা সঙ্গীত	৮।৩০০
১০৭। রথযাত্রা সম্বন্ধে দু'চারটা কথা	৮।৩১৫
১০৮। শরণাগতি	৫।১৮০
১০৯। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বক্তব্য	২।৭৬, ৬।২৩৩
১১০। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সম্বন্ধে কয়েকটা অভিমত	২।৭৯, ৩।১২০
১১১। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সম্বন্ধে বক্তব্য	১।২৯
১১২। শ্রীগৌড়ীয়ের পুনরাবির্ভাব	৯।৩৩৪
১১৩। সদাচার	৮।২৯৩
১১৪। সদগুণ ও ভক্তি [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৮।২৯১
১১৫। সনাতন ধর্ম	৩।১১৩
১১৬। সনাতনাত্মিক শ্রীগুরুদেব [পন্থ]	১২।৪৪৬
১১৭। সমিতির বিশিষ্ট দাতৃবর্গ	১।৩৬
১১৮। সরস্বতীগোস্থামাষ্টকম্—শ্রীল	৮।২৮১
১১৯। সরস্বতী-গোস্থামাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীল	৮।২৮২
১২০। সাধু ও অসাধু	৬।২১১
১২১। সাধুজনসঙ্গ [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১০।৩৭০
১২২। স্বধামে অতীন্দ্রিয় প্রভু	৫।১৩২
১২৩। স্বাধীনতা	৯।৩৪১
১২৪। স্মার্ত "শ্রমণের" বিশ্বাসঘাতকতা	৮।৩০৭
১২৫। হরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা—শ্রীশ্রী	১।১

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যন্নায়া সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম পরসর । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিষ্মশ্রুত ॥
অন্য ধর্ম স্তম্ভরূপে পালে বেই জন । হরি কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১ম খণ্ড } গৌরপূর্ণিমা, ২৯ গোবিন্দ, ৪৬২ গৌরাঙ্গ { ১ম সংখ্যা
সোমবার, ফাল্গুন ১৩৫৫, ইং ১৪।৩।৪৯

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা

বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরুন বৈষ্ণবাংশচ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবম্
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশচ ॥

শ্রীল-প্রভুপাদ-বন্দনা

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রোষ্ঠায় ভূতলে ।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধাস্ত-সরস্বতীতিনামিনে ॥

নোৎপাদয়েদ্ যদি দ্বিভিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

শ্রীবার্ধভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাক্ষয়ে ।

কৃষ্ণস্বক্সবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥

মাধুর্যোজ্জলপ্রেমাত্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ ।

শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিশ্রহায় নমোহস্ত তে ॥

নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে ।

রূপানুগবিরূপাসিদ্ধাস্তদ্বাস্তহারিণে ॥

শ্রীল-গৌরকিশোর-বন্দনা

নমো গৌরকিশোরায সাক্ষাৎধৈরাগ্যমূর্তয়ে ।

বিশ্রলন্তরসান্বোধে পাদানুজায় তে নমঃ ॥

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-বন্দনা

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে ।

গৌরশক্তি স্বরূপায় রূপানুগবরায তে ॥

শ্রীল-জগন্নাথ-বন্দনা

গৌরাবির্ভাবভূমেস্বঃ নির্দেষ্ঠা সজ্জনপ্রিয়ঃ ।

বৈষ্ণব-সার্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিদ্ধুভ্য এব চ ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ ॥

শ্রীমহাভ্র-বন্দনা

মহো মহাবদান্তায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনায়ে গৌরদ্বিষে নমঃ ॥

বিরহ-মাজল্য

আজ প্রচুর হর্ষ ও আনন্দের মধ্যে বিষাদ বেদনাই জাগিয়া উঠিতেছে । হৃদয়ের বেদনা হৃদয়ে অবরুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিলেও দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহা ব্যক্ত করিয়া ফেলে । সেই নিঃশ্বাস-বায়ু বিলোড়িত ও বিকোভিত হইয়া শব্দে পরিণত হইয়াছে । সেই শব্দই ক্রন্দন । তাহার ভাষা অশ্রুট, অর্ধশ্রুট ; কণ্ঠ রুদ্ধ ও পদপদ । তথাপি অদৃষ্টিতা বিরহ-বেদনা ব্যক্ত হইলেই কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইবে মনে করিয়া শ্রীশ্রীগুরুশাদপদ্য ও তাঁহার একনিষ্ঠ সেবক ঠাকুর শ্রীল নরহরি

সেবাবিগ্রহ প্রভুর অদর্শনজনিত ক্লেশলাঞ্ছিত লেখনী আজ কম্পিতপদে ধীরে ধীরে মন্দির গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

যিনি সর্বাকর্ষক কৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, যিনি সর্বশক্তিমান ভগবানকে প্রিয়তম পরাভূত করিয়া স্বেচ্ছায় অস্ত্রের চিত্তে সমর্পণ করিতে সমর্থ, যিনি শ্রীহরির যাবতীয় গুণসমূহ সমাহরণ করিয়া নিঃশব্দ-ব্রহ্মবাদিগণকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ জগদগুরুরূপে শ্রীচৈতন্যবাণী ও শ্রীব্যাসবাণীর সার্থকতা সম্পাদনের জন্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীধুরীধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যিনি মাদৃশ বিষয়ী-ধুরন্ধর দুর্দান্ত প্রকৃতির পতিতধর্মের কেশাকর্ষণ করিয়া স্বীয় পাদপঙ্কজধূলিসদৃশ করিয়াছিলেন, যিনি কারুণ্য-গুণে ঈশ্বর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, সেই গুরুপাদপদ্ম পরমহংসকুলের আদর্শ মহাপুরুষ দৈন্তবশে জগতের নিকট আত্মস্বরূপ আচ্ছাদন করিতে গিয়া আপনাকে “ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর” নামে পরিচয় দিয়াছেন—সংক্ষেপে বিশ্ববাসী তাঁহাকে “শ্রীল প্রভুপাদ” বলিয়াই সাদর সম্বোধন জ্ঞাপন করিতেন।

ঐহার পাণ্ডিত্য প্রতিভায় সমগ্র ভারত কেন সমগ্র বিশ্ব বিমোহিত হইয়াছে, ঐহার দার্শনিক বিচার নৈপুণ্য দর্শন করিয়া সূদূর পাশ্চাত্যের মহা-মনিষীবৃন্দ চমৎকৃত হইয়া পদানত হইয়াছেন, ঐহার পরপক্ষনিরাশপর যুক্তিসমূহ বজ্রের ত্রাণ কঠোর বলিয়া বিরোধী সম্প্রদায় সর্বদাই ভয়ে আতঙ্কিত থাকিত, ঐহার অচল অটল অধোক্ষজ সেবাসিদ্ধান্তসমূহ হিমগিরির অত্যুচ্চ শিখর নত করিয়াছে আজ তাঁহার আত্মগোপনজনিত বিরহ-ব্যথা বহু ব্যক্তিকে ব্যথিত করিয়াছে।

ঐহার অপ্রাকৃত ললিতলাবণ্য মূর্তি পার্থিব যাবতীয় সৌন্দর্য্যকে লঙ্ঘিত করিয়াছে, ঐহার হৃদয় সিদ্ধান্ত-বিরোধ খণ্ডনে পাষাণ অপেক্ষা কঠোর হইলেও যিনি কাহারও সামান্য সেবা-সৌষ্টব সন্দর্শন করিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন, যিনি “অল্প সেবা বহু করি’ মানে” বৈষ্ণবের এই মহান গুণের প্রধান প্রতিমূর্তি-স্বরূপ, যিনি আমাদের অতি অল্প সেবা দেখিয়া কতই না প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি আবার সামান্য ত্রুটি দেগিয়া প্রভূত হিতকথাপূর্ণ অমৃততুল্য গালি বর্ষণ করিয়াছেন। } যিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বিশ্রান্তসেবক পরমপূজ্যপাদ শ্রীমন্ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রিয়তম আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় সেবাতার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে ও মহানন্দে দূরাতীত

দেশে অবস্থান করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই, {আজ তাঁহারা উভয়েই মাদৃশ স্মৃতিত পতিতাদিমের সঙ্গ অত্যন্ত বিষবৎ মনে করিয়া এমন দেশে চলিয়া গেলেন যে তাঁহাদের সন্ধান পাওয়াও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।}

হে নরহরি দা, আপনি সকলের নিকট ‘ঠাকুর মহাশয়’ বলিয়া পরিচিত। আপনার স্তম্ভল শ্রীনাথ গ্রহণ করা মাত্রই আপনার সেবার নৈরন্তর্য্যের কথা সকলেরই স্বরণ পথে আসিয়া পড়ে। আপনি স্বয়ংই শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়তম শ্রীচৈতন্ত মঠ-স্বরূপ। আপনার নিকট থাকিলে সর্বদা মনে হইত আমরা শ্রীচৈতন্ত মঠেই অবস্থান করিতেছি। আপনি অক্লোদ পরমানন্দ-স্বরূপে যে সেবার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একমাত্র লক্ষ্য। আপনি আপনার অতীত শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সেবা দর্শন করিয়া আমাদের প্রতি কৃপা বর্ষণ করুন। {কোনও সময় অপরাধ করিলে আমাকে শাসন করুন।}

আমার সেবার ক্রটি দেখিয়া ভৎসনা করিবার জন্ত আদর্শ পুরুষের যেকোনও অভাব, আবার সামান্য সেবা-চেষ্টা দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া উৎসাহ দিবার লোকেরও সেইরূপ অভাব। হে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়! হে শ্রীল প্রভুপাদ! আপনারা উভয়েই আমার পরজীবনের একমাত্র কাণ্ডারী। আপনারা উন্নততম পরজগতে নিজ নিজ উন্নততম সেবানন্দে মগ্ন থাকিলেও মাদৃশ পতিতের কথা স্বরণ করিয়া প্রচুর আশীর্বাদ করুন—প্রচুর আশীর্বাদ করুন—প্রচুর আশীর্বাদ করুন। ইহাই আজ আপনাদের পাদসরোজে সকাতির প্রার্থনা।

হে শ্রীল প্রভুপাদ! আপনি আপনার প্রিয়তম সংবাদপত্রগুলিকে বৈকুণ্ঠ-বার্তাবহ বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠ হইতে পূর্বাচার্য্যবর্গ আপনার নিকট যে সমস্ত সংবাদ মন্ত্যে প্রেরণ করিতেন তাহাই আপনার প্রিয় পত্রগুলিতে প্রকাশিত হইত বলিয়া উহা বৈকুণ্ঠ-বার্তাবহ। আজ আপনি আমাদেরকে আপনার পরমোচ্চতম স্থান হইতে সংবাদ প্রেরণ করুন, আমরা উহা প্রকাশ করিয়া আপনার “বৈকুণ্ঠ-বার্তাবহ” আখ্যার স্বার্থকতা সম্পাদন করি।

শ্রীল প্রভুপাদ! আপনি দূর হইতে আমাদের পত্রদ্বারা সন্ধান করিয়া উপদেশ নির্দেশ দান করিতেন। আজ তাহাই আমাদের একমাত্র স্মরণীয় আপনার নিজ লেখনীনিঃসৃত পত্রখানি আমাদের এই “শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা” জীবাতু হউন।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীশ্রীকরকমলাঙ্কিত পত্রখানি পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। পরমমুক্তপুরুষের স্বহস্তলিখিত পত্র গৃহে সংরক্ষিত হইলে গৃহের যাবতীয় অমঙ্গল দূর হইবে। স্তবরাং শ্রীপত্রিকার এই সংখ্যা সযত্নে রক্ষা করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

শ্রীশ্রীগৌরহরি: নমঃ ২৫।

শ্রীমদ্রামপুর বৃদ্ধাশ্রম

২।৮।২৫

শ্রুতগীষাঃ বাশমঃ মন্তু-বিশেষাঃ

আমনার ১১।৪।২২ তারিখের পুঁজি
পার্কম আশ্রু হইয়াছে এবং দত্ত প্রদান করিয়াছি।
শ্রীমদ্রামপুর নিকট-কিয়দংশ ও অপর
ভক্তগণবাসীগণকে কিয়দংশ প্রদান করিলাম।
শ্রীমদ্রামপুর রূপায় আমি বিগত ২২ বর্ষ
কাল ^{জীবনকাল} আমি ফল প্রদান পাঠ-পাঠ এবং আম-
লাদি ব্যবহার করি না। আমনার উল্লিখিত
কৃত্যকারণ নিবন্ধন করিলাম। শ্রীমদ্র
মুখ্যমুদনের অর্থ পাঠ্যগতি। শ্রীযুক্তা মনোজ-
বাঈনীর্ষ পত্র ও পাঠ্যগতি।

মঙ্গল ভাষনী নামী বক্ষ-শাস্ত্র মাণিক
পাশ্বিন্য প্রকাশ হইতেছেন। অহাভ হইয়া
বুজিৎ ওয়া বাজে কখন নাই। অনেক
ভক্তগণ প্রবন্ধাদি অহাভ মন্তিবিধি মাণিক
আমনারা উহা যথাশীতি পাঠ করিত
পারেন। উহা পাঠ করিলে অন্য ভাষনী ও
কর্মীমদে ^{কর্মীমদে} পাঠ্য হইয়া। আমাধর
আমনার উল্লিখিত ^{উল্লিখিত} নিম্নলিখিত
শ্রীবিদ্যামঙ্গলমদ-সিদ্ধান্ত

বৈষ্ণবই শুদ্ধ শাস্ত্র

শক্তি ও শক্তিমানের একত্র উপাসনাই কর্তব্য
ব্যবহারিক জগতে শাস্ত্র ও বৈষ্ণবে বহুকাল বিরোধ চলিয়া আসিতেছে।

পৌরাণিক ঐতিহ্যেও তাহা স্থান পাইয়াছে। বৈষ্ণব রাজা চন্দ্রহাসের বিবরণে আমরা তাহারই প্রকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু সূত্ৰবিচারে যদি দর্শন করা যায়, তাহা হইলে শুদ্ধ শাক্ত ও বৈষ্ণবে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতে পারে না, যেহেতু একজন অনন্ত শক্তির ও অগ্ন্যতর একল শক্তিমানের উপাসক। শক্তির উপাসক, শক্তিমানের সেবক না হইয়া থাকিতে পারে না, আর শক্তিমানের সেবক সশক্তিক ভগবানের উপাসক, তাঁহার উপাস্ত তত্ত্ব নিঃশক্তিক নহেন। “শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ” এই সিদ্ধান্তে শক্তিশূণ্য শক্তিমান উপাসিত হইতে পারেন না, অথবা শক্তিমান হইতে পৃথক্ তত্ত্বরূপেও শক্তির উপাসনা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সুতরাং, নিম্নলি সেবাধর্মে অধিষ্ঠিত শাক্ত ও বৈষ্ণবে পার্থক্য কি? কিন্তু যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার কারণ নিম্নলি সেবা-বুদ্ধির ব্যত্যয় অর্থাৎ ভোগবুদ্ধির অভ্যুদয়।

গুণজাত উপাসনা অনিত্য

গুণজাত বৃত্তি যখনই জীবকে অধিকার করিতেছে, তখনই সেবা-বৃত্তির হ্রাস বা লোপ সংসাধন পূর্বক তাহার শক্তিমানসহ শক্তির সেবা অন্তর্হিত করাইয়া ভোগেরই আবাহন করায়। বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্থলে রজস্তম আমিয়া লোককে ভোগে প্রবৃত্ত করাইয়া ফেলে। এই অবস্থায় যে ধর্ম তাহা নিত্য ধর্ম নহে, সৌভাগ্যক্রমে ভোগপ্রবৃত্তি ও গুণাধিকার প্রশমিত হইলেই ঐ তাৎকালিক ধর্মের আর অধিকার থাকে না। তখন জীব বিশুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া নিম্নলি সেবাই তাঁহার বৃত্তি বলিয়া নিত্য ভগবদাস অভিমান করিবেন। এক্ষণে কোন কোন স্থলে ঐ রজস্তমোধিকৃত ভোগীর ধর্মকেই বিকৃত বৈষ্ণব বা শাক্ত ধর্ম বলা হইয়া থাকে। একরূপস্থলে যে যে উপাসনায় যথার্থ সেবা বুদ্ধি নাই তৎসমূলে স্ব স্ব জাগতিক সুখ-চেষ্টা বিরাজিত।

গৌণ বৈষ্ণব বা গৌণশাক্ত

ধন, যশ, শত্রুনাশ, লোকবল প্রভৃতি লাভের জন্তই প্রজারঞ্জনাদির প্রয়োজন। লক্ষ্মী, কাত্যায়নী প্রভৃতি শক্তিকে অধিকারিক দেবতাজ্ঞানে তাঁহাদের নিকট এ পৃথিবীতে থাকা কালে সুবিধার জন্ত যে যে বস্তুর প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়, সেইগুলি প্রার্থনাই আমাদের সকাম কৃত্য হইয়া পড়ে, তখনই গৌণ বৈষ্ণব বা শাক্ত ধর্মের যজন। সুতরাং মূলে নিষ্কাম শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মে প্রভেদ না থাকিলেও আমরা গুণগত বৃত্তি লইয়া কামনামূলে সত্য হইতে উদয়কে পৃথক্ করিয়া ফেলিয়াছি। যাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতেছেন,

তাহাদের সকলেই যে বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর নিষ্কাম সেবক, তাহা নহে, অনেকেই ভোগমার্গের বৈষ্ণব ও শাক্ত। যেখানে বিষ্ণুকে ও বিষ্ণুশক্তিকে আধিকারিক দেবতাজ্ঞানে ঐ জাগতিক শুভ প্রার্থনার প্রশ্রয় আছে, সেখানে নির্মল সেবা, ধর্ম থাকিতে পারে না। বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিলেও এবং বৈষ্ণব চিহ্নে চিহ্নিত থাকিলেও এরূপ বিষ্ণুপাসকের গোণ বৈষ্ণব বা গোণ শাক্ত ভিন্ন অন্য পরিচয় নাই।

শক্তিমান ব্যতীত কেবল শক্তির কর্তৃত্ব বেদ বিরুদ্ধ

স্বীয় ভোগোপকরণ-সংগ্রহ জন্ত বহিরঙ্গা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, কেননা ভোগময় জগতে যাহা কিছু কার্য, সকলই শক্তিসম্পন্ন। তাই, ভোগাধিকৃত বুদ্ধি শক্তিমান বৈকুণ্ঠের দর্শনে অসমর্থ হইয়া ভোগময়ী মায়া-শক্তিকেই চিনিতে পারে, শক্তিমানের সংবাদ রাখে না। তাহাতেই বিরোধের সৃষ্টি। নচেৎ, যদি তটস্থ হইয়া বিচার করা যায় যে, শক্তির স্বতন্ত্রাধিষ্ঠান সম্ভবপর কিনা, তখন বেদানুগত হইয়া আমরা দেখিতে পাই, ভগবদন্তরালেই শক্তি আছেন। যেখানে শক্তিমান ছাড়িয়া পূর্বে শক্তি ও পরে শক্তিমান, তাহা বেদ বিরুদ্ধ কপিলমতানুবর্তিতা। তাহার প্রকৃতিকেই কর্তা করিলেও বেদে তাহার স্বীকার নাই।

শক্তিমানের আশ্রয় ব্যতীত শক্তির আশ্রয় অসম্ভব

ব্রাহ্মণ, যাহার বেদই একমাত্র অবলম্বনীয়, স্তম্ভবিচারে শক্তিমান স্বীকার করিয়া শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন না, বিশেষতঃ শক্তিকে কেবল অচিৎ বলা হয় না। শক্তি তদীয় তত্ত্ব। তদবস্থ বা তত্ত্ববস্থ অর্থাৎ শক্তিমানত্ব স্বীকার না করিলে তিনি শুদ্ধ শাক্ত হইতে পারেন না। কেননা, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণাবলম্বী, তিনি কিরূপে সত্ত্ব পরিহার করিয়া রজস্তমের অধীন হইবেন? বরং তিনি ক্রমে বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ নিগুণতা অবলম্বন পূর্বক ক্রমশঃ যথার্থ বৈষ্ণব হইবেন। তিনি স্বয়ং নিত্য ভোগ্য-তত্ত্ব বা শক্তি, স্তবরাং তাহার কিছুমাত্র ভোগ প্রবণতা থাকিবে না, তিনি বিশুদ্ধ ভগবৎ সেবারূপ নিত্যস্বরূপ ধর্মে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন জড়ভোগার্থে কৃত উপাসনাদিকে তাহার আর ভক্তি বলিয়া ভ্রম হইবে না, তিনি ভক্তি বলিয়া ভুক্তি স্বীকার করিবেন না ও ভুক্তিমূল্য প্রার্থনাকে ভক্তির সহিত অভিন্ন ভাবিবেন না।

ভোক্তা ভক্ত নহে

মায়ের কাছে আদ্য করিয়া, যত পারা যায়, আদ্য করিবার যত্নকে মাতৃ-

ভক্তি বলা যায় কি? “কারও দুখে চিনি, আমার শাকে বানি” এই ক্ষোভকে যদি ভক্তি বলা যায়, তাহা হইলে জগতে ভক্তের অভাব থাকিত না, আর ভক্ত এত আদরণীয় তত্ত্ব হইত না। নিজ কার্য্যসিদ্ধির জন্ত রাবণও মহামায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভক্তনামে অভিহিত হয়েন নাই।

১-ক্রব ও প্রহ্লাদ মহারাজে পার্থক্য

ক্রব মহারাজের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান বৈষ্ণবানুমোদিত ছিল না, যেহেতু তিনি রাজ্যলোভে ও দুঃখ নিরাকরণমানসে পদ্মপলাশলোচন হরির অন্তঃসন্ধান বাহির হইয়াছিলেন, তাহা শুদ্ধভক্তি নহে। পরে সৌভাগ্যবলে দেবর্ষি নারদের পাদাশ্রয়ে সাধুসঙ্গক্রমে তাঁহার সে দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হয়, তখনই তিনি ভক্তাগ্রগণ্য হইলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রে কদাপি এরূপ ভোগপ্রবণ, সেবারহিত বৈষ্ণব বা শাক্ত ধর্ম্মের আবাহন দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

বৈষ্ণব ও শাক্তের শিবপূজা

সময়ে সময়ে ভোগপর বিকৃত বৈষ্ণব বা শাক্তগণকে শৈবধর্ম্মযাজী দেখিতে পাওয়া যায়। যখন তাঁহারা মোক্ষসাধন-তৎপর হ’ন, তখন তাঁহারা শাক্তের শৈবগণের পথ অবলম্বন করেন। যখন তাঁহারা মায়ে’র নিকট আশ্রয় করেন, “এ সংসার-গারদে আর আমি থাকিতে পারি না, আমার এ গারদ হইতে উদ্ধার কর,” অর্থাৎ যখন ভোগ করিয়া দেখে, অবিমিশ্র সুখভোগ ঘটে না, তৎসহ দুঃখ ভোগ মিশ্রিত, তখন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকল্পে মোক্ষচেষ্টা প্রবল হয়। আমরা অজ্ঞতাক্রমে উহাকেও ভক্তি বলিয়া মনে করিয়া লই, কিন্তু এরূপ মোক্ষ-প্রবৃত্তিতে শুদ্ধা ভক্তির স্থান নাই, তাহাও তাত্‌কালিক কার্য্যসিদ্ধির জন্ত আধিকারিক দেবতার উপাসনা মাত্র।

নির্ম্মলা ভক্তির লক্ষণ

নির্ম্মলা ভক্তি ভোগ-মোক্ষ-বাসনা-হ্রষ্ট নহে। নির্ম্মল বৈষ্ণব বা বিষ্ণুশক্তির আশ্রিতগণ শুদ্ধভক্তি-যাজী। এই সকল বিচার করিলে শাক্ত-বৈষ্ণবের বিরোধ থাকিতে পারে না। ষাঁহার যেরূপ প্রাপ্য, তিনি তদ্রূপ ভজন করিবেন, তাহাতে বিবাদের স্থল কোথায়?

—শ্রীল প্রভুপাদ

গৃহী বৈষ্ণবের বৃত্তি

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী এই উভয়দলের মধ্যে যিনি শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত তিনি বৈষ্ণব। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ভিক্ষাদ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রম

অনুসারে বৃত্তি অবলম্বনপূর্বক দেহযাত্রা নির্বাহ করিবেন। যে সকল গৃহস্থদিগের বর্ণাশ্রম নাই তাঁহারাও স্বীয় স্বীয় স্বভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে ত্রাণ্য বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। ব্রহ্মস্বভাবপ্রাপ্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের জ্ঞান উপদিষ্ট, যজ্ঞ, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি জীবন যাপনের বৃত্তি। রাজ্য-পালন, যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। কৃষি, গোবক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদি বৈশ্য-বৃত্তি ও ত্রিবর্ণের সেবা—ইহাই শূদ্র-বৃত্তি। এই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ত্রায়পূর্বক ধনসঞ্চয় করতঃ প্রাণ রক্ষা করার নাম ধর্ম।

রাজকাৰ্য্য দুই প্রকার অর্থাৎ শূদ্র যোগ্য-রাজকাৰ্য্য ও ক্ষত্র যোগ্য রাজকাৰ্য্য। কাৰ্য্যালয়ে নিয়মিত সময়ে গমনপূর্বক লেখাপড়া দ্বারা রাজ্যশাসন কাৰ্য্যে ষাঁহারা রাজসেবা করেন তাঁহাদের ক্ষাত্রবৃত্তি। এই সকল রাজসেবকদিগের পক্ষে রাজদত্ত বেতনদ্বারা জীবন নির্বাহ করাই উচিত। গোপনে অর্থ সংগ্রহ করাটা চৌর্য্যবৃত্তি। তাহা দুই প্রকার—রাজদত্ত বেতন অপেক্ষা অধিক ধন রাজসভাগুণ হইতে বাহির করিয়া লওয়া এক প্রকার চৌর্য্য। নিজ কর্তব্য কাৰ্য্যসূত্রে অপর লোকের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করা দ্বিতীয় প্রকার চৌর্য্য। তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্রাধা প্রভু এই উপদেশ দিয়াছেন;—

রাজার বর্জন খায় আর চুরি করে।

রাজদণ্ড হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য-২।৯০

যে সকল রাজকর্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করেন তাঁহারা প্রভুর মতে দণ্ড অত-এব অবৈধ। এই পাপ ক্রিয়া তাঁহারা সত্ত্বর পরিত্যাগ করিবেন। বেতনের দ্বারা যতদূর জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা বৈষ্ণবের উচিত।

ষাঁহারা রাজার নিকট নিয়মিত অর্থ দান চুক্তি করিয়া কিছু ভোগ করেন তাঁহারা রাজার মূল ধন দিয়া ষাঁহা পান তাহাই তাহদের সমৃদ্ধি প্রাপ্ত ধন। তৎসম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন;—

ব্যয় না করিও কভু রাজার মূলধন॥

রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।

সেই ধন করিও নানা ধর্ম্মে ধর্ম্মে ব্যয়॥

অসদ্ব্যয় না করিও যাতে দুই লোক যায়।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য-২।১৪২-৪৪

ষাঁহাদের বেতন স্থূল এবং ষাঁহারা রাজার মূলধন দিয়া কিছু বিশেষ উদ্বর্ত্ত ধন

পান তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ হইয়া কিছু কিছু সঞ্চয় হয়। সঞ্চিত অর্থ সংকল্পে ব্যয় করা উচিত। যত্নমাংস ভোজন, অসং নাট্যাদি দর্শন, বৃথা মোকদ্দমা ইত্যাদিতে ব্যয়, অসংপাত্রে দান ইত্যাদি বহুবিধ অসদ্ব্যয় আছে। যাহারা শ্রীমন্নহাপ্রভুর দাস হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা উদ্বর্ত অর্থের দ্বারা অসদ্ব্যয় না করিয়া সদ্ব্যয় করিবেন। অতিথি সেবা, দুঃখী লোককে অন্নদান, পীড়িত লোককে ঔষধ ও পথ্যদান, বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাদান, দরিদ্র লোককে কণ্ঠাদি দায় হইতে মুক্তকরণ, এই সমস্ত সদ্ব্যয় অপেক্ষা আর একটা বিশেষ গুরুতর সদ্ব্যয় আছে। সেই ব্যয় শ্রীভগবৎসেবা ও শ্রীভাগবত সেবাতে হইয়া থাকে। এ বৎসর যে সব ধনী, ধর্মশীল ব্যক্তি ভগবৎসেবার উদ্দেশে অর্থ দান করিয়াছেন তাঁহাদের তুল্য সর্দৈক্ষ্য আর কে আছে? শ্রীমন্নহাপ্রভুর দৈনন্দিন সেবা সংস্থাপনের জন্ত সমস্ত গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগের উদ্বর্ত অর্থ হইতে কিছু কিছু দেওয়া কর্তব্য। মহাআগণ আনন্দের সহিত সে কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন ও হইবেন।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব

শ্রীবলদেব বিজ্ঞাভূষণ প্রভুর আলোচনা করিতে গেলে সর্বপ্রথমেই তাঁহার রুত বেদান্ত-ভাষ্য—শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যের কথা স্মৃতিপটে জাগরিত হয়। তাঁহার ভাষ্যই তাঁহাকে চারি-সম্প্রদায় বৈষ্ণবের মধ্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। এমন কি চারি সংসম্প্রদায় ব্যতীত অত্রাণ্ড প্রধান দার্শনিক সম্প্রদায়গুলিও আচার্য্য শ্রীল বলদেব বিজ্ঞাভূষণের কথা স্মরণ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্নহাপ্রভুর অল্পগত বৈষ্ণবগণের ত' কথাই নাই প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ই তাঁহার প্রতিভার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

সং ও অসং সম্প্রদায়

শ্রীশ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ণ ব্যাস তাঁহার স্বরচিত পদ্মপুরাণ শাস্ত্রে লিখিয়াছেন;—“সম্প্রদায়বিহীনা যে যজ্ঞান্তে বিফলা মতাঃ।” অর্থাৎ সম্প্রদায়বিহীন যে সমস্ত যজ্ঞ বর্তমান যুগে পরিদৃষ্ট হইতেছে তৎসমুদয়ই ফলপ্রদ নহে। এইস্থলে যজ্ঞ শব্দের দ্বারা গ্রন্থ ও স্বাহাপুটিত দীক্ষামন্ত্র অথবা তদনুকূল শিক্ষাসমূহকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ব্যতীত অসাম্প্রদায়িক শিক্ষার প্রতিষ্ঠা নাই। বর্তমান যুগে যে সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত চিন্তা প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার সহিত শাস্ত্রোক্ত সাম্প্রদায়িকতার

প্রচুর পার্থক্য আছে। একপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা লোককে অধঃপাতিত করে, অন্যপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা পতিত জীবকে উদ্ধার করিয়া সর্বোত্তম স্থানে সমাসীন করায়। যাহারা সং সম্প্রদায় স্বীকার করিতে অক্ষম তাহারা সং সম্প্রদায় হইতে পৃথক করিয়া অসং সম্প্রদায়ের প্রশ্রয় দিতেছেন। এইরূপ অসং সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে বহু প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারাও প্রত্যেকে অসং কার্যের প্রশ্রয় দিবার জন্য এক একটা সম্প্রদায় সংগঠন করিয়াছেন। এই প্রকার অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়সমূহের গণ্ডিগুলি যতই উৎসাদিত হইবে ততই জগতের মঙ্গল।

গলতাগাদীতে সং সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা

সং সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় যে প্রকৃত সং সম্প্রদায় তাহা গলতার গাদীতে স্থাপন করেন। গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তাঁহার মূল-পুরুষ শ্রীবলদেবের বিচার-বিজয়-বৈজয়ন্তী-ক্ষেত্র জয়পুরের নিকটবর্তী গলতা পাহাড় শ্রীধারকাধাম পরিক্রমাকালে সমস্ত ভক্তমণ্ডলীকে প্রদর্শন করাইয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ স্থাপন

এই গলতা পাহাড়েই তিনি রামানন্দী, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি বহু ধর্ম্ব্যাজী পণ্ডিতগণের নিকট শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথই যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা স্থাপন করেন। বিচারে পরাস্ত হইয়া ভারতের যাবতীয় ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকগণ পদপূরণের উক্ত প্রমাণের দ্বারা তাঁহাকে আক্রমণ করেন। তাঁহারা বলিতে চাহিয়াছিলেন যে শ্রীমন্নহাপ্রভু শাস্ত্রোক্ত কোন সম্প্রদায় স্বীকার না করায় বলদেবের প্রদর্শিত বিচারযুক্তি যতই অকাট্য-হউক না কেন উহা নিষ্ফল বলিয়া গণ্য হইবে। আচার্য্য বলদেব তাঁহাদের এই উক্তির নিষ্ফলতা প্রদর্শনকল্পে কয়েকদিনের মধ্যে বেদান্তের ভাষ্য রচনা করেন। এই সম্পর্কে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে বলদেবের অলৌকিক শক্তির পরিচয় সম্বন্ধে বহু ইতিহাস প্রচলিত আছে। আমরা শ্রীবলদেবের দাসহৃত্রে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ করিব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মধব-সম্প্রদায়ভুক্ত

শ্রীবলদেবই সেই সময় হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে ব্যাসোক্ত চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ব্রহ্ম-মাদ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া বিশ্ববাসীকে জানাইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বলদেবের এই বিচারের পূর্বেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মধব-

সম্প্রদায়ের একটি শাখাস্বরূপ বিবেচিত হইত। কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুই মধ্ব-সম্প্রদায়ের জনৈক আচার্য্য শ্রীশ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদকে আচার্য্য স্বীকার করিয়া তাঁহার অনুগত সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিয়াছেন যে তাঁহারা সকলেই মধ্বসম্প্রদায়-ভূক্ত। আচার্য্য বলদেব আমাদেরকে যে গুরুপরম্পরা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুই প্রদর্শিত পরম্পরা। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আলোচনা করিলেও ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। নিম্নে বলদেব-প্রদর্শিত শ্রীগুরু-পরম্পরা পাঠকবর্গের অবগতির জ্ঞ প্রদত্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।

শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমদ্বহ্নি-মাধবান্ ॥

অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিকু-দয়ানিধীন্।

শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্মান্ ক্রমাদয়ম্ ॥

পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাস্চ সংস্কৃতম্।

ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥

তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরঈশ্বর-নিত্যানন্দান্ জগদগুরুন্।

দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ।

—প্রমেয় রত্নাবলী।

শ্রীবলদেব রূপানুগ বৈষ্ণব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য বলদেবের যে অর্জেষ্ঠ সঙ্গ তাহা বলা বাহুল্য। বলদেবের আচার বিচার ও ভজন-পদ্ধতি বর্ত্তমানকালেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি অঙ্গীকার করিয়াছেন। যেহেতু বলদেব রূপানুগ বৈষ্ণব। তাঁহার রূপানুগ তাঁহার বিবিধ গ্রন্থ হইতে প্রচারিত আছে। তাহারা শ্রীবলদেবকে রূপানুগ বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত তাঁহারা প্রকৃতই ভ্রান্ত ও বৈষ্ণব অপরাধী। এমন কি তাঁহারা সম্প্রদায়-অনুগত গুরুপরম্পরায় গুরুানুগত্যা ত্যাগ করিয়া শ্রীবলদেবের নাম উল্লেখ করিতে শঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। এক্ষণে অসং সম্প্রদায়কে ‘কর্ত্তাভজা,’ ‘কিশোরী-ভজা’ বা ‘ভজন-থাজা’ সম্প্রদায় বলিয়া আপ্যাদেয়া যাইতে পারে।

শ্রীবলদেবের আবির্ভাব কাল

শ্রীল বলদেবের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে স্থস্থির সিদ্ধান্তে আমরা এখনও উপনীত হইতে পারি নাই। তবে শ্রীল রূপগোস্বামীর সঙ্কলিত স্তবাবলীর টীকা প্রনয়ণের

কাল নিরূপণ করিতে গিয়া তিনি স্বয়ং ১৬৮৬ শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয় বর্তমান সময়ের কিঞ্চিদূর্দ্ধ দুইশত বৎসর পূর্বে তিনি ভৌম জগতে প্রকট ছিলেন। সেই সময়ে শ্রীশ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্তমান ছিলেন। আচার্য্য বলদেব তাঁহাকে তাঁহার শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়া-ছিলেন। বলদেবের পাঞ্চরাত্রিক গুরুপরম্পরা প্রদর্শনকালে আমরা এই সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিব।

শ্রীবলদেবের জাতি ও জন্মভূমি

শ্রীবলদেব গৌড়দেশ অর্থাৎ বাদ্বলা দেশের উপকণ্ঠে উৎকল দেশে বালেশ্বর জেলার উপরিভাগের অন্তর্গত রেমুণার নিকটবর্তী একটি পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উৎকল দেশে জন্মগ্রহণ করিলেও বলদেব কোন দিনই কোন প্রকার প্রাদেশিকতার কালিমার প্রশ্রয় দেন নাই। শ্রৌত্র-বৈষ্ণবকূলে উদ্ভূত বলিয়া তাঁহাকে কেহ বৈষ্ণব বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি কৃষিজীবী খণ্ডাইৎ জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ-কুল-তিলক বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং বহু শ্রৌত্র-ব্রাহ্মণ তাঁহার পদাবলেহন করিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে কেহই ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভব বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন নাই। তিনি তাঁহার নিজের জীবনের দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন ;—

যেতে কূলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।

তথাপিহ সর্বোত্তম সর্বশাস্ত্রে কয় ॥

কিবা বিপ্র, কিবা স্ত্রাসী, শূদ্র কেনে নয়।

যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই ‘গুরু’ হয় ॥

—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীগীতাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, “চাতুর্ধর্ম্যঃ স ময়া সৃষ্টঃ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।” অর্থাৎ গুণ এবং কর্ম্মানুসারে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র চারিটি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাগ্যকার বলদেব নিজে আচরণ করিয়া এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, এমন কি তাঁহার বর্ণের মধ্যে অনেকেই আজও উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীবলদেব দৈববর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠার অমৃতম আদর্শ

শ্রীল প্রভুপাদ এ সম্বন্ধে আমাদের কাছে যাহা জানাইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—‘যে সকল মতিচ্ছন্ন শৌত্রকুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণকব “যোহনধীত্য ষি জো বেদমন্ত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রতমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥” —এই স্মৃতি-

বাক্য গোপন করিয়া আপনাদিগকে ‘ব্রাহ্মণত্ব’-সংজ্ঞায় প্রচলিত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা ই বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণ-ক্রমেতর কুলে বৈষ্ণবাচার্যের জন্ম-গ্রহণ, বিদ্যাভূষণাদি সংজ্ঞা-গ্রহণ বা শ্রুত্যাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন সম্ভব নহে। তাঁহাদের ঐতিহ্যজ্ঞানের দরিদ্রতা নিতান্ত শোচনীয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই এই কল্লিত যুক্তির বিভঞ্জনকারী। বৃত্ত ব্রাহ্মণ হইতেই শৌক ব্রাহ্মণকুল উদ্ভূত হইয়া মন্বাদি-প্রচলিত স্মার্ত-ধর্ম গ্রহণ করেন। গীতাশাস্ত্র এই সকল মতবাদের বিরোধী বৃত্তবর্ণের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারতের স্থানে স্থানে, শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ গোপন-গ্রন্থ, আগম-প্রামাণ্য ও নারদাদি পঞ্চরাত্র, রামার্চন-চঞ্জিকা প্রভৃতি পদ্ধতি-গ্রন্থের আলোচনাভাবে বঙ্গীয় স্মার্তকুল শ্রৌত-পথের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি আচার্যকুল বহিস্মুখ অক্ষজবাদীর তর্কপথকুঞ্জরদন্ত ভগ্ন করিয়া দিয়াছেন। শ্রৌতপন্থা ভক্তিপথেরই নামান্তর। তর্কপন্থা বহিস্মুখ নাস্তিক সম্প্রদায়ের বাসনামূলে জাত।

শুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম ও একাকারত্ব এক নহে

তর্কপথের পথিকগণ সুবিধাবাদী। তাঁহারা স্ব স্ব বংশ-মর্যাদার অবস্থা বহুমান-করিবার জন্য শাস্ত্রযুক্তিকে উল্লঙ্ঘন করিতে বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ নহেন। ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু শ্রীমদ্রামপ্রভুর উদার-নীতি অনুসারে সমাজ সংগঠিত হইলে জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। বর্তমান সমাজ আপন আপন শৌক-পারম্পর্য্য অবলম্বন করিয়া যে বংশ মর্যাদা স্থাপন করিতেছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রকারকণের অভিপ্রেত নহে। বর্তমান যুগের রাজনৈতিকগণও ইহার উল্লঙ্ঘনকল্পে ব্যস্ত হইতেছেন। প্রকৃত শাস্ত্রানুগত সমাজ সংগঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যিক। অসমস্বীয় উচ্ছৃঙ্খল একাকারত্ব জগতের মঙ্গল-আনয়ন করিবে না। আমরা এসম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

ভাষ্যকারের গুরুপরম্পরা

ভাষ্যকারের গুরুপরম্পরা বিচার করিলে আমরা যে ঐতিহাসিক সত্য উপলব্ধি করি তাহা সংক্ষেপে আপনাদের নিকট বর্ণনা করিতেছি,—তিনি প্রথমতঃ বিরক্তশিরোমণি পিতাম্বর দাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করেন। পরে রাধাদামোদর দাস নামক একজন কান্তকৃষ্ণবাদী শৌক ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত হন। শ্রীরাধা-দামোদর বেদান্ত শ্রামন্তকের লেখক এবং রমিকানন্দ মুরারীর পৌত্র। তিনি অপর একজন

কান্তকূজীয় ব্রাহ্মণ শ্রীনয়নানন্দ দেব গোস্বামীর নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। রসিকানন্দ প্রভু ভাষ্যকারের পাঞ্চরাত্রিক গুরুপারম্পর্য্যে চতুর্থ পূর্বপুরুষ। রসিকানন্দ প্রভু শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য। পূর্বে যে নয়নানন্দ দেব গোস্বামীর উল্লেখ করিয়াছি তিনি রসিকানন্দ প্রভুর পুত্র। শ্যামানন্দের গুরু গৌরীদাস পণ্ডিত। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু গৌরীদাস পণ্ডিতকে রূপা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু আচার্য্য হৃদয় চৈতন্তের শিষ্য হইলেও পরবর্ত্তীকালে শ্রীজীব গোস্বামীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণপাদেবের শিষ্য এবং রূপপাদ শ্রীসনাতনের শিষ্য। শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত সহচর।

ভাষ্যকারের শিষ্যপরম্পরা

শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত পাঞ্চরাত্রিক পরম্পরার উল্লেখ করিলাম। উদ্ধবদাস, কোথাও বা উদ্ধরদাস নামে ভাষ্যকারের শিষ্যরূপে উল্লেখ দেখা যায়। কাহারও মতে উহার পৃথক ব্যক্তি। সে যাহাই হউক না কেন, উদ্ধবদাসের শ্রীমধুসূদন দাস নামে এক শিষ্য ছিলেন। শ্রীজগন্নাথ তাঁহারই শিষ্য। যিনি সিদ্ধ জগন্নাথ দাস নামে কিছুদিন পূর্বে মাধুরমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও গোড়মণ্ডলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজকেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভাগবত-পারম্পর্য্যমতে ভজন শিক্ষায় গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সার্বভৌম জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নির্দেশানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রকাশ করেন। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের ভজন-গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ মদীয় গুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে দীক্ষামন্ত্রাদি প্রদান করিয়া শিষ্যত্বে বরণ করেন। এই পারম্পর্য্য যাহারা স্বীকার করিতে অক্ষম তাঁহারা তোতারাম বাবাজী মহারাজের উল্লিখিত তের অপসম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত অথবা চতুর্দশম সম্প্রদায়ের উৎপত্তিকর্ত্তা।

পাঞ্চরাত্রিক-পারম্পর্য্য ও ভাগবত-পারম্পর্য্য

উল্লিখিত গুরুপরম্পরা হইতে আমরা দেখিতেছি শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত শ্যামানন্দ পরিবারভুক্ত। আচার্য্য শ্যামানন্দ শ্রীজীব গোস্বামীর অনুগত্য স্বীকার করায় এবং শ্রীজীব একান্ত রূপানুগ বিধায় শ্রীবলদেবও রূপানুগ বৈষ্ণব। যাহারা শ্রীবলদেবকে রূপানুগ মনে না করিয়া

শ্রামানন্দ পরিবারভুক্ত বলিয়া উন্নত-উজ্জল রসের পরমোচ্চতম সেবাভাগের অধিকারী নহেন বলিয়া মনে করেন তাঁহারা প্রকৃতই ভ্রান্ত ও অপরাধী। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীরাধাদামোদর দাসের নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেও শ্রীবিংশনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্রিক-পারম্পর্য্য ব্যতীত ভাগবত পারম্পর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। ভাগবত-পারম্পর্য্য ভজন-নিষ্ঠার তারতম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাগবত পারম্পর্য্যে পাঞ্চরাত্রিক পারম্পর্য্য অনুষ্মাত থাকে বলিয়া ভাগবত-পারম্পর্য্যেরই মাধুর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। ইহাতে কালগত ব্যবধান থাকে না। শুদ্ধ-ভক্তির বিচারে পাঞ্চরাত্রিক এবং ভাগবত সম্প্রদায় উভয় মতই, একার্থ-প্রতিপাদক'। চৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—‘পঞ্চরাত্র, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।’—(মধ্য-১১১।১১২)। প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায় যেরূপ ‘শ্রীকৃষ্ণগোস্বামীর অনুগত জন’ পরিচয় দিয়া আচার্য্য শ্রীজীবের চরণে অপরাধরাশি সঞ্চয় করেন, অধুনাতন জাতি-গোস্বামীকুলের উচ্ছিষ্টভোজী কতিপয় সহজিয়া ‘কর্ত্তাভজা’, ‘কিশোরীভজা’ ও ভজন-খাজা’ সম্প্রদায় চক্রবর্তী ঠাকুরের অনুগত অভিমানে ভাষ্যকার শ্রীবলদেবের প্রতি নানাপ্রকার অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া অত্যন্ত ঘৃণিত নরকগামী হইয়া থাকেন।

শ্রীবলদেবের গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীবলদেব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ব্যতীত বহু গ্রন্থের রচয়িতা ও টীকাকর্ত্তা। তিনি প্রেমের রত্নাবলী নামে একখানি সন্ধ্যায়তন গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাতে প্রভূত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। বিংশনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের জনৈক শিষ্য কৃষ্ণদেব এই গ্রন্থের একটি সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছেন। বেদান্তাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন তাহার নাম ‘শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য’। স্বয়ং গোবিন্দদেব তাঁহাকে এই ভাষ্য রচনা করিতে প্রেরণা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই ভাষ্যের নাম ‘গোবিন্দভাষ্য’। যে কালে রামানুজীয় মতাবলম্বিগণ জয়পুরে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির অধিকারপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়গণের বৈষ্ণবধিকার খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীবলদেবই শ্রীচক্রবর্তী প্রমুখ বৃন্দাবনবাসী প্রাচীন বৈষ্ণবগণের অহুমতিক্রমে জয়পুরে গিয়া তাঁহাদিগকে উক্ত গোবিন্দভাষ্যের বিচারের দ্বারা পরাজিত করেন। সেই জয়পুরেই গোবিন্দদেবের নির্দেশানুসারে গোবিন্দভাষ্য রচিত হয়। এই ভাষ্যের একটি টীকাও তিনি রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ‘সিদ্ধান্ত রত্ন’ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের অপর

নাম ভাষ্যপীঠক। ইহারও একটা টীকা তাঁহার নিজেরই রচিত। এতদ্ব্যতীত সাহিত্য কৌমুদী নামে একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ নির্ণয়-সাগর যন্ত্রে কতিপয় বংসর পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত ব্যাকরণ-কৌমুদী নামক একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ অতাপি মুদ্রিত না হইয়া বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণাচার্য্য-শ্রেরায় রহিয়াছে। বলদেব তত্ত্বসন্দর্ভের একটা টীকা রচনা করিয়া প্রভূত পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচিত দশখানি উপনিষদ-ভাষ্যের সকলগুলি পাওয়া না গেলেও ঈশাবাস্তুর ভাষ্য কয়েকটি সংস্করণ বৈষ্ণব-করকমল বিভূষিত করিতেছে। সিদ্ধান্ত দর্পণ, কাব্য-কৌস্তভ নামক গ্রন্থসমূহ তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। ভাষ্যকার গোপালতাপনী-ভাষ্য, কৃষ্ণানন্দিনী টীকা, ছন্দকৌস্তভ, লঘুভাগবত-মূর্তের টীকা প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। শুনা যায় তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের একটা টীকাও প্রচারিত ছিল। জয়দেবের চন্দ্রালোক নামক অলঙ্কার গ্রন্থের টীকা ও শ্রীকৃষ্ণের নাটকচন্দ্রিকার টীকা তিনি রচনা করিয়া বৈষ্ণব জগতে অলৌকিক পাণ্ডিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ভাষ্যকারের রচিত গ্রন্থের সংক্ষেপ পরিচয় প্রদান করিয়া অণু ক্লান্ত হইতেছি। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ যেরূপাচ্ছন্ন রসিকভক্ত ছিলেন, আমরা তাঁহার গ্রন্থ হইতে আলোচনা করিয়া ক্রমশঃ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায় পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিব।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেবের অভিন্ন বিগ্রহ

শ্রীল প্রভুগাদের সাক্ষর

Bhakṭi Siddhanta
Saraswati

শ্রীগুরুদেব

অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণের বিবিধ বিলাস ।
 গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রেতে প্রকাশ ॥
 ভেদাভেদ পরিচয় নিত্য দৌহাসনে ।
 শক্তি শক্তিমান্ বলি সাধুজন জানে ॥
 গুরু ভোক্তা কভু নহে আশ্রয় ভগবান ।
 বিষয় বিগ্রহ পূজ্য তাঁহারই সমান ॥
 ভগবানে প্রীতিদান তাঁর নিত্যধর্ম ।
 জীব উদ্ধারণ লীলা আর এক কর্ম ॥
 জীব পরিত্রাণ পায় তাঁহার শরণে ।
 ভগবদ্ কৃপা নহে গুরু কৃপা বিনে ॥
 জানিয়া গুনিয়া যেবা গুরু নাহি ভজে ।
 কৃষ্ণকৃপা দূরে রহু রৌরবে পড়ি মজে ॥
 দাস্তিক বলিয়া কৃষ্ণ তারে না দেখয় ।
 দীন জনে কৃপা তার বহুত আছয় ॥
 কৃষ্ণের পূজায় কৃষ্ণ যত প্রীত হন ।
 ততোধিক তুষ্ট করে শ্রীগুরু সেবন ।
 ভবসিদ্ধি কর্ণধার গুরুপাদপদ্ম ।
 পরম কল্যাণখনি ভকতির সদ্ম ॥
 অহৈতুকী কৃপাসিদ্ধি প্রেমের মূরতি ।
 সেবকেতে স্নেহময় জনক যেমতি ॥
 সকল বৈষ্ণব মোরে হইউন পরসন্ন ।
 গুরু পাদপদ্ম সেবি হই যেন ধন্য ॥
 হে গুরো করুণাসিক্তো অনাথের নাথ ।
 তোমার চরণে মোর কোটী প্রণিপাত ॥

—শ্রীরাধানাথ দাস অধিকারী

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,

চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ,
জেলা হুগলী (পশ্চিম বঙ্গ)
২১শে মাঘ, ১৩৫৫ সাল।

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রমণসজ্জারাদ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৫, ইং ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯, শুক্রবার, ব্যাসাভিন্ন জগৎগুরু ঔবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবতিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরোক্ত মঠে আগামী ৪ঠা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার হইতে ৬ই ফাল্গুন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার পর্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, শ্রীব্রহ্মাদি আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদিপঞ্চক, শ্রীগুরুপঞ্চক এবং তত্ত্বপঞ্চকের পূজা ও হোম প্রভৃতি বিরাট ভাবে অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ মনোহরসাহী কীর্তন, ভাগবতপাঠ, বক্তৃতা, জবপাঠ, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসংগন ও অঞ্জলিপ্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান অঙ্গ।

ধর্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাক্ষব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেকীকাধ্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দৃষ্টব্য :—বুধবার পূর্বাঙ্কে শ্রীশ্রীপূজাপঞ্চকাদি, বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা, সন্ধ্যার পর প্রসাদসেবা। শুক্রবার পূর্বাঙ্কে শ্রীপ্রভুপাদের শ্রীপাদপদে অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজা

পূজাপঞ্চকের অনুষ্ঠান

পূর্ববৎসরের ন্যায় এবৎসরও নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ব্যাসপূজা বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ৪ঠা ফাল্গুন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মহোদয় স্বয়ং ব্যাসপূজা উপলক্ষে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত থাকিয়া স্মৃতির বিধান অনুযায়ী পূজাপঞ্চকাদির যথারীতি শুদ্ধ হৃদয়ে অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

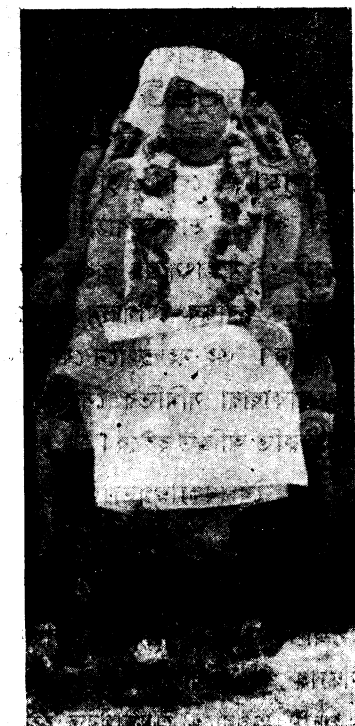
শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত ঐকান্তিক সেবকগণের পক্ষে কেবলমাত্র তত্ত্বপঞ্চকের পূজা ও হোমাদি করিলেই চলিতে পারে; কিন্তু তত্ত্বপঞ্চকের পূজার সহায়ক-রূপেই বৈষ্ণবগণ পূজাপঞ্চকের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সুতরাং ব্যাসপূজায় পূজাপঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চক উভয়েরই পূজা স্বয়ং সভাপতি-মহারাজের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছেন।

অভিনন্দন পাঠ

দ্বিতীয় দিবস ৫ই ফাল্গুন হিন্দী ভাষায় ২টী ও বাংলাভাষায় গুণ ও পদ্মে ৮টী অভিনন্দন আলোচিত হয় ও হরিকথা কীর্তন হয়। পত্রিকার এই সংখ্যায় স্থানাভাবেহু উহা প্রকাশিত হইল না। সময়ান্তরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

অঞ্জলি প্রদান

৬ই ফাল্গুন শুক্রবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব দিবসে ব্যাসপূজার বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য শ্রীমন্দিরের সম্মুখে বিচিত্র বসনের দ্বারা ও নানাপ্রকার সুশোভিত পুষ্পমালা দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। অঞ্জলি প্রদানের পূর্বে পণ্ডিত শ্রীযুত দীনাক্ষিত্র ব্রহ্মচারী 'শ্রীল প্রভুপাদ-দশকম্' অর্থাৎ 'শ্রীস্বজনাক্ষুদ' স্তোত্র,



তৎপরে 'গুরুষ্টক'—'সংসারদাবানললীচ', 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম', 'গুরুপরম্পরা'—

“শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মদেবর্ষি” এবং পরে পঞ্চতরু ও মহামন্ত্র কীৰ্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীহরিসাধন ব্রজবাসী শ্রীল প্রভুপাদের আরতি করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদের প্রবীণ একনিষ্ঠ সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী প্রভুর আত্মগত্যে সকলে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। সমাগত শ্রী পুরুষ সকলেই জগদগুরুর শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা-মহারাজ শ্রীব্যাসপূজা সম্বন্ধে অপরূহ ৫ ঘটিকার সময় আলোচনা করিবেন বলিয়া নিবেদন জানাইলে শ্রোতৃমণ্ডলী সকলে প্রসাদ সেবনান্তে যথাসময়ে সভাস্থলে পুনরায় উপস্থিত হন।

শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে বক্তৃতা

সভা আরম্ভ হইবার পূর্বে “জয়রে জয়রে জয় পরমহংস মহাশয়” এই গীতিটি উক্ত ব্রহ্মচারীজী অতি সুললিত কণ্ঠে কীৰ্ত্তন করেন। তৎপরে সভাপতি মহারাজ বক্তৃতামুখে শ্রোতৃমণ্ডলীকে যাহা পরিবেশন করিয়াছেন সংক্ষেপে নিয়ে তাহা বিবৃত হইল।

শ্রীল প্রভুপাদই ব্যাসপূজার প্রবর্তক

প্রতি বৎসরই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে ব্যাসপূজা অহুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং এতদপ্রসঙ্গে বহু কথাই আপনাদের নিকট নিবেদন করা হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমন্তুক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরই বঙ্গদেশে এই ব্যাসপূজার প্রবর্তনকর্তা। শুধু বঙ্গদেশ কেন সমগ্র ভারতেই বিগুপ্ত ব্যাসপূজা তাঁহার দ্বারাই অহুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্বে শ্রীমন্নহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুর দ্বারা শ্রীবাস অঙ্গনে এই ব্যাসপূজার প্রথম অধিবেশন করিলেও উহার আচার-বিচার-পদ্ধতি তাঁহাদের পরবর্ত্তীকালে লোকসমাজে বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

শাক্তরসম্প্রদায়ে ব্যাসপূজার ভাণ বর্ত্তমান

ব্যাসাচ্যুতাই জীবের পক্ষে মঙ্গলের আকর। ইহা জগৎজীবকে জানানই ব্যাসপূজার প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতের বহু ধর্মসম্প্রদায় থাকিলেও সকলেই ব্যাসাচ্যুত নহে। শাক্তর সম্প্রদায় জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ব্যাসপূজা করিয়া থাকিলেও তাহা ব্যাসপূজা নহে—ব্যাসপূজার ভাণমাত্র। যাহাকে পূজা করিতে হয় তিনি ভ্রান্ত একরূপ বিচার যাহাদের—তাহাদের পক্ষে ব্যাসপূজা বিড়ম্বনা-বিশেষ। আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের আনন্দময়াধিকরণে ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী আচার্য্য

শঙ্করের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“বাস ভ্রান্ত বলি’ তার উঠাইল বিবাদ” (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৭।১২১)। এই শ্রেণীর সম্প্রদায়ের পক্ষে বাসপূজা প্রকৃত বাসপূজা নহে। সুতরাং সমগ্র ভারতে শ্রীল প্রভুপাদই প্রকৃত বাসপূজার প্রবর্তন কর্তা।

অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ে ব্যাসানুগত্যের অভাব

শ্রীমন্ন্যূহাপ্রভুর আবির্ভাব সময়ে ভারতে ধর্মচিন্তাস্রোতের বহু প্রবাহিত হইয়াছিল। সকল প্রদেশেই দাম্বিক মনিষীবৃন্দের ইতিহাস পাওয়া যায়। পশ্চিমদেশে ভক্ত তুলসীদাস, পাঞ্জাবে গুরু নানক, উড়িষ্যায় অতিবাড়ী জগন্নাথ, আসামে হঙ্করদেব বা শঙ্করদেব ও বাংলায় শ্রীমন্ন্যূহাপ্রভুর অন্তর্গত শ্রীবৃন্দাবন দাস ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতির কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মনিষী বৃন্দের প্রকরণ গ্রন্থগুলি বর্তমানযুগে ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ধর্ম চিন্তাস্রোত বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে। সকলেই অল্পবিস্তর ব্যাসের রচিত ও সংকলিত শাস্ত্রাদিকে অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তুলসীদাসের রামায়ণ, পাঞ্জাবে গুরুনানকের গ্রন্থসাহেব, উড়িষ্যায় জগন্নাথ দাসের ভাগবত, আসামে শঙ্করদেবের কীর্ত্তনবোধী প্রভৃতি প্রকরণ গ্রন্থসমূহ প্রচারিত হইবার পর সকলেই ব্যাসের মূল গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া প্রকরণ গ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করিয়া ধর্মজীবন অভিযাহিত করিতে লাগিল। কিন্তু বাংলাদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি প্রকরণ গ্রন্থসমূহ ব্যাসানুগত্যে রচিত হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মযাজী সকলেই উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের শিক্ষাকে হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্থান দিয়াও ব্যাসের আনুগত্য পরিত্যাগ করেন নাই। বেদব্যাস-রচিত শ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একমাত্র জীবাত্ম। শ্রীমন্ন্যূহাপ্রভুই ব্যাসানুগত্য শিক্ষার মূল পুরুষোত্তম। তাহা কালক্রমে বিলুপ্ত হইলে শ্রীল প্রভুপাদই তাহার উদ্ধার করিয়া জগৎতরু সমক্ষে ব্যাসানুগত্যের প্রকৃত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা আজ তাঁহার আবির্ভাব দিবসে চিরকৃতজ্ঞ হইয়া আবদ্ধ থাকিয়া প্রদ্বাজগি নিবেদন করিতেছি।

[সভাপতি মহারাজের উল্লিখিত অভিভাষণ সমাপ্ত হইলে পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লেখা-অর্চা-মূর্তির সন্ধ্যা-আরতি করা হয়। আরতিকালে যে গীতিটা কীর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য মুদ্রিত হইল।]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাদেও জয়তঃ

শ্রীল-প্রভুপাদের আরতি

জয় জয় প্রভুপাদের আরতি নেহারি ।
 যোগমায়াপুর নিত্য সেবাদানকারী ॥
 সর্বত্র প্রচার ধূপ সৌরভ মনোহর ।
 বদ্ধ মুক্ত অলিকুল মুখ চরাচর ॥
 ভকতি সিদ্ধান্ত দীপ জ্বালিলা জগতে ।
 পঞ্চরস-সেবা-শিখা প্রদীপ্ত তাহাতে ॥
 পঞ্চ মহাদীপ যথা পঞ্চ মহাজ্যোতিঃ ।
 ত্রিলোক-তিমির নাশে অবিষ্টা দুর্মতি ॥
 ভকতিবিনোদধারা জল-শঙ্খ-ধার ।
 নিরবধি বহে তাহা রোধ নাহি আর ॥
 সর্ববাত্মময়ী ঘণ্টা বাজে সর্বকাল ।
 বহুত মৃদঙ্গবাণ্ড পরম রসাল ॥
 বিশাল ললাটে শোভে তিলক উজ্জ্বল ।
 গলদেশে তুলসীমালা করে বলমল ॥
 আজানুলম্বিত বাহু দীর্ঘ কলেবর ।
 তপ্ত-কাঞ্চন-বরণ পরম সুন্দর ॥
 ললিত লাবণ্য মুখে স্নেহভরা হাসি ।
 অঙ্গকান্তি শোভে যৈছে নিত্য পূর্ণশশী ॥
 যতিধর্ম্যে পরিধানে অরুণ-বসন ।
 মুক্ত হৈল মেঘাবৃত গৌড়ীয় গগন ॥
 ভকতি কুসুমে কত কুঞ্জ বিরচিত ।
 সৌন্দর্য্যে সৌরভে তার বিশ্ব বিমোহিত ॥
 সেবাদর্শে নরহরি চামর ঢুলায় ।
 কেশব অতি অভাগা নিরাজন গায় ॥

শ্রীশ্রীদ্বারকাধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীউর্জব্রত

(১) শ্রীগোড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্ষা শ্রীমদুক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ বিগত কার্তিক মাসে দেশবাসীকে শ্রীউর্জব্রত-পালন-মুখে শ্রীদ্বারকাধাম পরিক্রমা এবং অন্ত্যাত্ম কতিপয় বিশিষ্ট তীর্থস্থান সন্দর্শনের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য ২৫০ আড়াইশত ধর্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয় ও মহিলাগণ এতদুচ্ছ্রুতানে যোগদান করিয়া নিতামঙ্গল অর্জন করিয়াছেন। তাঁহারা বিগত ২রা কার্তিক ১৯শে অক্টোবর তারিখে হাওড়া স্টেশন হইতে তুফান এক্সপ্রেসে ২ থানি বগি রিজার্ভ করিয়া যাত্রা করেন।

(২) দ্বারকা পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য এই যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং অর্চ্য-মূর্তিতে একটা সুসজ্জিত শিবিকায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সমিতির সম্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ ইহা বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। ইহাতে যাবতীয় দর্শক মণ্ডলীর চিত্ত প্রচুর পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছিল। পরিক্রমাকারিগণ যুদ্ধ, করতাল, ঘণ্টা, কাসর ও বিবিধ বর্ণের পতাকা প্রভৃতি যোগে উচ্চ কীর্তন করিতে করিতে তাঁহারই অনুগমন করিতেন।

(৩) হাওড়া হইতে তাঁহারা প্রথমে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামে উপস্থিত হন এবং শ্রীশ্রীমদনমোহন, শ্রীশ্রীগোবিন্দ ও অন্ত্যাত্ম বিগ্রহ, বিভিন্ন লীলাস্বলী এবং ভক্তস্থানসমূহ দর্শন করেন। পরিক্রমাকালে বিভিন্নস্থলের বর্ণন উপলক্ষে সমিতির সভাপতি মহারাজ সমাগত ভক্ত মহোদয়গণের নিকট কৃপাপূর্বক বক্তৃতা প্রদান করেন।

(ক) যখন দাবানল কুণ্ডে পরিক্রমা সজ্জ উপস্থিত হন তখন তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই :— অগ্নিমানি যোগসিদ্ধি প্রভাবে কোনও ব্যক্তিতে কোনও প্রকার আশ্চর্যজনক কিছু প্রদর্শিত হইলেই তাহাকে সাধু বলিয়া বিবেচনা করা উচিত হইবে না। পরন্তু ভগবৎ-সেবাপরায়ণ ব্যক্তিতে কোন প্রকার এরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপার পরিদৃষ্ট মা হইলেও তাহাকেই সাধু বলিয়া জানিতে হইবে। প্রলম্বাস্থরের বন্ধু দীর্ঘায়ুরূপ ধারণ করিতে সক্ষম হইলেও তাহাকে কেহ সাধু বলেন নাই, যেহেতু সে ভগবান্ কৃষ্ণের বিরোধী হইয়া তাহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

(খ) **শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের স্থানে বক্তৃতাকালে—**

“কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশ পুষ্পায়তে

হৃদান্তেন্দ্রিয়-কালসর্পগটলী প্রোংখাত দংষ্ট্রায়তে ।

বিশ্বং পূর্ণস্থায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে

যৎ কারুণ্য কটাক্ষবৈভবতাং তং গৌরমেব স্তমঃ ॥”

শ্লোকটি আলোচনামুখে তিনি বলিয়াছেন—মায়াবাদিগণ কৈবল্য-মুক্তিকে চরম সাধ্য বিবেচনা করিয়া একদণ্ড সম্মাস গ্রহণ করেন কিন্তু শ্রীমন্নহা-প্রভুর কৃপাকটাক্ষ-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ মায়াবাদিগণের চরম সাধ্য মুক্তিকে নরক-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ভগবদ্ভক্তি লাভের উদ্দেশ্যেই ত্রিদণ্ড-সম্মাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর তাহার জলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ।

(গ) **কালীয় হ্রদে বক্তৃতাকালে** তিনি জ্ঞানান যে—স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে কালীয় কর্তৃক আক্রান্ত দর্শন করিয়া সমীপবর্তী সখাগণ এবং মাতা ও মাতৃস্থানীয়া গোপিগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তাঁহাদের ব্যাকুলতার তারতম্য বিচার করিলে সখ্যরস অপেক্ষা বাৎসল্য রসের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা যায়।

(ঘ) **মির্জাপুর ধর্মশালায়** অবস্থানকালে সন্ধ্যার সময় সভাপতি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের “গোবিন্দভূজগুপ্তায়াং দ্বারাভ্যাং কুরুত্বহ” শ্লোকের ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীনারদ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লালসায় দ্বারকায় প্রায়ই আগমন করিতেন—ইহা উল্লেখ করিয়া পরিক্রমাকারী ভক্তগণের নিকট কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবার উদ্দেশ্যেই দ্বারকা পরিক্রমার তাৎপর্য বলিয়া বর্ণনা করেন।

(৪) **শ্রীবৃন্দাবন হইতে** পরিক্রমাসজ্জ **শ্রীমথুরাধামে** উপস্থিত হন এবং তথাকার দর্শন সমাপনান্তে আগ্রা হইয়া জয়পুর যাত্রা করেন।

(৫ক) অতি প্রত্যুষে পরিক্রমাসজ্জ **জয়পুর ষ্টেশনে** অবতরণ করেন। পূর্বত-বেষ্টিত জয়পুরের প্রাকৃতিক শোভা বিশেষতঃ যখন তাঁহারা শ্রীমন্নহা-প্রভুর অর্চ্যমূর্তিকে অগ্রবর্তী করিয়া সংকীর্ণ সংযোগে তাঁহার অনুগমন করিতে করিতে পূর্ব নিদ্রিষ্ট ধর্মশালাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন সূর্য্যোদয়ের পূর্বাকাশ রক্তিম ছটায় উদ্ভাসিত করিয়া পাহাড়ের মধ্য হইতে তদীয় আরাধ্যদেব শ্রীমন্নহা-প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অতীব সন্মের সহিত নিনিমেষ নেত্রে দর্শন করিতে দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হন। তাঁহারা “উদিল অরুণ” গীতিটি স্মরণ করিতে করিতে এবং মহামন্ত্র কীর্ণন করিতে করিতে ধর্মশালায় উপস্থিত হন। স্থানীয়

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী “শঙ্করলাল রূপনারায়ণ”এর সত্বাধিকারী মহোদয় পরিক্রমা সঙ্ঘকে ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করিতে আসিয়াছিলেন। পরিক্রমার অহুগমন করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং তিনি পাণ্ডকা দূরে নিক্ষেপ করতঃ নগ্নপদ হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিবিকা স্তবীর্ণপথ বহন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

(খ) তথায় তাঁহারা আদি শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীগোপীনাথজী ও অগ্ন্যাত্ত বিগ্রহগণের দর্শন লাভ করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করেন। জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী আশ্বেরের নিকটবর্তী গীতগোবিন্দ-রচয়িতা শ্রীজয়দেব কবির সেবিত শ্রীশ্রীরাধামাধবজীর দর্শন লাভ করিয়া ভক্তযাত্রিগণ সমিতির প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন।

(গ) এই জয়পুর হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে সুউচ্চ পর্বত-বেষ্টিত স্থল—**গলতা পাহাড়** নামে পরিচিত। এই স্থানে গোবিন্দ ভাষ্যের রচয়িতা শ্রীমদ্বলদেব বিখ্যাত প্রভু, যাহার গৌরবে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতি বিশেষভাবে গৌরবান্বিত, তিনি তদানীন্তন শ্রী, রামানন্দী ও অগ্ন্যাত্ত সম্প্রদায়ের সহিত বিচারে জয়লাভ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের সমুজ্জল পতাকা সর্বোচ্চে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্থান গৌড়ীয় মাত্রেরই বিশেষতঃ মদীয় শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির পরম গৌরবের স্থল। এই স্থানে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্বক্তা প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ রূপাপূর্বক সমবেত জনগনের নিকট অত্যন্ত আবেগভরে ২১৩ ঘণ্টাকাল যাবৎ শ্রীপাদ বলদেব প্রভুর বিজয়-কাহিনী ও হরিকথা কীর্তন করিয়াছিলেন। গলতাগাদীস্থ মঠের মোহান্ত মহারাজ রামানন্দী শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্য। তিনি স্বামীজী ও তাঁহার সেবকগণকে এবং যাত্রিগণকে প্রচুর সম্মান প্রদর্শন করেন ও বিশেষভাবে প্রসাদ সেবার আয়োজন করেন। পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজের আদেশে মঠ-সেবকগণ তথায় রন্ধন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ দিয়া প্রসাদ পান। তাহাতে সকলেরই মনে বলদেবের পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল যেন পরাজিত-সম্প্রদায় বিজিত-সম্প্রদায়কে সম্মান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আমরা তথাকার মোহান্ত মহারাজকে সাদরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

(৬) জয়পুর হইতে পরিক্রমাসঙ্ঘ আজমীর হইয়া **পুষ্করতীর্থে** উপস্থিত হন এবং পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ তথায় কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া পুষ্করস্নান, দর্শনাদি ও প্রত্যহ পাঠকীর্তন শ্রবনের স্বযোগ লাভ করেন। পুষ্কর হইতে

আজমীরে একরাত্র অবস্থান করিয়া পরিক্রমাকারিগণ পোরবন্দরাভিমুখে অগ্রসর হন।

(৭ক) যথাসময়ে যাত্রিগণ পোরবন্দরে উপস্থিত হন। সুদীর্ঘ পথ আসিতে তাঁহাদের দুই দিনের অধিক সময় লাগিলেও নিয়ামক মহারাজের সুব্যবস্থায় তাঁহাদের কোনরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। সুদামাপুরীর বর্তমান নাম পোরবন্দর। এই স্থান কৃষ্ণসখা শ্রীসুদামাবিপ্রেস নামান্তসারে সুদামাপুরী হইয়াছে। শ্রীমন্দিরে সুদামাবিপ্রে সিংহাসনোপবিষ্ট এবং দ্বারকা-দ্বীপজী তাঁহার পদসেবারত দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবানের এইরূপ ভক্তবাৎসল্য দর্শন করিয়া সাধুগণ পরমানন্দ লাভ করেন। এখানে (নাট্যমন্দিরে) সমিতির অত্যন্তম প্রচারক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ-নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিকমল প্রভু হিন্দী ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অল্পগত শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় গান্ধি সম্প্রদায়ের লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে ও জৈনিক প্রবাসী বাঙ্গালী ডাক্তার এন, এল, জ্যোতি মহোদয়ের গৃহে সমবেত স্থানীয় বিদ্বৎশ্রী নিকট শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যামুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত রাগী কীর্তন করা হয়।

(খ) পোরবন্দর হইতে ১৬ মাইল দূরে মূল-দ্বারকা-মথুরা হইতে দ্বারকা আসার পথে ভগবান্ কৃষ্ণের বিশ্রামস্থল। পরিক্রমাকারিগণ তথায় শ্রীমন্দির মধ্যে ভগবান্ দ্বারকানাথের পাদদেশে শ্রীশিবলিঙ্গকে অবস্থান করিতে দেখিতে পান। ইহা দর্শনে সিদ্ধান্তবিদ সজ্জনবর্গ পরমানন্দ লাভ করেন। মন্দিরের সেবকগণ প্রসাদ, চন্দন ও মাল্যদ্বারা সভাপতি মহারাজের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। মূল দ্বারকা দর্শনান্তে যাত্রিগণ পোরবন্দরে প্রত্যাবর্তন করেন, তথা হইতে “সোণাবতী” নামী সমুদ্র-জাহাজ-যোশে বেট দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করেন।

(৮) ২৪ ঘণ্টা সমুদ্রবক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্তনমুখে অবস্থান করিয়া যাত্রিগণ সমুদ্রযাত্রার প্রচুর আনন্দের সহিত পরদিবস বেট দ্বারকায় উপস্থিত হন। দ্বীপকে এতৎপ্রদেশে বেট কহে। এই দ্বারকা প্রায় চতুর্দিকেই সমুদ্র-বেষ্টিত বলিয়া ইহার নাম বেট দ্বারকা। এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া যাত্রিগণ শ্রীদ্বারকাধীশ এবং অগ্ন্যাগ্নি বিগ্রহাদি ও শঙ্খকুণ্ড প্রভৃতি দর্শনের সুযোগ লাভ করেন। পরিক্রমা সজ্জ শ্রীদ্বারকাধীশের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলে সেবকগণ অতীব যত্নসহকারে সকলকে দর্শনের সুযোগ দিয়াছেন এবং তাঁহারা

পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজের গলদেশে ও তাঁহার ত্রিদণ্ডে প্রসাদীমালা দান করিয়া সন্ন্যাসী ও ত্রিদণ্ডের প্রতি মর্যাদাজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

(৯) বেট হইতে ৬ মাইল সমুদ্র পার হইয়া যাত্রিগণ গৌপীতলাও দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। গোপিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দাবনে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে আসিয়া এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ইহা অতীব আদরের স্থান। তজ্জন্ত ভক্তগণ সকলেই এই স্থান হইতে গোপীপদরজঃ সংগ্রহ করিয়া লন। এখান হইতে পরিক্রমাসভ্য গোমতী-দ্বারকা অভিমুখে অগ্রসর হন।

(১০ক) যথাসময়ে পরিক্রমাকারিগণ গোমতীদ্বারকায় উপস্থিত হন এবং সমিতির সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারি-বাহিত শিবিকাক্রুত শ্রীমন্নহাপ্রভুর অন্নগমন করিয়া সংকীর্তন সহযোগে শ্রীদ্বারকাধীশের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হন। শ্রীমন্নহাপ্রভু শিবিকা-সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলে মন্দিরের সেবকগণ পুষ্পমালাদির দ্বারা শ্রীমন্নহাপ্রভুর পূজা বিধান করেন। ক্রমশঃ দর্শকবৃন্দ-প্রদত্ত মালায় শ্রীমন্নহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ আবৃতপ্রায় হইয়া উঠে। এতদ্ প্রদেশের অনেক অধিবাসী শ্রীমন্নহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানিতেন না; তাঁহারা তাঁহাকে ভক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিতেন। কিন্তু গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারফলে ও তাঁহার অর্চ্চামূর্তি দর্শন করিয়া তাঁহাদের সে ধারণা দূরীভূত হইয়াছে। পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ শ্রীদ্বারকাধীশের পূজা বিধান করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করেন। তৎপরে তাঁহারা গোমতীতে স্নান করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

(খ) এই স্থানে অবস্থানকালে পরমাধ্য নিতালীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীজন্ম গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-তিথি আসিয়া উপস্থিত হন। এই দিবস সন্ধ্যায় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমন্ত্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ এবং মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ তক্তিকমলপ্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ বক্তৃতামুখে শ্রীল ঋষাঙ্গী মহারাজের সেবা করেন। সভাপতি মহারাজের বক্তৃতায় ভাগবত পারম্পর্য্যের কিচিৎ-খায়াটি সকলকে আকৃষ্ট করে। তিনি যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম—

গুরুপারম্পর্য্য কেনিরূপ মায়িক কালের মধ্যে আবদ্ধ নহে। মায়িক কালের ব্যবধান থাকিলেও পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণই থাকে। যেহেতু গুরুপাদপদ্য মায়াতীত বস্তু। তিনি কাল-স্ফোভা বস্তু নহেন।

তাহার আর একটি বিচারধারাও সকলের অতীব চিত্তগ্রাহী হইয়াছিল—

“গুরু ছাড়ি গৌরান্দ্র ভজে ।

সে পাপী নরকে মজে ॥”

বর্তমান সময়ে এইরূপ বিচারের বিরোধী গৌড়ীয় নামধারী কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয়। সাক্ষাৎ গুরুমুখনিঃসৃত বাণীকে বিশ্বাস না করিয়া শাস্ত্রবাণীকে বিশ্বাস করা একটি অভিনয় ছাড়া কিছু নহে। কারণ শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়—

যস্য দেবে পরাভক্তিৰ্যথা দেবে তথা গুরো।

তস্মৈতে কথিতা হর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

(১১) গোমতী দ্বারকায় পরিক্রমাসম্বয় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া দ্বারকাধীশের প্রচুর দর্শনলাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। মাসাধিককাল ভক্তসঙ্গে বাস, শ্রীহরিকথা ও কীর্তনাদি শ্রবণ করিয়া পরিক্রমা-কারিগণ ৬ই অগ্রহায়ণ ২২শে নভেম্বর দিবস হাওড়া ষ্টেশনে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করেন।

আমরা সমিতির পক্ষ হইতে সমস্ত পরিক্রমাকারিগণকে সাদর অভিবাদন জানাইতেছি। তাহারা যেন পরিক্রমার সমস্ত শ্রম-ক্লেশ ভুলিয়া সর্বদা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবানন্দে মগ্ন থাকেন।

—শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী

সহঃ সম্পাদক

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা সম্বন্ধে বক্তব্য

শ্রীপত্রিকার স্বরূপ

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত নবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভা ও শ্রীলজীব গোস্বামী প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-রাজসভার একনিষ্ঠা ঐকান্তিকী প্রের্ণা সেবিকা। সর্বপ্রধানা ও প্রিয়তমা সেবিকাসূত্রে উক্ত সমিতি উভয় সভারই অভিন্না প্রতিমূর্তি। সুতরাং গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র বলিলে ইহাকে উক্ত সভাদ্বয়েরও মুখপত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। নবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার মুখপত্র শ্রীসজ্জনতোষণী ও শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার মুখপত্র সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের অভিন্ন কলেবর এই শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের ভাব, ভাষা ও ধারার সহিত শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ভাব, ভাষা ও ধারা অভিন্ন। সংক্ষেপতঃ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা শ্রীলরূপ ও রঘুনাথের কথার একমাত্র প্রচারিকা।

সজ্জনতোষণী ও গৌড়ীয়ের অবস্থিতি কাল

শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা বর্তমান কাল হইতে অনুমান ৬৭ বৎসর পূর্বে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে সপ্তদশ বর্ষকাল শ্রীল ঠাকুর কর্তৃক পরিচালিত হন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ ঐ পত্রিকার সপ্তবর্ষকাল সম্পাদনা করেন। মোটের উপর চতুর্বিংশ বর্ষকাল সজ্জনতোষণী প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এই চতুর্বিংশ বর্ষের চতুর্বিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে অনুমান ৪৫ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তৎপরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা'র নিয়ামক মহারাজের সহায়তায় মাসিক সজ্জনতোষণী পত্রিকার অভিন্ন কলেবরস্বরূপে 'গৌড়ীয়' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকেন। ইহাও চতুর্বিংশ বর্ষ অবধি অবস্থিত থাকিয়া অনুমান ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে অন্তর্হিত হয়েন।

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার আবির্ভাবের কারণ

শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্ধানের পর তাঁহার মনোভাব অনুযায়ী শুদ্ধ-হরিকথা কিয়ৎকাল যাবৎ তাঁহার একনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সেবকগণ প্রচার করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইলেও নানা প্রকার দৈব ও আশ্রয় দুর্ঘটনায় উক্ত সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের প্রকৃত সেবা করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা শ্রীগুরুপরতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। তখন হইতে 'গৌড়ীয়' অবাধে আমূল পরিবর্তিত হইয়া 'ঘোমটার মধ্যে খেমটা' নীতির পরিপোষক হইয়া পড়িল। কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তি প্রাণহীন গৌড়ীয়ের কঙ্কাল বিষাক্ত দুর্গন্ধ তৈলের দ্বারা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেও ক্রমশঃ তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাপর শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্তসমূহই গৌড়ীয়ের প্রকৃত আহার। তাহার অভাব হইলে গৌড়ীয়ের প্রাণধারণ একান্ত অসম্ভব। কতকগুলি গুরুদ্রোহীতামূলক অপসিদ্ধান্তপর অপদার্থ অখাদ্য কুখাদ্য গৌড়ীয়কে সঞ্জীবিত রাখিতে পারে না। এইরূপে গৌড়ীয়ের চতুর্বিংশতি বর্ষ অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই তথাকথিত পরিচালক-বর্গের অপরাধফলে গৌড়ীয় অন্তর্হিত হন। স্বতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগৎ শ্রীল প্রভুপাদের আচরিত প্রচারিত শুদ্ধ-রূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-ধারায় অবগাহন করিবার মৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে।

শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য

বর্তমান সময়ে ধর্মজগতে বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রকাশ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই পত্রিকা নির্ভীকচিত্তে নিরপেক্ষভাবে সত্য কথা প্রচার করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। শুদ্ধ-ভক্তিধর্মের অনুকরণে কতকগুলি অপসিদ্ধান্তের সংবাদপত্রের ও গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাইয়াছি। ক্রমশঃ তাহাদের বিচারধারা যে শ্রীকৃপানুগ-শুদ্ধ-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ধারণার প্রতিকূল তাহা আমরা প্রদর্শন করিব। কেহ বা অপ্রাকৃত স্মৃতির সহিত প্রাকৃত স্মৃতির মিল রাখিয়া পর্বাদি পালনের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন না যে ‘অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।’ আরও কতকগুলি সংবাদপত্র দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলির দ্বারা গৌরজনগণের চিত্তোল্লাসের সম্ভাবনা নাই। ঐ সাময়িক পত্রগুলি সময় সময় কেবল বিষয় কথা লইয়া, হরিকথার ছলে কেবল মায়ার কথা লইয়া, ভক্তি-বিরুদ্ধ কথা লইয়া পরস্পর কলহ ও প্রণয় উপস্থিত করিয়া কোথাও বা আত্ম-প্রশংসায় ভরপুর হইয়া হরিকথা হইতে দূরে চলিয়া যান। তাহাতে ভক্তগণের হৃদয়ে স্বেচ্ছাদয় হয় না। কেহ বা বিষয়গণের মতানুগমনে শুদ্ধ ভক্তির বিলোপ সাধন করিয়া ভক্তিমার্গের উন্নতি হইল মনে করেন, কেহ বা প্রাকৃত সম্প্রদায় বিশেষের স্তুতিধা করিতে গিয়া শুদ্ধভক্তির সৌন্দর্য্য খর্ব্ব করিয়া ফেলেন। শ্রীপত্রিকা এই প্রকার সংবাদপত্র সমূহের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবেন। তবে শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ ভাবসমূহ ভক্তি কথার সহিত অজ্ঞান্তভাবে স্থান পাইলে ভাগবতগণের হৃদয়ে সেবাবিরোধ ঘটাইতে পারে এই আশঙ্কায় মায়িক-প্রসঙ্গ হইতে সর্বদা সাবধান করিবার জন্ত অনুরোধ জানাইতে পত্রিকা সর্বদাই সচেষ্ট থাকিবেন। ভক্তির প্রতিকূল মতবাদ সমূহে যাহাদের চিত্ত দৃঢ়ভাবাপন্ন তাহারা নিসর্গক্রমে ভক্তিস্থখ সন্দর্শনে অসমর্থ। শ্রীপত্রিকা এই শ্রেণীর পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদন করিতে পারিবেন না।

শ্রীগৌড়ীয়ের সহিত বিভিন্ন নীতির সম্বন্ধ

বর্তমান সময়ে ভারতীয় চিন্তাশ্রোত যে ভাবে প্রধাবিত হইতেছে তাহা ধর্মজগতের সহিত কতদূর সম্বন্ধযুক্ত শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা তাহা সর্বদাই সমালোচনা মুখে বিশ্লেষণ করিবেন। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষানৈতিক আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়া-কলাপের সহিত এই পত্রিকার প্রত্যক্ষ-ভাবে কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও যে স্থলে উক্ত নীতিসমূহ নিত্য সনাতন ধর্মনৈতিক চিন্তাশ্রোতের ও আচার-ব্যবহারের ব্যাঘাত জন্মাইবে, সেস্থলে ইহা

নির্বাক থাকিয়া জগতের অমঙ্গল আনয়ন করিবেন না। স্বাধীন ভারতের পূর্ক্স ঐতিহ্য আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি ধর্মনীতিই যাবতীয় নীতিসমূহের মূল ও ভিত্তিস্বরূপ। স্মৃতরাং যাহার উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া বিশ্বের যাবতীয় সম্মা উপলব্ধি হইয়া থাকে সেই বস্তুর প্রতি ওদাসীত্বই আমাদের অধঃপতনের প্রধান কারণ। শ্রীপত্রিকা তাহা প্রতি পদে পদে প্রদর্শন করিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে সচেতন রাখিবেন। ধর্মই ভারতের বৈশিষ্ট্য, ধর্মই ভারতের প্রতিষ্ঠা, ধর্মই ভারতের জীবন। ধর্মের জন্তই ভারত সমগ্র পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। স্বাধীন ভারতের বিজয়পতাকা সমগ্র বিশ্বের শীর্ষোপরি স্থাপন করিবার মূল-মন্ত্র শ্রীমন্নহাপ্রভুর ‘শিক্ষাষ্টকের’ অন্ততম “তৃণাদপি স্তনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।” শ্লোকের তাৎপৰ্য্য জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিবার জন্ত শ্রীপত্রিকা সর্বদাই মুক্তকণ্ঠে কীর্তন করিবেন।

ধর্মই ভারতের গৌরব ও শান্তিদাতা

ধর্মস্বাধীন রাষ্ট্রই ভারতের গৌরব এবং ধর্মই ভারতকে চিরদিন পরিচালনা করিয়াছেন। ধর্ম বলিতে কোন সঙ্কীর্ণতা, হীনতা বা কোনপ্রকার অনুপাদেয়তাকে লক্ষ্য করে না। ধর্ম ও ধর্মের ভাগ এক নহে। ধর্মধর্মজীর সঙ্কীর্ণ অসৎ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া কর্তব্য নহে। পার্থিব চিন্তাস্রোত মানুষকে অধঃপাতিত করিয়া হুঃখসাগরে নিমজ্জিত করে। খাণ্ড, বস্ত্র, বাসগৃহ প্রভৃতির স্বব্যবস্থা করাই আমাদের পরাশান্তি লাভের উপায় নহে। যাহারা ঐগুলি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের চরম সীমায় উঠিয়াছেন তাঁহারাও যে অশান্তির গভীরতম জলধিগর্ভে নিমজ্জিত আছেন, ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। শান্তি একটা পৃথক তত্ত্ব। পার্থিব বস্ত্র তাহা কখনই সম্পাদন করিতে পারে না।

শ্রীপত্রিকার ভাষা

এই পত্রিকা সমগ্র ভারতে যাহাতে সমাদৃত হইতে পারে তজ্জন্ত প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় প্রবন্ধাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে। প্রধানতঃ বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, আসামী, উৎকল, ইংরাজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার প্রবন্ধাদি ইহাতে স্থান পাইবে।

গভীর গুরুদায়িত্ব লইয়া এই পত্রিকা বিশ্ববাসীর সমক্ষে উপস্থিত হইতেছেন। ভারতবাসীর আন্তরিক সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বর্দ্ধমান, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি বহু স্থানে :—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরেন্দ্রমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল, ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের সহায়তায়, পার্টিসহ বিগত কয়েকমাস যাবৎ বিপুলভাবে শ্রীহরিকথা কীর্তন করিয়া তত্তদেশীয় সজ্জন ও স্ত্রীগণের হৃদয়ে শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর আসন বিস্তৃত করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিপূর্ণ এবং শাস্ত্রবাণী-সম্মত বিচারধারা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী এই সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া প্রচুর সহায়ভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

বাঁকুড়ায় :—

গত জানুয়ারী মাসে তিনি মহারাজজীর সাহায্যে কিছুদিন অবস্থান করিয়া তথায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা দ্বারা তথাকার সজ্জন ও স্ত্রীগণের নিকট সনাতন ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ এবং সনাতন ধর্মই যে বিশ্ববাসীর একমাত্র কল্যাণের পথ তাহা বিশেষ দক্ষতার সহিত বুঝাইয়াছেন। তাঁহার তাঁহার স্মৃতিপূর্ণ বাণীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। বি, ডি, আর রেলওয়ের অফিসার-ইন-চার্জ, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নারায়ণ বসু বি, ই ; সি, ই ; এ, এম. আই, ই, (ইণ্ডিয়া) চীফ ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় তাঁহার নিকট নানাপ্রকার প্রশ্নের স্মৃতিপূর্ণ সমাধান লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দ ও সহায়ভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। সমিতির প্রচার ও উন্নতিকল্পে তিনি যে সহায়তা করিয়াছেন বেদান্ত সমিতি তজ্জগৎ তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। সমিতি নবদ্বীপে যে নূতন ষষ্ঠ নির্মাণ করিতেছেন তাহার যে প্ল্যানটি তিনি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন তজ্জগৎ সমিতি তাঁহার নিকট অতীব কৃতজ্ঞ।

লোণাবুখী গ্রামে :—

বাঁকুড়ার নিকটবর্তী এই স্থানে তাঁহার কয়েকদিন যাবৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী ও তাঁহার প্রচারিত ধর্মের মধ্যে যে আবিলতা প্রবেশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে স্থানীয় সজ্জনগণকে অবহিত করিয়াছেন।

হুগলী জেলায় :—

গত ২ই ফেব্রুয়ারী পণ্ডিতজী মহারাজজীর সাহচর্যে সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত বেড়াবেড়ী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ মহোদয়ের সাদর আহ্বানে

তাঁহাদের গ্রামে গমন করেন এবং কয়েকদিন তথায় অবস্থান করিয়া আত্যন্তিক মঙ্গলের কথা কীর্তন করিয়াছেন।

বৈচী অঞ্চলে :—

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী পণ্ডিতজী, প্রচার সম্পাদকসহ বৈচী গ্রামে শুভবিজয় করিয়া সাত্তত শাস্ত্রবাণী কীর্তন করিয়া সেবোন্মুখজনগণের আনন্দ ও বিমুখ-জনগণের স্নকৃতি বর্দ্ধন করিয়াছেন। তদ্বেশীয় শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত অচলানন্দ ঘোষ মহাশয় তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে সহায়তা করিয়া সমিতির ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন।

মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় :—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমদ্বক্তা প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ বিগত ১১ই জানুয়ারী তারিখে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করিয়া মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্নস্থানে ছলধর্ম্ম নিরসনমুখে বেদান্তপত্র বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া বহু ব্যক্তি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বহু স্থানে বিদ্বন্মণ্ডলী স্বামীজীকে শোভাযাত্রা সহকারে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। নিম্নে কয়েকটি স্থানের প্রচার বৃত্তান্ত উল্লেখ করিতেছি—

মেদিনীপুর জেলার খারড় গ্রামে (কাঁথি মহকুমা) :—

গত বৎসর স্বামীজীর সভাপতিত্বে এই পল্লীতে শ্রীগৌরীনাথ তরুণ সজ্জ নামে একটি প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত হয়। তাঁহাদের সাদর আহ্বানে স্বামীজী এবৎসরও তদঞ্চলে শুভ বিজয় করেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী জুথিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুত হরিচরণ দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলে উক্ত সজ্জ তথায় উপস্থিত হন এবং স্বামীজীকে মালাচন্দনে বিভূষিত করেন। তৎপরে তাঁহারা কীর্তন সম্বলিত শোভাযাত্রাযোগে স্বামীজীকে সভামণ্ডপে লইয়া যান। স্বামীজী সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে একটি উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয় এবং তাঁহাকে মালা দ্বারা বিভূষিত করা হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী দাস পুরাণরত্ন মহোদয় স্বামীজীকে একটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তৎপরে স্বামীজী

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে সনাতন-শিক্ষা আলোচনা করেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব উকিল ও সংস্কৃতির ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র ভূঞা মহাশয় কয়েকটা প্রশ্ন করেন। স্বামীজী সভাস্থলেই শাস্ত্র-যুক্তিমূলে তাহার সমাধান করিলে উকিল মহাশয় বিশেষ সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হন। উক্ত সম্মেলন সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুত গোবিন্দ প্রসাদ দাস, প্রাচীন কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুত শশীভূষণ ভূঞা, শ্রীযুত বঙ্কিম বিহারী দাস, ও শ্রীযুত হরিচরণ দাসাধিকারী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুলবাড়ী গ্রামে (তমলুক মহকুমা) :—

উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুত বিহারীলাল দাস মহাশয়ের সাদর আহ্বানে গত ১৬ই জানুয়ারী স্বামীজী তথায় উপস্থিত হন। তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ে ছায়াচিত্রে শ্রীমন্নহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা করেন। বিহারী বাবুর বাড়ীতে শ্রীশ্রীভগবদবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তথায় স্বামীজী কয়েকদিবস শ্রীহরিকথা কীর্তন করেন। তাঁহার শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া বিহারী বাবু অতিশয় আকৃষ্ট হন এবং সন্ত্রীক স্বামীজী মহারাজের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিয়া সাত্বত-বৈষ্ণবস্মৃতি-অনুসারে শ্রীনাম ও দীক্ষা লাভ করেন। এতদ্দেশে বিহারী বাবু একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। তিনি “সর্বস্বং গুরুবে দত্তাং” বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহার শ্রীগৌরগোপাল মঠ, ২০/০ বিঘা ধানী জমি ও যাবতীয় ধন-সম্পত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছেন।

হাঁসচড়ায় :—

১২শে জানুয়ারী স্বামীজী গ্রামস্থ হাইস্কুলে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্নহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ স্বামীজীর সারগর্ভ, শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচার শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হন।

পিছলদায় :—

গ্রামবাসিগণের সাদর আহ্বানে স্বামীজী ২৩শে জানুয়ারী তারিখে শ্রীমন্নহাপ্রভুর পদারূপূত পিছলদা গ্রামে উপস্থিত হন। সংকীর্ণন শোভাযাত্রা যোগে তাঁহারা স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন। স্থানীয় হরিতলায় তিনি শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা এবং ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্নহাপ্রভুর লীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী মহারাজ কর্তৃক উক্ত গ্রামে শ্রীমন্নহাপ্রভুর পাদপীঠের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছেন। গ্রামবাসী জনৈক ভক্ত পাদপীঠের জন্ত

এই ভূমিখণ্ড দান করিয়াছেন। শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর রথ, শ্রীযুত গোবিন্দপ্রসাদ মাইতি, শ্রীযুত প্রিয়নাথ দাস ও শ্রীযুত শ্রীনিবাস দাসাধিকারী মহোদয়গণের সেবা প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২৪ পরগণা জেলার গদামখুরায় (ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা) :—

পিছলদা হইতে স্বামীজী-মহারাজ উক্ত গ্রামে উপস্থিত হন এবং শ্রীহরিকথা কীৰ্ত্তন করিয়া গ্রামবাসিগণের নিত্যকল্যাণ বিধান করেন। শ্রীযুত গিরীশ চন্দ্র দাস, তৎপুত্র শ্রীযুত গণেশচন্দ্র দাস এবং শ্রীযুত অরুণচন্দ্র দাস মহাশয়ের সৌজন্য এবং আন্তরিক সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

আইপ্লটে :—

অতঃপর সভাপতি মহারাজ আইপ্লট নামক স্থানে আগমন করেন। তথায় বিভিন্ন স্থানে তিনি ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন। এখানে শ্রীযুত শশীভূষণ মাল দাস, শ্রীযুত সুখচাঁদ বেরা, শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ দাস, শ্রীযুত গজেন্দ্র নাথ মাল্লা প্রভৃতি মহোদয়গণ স্বামীজী মহারাজকে প্রচারকার্যে বিশেষভাবে সহায়তা করেন।

সূর্যাপুরে :—

আইপ্লট হইতে স্বামীজী উক্ত গ্রামে উপস্থিত হন এবং তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া বিভিন্ন স্থানে শ্রীনাম-প্রেম প্রচার করেন। স্থানীয় বিজ্ঞালয় প্রাঙ্গণেও তিনি ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন। ডাঃ শ্রীযুত কেলারাম মাল, ম্যানেজার কাছারীর কর্মচারী শ্রীযুত গোবিন্দ প্রসাদ খাটুয়া, শ্রীযুত নিত্যানন্দ মাইতি দাস মহোদয়ের সেবা-প্রবৃত্তি ও ভক্তিবর্ধন-প্রচারের আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমিতির বিশিষ্ট দাতৃবর্গ

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত মোহাটী গ্রামনিবাসী শ্রীযুত গোবিন্দ প্রসাদ বাড়ই দাস মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নবদ্বীপ মঠের জলকষ্ট দূর করিবার জন্ত তথায় একটি নলকূপ প্রস্তুতের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে

অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইহার জল পান করিয়া মনুষ্যীপে সমাগত বহু সঙ্কমব্যক্তি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিবেন।

বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত সিধাবাড়ী গ্রাম প্রভৃতির জমীদার চুঁচুড়া-নিবাসিনী শ্রীযুক্তা নলিনী বালা দাসী সমিতির একটি শাখামঠ স্থাপনের নিমিত্ত সিধাবাড়ীতে ১৫/০ পনের বিঘা জমী প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মঠের অগ্ৰাণ্য বায় নির্বাহের জন্ত আরও ২০/০ বিশ বিঘা ধানী জমী প্রদান করিয়া দানের স্বার্থকতা করিয়াছেন। তাঁহার এই সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর উক্ত সদিক্ষা পূরণ কার্যের জন্ত প্রচুর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত কুলবাড়ী গ্রামের শ্রীযুত বিহারীলাল দাস মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারে মুগ্ধ হইয়া সন্ত্রীক সমিতির আনুগত্য স্বীকার করেন এবং যথাসর্বস্ব উক্ত সমিতিকে প্রদান করিয়াছেন। এতদঞ্চলে একটি শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা করিয়া তিনি অত্রস্থ অধিবাসিগণকে প্রচলিত তথাকথিত বৈষ্ণবধর্মের অনুপাদেয় উপলব্ধি করাইয়া শ্রীমন্নহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণে সাহায্য করিয়াছেন। সমিতি তাঁহাদের সেবা-চেষ্টার প্রশংসা করিতেছেন।

বঙ্গদেশ হইতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরীষাত্রাকালে পিছলদা গ্রাম অতিক্রম করিয়াছিলেন—প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পিছলদা শ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভুর পদারূপত্ব তীর্থস্থান। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মহোদয়ের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া উক্ত গ্রামবাসী একজন ভক্ত তথায় শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ নির্মাণের সঙ্কল্প করেন এবং তজ্জন্ত স্বামীজীকে অনুরোধ করায় তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। সভাপতি মহারাজ উক্ত ভক্তের প্রদত্ত একখানি গৃহ ও তন্নিম্নস্থ ভূমি অঙ্গীকার করেন এবং গ্রামবাসিগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীমন্নহাপ্রভুর পাদপীঠের স্মৃতিতর্পণ-কল্পে উক্ত গৃহদ্বার উন্মুক্ত করেন। আমরা উক্ত ভক্তের সেবোত্তম দর্শন করিয়া আনন্দিত হইতেছি।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পূর্ব-অনুষ্ঠিত উৎসব তালিকা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীল প্রভুপাদের মনোহরীষ্ট প্রচার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বর্ষে বিভিন্ন সময়ে বিরাট বিরাট উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। পাঠক বর্গের অনেকেই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া প্রতি বৎসরেই ভক্তগোষ্ঠীতে যোগদান করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। তজ্জন্ম তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি। উৎসবদির প্রধান উদ্দেশ্য বিশ্ববাসীকে সংসঙ্গ লাভের সুযোগ দান করা। ইহাতে সংসঙ্গে শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ, অমেধ্য ভক্ষণ হইতে বিরতি ও শ্রীশ্রীভগবানের অর্চামূর্তি ও লীলাস্বলীসমূহের দর্শনাদি বহু ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের মহা সুযোগ লাভ ঘটিয়া থাকে। সমিতির এবম্প্রকার উৎসবাদিতে হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা লাভ করিয়া বহু স্বকৃতিবান্ ব্যক্তির ভক্তি-লাভের সুযোগ হইয়াছে ও হইতেছে। সমিতির উৎসবের সংবাদ অনেক সহৃদয় ব্যক্তি সর্বদা আলোচনা করিয়া থাকেন তজ্জন্ম আমরা তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। ইহাতে সমিতির কার্য-বিবরণ কিছু অবগত হইতে পারিবেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিভ্রমণ ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

- ১। ১৩৪৮ সাল ১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ বুধস্পতিবার হইতে ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ বুধবার পর্য্যন্ত।
- ২। ১৩৪৯ সাল ২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ ১৯৪৩ মঙ্গলবার হইতে ৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ সোমবার পর্য্যন্ত।
- ৩। ১৩৫০ সাল ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ ১৯৪৪ শনিবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত।
- ৪। ১৩৫১ সাল ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ বুধবার হইতে ১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।
- ৫। ১৩৫২ সাল ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ ১৯৪৬ মঙ্গলবার হইতে ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ সোমবার পর্য্যন্ত।
- ৬। ১৩৫৩ সাল ১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ ১৯৪৭ রবিবার হইতে ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ শনিবার পর্য্যন্ত।

- ৭। ১৩৫৪ সাল ৭ই চৈত্র, ২০শে মার্চ ১৯৪৮ শনিবার হইতে ১৩ই চৈত্র, ২৬শে মার্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত।
- ৮। ১৩৫৫ সাল ২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ, ১৯৪৯ বুধবার হইতে ১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

শ্রীউর্জ্জ্বত ও পরিক্রমা

- ১। ১৩৪৯ সাল ৭ই কার্তিক, ২৪শে অক্টোবর ১৯৪২ শনিবার হইতে ৬ই অগ্রহায়ণ, ২২শে নভেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চাঁপাহাটি শ্রীগৌরগদাধর মঠে।
- ২। ১৩৫০ সাল ২৬শে আশ্বিন, ১৩ই অক্টোবর ১৯৪৩ বুধবার হইতে ২৬শে কার্তিক, ১২ই নভেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত হুগলী জেলার অন্তর্গত চু চুড়া সহরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে।
- ৩। ১৩৫১ সাল ১৬ই আশ্বিন, ২রা অক্টোবর ১৯৪৪ সোমবার হইতে ১৪ই কার্তিক, ৩১শে অক্টোবর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত চৌরাশীক্ৰোশ শ্রীব্রজমণ্ডলে।
- ৪। ১৩৫২ সাল ৩০শে আশ্বিন, ১৭ই অক্টোবর ১৯৪৫ বুধবার হইতে ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৯শে নভেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত চৌরাশী-ক্ৰোশ শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে।
- ৫। ১৩৫৩ সাল ২৩শে আশ্বিন, ১০ই অক্টোবর ১৯৪৬ বৃহস্পতিবার হইতে ২৩শে কার্তিক, ৯ই নভেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীকাশীধামে।
- ৬। ১৩৫৪ সাল ১১ই কার্তিক, ২৯শে অক্টোবর ১৯৪৭ বুধবার হইতে ১২ই অগ্রহায়ণ, ২৮শে নভেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীবৈষ্ণনাথধামে।
- ৭। ১৩৫৫ সাল ১লা কার্তিক, ১৮ই অক্টোবর ১৯৪৮ সোমবার হইতে ৩০শে কার্তিক, ১৬ই নভেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীদ্বারকাধামে।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোত্তাব ও শ্রীরথযাত্রা মহোৎসব

- ১। ১৩৫১ সাল ৬ই আষাঢ়, ২০শে জুন ১৯৪৪ মঙ্গলবার হইতে ১৭ই আষাঢ়, ১লা জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত।
- ২। ১৩৫২ সাল ২৫শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই ১৯৪৫ সোমবার হইতে ৩রা শ্রাবণ, ১৯শে জুলাই বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত।

- ৩। ১৩৫৩ সাল ১৪ই আষাঢ়, ২২শে জুন ১৯৪৬ শনিবার হইতে ২৩শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত।
- ৪। ১৩৫৪ সাল ৪ঠা আষাঢ়, ১২শে জুন ১৯৪৭ বৃহস্পতিবার হইতে ১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন শনিবার পর্য্যন্ত।
- ৫। ১৩৫৫ সাল ২২শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই ১৯৪৮ মঙ্গলবার হইতে ৩২শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই শুক্রবার পর্য্যন্ত।

—প্রকাশক কর্তৃক সংগৃহীত

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার পাঠকবর্গের নিকট আমায় বিনীত নিবেদন এই যে অতি অল্প সময়ে ও নানাপ্রকার গুরুতর সেবাকার্যের চাপের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় বহুস্থানে নানাপ্রকার ভ্রম ও মুদ্রাকর প্রমাদাদি রহিয়া গিয়াছে। শ্রীপত্রিকাকে মনোরম ও সুন্দর করিয়া তুলিবার প্রভূত প্রয়াস পাইলেও তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারি নাই। মাননীয় সরকার বাহাদুর অল্পগ্রহপূর্বক চুঁচুড়া সহরস্থ শান্তিপ্রেসে শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা প্রকাশ করিতে আদেশ দিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রেসের অত্যন্ত সময়ভাববশতঃ আমাদিগকে ও প্রেসকে অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সহিত মাত্র ৫ পাঁচদিনের মধ্যে মুদ্রণ কার্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। এমনকি পত্রিকার বিশিষ্ট লেখকগণের প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিবারও সুযোগ ঘটিল না। আগামী সংখ্যায় সেই সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে উহা পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ বিশেষ আনন্দিত হইবেন। পত্রিকার উন্নতিকল্পে কেহ কোন নির্দেশ দিতে ইচ্ছা করিলে তাহা সাদরে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। পরিশেষে আরও অনুরোধ জানাইতেছি যে ইহার বাবতীয় ক্রটি-বিচ্যুতি সমস্তই আমার। তজ্জন্তু সহদয় পাঠকবর্গ নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন।



স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম পরসর । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥
অন্য ধর্ম সৃষ্টরূপে পালে যেই জন । হরি কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১ম বর্ষ	{ অনিরুদ্ধ, ৩০ বিষ্ণু, ৪৬৩ গৌরাঙ্গ বুধবার, ৩০ চৈত্র ১৩৫৫, ইং ১৩৮৪৪৯	{ ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীভাগবত-গুরু-পরম্পরা

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্ ।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ শ্রীমন্ হরি-মাধবান্ ॥
অক্ষোভা-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিদ্ধ-দয়ানিধীন্ ।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্মান্ ক্রমাদয়ম্ ॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশচ সংস্কৃতমঃ ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥

নোংপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

তচ্ছিয়ান্ শ্রীশ্বরাদৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্ গুরুন্ ।
 দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ॥
 শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ।
 কলিকলুষসন্তপ্তং করুণাসিদ্ধুনা স্বয়ম্ ॥
 মহাপ্রভু-স্বরূপ-শ্রীদামোদরঃ প্রিয়ঙ্করঃ ।
 রূপ-সনাতনৌ হৌ চ গোস্বামিপ্রবরৌ প্রভু ॥
 শ্রীজীবো রঘুনাথশ্চ রূপপ্রিয়ো মহামতিঃ ।
 তৎপ্রিয়ঃ কবিরাজঃ শ্রীকৃষ্ণদাস প্রভুমতঃ ॥
 তস্মৈ প্রিয়োত্তমঃ শ্রীলঃ সেবাপরো নরোত্তমঃ ।
 তদনুগতভক্তঃ শ্রীবিষ্ণুনাথঃ সতুত্তমঃ ॥
 তদাসক্তশ্চ গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্যভূষণঃ ।
 বিভাভূষণপাদঃ শ্রীবলদেবঃ সদাশ্রয়ঃ ॥
 বৈষ্ণবসার্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথপ্রভুস্তথা ।
 শ্রীমায়াপূরধামস্ত নিদ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ॥
 শুদ্ধভক্তিপ্রচারস্ত মূলীভূত ইহোত্তমঃ ।
 শ্রীভক্তিবিনোদো দেবস্তৎপ্রিয়ঃ হেন বিষ্ণুতঃ ॥
 তদভিন্নসুহৃদবর্ষো মহাভাগবতোত্তমঃ ।
 শ্রীগৌরকিশোরঃ সাক্ষাদ্ বৈরাগ্যং বিগ্রহাশ্রিতম্ ॥
 মূয়াবাদিকুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি-নিরাসকঃ ।
 বিগুহ্বভক্তিসিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তঃপদ্মবিকাশকঃ ॥
 দেবোহসৌ পরমো হংসো মন্তঃ শ্রীগৌরকীর্তনে ।
 প্রচারাচারকার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ ॥
 হরিপ্রিয়জনৈর্গমা ঔবিষ্ণুপাদপূর্ব্বকঃ ।
 শ্রীপাদো ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহোদয়ঃ ॥
 সর্ব্বে তে গৌরবংশ্যশ্চ পরমহংসবিগ্রহাঃ ।
 বয়ঞ্চ প্রণতা দাসাস্তুচ্ছিত্তিগ্ৰহাগ্ৰহাঃ ॥

অভক্তি মার্গ

অভক্তির পরিচয়

যে পথে কৃষ্ণ সেবার কথা নাই তাহাই অভক্তি মার্গ বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণের উত্তমা সেবায় কৃষ্ণ ব্যতীত অণু বস্তুর অভিলাষ, কৰ্ম্মের আবরণ, জ্ঞানের আবরণ ও শিথিলতার আবরণ নাই। তাহাতে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন আছে। অনেকে ভক্ত হইবার অভিলাষ পোষণ করিয়াও অভক্তি মার্গের আশ্রয় করেন। ষাঁহারা কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ জানিয়া উহাই জীবের একমাত্র বৃত্তি বুঝিয়াছেন তাঁহারা ভক্তিপথের পথিক। ষাঁহারা নিজের প্রতিভায় বা অনভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভক্তির সংজ্ঞা নিজেই দিয়াছেন তাঁহাদের হটকারিতায় অনেক সময় ভক্তির স্বরূপ বিপর্যায় ঘটিয়াছে। কেহ কেহ আপনাকে ভক্ত মনে করিয়া নিজের কল্পিত বৃত্তিকেই ভক্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কনিহত দুর্বল জীবের মঙ্গলের জন্ত ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি

সচেতা সামাজিকগণ! আপনাদিগকে ভক্তাভিধানে ভূষিত করিতে হইলে ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন। ভক্তাগ্রণী শ্রীপাদ রূপ শ্রীমহাপ্রভুর নিকট শুনিলেন যে কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। অনুশীলন শব্দে অনুক্ষণ সেবা বুঝায়। অনু শব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধান রহিত। শীল্ ধাতুর অর্থ একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া। প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যাত্মক কায়মনোবাক্য সম্বন্ধীয় তত্ত্বচেষ্টারূপ এবং প্রীতিবিষয়াত্মক মন সম্বন্ধীয় তত্ত্বদ্রাবরূপ কৃষ্ণের অনুশীলন দ্বয়।

শ্রীগৌর-কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ-রাম ও জীবতত্ত্ব

কৃষ্ণ বলিলে পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অনাদি, সর্বাদি ও সকল কারণের কারণকে নির্দেশ করা হয়। ইহা হইতেই সবিশেষ তত্ত্ব বলদেব ও শ্রীনারায়ণের প্রকাশ। গোলোকে মাধুর্য্যের পরমাশ্রয় ব্রজেন্দ্রনন্দন মাধুর্য্যদাতা ঔদার্য্যের পরমাশ্রয় শ্রীগৌরহরি, স্বীয় প্রকাশ মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-রামের দ্বারা সবিশেষ ঐশ্বর্য্য বিগ্রহের প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ বাহ চতুষ্টয় বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল প্রকট করিয়াছেন। সেই অদ্বয় তত্ত্ব বস্তু হইতে ভগবানের মুখ্য নিত্য অবতারসমূহ প্রকট হইয়াছেন। ভগবানের পুরুষাবতার, নৈমিত্তিকাবতার, গুণাবতার প্রভৃতি বিষ্ণুতত্ত্ব জীবকে ভগবান্ ও তদিতর বস্তুর

পার্থক্য উপলব্ধি করাইতেছেন। মায়াধীশ বিষ্ণু মায়াবশীভবক্ষে বিশুদ্ধভাবে স্বীয় অনুশীলন করাইয়া বিষ্ণু ব্যতীত অণু প্রতীতিরূপ মায়াব কবল হইতে উদ্ধার করেন। জীব যে কৃপারজ্জু অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-সেবা লাভ করিতেছেন উহাই ভক্তি। ভক্তি উদিত হইলে জীব ভক্ত সংজ্ঞা লাভ করেন। ভক্ত, ভক্তিদ্বারা ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ লাভ করেন।

অভক্তি-বৃত্তির লক্ষ্য

ভক্তের ভক্তি-বৃত্তি স্থপ্ত হইলে নিজ বৃত্তির অভাবে অভক্তির কোন এক প্রকারের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বৃত্তি ভজনশূন্য হইয়া লক্ষ্য তত্ত্ব কৃষ্ণকে পরমাত্মা, কখনও বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া সংজ্ঞা দেন; স্মৃতিরাং যোগীগণের পরমাত্মা ও জ্ঞানীগণের ব্রহ্ম, কৃষ্ণের আংশিক এবং ভেদাভেদ প্রকাশবিশেষ। কৃষ্ণের চিন্তা প্রবল হইলে জীব ভক্তিবৃত্তি হইতে চ্যুত হইয়া ভগবদর্শন করিতে পারেন না। তখন কখন বা সহস্রারে পরমাত্মা, কখন বা ঈশ্বরকে অজ্ঞানের প্রকাশক পঞ্চদেবতা, কখন বা অজ্ঞান সমষ্টির উৎকণ্ঠোপাধি বিশুদ্ধ মত্ব প্রভৃতি ভক্তিবিরোধিনী চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ বিস্মৃত হইয়া ভোগ-তাৎপর্যাপর হইয়া কৃষ্ণকে জড়ের কর্মফলদাতা, যজ্ঞের ঈশ্বর, গোব্রাহ্মণের হিতকারী প্রভৃতি ঈশ্বরত্বে বহমানন করেন। আবার কোন সময় স্বীয় বিভ্রুত্রে ও প্রভুত্বে ব্যস্ত হইয়া যথেষ্টাচার ভোগপর জীবনই হরিত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু কৃষ্ণ বলিলে ভক্ত বাতীত অণুর যাবতীয় লক্ষ্য বস্তু এস্থলে গৃহীত হয় নাই জানিতে হইবে। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা না করিয়া যাহারা কৃষ্ণ শব্দে কৃষ্ণকে না বুঝিয়া নিজের কল্পিত অর্থে বিশ্বাস করেন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লক্ষ্য বস্তু কৃষ্ণকে নিজ কল্পনায় কলঙ্কিত করেন মাত্র, বস্তুতঃ নিজে বা অপরকে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। সেই সকল বঞ্চক ও বঞ্চিতগণের প্রতি আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

অনুকূল-প্রতিকূল ভেদে দ্বিবিধ কৃষ্ণানুশীলন

কৃষ্ণের অনুশীলন অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় ভাবেই হইতে পারে। জরাসন্ধ, কংস, দম্ভবক্র, শিশুপাল, পুতনা, অঘবক প্রভৃতি অসুরগণ, নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীগণ প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন। প্রতিকূলভাবে সেবাবিপর্ধ্যায় ঘটে বলিয়া উহা ভক্তি নহে। অনুকূল বলিলে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যোচ্যমান প্রবৃত্তি বুঝায়। আনুকূল্য ঘটিলে সর্বক্ষণ বাবধান রহিত সর্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইয়া ভজন সিদ্ধ হয়।

অনুকূল অনুশীলনের স্বরূপ

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অগ্ৰাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না। কৃষ্ণের নিজ সেবা ও সেবা-জন্তু ভগবানের নিজের লভ্য ফল ব্যতীত অগ্ৰ কোন উদ্দেশ্যে ভক্ত সেবা করিবেন না। ভক্তের নিজ ফলবাঞ্ছা কিছু থাকিলে উহা ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ভুজান্তর্ভুক্ত হইতুকী বৃত্তি হইয়া যাইবে। উহাই কৃষ্ণস্বথের উদ্দেশ্য ব্যতীত অগ্ৰাভিলাষ শব্দবাচ্য। যথেষ্টাচারী কুকর্মকারী বা অজ্ঞান-সেবী কুজ্ঞানীগণ কৃষ্ণস্বথ ছাড়িয়া নিজ নিজ কলিত প্রার্থনা অন্তরে পোষণ করিয়া অনুকূল্য সহকারে কৃষ্ণানুশীলন করিলেও ভক্ত হইতে পারেন না। ঐহাদের চিন্তে প্রতিষ্ঠাশা আছে, ঐহারা ইন্দ্রিয় তর্পণাশা সমন্বিত, ঐহারা পার্থিব বা মোক্ষসম্বন্ধীয় পরোপকারে বা নিজোপকারে ব্যগ্র, পাণ্ডিত্য প্রতিভা বিস্তারশীল, ঐহারা রোগ শান্তির জন্তু উদ্গ্রীব, ঐহারা উত্তম আচার্য্যবংশ বা বর্ণগত সম্মান লাভে তৎপর, লাভপূজা প্রতিষ্ঠা, নিষিদ্ধাচার কুটীনাটী জীবহিংসা প্রভৃতি, ঐহিক বা স্বর্গস্ব-ভোগরত, বেশ বা আশ্রমের মাহাত্ম্যালোল্প, মুমুক্শু, সিদ্ধিকামী প্রভৃতি অবাস্তব উদ্দেশ্যের জায় কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন তাঁহাদের কৃষ্ণানুষ্ঠান কপটতায়ুক্ত। স্ততরাং কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যপ্রষ্ট হইয়া অগ্ৰ অভিলাষযুক্ত ভগবদনুশীলনও অভক্তি পথে দেখা যায়।

অমল জ্ঞানের বিচার ও পঠন-পাঠনই ভক্তি

জ্ঞানের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। এস্থলে জ্ঞান শব্দে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে বুঝিতে হইবে। ভজনীয় একমাত্র বস্তুই কৃষ্ণ। কৃষ্ণবিষয়ক পরেশানুভূতি অর্থাৎ ভজনীয় বস্তুর স্বরূপজ্ঞান ভক্তিসহ যুগপৎ প্রয়োজনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের চরম শ্লোকে লিখিয়াছেন যে ভক্তবৈষ্ণবগণের প্রিয় নির্মল-পুরাণ-শাস্ত্র শ্রীভাগবতে একমাত্র পারমহংস অমল জ্ঞানই বিশিষ্টরূপে গীত হইয়াছে এবং এই শাস্ত্রেই জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি একত্র আবির্ভূত হইয়া জীবের কর্মজৌগফল নিরস্ত করিয়াছে স্ততরাং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, উত্তমরূপে পঠন ও নানাবিধ জ্ঞানাদি মতবাদের অকর্মণ্যতা উপলব্ধি করিবার জন্তু বিচার করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তে উপনীত হইলে জীব ভক্তি অবলম্বন করিয়াই অগ্ৰাভিলাষ, জ্ঞান কর্ম ও শিথিলতার হস্ত হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি লীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১১৭ সংখ্যায় লিখিয়াছেন :—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিন্তে না কর অলস।

ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে স্ফূট মানস ॥

ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয়

ভক্তির প্রারম্ভেই শ্রদ্ধার উল্লেখ। প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্র শ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ বিশ্বাস। কৃষ্ণে সম্বন্ধ জ্ঞান হয় নাই, অভিধেয় ভক্তি অগ্রসর হইয়াছে একরূপ কখনও হয় না। “ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরনুত্র চৈষংত্রিক এককালঃ।” কৃষ্ণের বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবদ্ বিষয়ক জ্ঞান ভক্তির সহিত সমকালেই উদ্ভূত হন। ভক্তি ব্যতীত উহাদের উদয়ের সম্ভাবনা নাই। তবে ঋগ্বেদে মাযিক জ্ঞান-সাহায্যে জ্ঞানী হইবার জন্য নিষ্ফল মিথ্যা চেষ্টা করেন তাঁহাদের সেই চেষ্টা ভক্তির অঙ্গ নহে। বদ্ধ জীবভিমানের জ্ঞানীর চেষ্টার মধ্যে সর্বতোভাবে মুমুক্ষুর ধর্ম-কৈতব অন্তর্নিহিত আছে। হৈতুক জ্ঞান কখনই শুদ্ধা ভক্তির পরিবার হইতে সমর্থ হয় না। ভক্তের অন্তরে পিশাচিনী মুক্তি বর্তমান থাকিলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে।

কৃষ্ণই অদ্বয় জ্ঞান ও কৃষ্ণের দ্বৈতজ্ঞান

শুদ্ধভক্তিকে তাহার বর্ণিত্বের অন্ততম মনে করিয়া অনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ছাড়িয়া অন্যাভিলাষী বা অহংগ্রহোপাসক করাইবে। ঐ প্রকার বৃথা তর্কদ্বারা তত্ত্ব বস্তুকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক করাইবে। এজন্য ভক্তিবিরোধী জ্ঞানী, আত্ম-বঞ্চনাক্রমে কেবল অহৈতুকী প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে অজ্ঞান মিশ্রিত, অন্ধাখ্য, প্রাকৃত বলিয়া জানিয়া নিজের মূঢ়তা প্রকাশ করেন। বাস্তবিক জ্ঞানীর ক্ষমতা বৈরাগ্যে ভক্তের ভক্তি নির্ভেদ জ্ঞানে আবৃত না হয়। **কৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞান।** তদিতর জ্ঞানে মায়াশক্তির সুপ্ত গৌণ বা জাগ্রত মুখ্য ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের আবরণের অন্তর্ভুক্ত হইলে ভক্তি অভক্তি নামেরই সার্থকতা সাধন করিবে। শুদ্ধা ভক্তি উদ্ভূত হইলে তাহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞান সহায় ও দাঁসরূপে বর্তমান থাকে। যে জ্ঞানের কৃষ্ণভক্তির উপর কর্তৃত্ব সে জ্ঞান **কৃষ্ণভক্তির দ্বৈত জ্ঞান।** জ্ঞানীর অজ্ঞান বিজ্ঞানিত মাযিক নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানের কৃষ্ণ ব্যতীত জ্ঞানাবরণে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন সম্ভাবনা নাই।

কর্ম মায়ায় বিক্রমহেতু অভক্তি, কিন্তু হরির উদ্দেশ্যে ক্রিয়াই ভক্তি

কর্মের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। স্মৃতি-কথিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি ফলপ্রসূ কর্ম জীবের ভক্ত্যাবরক। কৃষ্ণের জীবাবরণায়িক মায়াশক্তির একটি বিক্রম কর্ম। কর্মফলবাদী নিজকর্মবিপাকে পড়িয়া মনে করেন যে সংকর্ম প্রভাবে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। ভজনীয় পরিচর্যাাদি কর্মাবরণ নহে। তাদৃশ পরিচর্যাই ভজনীয় কৃষ্ণ বস্তুর অনুশীলন। বাহ্যতে জীবের ফলভোগ

সংশ্লিষ্ট উহাই কৰ্ম্ম। যে অনুষ্ঠানের ফল, জীবের প্রাপ্য-কৰ্ম্মফলভোগ নহে ভগবানের নিজের, উহা ভক্ত্যনুষ্ঠান। ভুক্তি পিশাচিনী, ভক্তের অন্তরে স্থান পাইলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে। পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে—হে দেবর্ষে হরিকে উদ্দেশ্য করিয়া শাস্ত্রীয় ষাটতীয় অনুষ্ঠান বৈধি ভক্তি বলিয়া কথিত হয়। তদ্বারা প্রেমভক্তি লভ্য হয়। শ্রীচরিতামৃত মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদ ১৪১ সংখ্যা—

জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।

অহিংসা যমনিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ।

ঠাকুর বিশ্বমঙ্গলও বলিয়াছেন—

ভক্তিস্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্ম্যং

দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যাকিশোর মৃতিঃ।

মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেহস্মান

ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥

জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে

শিথিলতার আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। ধন দ্বারা বা শিশু দ্বারা উত্তমা ভক্তি উৎপন্ন হয় না। বিবেকাদি হইতে ভক্তি হয় না পরন্তু ভক্তিমান্ জনে বিবেকাদি লক্ষিত হয়। কৃষ্ণ ছাড়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই দুইটা চিত্ত কাঠিণের হেতু তজ্জ্ঞ সুকোমলা ভক্তির উপযোগী নহে। ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিছু উপযোগিতা থাকিলেও তাহারা ভক্ত্যঙ্গে গৃহীত হয় নাই।

কৰ্ম্ম, জ্ঞান, তপস্বাদি অভক্তিমার্গ

ভক্তি থাকিলে কৰ্ম্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ তপস্বার আবশ্যকতা নাই। ভক্তি না থাকিলেও কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও তপস্বার আবশ্যকতা নাই, হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি থাকিলে কৰ্ম্ম ও জ্ঞান তপস্বার প্রয়োজন নাই আবার হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি না থাকিলেও কৰ্ম্ম ও জ্ঞান তপস্বার আবশ্যকতা নাই। জীবের পরম আবশ্যকীয় ভক্তি থাকিলে অবাস্তব মার্গদ্বয় না থাকিলে কোন ক্ষতি নাই, আবার মূল বৃত্তি ভক্তি না থাকিলে ঐ জ্ঞান ও কৰ্ম্মজ অনুষ্ঠান দ্বারা ভক্তি হইতে পারে না ইহাই পঞ্চরাত্রে সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। সুতরাং অগ্রাভিলাষ, কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও শৈথিল্য ভক্তির প্রতিবন্ধক মার্গ সমূহই অভক্তিমার্গ।

অভক্ত ও অভক্তি হইতে নিরপেক্ষ থাকা কর্তব্য

বিচক্ষণ পাঠক আপনারা, অভক্তি জীবের শ্রেয়ঃ নহে জানিয়া অভক্তিমার্গে

উদাসীন থাকিবেন। অভক্তি পথের আদর না করিয়া উদাসীন হইলে কেহ অভক্তিমার্গের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা নাই বলিয়া নিন্দা করিতে পারিবে না এবং ভক্তকেও অভক্তের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হও এবং যাবতীয় অভক্তকে শ্রদ্ধা না করিলে ভক্তি হইবে না বলিয়া বল প্রকাশ করিতে পারিবে না। অভক্তগণকে অবজ্ঞা করিবেন না কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রেমময় ভক্তও বলিবেন না। তাঁহাদের মায়াবাদীয় বা যোগমার্গীয় সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ পদ্ধতিকে ভক্ত্যন্তর্গত বলিবেন না। অভক্তি কখনও ভক্তির সমজাতীয় নহে।

—শ্রীলপ্রভুপাদ

ধর্ম ও বিজ্ঞান

চিৎ ও জড়ের সমন্বয় অসম্ভব

কোন খ্রীষ্টান পণ্ডিত একখানি ইংরাজী পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন :— বর্তমান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সহিত ধর্মভাবের সামঞ্জস্য যে প্রকার উচ্চ জীবনপ্রার্থীদিগের নিকট গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়াছে এমন আর কিছুই নহে। সদস্য নির্দ্বারিণী বুদ্ধি কি প্রকারে মানবের জড়মূলক সিদ্ধান্তের সহিত একত্রাবস্থান করিতে পারে এবং কিরূপেই বা মনুষ্যের উচ্চ অর্থাৎ অপ্ৰাকৃত জীবন জড়বিজ্ঞাননির্দ্বারিত মানবের জড়মূলত্বসাধক সিদ্ধান্তের সহিত যুগ্মপং স্বীকৃত হইতে পারে এই দুইটি প্রমেয় তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের হৃদয়কে অবশ্য উদ্বিগ্ন করিতে থাকিবে। পারমাণবিক বুদ্ধি এবং জড়বৈজ্ঞানিকবুদ্ধি এতদ্ব্যতিরিক্ত মধ্যে একটি বিবদমান-ভাব আছে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জীবননির্ণয়স্থলে এই বিবদমান ভাবটি নিত্যবর্তমান, প্রেমচেষ্টাস্থলে জানচেষ্টাকে স্থাপন করিবার বাসনা হইতে উৎপন্ন হয়।

জীব জড়বস্তু হইতে পৃথক ও ইচ্ছাশক্তি চালনে সমর্থ

নরজীবনের জড়মূলত্ব সাধকভাবে সদস্য বিচার এবং ধর্মভাবের সহিত তাহার কতদূর সম্বন্ধ ইহা স্থির করিতে গেলে যে, কোন প্রকার লাভ হইবে না, তাহা নয়। বরং সমস্ত মানবের পক্ষে এই অনুসন্ধানটী নিত্যান্ত প্রয়োজনীয়। সর্বকালে এবং সর্বদেশে একাল পর্যন্ত যত প্রকার সামাজিক ব্যবস্থা হইয়াছে সে সমুদয়ই একটি বিশ্বাসের উপর অবস্থিত। বিশ্বাসটী এই যে মানব একটি

আধ্যাত্মিক পদার্থ এবং তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছানুসারে মানসিক ও শারীরিক শক্তি চালন করিতে সক্ষম। আধুনিক বিজ্ঞান এই বিশ্বাসকে দূর করিয়া তাহার স্থলে সেই বিশ্বাস হইতে বিলক্ষণ আর একটি বিশ্বাসকে আনিয়া স্থাপন করিতে চান।

জড়-হইতে চেতনের সৃষ্টি অত্যন্ত অসম্ভব

তাঁহার প্রস্তাবিত ভাব এই যে, মন এবং শরীরের শক্তিসমূহ হইতে একটি জড়মত্রেয় হ্রায় মানব সৃষ্ট হইয়াছে। এই দুইটা ভাবের অত্যন্ত পার্থক্য লক্ষিত হইবে। শেষোক্ত ভাবটা স্বীকার করিতে গেলে ধর্ম ও সংকারণের প্রাচীন মন্দির কেবল ভগ্ন করিয়া ফেলা হয় এমত নয়, কিন্তু তাহাদের প্রতীতি, অমূলক ছবির হ্রায় এককালে তিরোহিত করিয়া দেওয়া হয়। সদস্য চিন্তা, বিচার, দয়া, আশা এবং ক্ষমা বাহা সম্প্রতি আমাদের সহায় গম্ভীর সত্যরূপে প্রতীত আছে সে সমস্ত এককালে খণ্ডপের হ্রায় অমূলক প্রতিচ্ছায়াভাবে পরিণত হইয়া পড়ে। সল্লোক ও অসল্লোকের মধ্যে পার্থক্যবুদ্ধি একেবারে উঠিয়া যায়। নরভোজী রাক্ষস এবং পরোপকারী যীশুখ্রীষ্ট উভয়ই জড়ীয় পূর্বভাবের জড়সত্তারূপে প্রতীয়মান হয়। তাহার মাধ্যাকর্ষণবলনিষ্কিপ্ত পর্বত হইতে নিপতিত প্রস্তর ফলকের হ্রায় জড়দ্রব্যবিশেষ হইয়া পড়ে, তাহাদের প্রশংসা ও নিন্দা এবং তাহাদের প্রতি রাগ-দ্বेष কিছুই আবশ্যক হয় না। ডারউইন, টিওল, হাক্সলি প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পুরুষগণের গ্রন্থ আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, তাহাদের মত এইরূপ বিরূত সিদ্ধান্তকে ভয় করে না।

তর্কস্থলে বিজ্ঞান ও আত্মার অবিরোধ হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বী

নরজীবনের অন্তরঙ্গ রহস্য নির্ণয়স্থলে প্রাপ্ত জড়মূলক মতকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই। মনুষ্য যে কেবল জড়জাত যন্ত্রবিশেষ ইহাই মাত্র মানিয়া লইতে হয়, ইহা না মানিলে আর জড়বাদীদিগের অগ্রগামী হইবার পথ দেখা যায় না। এহলে সরল জিজ্ঞাসুদিগের কর্তব্য এই যে, তাঁহারা জড়বাদীদিগকে তাহাদের নিজ সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া বিচার করিতে বাধ্য করান এবং তাহাদের নিকট হইতে স্পষ্টবাক্যে আমরা সত্য বলিলাম কিনা ইহার উত্তর গ্রহণ করুন। কয়েক বৎসর পূর্বে লুএলিন ডেভিস নিজ প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

মনে করা যাউক যে বিজ্ঞান এবং আত্মার তত্ত্বের বিরোধ না থাকিলেও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে।

জড়বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা আত্মতাত্ত্বিক শ্রদ্ধেয়

এখন দেখা উচিত, ইহাদের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধার উপর কাহার বিশেষ অধিকার। উভয়কে সমান সম্মান দিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইতাম। কিন্তু তাহা আমরা করিতে পারি না। যখন জড়বাদীগণ বিজ্ঞানকে অধিক সম্মান দেওয়া উচিত এরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তখন আমাদের এরূপ প্রশ্ন করা অনধিকার চর্চা নয়। তাঁহাদের বিজ্ঞান তাঁহাদের অপ্রাকৃত জীবন সম্বন্ধীয় কোন ভাবেরই আভাস দেয় না। কেবল ক্রমোৎপত্তি, শক্তির রূপান্তরতা, স্বভাবের গতি ও সিদ্ধক্রম এই সকল শব্দ ব্যক্ত করিয়া থাকে। এই সকল ভাবের প্রতি আদর তাঁহারা নিজেই করিয়া থাকেন। এই সকলকে তাঁহারা সুন্দরতম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, অথচ তাঁহারা নিজেই ফিছু বুঝিতে পারেন না। এই সকল তত্ত্বের অনুশীলন প্রয়াসে তাঁহারা অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী আমরা এইরূপ বিশেষ ব্যক্তি সিদ্ধান্তের বাক্যকে অনাদর করি না, কিন্তু জড়বাদীদিগের বিজ্ঞান আমাদের সম্মুখীন হইলে তাহার প্রতি কোন প্রকার বিশেষ আদর প্রকাশ করিতে পারি না। আমরা স্পষ্টই বলিয়া থাকি যে বিজ্ঞান-বৈশারদীবুদ্ধি অপেক্ষা আত্মতত্ত্বের প্রতি আমাদের ভক্তি অধিক।

আত্মতত্ত্ব পারমার্থিক উদ্ধর্গতিসম্পন্ন

আমাদের বিবেচনায় আসল প্রশ্ন এই যে বৈকুণ্ঠ হইতে প্রেরিত আলোক তাঁহারা অবলম্বন করিবেন কি না? এখনকার কথা এই যে তুমি বিজ্ঞানের অন্বেষণে হইবে, না আত্মজ্ঞানের অন্বেষণে হইবে। বিজ্ঞান বিগত-ব্যাপার এবং নিম্নগত ব্যাপার সকল লক্ষ্য করে। কিন্তু আত্মতত্ত্ব জীবের ভাবী ব্যাপার এবং উদ্ধর্গতির প্রতি দৃষ্টি করে। বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়-গৃহীত ব্যাপার সকলের অনুসন্ধান-পূর্বক দেখিয়া থাকেন যে বস্তু সকলের কিরূপে ক্রমবিবর্ত হইয়াছে। কিন্তু আত্মজ্ঞান পারমার্থিক জীবনের অন্বেষণ করতঃ কাব্য এবং শিল্প রচনা করিতে সক্ষম হন।

লুএলিন ডেভিসের মত শুদ্ধ নহে

লুএলিন ডেভিসের কথাগুলি সুন্দররূপে সজ্জিত হইলেও আমরা ইহাতে অনেক বিতর্কের স্থল পাই। ইহার সর্বত্র এই কথাগুলি লক্ষিত হয়। যদিও আত্মজ্ঞান বিজ্ঞান অপেক্ষা কাব্য, শিল্প ও সামাজিক ভাবও ধর্মপ্রসূত হইয়া আমাদের শ্রদ্ধার উপর অধিক দাবী করিতে পারে তথাপি জীবনের বৈজ্ঞানিক ভাব আমাদের কিছু না কিছু শ্রদ্ধার উপর দাবী রাখে, কেন না ইহা সত্য।

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অপ্রমাণিত স্মরণ্য হেয়

আমরা স্থির করি এই যে, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আমাদের শ্রদ্ধার্থ হওয়া দূরে থাকুক, নিতান্ত হেয়। কেননা যাহাকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলেন তাহাতে বিজ্ঞান-লক্ষণ কিছুই নাই। তাহাতে কতকগুলি কথা আছে যাহা প্রমাণিত হয় নাই এবং প্রমাণ হইবার যোগ্য নয়। দেখ নব্য বৈজ্ঞানিকদিগের আসল কথা কি? তাহাদের আসল কথা এই যে, মানবের আধ্যাত্মিক সত্তা নাই স্মরণ্য। তাঁহাদের চরিত্র এবং ইতিহাসের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে তাহার কোন কার্য নাই। খ্রীষ্টের কোন অমুগত গোস্বামী বলেন যে, খ্রীষ্টপ্রেম দ্বারা আমি এইরূপ কার্য করিয়া থাকি কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ক্রমোৎপত্তি-সাধক বৈজ্ঞানিক বলিয়া থাকেন তাহা নয়। হে খ্রীষ্টিয়ান, তোমার বিশ্বাস শুদ্ধ ভ্রম। তোমার খ্রীষ্ট-প্রেম বৈজ্ঞানিক সংবাদদাতার কার্য সম্বন্ধে ত্রায় সাংসারিক কার্যের নিতান্ত গোণ কর্তামাত্র। স্বথ-হুঃখ, অশ্র ও হাস্য, বিশ্বাস, আশা, উচ্চাভিলাষ এবং প্রেম ইহারই সামাজিক কার্যের গোণ নিয়ন্তা।

ক্রমোৎপত্তিবাদের যুক্তি-খণ্ডন

শ্রায়মতে বৈজ্ঞানিকদিগের এই কথাই সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মানবজাতির বিশ্বাসের উপর এরূপ দাবীর হেতু কি দেখা যাউক। আজকাল যাহাকে বৈজ্ঞানিক-জগৎ বলা হইয়াছে তাহা ডারউইনের ক্রমোৎপত্তি সিদ্ধান্তের চরণে এতদূর সাষ্টাঙ্গ প্রণত যে ডাঃউইনের সিদ্ধান্তটী যে একটি মতবাদমাত্র তাহা দেখাইতে হইলে বিশেষ সাহসের প্রয়োজন। ডারউইনের পরম ভক্তগণ যে যে কথা স্বীকার করিয়াছেন তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাঁহাদের আজ্ঞাও প্রমাণের বিশেষ অভাব। কেবল এইমাত্র, তাহা নয়। প্রমাণ চিরদিনই অভাব থাকিবে। এক জাতীয় বস্তু হইতে বহু জাতীয় আকৃতি ও বর্ণ কৃত্রিম উৎপত্তির দ্বারা হইতে পারে দেখিয়া তাঁহারা এই স্থির করিয়াছেন যে কোন মূল আকার হইতে আকারবৈচিত্র্য জন্মিয়া থাকে। প্রকৃতি কখনই দুইটী সর্বপ্রকারে সমান বস্তু উৎপন্ন করেন না। বৃক্ষের এক পত্রের ত্রায় অল্প আর এক পত্র সে বৃক্ষে দেখা যায় না। কোন জন্তু সর্বপ্রকারে তাহার মাতা বা পিতার সমান হয় না। এই অত্যন্তিক ঘটনাগুলি দৃষ্টি করিয়া মালিগণ, পশুপালকগণ এবং তাহাদের ত্রায় অনেকই বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত একজাতীয় বস্তু হইতে বহু প্রকার আকৃতিশালী বস্তু অর্থাৎ উদ্ভিদ ও জন্তু উৎপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু একাল পর্যন্ত দুই জাতীয়কে একত্র করিয়া পৃথক

জাতি নির্মাণ করিতে সক্ষম হন নাই। মানব সৃষ্টির পর ক্রমোৎপত্তির কোন কার্য দেখা যায় না একথা ক্রমোৎপত্তিবিদ পুরুষেরাও অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন যে বহুকাল বিগত না হইলে একটি নূতনজাতীয় বস্তু উৎপত্তি হয় না, সুতরাং নূতন জাতি দর্শনের আশা এত শীঘ্র করা উচিত নয়। এখন কথা এই হইল, যে প্রতিদিবসের প্রতিঘণ্টার এবং প্রতি মুহূর্তের ঘটনাসকলে বিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক একটি অদৃষ্ট-ফল মতবাদ স্বীকার কর, যাহার স্বভাব বিচার করিলে তাহাকে প্রমেয় বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে না।

জড়বাদ স্বীকারের গুরুতর প্রতিবন্ধক

জড়বাদ স্বীকার করার পক্ষে এই সমস্ত প্রতিবন্ধক থাকিলেও তদপেক্ষা গুরুতর আর একটি প্রতিবন্ধক আছে। ক্রমোৎপত্তিবাদকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহার অধিকার নির্ণয়স্থলে ইহাকে একটি সামান্ত প্রক্রিয়ামাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যে শক্তি হইতে এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহার মূল ও স্বভাব সম্বন্ধে এই বাদ নিতান্ত নিস্তব্ধ। যে পর্যন্ত ভূমিস্তরসমূহে ও উদ্ভিদ ও জন্তুদিগের আকৃতি ও নির্মাণ সম্বন্ধে এই মতের ক্রিয়া হইতে থাকে সে পর্যন্ত এই ক্রিয়ারও মূলানুসন্ধান প্রবৃত্তি কার্য্য করে না। এই মতে তত্ত্ববাদী যথেষ্ট। কিন্তু সম্বুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ যখন দেখিতে থাকেন, যে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আত্মপ্রত্যয় পরিপূর্ণ জীবন সম্বন্ধে যে সময়ে অনুসন্ধান করিতে থাকেন, তখন তাঁহার সম্মুখে অনেক প্রকার সত্তা প্রতীত হয় যাহার সম্বন্ধ-প্রাপ্ত বস্তু আত্মপ্রত্যয়ের সীমার বাহিরে নাই।

ক্রমোৎপত্তিবাদের হেয়তা ও দৃষ্টতা

যখন আমরা আনন্দ ও বিষাদ, দুঃখ ও সুখ, বাক্য ও ক্রিয়া বিষয় চিন্তা করি, তখন তাহাদের উৎপত্তিক্রমের মূল জানিতে পারি না, কেবল যখন সৃষ্টিশক্তির তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করি, তখনই তাহা জানিতে পারি। ক্রমোৎপত্তিবাদী সাহসের সহিত কিন্তু প্রমাণশূন্য হইয়া বলিতে থাকেন যে, এই শক্তি জড়যন্ত্রোদ্ভিত এবং আত্মপ্রত্যয়ের সম্বন্ধবিহীন। কি প্রকারে জড়যন্ত্রোদ্ভিত এবং আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধশূন্য কোন প্রকার শক্তি আধ্যাত্মিক স্বতন্ত্রতাপূর্ণ জীব সকলকে উৎপত্তি করিতে পারে, তদ্বিষয়ে ক্রমোৎপত্তিবাদী কোন সিদ্ধান্ত করিতে চায় না। পক্ষান্তরে তিনি স্বীকার করিয়া থাকেন যে এই তত্ত্বটী অপরিজ্ঞাত এবং অবিচিন্ত্য। তথাপি তাঁহার জড়বাদের অকর্ম্মণ্যতা স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় অবিচারপূর্বক তিনি বলিয়া থাকেন, যাহারা ক্রমোৎপত্তিবাদের সত্যতা

সন্দেহ করেন, তাঁহারা অতঃপ্ত এবং বান্দুসিত ।

জড়ীয় মতবাদ সসীম ও ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত

হারবার্ট স্পেন্সার, হাক্সলি প্রভৃতির উদ্ভাবিত বিজ্ঞান করণাপাটবসন্তুত প্রমাদবিশেষ । অপক চিকিৎসক বেক্রপ অথবা ঔষধ প্রয়োগদ্বারা সমস্ত শারীরিক পীড়া নিবৃত্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, সেইরূপ আমাদের নব্য জড়বিং পণ্ডিতাভি-মানীগণ জৈবজীবনের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্র জড়বাদান্ত-গত বিধি সকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন । প্রমাদজনিত ক্লেশ না বুঝিয়া অমূলক স্বপ্নবৎ বিচার উপর বিশ্বাস করিয়া সকল বিষয়েরই তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন । জড়ীয় মতবাদ যে নিতান্ত সীমাবিশিষ্ট এবং ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটে পরিপূর্ণ দেখাইয়া দিলে আধ্যাত্মিক জীবনের বিরোধে সেই ভ্রান্তদিগের শিক্ষা কিছুমাত্র কার্য করিতে পারিবে না ।

খ্রীষ্টিয়ান মতের Soul ও বেদের আত্মা এক নহে

এই প্রবন্ধটা কোন খ্রীষ্টিয়ান লেখনী হইতে নিঃসৃত, ইহাতে সন্দেহ নাই । লেখক জড়বাদ অস্বীকারপূর্বক যেটুকু আধ্যাত্মিকবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা খ্রীষ্টিয়ান ধর্মোচিত সঙ্কোচিত আত্মবাদ মাত্র । খ্রীষ্টানধর্মো যে একটি (Soul) শব্দ আছে, তাহা স্থাপনা করিতে গেলে নিতান্ত জড়বাদীদিগের মতের খণ্ডন করা আবশ্যক, কেন না জড়শক্তিগত বিধি সকলকে অতিক্রম করিয়া সেই Soul বর্তমান । পরন্তু খ্রীষ্টিয়ান মত-ভাবিত Soul যে শুদ্ধ আত্মা তাহা নয় । বেদশাস্ত্রে ‘আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য মন্তব্য’ ইত্যাদি মন্ত্রে যে আত্মার উদ্দেশ আছে সে আত্মা নিতান্ত জড়বাদ ও মিশ্রজড়বাদ হইতে পৃথক্ । খ্রীষ্টানের আত্মা মিশ্র জড়বাদের অন্তর্গত । মন ও মনের ধর্ম সমস্তই খ্রীষ্টানের আত্মা । কিন্তু শুদ্ধ আত্মা মন হইতে অত্যন্ত উচ্চ ও শুদ্ধ ।

জড়বাদ অপেক্ষা খ্রীষ্টিয় আত্মবাদও শ্রেষ্ঠ

লিঙ্গ শরীরকে খ্রীষ্টিয়ানগণ আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করেন । সেই বিশ্বাসের অনুগত একটি স্বর্গ ও একটি নরকের কল্পনা করিয়াছেন ও সেই বিশ্বাসের অনুগত একটি ঈশ্বর ও একটি সয়তানের বিশ্বাসকে অঙ্গীকার করেন । যাহা হউক খ্রীষ্টানগণ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব অনুভব করিতে না পারিলেও সর্ব প্রকার জড়বাদীর পূজনীয়, কেন না সর্বপ্রকার জড়বাদেই আত্মতত্ত্বের অন্বেষণ মাত্রই নাই । খ্রীষ্টানগণের স্থূল ও জড়বন্ধন মুক্তি পূর্বক আত্মপথে শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়

—ইহাই তাহাদের মঙ্গলের বীজ। এই শ্রদ্ধাভাস জন্মজন্মান্তরে সংস্করণ স্বকৃতি বলে অনন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধারূপে পরিণত হইবে। জড়বাদীগণ দুর্ভাগা। তাহাদের মরণান্তে জড়ধর্ম প্রাপ্তিই ফল। “ভূতানি যান্তি ভূতেজ্য” এই ভগবদ্বাক্যই ইহার প্রমাণ। “যান্তি দেবব্রতা দেবান্” এই বাক্য দ্বারা খ্রীষ্টানগণ দেবতত্ত্বের স্বর্গলোক লাভ করিবেন হইতে সন্দেহ নাই। বেদার্থবিৎ বৈষ্ণবগণ “যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্” এই বাক্য ক্রমে শুদ্ধ আত্মবস্তুর যাজন পূর্বক পরমাত্ম স্বরূপ ভগবৎ সেবা লাভ করেন।

জড়বাদীগণই ভূত-পূজক—‘ভূতেজ্য’ এবং ইহাদের সভ্যতা আধুনিক ও আত্মরিক

জড়বাদীগণকেই ভূতেজ্য বলা যায়, কেননা তাহারা জড়ভূত ও জড় ভূতদিগের বিধি ও জড়-শক্তি আলোচনা পূর্বক যত প্রকার ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তি বিধি নির্ণয় করিয়াছে এবং সেই বিধিকে জগচ্চক্রের প্রধান বিধি বলিয়া মানিয়াছে। তাহারা মরণান্তে আত্মতত্ত্ব হইতে দূরীভূত হইয়া জড়মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ তাহাদের আত্মশক্তি বিলুপ্ত প্রায় হইয়া জড়শক্তি প্রধান হইয়া জড়ীভূত হয়। ইহাদিগের অবস্থা শোচনীয়। ইহারা স্বয়ং বঞ্চিত হইয়া জগৎকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। এই অপরাধেই তাহারা চরমে অধিকতর বঞ্চিত হয়। এই প্রকার ক্রমোৎপত্তিবাদ আধ্যাপকদিগের মধ্যে বহুতর অধঃপতিত পণ্ডিতাভিমাত্রী ব্যক্তিগণ কালে কালে স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে কিছুমাত্র নূতনতা নাই। পশ্চাত্য দেশে অতি অল্পকালই মানবের সভ্যতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেখা যায়। সেই সব দেশে স্মরণ্য টিওল, হাক্সলি, ডারউইন প্রভৃতি পণ্ডিত মধ্যে পরিগণিত। পুরাতন কথা নূতন ভাষায় বলিলে যে পাণ্ডিত্যের দাবী করা যায় তাহাই তাহারা করিতে পারেন। চারি সহস্র বৎসর পূর্বে যে ভগবদ্বাক্য প্রাচুর্য হইয়াছিলেন তাহাতে আত্মর প্রবৃত্তি বর্ণনে “জগদাহরনীশ্বরং” “অপরস্পরসম্বৃতং” ইত্যাদি বাক্যে স্বভাববাদ, ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তি বাদ এই সকল যে আত্মর প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয় তাহা কথিত হইয়াছে।

ক্রমোন্নতিবাদী ও ক্রমোৎপত্তিবাদীগণের প্রতি উপদেশ

এই সকল বাদ পরিত্যাগ পূর্বক আত্মতত্ত্বের প্রবেশ করা স্বার্থ-সাধক জীবের কর্তব্য। জড় জগতের বৈচিত্র্য সমস্ত স্বীকার পূর্বক তাহাতে অধিকর্তার লীলা

আলোচনা করতঃ ভগবৎ প্রেমের অনুসন্ধান করা উচিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবাদে আবদ্ধ থাকা বুদ্ধিমান পুরুষের কর্তব্য নয়। প্রক্রিয়াশেষী শিল্পীদিগের পক্ষে সেই সেই বিজ্ঞান বহু মাননীয়। শিল্প-বিদ্যা ও বিজ্ঞান-বিদ্যাকে উন্নতি করিয়া তত্ত্ববিদগণের সেবা করাই তাহাদের কর্তব্য। আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ়, যাহারা তাহার আলোচনায় নিযুক্ত তাঁহাদের সামান্য শিল্প বিজ্ঞানাদিতে আবদ্ধ হওয়ার অবসর নাই। এতদ্বিবন্ধন তাঁহাদের শরীর নির্বাহী ব্যাপার সকলের সাধনের জন্য অগ্ন্যাগ্ন সকলের চেষ্টা করা উচিত। হে ভ্রাত, ক্রমোন্নতিবাদি! হে ভ্রাত, ক্রমোৎপত্তিবাদি! তোমরা আপনাপন কার্য্য কর তাহাতে তোমাদের এবং জগতের উভয়ের মঙ্গল হইবে। তোমরা অনধিকারচর্চাপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বের দোষগুণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিও না। তোমরা ভাল মানুষ হইয়া কার্য্য করিলে আমরা তোমাদিগকে নিরন্তর আশীর্বাদ করিব।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিনিবোধ

শ্রীগুরু-কৃপা

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃপা শিক্ষায় লিখিয়াছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।

গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১০১)

তাৎপর্য্য এই যে জীবসকল দুষ্কৃতিফলে নানা ষোণিতে ভ্রমণ করিতেছে এবং নব নব কৰ্ম্ম বাসনার উদয়ে তাহার সংসার ক্রমে বদ্ধিত হইতেছে। যে কোন-রূপে অজ্ঞানক্রমেও এমন কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও যদি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা হইয়া যায়, তবে সেই প্রকার কৰ্ম্মফলে স্মৃতি সঞ্চয় হয় এবং ঐ সঞ্চিত স্মৃতির উদয়ে গুরুকৃপা লাভ ঘটে। সাধারণতঃ জীবের বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয় না। ভোগোন্মত্ত জীবের স্বভাব এই যে তাহারা নশ্বর বস্তুর সেবা করিবে, অন্নাভিলাষী, কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির সেবা করিবে, কিন্তু বিষ্ণুবৈষ্ণব সেবা করিবার অভিলাষ তাহাদের হইবে না। •

গৃহমেদী জীবের কনক কামিনী ও প্রতিষ্ঠাই একমাত্র কাম্য। যাহারা ঐ সকল ভোগ্য বস্তুর ইচ্ছন নোগাইয়া দেয়, তাহাদিগকেই উপদেষ্টা, হিতকামী বা

গুরুরূপে বরণ করে এবং তাহার ফলে পরিশ্রমে বাসনাময় সংসারই বৃদ্ধি হয়। পরন্তু যদি কোন জীবের মৌভাগ্যক্রমে ভক্ত্যুগ্মী স্বকৃতির উদয় হয়, তবে ঐ স্বকৃতিফলে তাহার সাধুগুরুর সঙ্গ লাভ হয়। সেই স্বকৃতিশালী জীবের পরম কল্যাণ বিধানের জন্তু নিখিল কল্যানৈকখনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ প্রেষ্ঠজনকে মহাস্ত গুরুরূপে এ জগতে প্রেরণ করেন। ইহাই কৃষ্ণ-কৃপা। আর শ্রীগুরুদেব জীবগণকে কৃষ্ণসেবারূপ অমুগ্রহ প্রদান করিয়া থাকেন ইহাই গুরুকৃপা। ইহার অপর নাম ভক্তিলতা-বীজ। ভক্তিলতা-বীজ লাভই যে ভক্তনের পরিপক অবস্থা তাহা নহে, এজন্য শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভু পুনরায় বলিতেছেন—

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।

শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন ॥

(টে: চ: ম: ১২।১৫২)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করতঃ তাহার অমুকীর্তনই জল-সেচন কার্য। শ্রদ্ধাবান্ জীব সদগুরুর চরণাশ্রয় করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা করিয়া শিষ্যের যোগ্যতানুসারে বিবিধ সেবাকার্যে নিযুক্ত করিয়া তাহার সকল ইন্দ্রিয়কে আত্মেন্দ্রিয় তোষণের পরিবর্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণে নিযুক্ত করেন। 'এই প্রকার সেবাকালে তাহার ক্রমান্বয়ে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি লাভ হইয়া থাকে'। ইহাই ভক্তিলাভের সহজ ও সুগম পন্থা। কিন্তু গুরুপাদপদ্ম ইহাতে স্বতন্ত্র থাকিয়া অর্থাৎ গুরুদেবকে বাদ দিয়া যে কৃষ্ণভক্তনের ছলনা; তাহা "ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার" ন্যায় বৃথা পণ্ড্রমে পর্যাবসিত হইবে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভাশা সুদূরপর্যাহত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—“ক্রয়ঃ স্নিগ্ধস্ত শিষ্যস্ত গুরবো গুহ্যমপ্যত”। শ্রীগুরুদেব স্নিগ্ধ অর্থাৎ বিশ্রান্ত শিষ্যকে পরম গুহ্য বস্তুর উপদেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের উপদেশানুসারে অকপট সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকিলে অন্তর্ধ্যায়ী শ্রীগুরুদেব আমাদের চিত্তবৃত্তি বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম প্রদান করিয়া থাকেন।

নব যোগেন্দ্রের অগ্নিতম প্রবুদ্ধ ঋষির বাক্যেও দেখিতে পাওয়া যায়—

তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্বেদ্ গুর্যায় দৈবতঃ ।

অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তম্বেদান্বদো হরি ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত)

শ্রীগুরুদেবকে একমাত্র হিতকারী বান্ধব এবং পরমারাধ্যতম হরিস্বরূপ জানিয়া নিরন্তর নিকপটে তাঁহার অমুগমনে ভাগবত-ধর্মের শিক্ষা করিতে হইবে।

তদ্বারা আত্মা হরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। মোটকথা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্বক নিষ্কপটে গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পালন করাই কর্তব্য। কিন্তু অনেক সময় ভোগোন্মত্ত চিন্তা নানা প্রকার পরামর্শ দিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহীষ্ট প্রচারে বাধা প্রদান করিয়া অজ্ঞ বিষয়ীর সেবা করিতে প্রবুদ্ধ করায়। তখন আমরা নিজ বিচারে শ্রীগুরুদেবের কৃষ্ণ-প্ৰীতি-উদ্দেশক কঠোর আদেশ-বাণী সমূহের বাছাই করিয়া লইয়া বলিয়া বসি—ইহা আমি পালন করিতে পারিব না, আমার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। তিনি আমার যোগ্যতা বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিতে পারিলে এরূপ অগ্নায় আদেশ করিতেন না। এইরূপ বিচার গুরুতে মর্ত্যবুদ্ধি আনয়ন করে, অথবা পরম বিজ্ঞ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অজ্ঞ মনে করাইয়া থাকে। অনেক সময় তিনি বাহ্যিক অজ্ঞের ভান করিলেও অন্তর্য্যামীস্বত্রে তিনি আমার প্রতি কাষ্যের প্রতি-পদবিক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকেন—বাহাতে আমি অগ্নাভিলাষ ত্যাগ করিয়া নিষ্কপটে সেবা-নিমগ্ন থাকিতে পারি তাহার ব্যবস্থা করেন। অতএব বিনা বিচারে গুরুর আদেশ পালন করিতে পারিলেই গুরুকৃপা স্নান হয়। আর স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিলে অনর্থ বর্ধিত হয় ও ক্রমে সংসার ভোগের পথস্বরূপ নরকের দ্বার প্রশস্ত হয়।

আমরা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এ বিষয়ের জলন্ত আদর্শ দেখিতে পাই। শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তির মূল অঙ্কুরস্বরূপ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের দুইজন শিষ্য ছিলেন। একজনের নাম শ্রীঈশ্বরপুরী অপর শিষ্যের নাম শ্রীরামচন্দ্র পুরী। শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ ‘গুরোবাজ্ঞা হবিচারণীয়া’ এই বাক্যের সার্থকতা করিয়া নির্বিচারে নিষ্কপটে নিরন্তর ‘বিশ্রান্তেন গুরোঃ সেবা’ অর্থাৎ প্ৰীতি ও অমুরাগের সহিত গুরুর সেবা করিতেন, এমন কি স্বহস্তে গুরুদেবের মল-মূত্রাদিও মার্জন করিতেন। যথা :—

ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ সেবন।

স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জন ॥

নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অমুরাগ ॥

তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।

বর দিলা,—‘কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন’ ॥

সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী ‘প্রেমের সাগর’।

আর শ্রীরামচন্দ্রপুরী গুরুদেবে অবজ্ঞা ও নিজে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করার ফলে চিত্তবৃত্তি নিম্নগামী হইয়া সর্ব বৈষ্ণবের নিন্দা এমন কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরির নিন্দা ও পরিশেষে গুরুদেব শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর অপ্রকটকালে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহারও মর্যাদা লঙ্ঘন করেন—

পূর্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করেন অন্তর্দ্বান ।

রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁর স্থান ॥

পুরী-গোসাঞি করে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন ।

‘মথুরা না পাইছ’ বলি’ করেন ক্রন্দন ॥

রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে ।

শিষ্য হঞা গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে ॥

‘তুমি—পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ ।

ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন ?”

শুনি’ মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল ।

‘দূর, দূর, পাপী’ বলি’ ভৎসনা করিল ॥

কৃষ্ণ-রূপা না পাইছ, না পাইছ ‘মথুরা’ ।

আপন হুঃখে মরে’, এই দিতে আইল জালা ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৮।১৬-২১)

—শ্রীদীনতিহর ব্রহ্মচারী, সহঃ সম্পাদক

বেদান্তাচার্য্য শ্রীরামানুজ

রামানুজ সম্বন্ধে লিখিবার উদ্দীপনা ও তাঁহার জন্ম-পরিচয়

আমরা গত সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান সংখ্যায় আমরা বেদান্তাচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামীর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অতুপ্রাণিত হইয়াছি। কারণ তিনি এই চৈত্র-মাসেই শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে আবির্ভূত হন। সে আজ প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তাঁহার স্থিতিকাল ১০১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২০ বৎসর।

রামানুজের পিতার নাম কেশব ভট্ট, মাতার নাম কান্তিমতী। কান্তিমতী যামুন মণিবরের পৌত্রী এবং শৈলপূর্ণের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। শৈলপূর্ণ যামুন্যচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামানুজ পেরেমবুদুর গ্রামে ১০১৭ খৃষ্টাব্দে মাতৃ-

কৃষ্ণি হইতে ভূমিষ্ঠ হন। পেরেশ্বরের গ্রামের অন্ত নাম ভূতপুৰী বা মহাভূতপুৰী। মাতুল শৈলপূর্ণ কেশব-তনয়ের অমাহুযিক লক্ষণাদি বিচার করিয়া সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণশক্তির অবতার জানিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন শ্রীলক্ষণ দেশিক। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অলুজ বলিয়া তাঁহার অলু জগদ্বিখ্যাত নাম শ্রীরামালুজ। তামিল ভাষায় তাঁহার গৌরবময় পরিচয় 'ইলায়া পেকমল'।

আচার্য্যের জন্ম, মাস ও ঋতুর তথ্য

আচার্য্যের আবির্ভাবের তিথি মাসাদির বিচারে দেখা যায় তাহাদের মধ্যেও বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। আমরা নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আচার্য্য শ্রীল রামালুজ বিশিষ্টাষ্টৈতবাদী ছিলেন। বিশিষ্টাষ্টৈতবাদী বৈষ্ণবগণ পঞ্চরাত্রের অনুগত। শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে প্রাকৃত কালের অন্তর্গত ঋতু, মাস, তিথি, বার প্রভৃতির প্রাকৃত নিরীশ্বর নামের পরিবর্তে বৈষ্ণব তোষণের নিমিত্ত বিষ্ণুপূর নামের দ্বারা তাহাদের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মদীয় শ্রীগুরুদেব জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই আদর্শে বিশেষ মৌলিকতার সহিত শ্রীনরদীপ পত্রিকা প্রতি বৎসর বৈষ্ণবগণের হিতের জন্ত প্রকাশ করিতেন। আজকালও উহা কতক পরিমাণে সেই আদর্শে কেহ কেহ প্রকাশ করিতেছেন। তাহাতে দেখা যায় বর্তমান চৈত্রমাসের নাম 'বিষ্ণু,' বসন্ত ঋতুর নাম 'মাধব' এবং পঞ্চমী তিথির নাম 'শ্রীধর'। সুতরাং আচার্য্য শ্রীরামালুজ মাধব ঋতুতে, বিষ্ণু মাসে, শ্রীধর তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন।

বিষ্ণু-মাসে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া বিষ্ণুপূজক রামালুজ তাঁহার পূর্বাচার্য্য বিষ্ণুচিন্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 'বিষ্ণুপুরাণ' দ্বারা শুদ্ধ-জ্ঞান-বিনাশিনী বিষ্ণুভক্তির অবলম্বনে 'বিষ্ণু পূজাই' জীবের একমাত্র কৃত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। অধিকন্তু এই মাধব বসন্তে মধু চৈত্রমাসে 'মধুর কবি' নামক মধুর কবিতা লেখক জর্নৈক আল-বরও বিশিষ্টাষ্টৈতবাদীদের আদর্শ আচার্য্য বিষ্ণুবাহনের অবতাররূপে অবতীর্ণ হন। সে আজ যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৩২৪৬-বৎসর পূর্বোৎসব কথা হইলেও রামালুজ তাঁহার কাব্য-মাধুর্য্যে ও আচার-বিচারে আকৃষ্ট হইয়া অহংগ্রহ-উপাসনার ধ্বংস সাধন করিয়া জগতের প্রভূত কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। যহু এই মধু চৈত্রমাস—যিনি বিষ্ণুমাস নাম ধারণের স্বার্থকতা করিয়াছেন।

রামানুজের জন্মতিথি শ্রীপঞ্চমীর তথ্য

পঞ্চমী অর্থাৎ শ্রীধর তিথি। রামানুজের এই শ্রীধর তিথিতে আবির্ভূত হইবার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা একটি বিশেষ তথ্যের সন্ধান পাই। শ্রীধর শব্দের অর্থ ‘শ্রী’ ধারণ অর্থাৎ স্বীকার করিয়াছেন যিনি, তিনি শ্রীধর। বেদব্যাস বলেন—“রামানুজঃ শ্রীঃ স্বীচক্রে।” অর্থাৎ শ্রী (লক্ষ্মীদেবী) বিষ্ণুতত্ত্বের মূল-পুরুষ শ্রীনারায়ণের প্রধানা সেবিকা। তিনি শ্রীরামানুজকে তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রধান সেবক আচার্য্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি শ্রীধর তিথিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া ব্যাসের ভবিষ্যদ্বাক্যের স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। সেই হেতু রামানুজ শ্রীসম্প্রদায়কে নিত্যকালের জন্য ধারণ করিয়া ‘শ্রীধর’ আচার্য্যস্বরূপে শ্রী-বৈষ্ণব সমাজে পূজিত হইতেছেন। ধন্য এই পঞ্চমী তিথি যিনি শ্রীধর-তিথি নামে খ্যাতা হইয়াছেন।

আচার্য্যের আবির্ভাব কালের অবস্থা বর্ণন

ভারত ধর্মের জন্য বিখ্যাত। ধর্মই ভারতের জীবন। ভারতবাসীর এমন দিন হইয়াছিল যে সময় তাঁহারা সর্বদা গভীর ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাসী, ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি-সমর্পিত, ভগবানের নিত্য বিগ্রহে আস্থা সম্পন্ন। তাঁহারা সমস্তরূপে বেদ-বেদান্ত, পঞ্চরাত্র-ভাগবত, পুরাণ-ইতিহাস, স্মৃতি-মহাভারত প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রের পূজা প্রদানে মুক্তহস্ত এবং তাহাদের মর্যাদা গানে মুক্তকণ্ঠ। কিন্তু দুর্দ্দমনীয় কালের করাল চক্রের অব্যর্থ আবর্তনে ভারতের সে সৌভাগ্য-সূর্য্য ক্রমে ক্রমে অন্তমিত হইতে লাগিল। শুভদিনের নির্মল আকাশ কঠোর নাস্তিকতার ঘন ঘটায় আবৃত হইয়া পড়িল। বেদ-বেদান্ত, মহাভারত, ভাগবত পুরাণাদির উজ্জল চর্চ্চালোক অদ্বৈতবাদের অমারুকারে নিম্ভ হইতে লাগিল; মানবের হৃদয়পটে শাস্ত্র সম্বন্ধে বিবিধ সন্দেহের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হইল। ক্রমশঃ শ্রীবেদব্যাসের নির্মিত ভগবদ্ভক্তির প্রশস্ত সহজ সরল সরণি শুষ্ক-জ্ঞান-কণ্টকে সমাকীর্ণ হইয়া দুর্গম পথে পরিণত হইল। ‘সমগ্র জগৎ মিথ্যা ও অসৎ’ এইরূপ চিন্তা-রাক্ষসী সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলিল; “অহং ব্রহ্মাস্মি” মন্ত্রের কদর্থ-বীজ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া দম্ভ-ক্রমের অরণ্য নির্মাণ করিল। ফলে পিতা-মাতা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা বিনষ্ট হইল; ধর্মভাব দূরে পলায়ন করিল; বিশ্ব ঘোর তমসচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এমন কি অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের অত্যাচারে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা, পাপ কার্য্যে উৎসাহ, নরহত্যাাদিতে নির্ভয়, পরনারী হরণে নির্লজ্জ-

ভাব প্রভৃতি পৈশাচিক প্রবৃত্তির তাণ্ডব নৃত্যে ধরিত্রী উদ্ভিগ্না ও ব্যথিতা হইতে ছিলেন। এমন সময় ভক্তি-ভাব-বিভাবিত ভুবন-মঙ্গল বিশিষ্টাঙ্গৈত চিন্তা-স্রোতের পূর্ণাস্তিক্য দর্শনের প্রবল বহ্না আনয়নকারী আচার্য্য-কেশরী ভাষ্যকার শ্রীরামানুজ অবতীর্ণ হইলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীরামানুজ চরিতকার শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী তাঁহার স্থলেখনী নিঃসৃত ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাও সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তাহার কিয়দংশ পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত নিম্নে উদ্ধার করিলাম।

রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর লিখিত কাল বিচার

কালধর্ম্মানুসারে শঙ্কর কথিত বেদ-চতুষ্টয়সার মহাকাব্য চতুষ্টয়ের হ্রস্ব করিয়া তন্মতাবলম্বী অনেক সন্ন্যাসী-বেশধারী ইন্দ্ৰিয় পরবশ মানব আপনাদের ও সমাজের উপর বহু অনর্থ আনিয়া ফেলিলেন। “অহং ব্রহ্মাস্মি” বাক্যে তাহার শাক্তত্রিহস্ত পরিমিত, সপ্তধাতুময়, বিষ্ঠামূত্রবাহী, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধির নিবাসভূমি, সন্ধীর্ণদৃষ্টি, অধ্রুব নশ্বর জীবন, অতীতানাগত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এবং অক্লতবুদ্ধি মনুষ্যই অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বাশ্রয়, পরমানন্দধাম, অচ্যুতব্রহ্ম, একুপ স্থির করিলেন। পদুপত্র যেরূপ জললগ্ন হইতে পারে না, ব্রহ্মবস্ততেও সেইরূপ পুণ্য-পাপ, আচার-অনাচার, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি কিছুই সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। আমিই সেই ব্রহ্ম,—স্বতরাং আমি যাহাই করি না কেন আমাতে কোনও দাগ লাগিতে পারে না। এতদপেক্ষা পৈশাচিক সিদ্ধান্ত আর কি হইতে পারে? একুপ ধারণার বশবর্তী ব্যক্তি সকল যে শীঘ্রই আপনাদের স্বদেশের সর্বনাশের কারণ হইবে, তাহা কি আর বুঝিতে বিলম্ব হয়? বস্তুতঃই উক্ত স্বকপোল-কল্পিত কদর্থকারিগণ শঙ্কর-কথিত অদ্বৈতবাদের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা করিতে না পারিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে দুর্নীতি, হিংসা, দ্বেষ, অসত্য প্রভৃতির রাজ্য স্থাপন করিল। সুখ, শান্তি, ও সত্যের অভাব সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইতে লাগিল; সেই অভাব দূর করিবার জন্তই এই মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দ স্বামীর অভিमत

গোঁড়া অদ্বৈতবাদী শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস লেখক। তাহাতে আচার্য্য লক্ষণ দেশিকের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও পাঠকবর্গের আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। বিরুদ্ধ-বাদিগণের দৃষ্টিতেও রামানুজের মহিমা যেরূপভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে

তাহা হইতেও আমরা অনেক কিছু অবগত হইতে পারি। শঙ্কর-পন্থী মায়া-বাদিগণের মধ্যে বাহারা তাঁহার মহিমায় উদ্ভাস্ত, সাম্প্রদায়িকতায় দুষ্ট, তাহারা অন্তের কোনও দোষ না থাকিলেও যে কোন প্রকার একটা কিছু আরোপ করিয়া শঙ্কর-মতের প্রাধান্ত স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প। সুতরাং রামানুজের বিজয় গান তাহাদের নিকট বিষয় মনে হইলেও রামকৃষ্ণানন্দজীর মতের প্রতিবাদ করিতে গিয়া স্বামীজী লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন যে—“বাস্তবিক রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর লেখার চিন্তাশীলতা আছে, কিন্তু ঐতিহাসিকতা নাই। জীবন-চরিতকারগণ রামানুজের আবির্ভাবের পূর্বতন অবস্থা যেরূপ বর্ণন করেন, তাহা আদর্শেই সঙ্গত মনে হয় না। কারণ তাঁহাদের মতে শঙ্কর-মত যখন সাধারণ বুদ্ধি লোকের নিকট বিকৃত হইয়াছে, যখন বেদান্তের গভীর আত্মতত্ত্ব দেহাশ্রবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তখনই রামানুজের আবির্ভাব। (বস্তুতঃ) যখন দক্ষিণ ভারতে—কেবল দক্ষিণ ভারতে নহে, সমস্ত ভারতেই যখন শঙ্কর-মত প্রবল, (প্রকৃতপক্ষে) তখন রামানুজের আবির্ভাব। অন্ত্র আরও লিখিয়াছেন—“আমাদের (অদ্বৈতবাদিগণের) দৃঢ় ধারণা রামানুজের যুগে শঙ্করমতে কোনও ব্যাপক গ্লানির উদ্ভব হয় নাই, বরং বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে শঙ্কর মতের প্রাধান্ত ও প্রাবল্যের যুগেই রামানুজের আবির্ভাব।” শঙ্কর মতবাদিগণের বিন্দুমাত্রও গ্লানি ও পতন হইতে পারে ইহা যেন স্বামীজীর পক্ষে স্বীকার করা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। তিনি অতি কষ্টে সত্যের খাতিরে লিখিয়াছেন—“শঙ্করের প্রতিপক্ষগণের মধ্যে রামানুজের ত্রায় প্রতিভা আর কাহারও হয় নাই। বিচার মল্লতায় রামানুজ অন্তান্ত আচার্য্যগণের অগ্রণী। তর্কিকের শিরোমণি রামানুজ শঙ্করমত খণ্ডন করিয়া ভক্তিবাদের স্থাপনে যেরূপ বদ্ধ-পন্থিকর, সেরূপ অন্ত কোনও আচার্য্যকে দেখিতে পাওয়া যায় না। শঙ্করের প্রতিপক্ষরূপে যে সকল আচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছে, রামানুজ তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।” আমরা শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর ঘোর সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ গৌড়ামী দেখিয়া অবাক হইতেছি। তিনি বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস লিখিতে গিয়া যে ঐতিহ্যজ্ঞানের ও শঙ্কর-প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত হান্তাম্পদ। এমন কি ঐ গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় শঙ্করপ্রেমে উদ্ভাস্ত হইয়াও স্বামীজীর শত শত ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন।

লক্ষ্মণদেশিকের বাল্য জীবনের সমালোচনা

শঙ্কর-প্রেমিক স্বামীজী আচার্য্য কেশব-তনয় শ্রীলক্ষ্মণ দেশিকের বাল্য-

জীবনের মধ্যে কোনও প্রকার প্রতিভা দর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—“তঁাহার শৈশবকালের বিশেষ কিছুই জানা যায় না। শৈশবে এমন কিছুই অসাধারণত্ব দেখা যায় নাই, যাহাতে তঁাহার পরবর্তী জীবনের সূচনা করিতে পারে।” অথচ এই স্বামীজী অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ মায়াবাদী পণ্ডিত মাননীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় তঁাহার অনূদিত ও সম্পাদিত শ্রীভাষ্যের ‘আভাস’-ভূমিকায় লিখিয়াছেন—“রামানুজের শিশুজীবনের ঘটনাবলী বড়ই মনোহর এবং কৌতূহলোদ্দীপক।

* * * * ফলকথা শৈশবেই তঁাহার বিমল প্রতিভালোকে ভবিষ্যৎ জীবনের কর্তব্য-পথ উদ্ভাদিত হইয়াছিল।” এস্থলে আমাদের বক্তব্য প্রজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর উল্লিখিত কথাগুলি বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসের ২য় খণ্ডে ১৩৩৩ সালের ভাদ্র তারিখে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্বে ১৩২২ সালের চৈত্র মাসে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতজীর শ্রীভাষ্যের অল্পবাদের আভাস-ভূমিকা প্রকাশিত হয়। স্বামীজী উহা ভালরূপে অধ্যয়ন করিলেও পরশ্রী-কাতরতা, হিংসা-দেষবশে বেদান্তের আচার্য্য-শার্দূল শ্রীরামানুজের বাল্যজীবনের কোনও প্রতিভা দর্শন করিবার চক্ষু তঁাহার প্রস্ফুটিত হয় নাই। ইহাই অদ্বৈত-বাদিগণের গৌড়ামী ও নীচ সাম্প্রদায়িকতা।

আমরা আচার্য্যের বাল্য জীবনের অসামান্য প্রতিভার কথা নিম্নে আলোচনা করিয়া স্বামীজীর লেখনী যে কতদূর অসংযত ও সাম্প্রদায়িকতা দোষে কলুষিত তাহা প্রমাণ করিব।

আচার্য্যের বাল্যজীবনে সাধুসঙ্গ

অতীব শৈশব কাল হইতেই লক্ষণ দেশিকের সাধুসঙ্গ লাভের চেষ্টা পরিলক্ষিত হইত। বালচপলতা প্রযুক্ত রামানুজ তঁাহার সমবয়স্ক শিশুগণের সহিত খেলাধুলা করিতে প্রায়ই বাড়ীর বাহিরে যাইতেন। একদিন পথিমধ্যে অকস্মাৎ কাঞ্চীপূর্ণ নামক একজন পরম ভাগবত বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ লাভ হয়। পরস্পর দর্শন মাত্রেই যেন চুম্বকের জ্বায় উভয়ই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। কাঞ্চীপূর্ণ বালকের অস্তুর্নিহিত অমাহুষিক প্রতিভাময়ী বুদ্ধি দর্শন করিয়া প্রায়শঃ তঁাহার নিকট আসিতেন এবং বাগককে প্রভূত ভুবন-মঙ্গলময় উপদেশ দান করিতেন। বালক তাহা মন্ত্রমুগ্ধের জ্বায় শ্রবণ করিয়া তাহা নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমশঃ কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি তঁাহার প্রচুর প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মিল। বালক প্রতিভাবলে তঁাহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া

জানিতে পারিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ কাঞ্চীনগরস্থ শ্রীশ্রীবরদরাজের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনি প্রত্যহ তাঁহার স্বগ্রাম পুণামেলি হইতে শ্রীবরদরাজের সেবার জন্ত কাঞ্চীপূর্ণ নগরে যাইতেন। পথিমধ্যে রামানুজের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ হেতু তাহার সহিত প্রায়ই দেখা করিতে আসিতেন। একদিন কেশব-তনয় তাহার পিতামাতার আদেশ না লইয়াই কাঞ্চীপূর্ণকে তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইলেন। নিজ হস্তে তাঁহাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া বালক তাঁহার পদসেবা করিতে উত্তত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ বালকের নিরতিমানে বৈষ্ণবসেবা করিবার প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার স্বভাব-স্বলভ দৈন্তবশে বলিলেন—“লক্ষ্মণ! তুমি অতি সদব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত ব্যক্তি, আর আমি অতি নীচ শূদ্র জাতি। স্ততরাং তোমার এরূপ কার্যে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। সমাজ তোমাকে নিন্দা করিবে।” ইহা শুনিয়া বালক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন—“প্রভো, বৈষ্ণব কখনও শূদ্র হইতে পারেন না। আপনি মহাভাগবত, বিশ্বাসীকে শিক্ষা দিবার জন্ত দৈন্ত করিয়া নীচ কুল গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। আপনার কুল আপনাকে সজাতীয়তা স্বরূপে কোনও প্রকার দাবী রাখিতে পারেন না। আরও নিবেদন করি—আমাদের পূর্বতন একজন আলোয়র চণ্ডাল কূলে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র ব্রাহ্মণ-কূলের উপাশ্রয় হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীতিরুপ্পান আলোয়র। তিনি সর্বদাই শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতেন।” রামানুজের এইরূপ বৈষ্ণবোচিত নিরপেক্ষ স্মৃতিস্ম বিচার দর্শন করিয়া কাঞ্চীপূর্ণ অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং তাহার বিশেষ প্রশংসা করিলেন।

বালকের এইরূপ প্রতিভার পরিচয় সর্বত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গফলেই রামানুজের হৃদয়ে যে ভক্তির বীজ রোপিত হইয়াছিল সম্ভবতঃ তাহাই একটা বিরাট বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া শুষ্ক-জ্ঞান-সমুপ্ত শত শত নরনারীর হৃদয়ে শান্তি-ছায়া দানে সমর্থ হইয়াছিল।

আচার্য্যের বিজ্ঞাভ্যাস

আচার্য্যের বিজ্ঞাভ্যাসের কাল উপস্থিত হইল। পিতা কেশব দীক্ষিত পুত্রের প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া তাহার শিক্ষার জন্ত তদানীন্তন কালের সর্বাপেক্ষা উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট তাহাকে প্রেরণ করা কর্তব্য স্থির করিলেন। তৎকালে কাঞ্চীপুর নগরে যাদব প্রকাশ নামক একজন জগদ্বিখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিত বাস করিতেন। অদ্বৈতবাদী যাদব প্রকাশ তখন পণ্ডিত কূলের মধ্যে অদ্বিতীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধ্যাপক। তাঁহার গৌরবে শাকর-মতবাদি-

গণ গৌরবান্বিত এবং তাঁহাকেই তখন কেন্দ্র করিয়া মায়াবাদ মহাদেশে কাল যাপন করিত। দ্রাবিড়-কুল-শশি কেশব-তনয় পিতার ইচ্ছাক্রমে অগত্যা তাঁহাকেই তাহার অধ্যাপকস্বরূপে গ্রহণ করিলেন। “তদ্বিক্তি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া” এই গীতোক্ত বিধি অনুসারে আচার্য্য রামানুজ যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। আচার্য্য যাদব-প্রকাশও তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ সৌভাগ্যবান্ মনে করিলেন। বিশেষতঃ তাহার ঐকান্তিক শাস্ত্রানুশীলন, বিনয়-নয় ব্যবহার, অসাধারণ প্রতিভা ও অকপট গুরুসেবা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ অতি অল্পকাল মধ্যেই অধ্যাপকের যাবতীয় পাণ্ডিত্য অধিকার করিয়া লইলেন। এখন রামানুজের পাণ্ডিত্য সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িল। বিখ্যাত বিদ্বৎসমাজ তাঁহার গভীর জ্ঞান, প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, অলৌকিক প্রতিভা দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। এমন কি অধ্যাপক অপেক্ষা ছাত্রেরই অধিক মহিমা ঘোষিত হইতে থাকায় যাদবের মনোবিকার উপস্থিত হয় এবং শ্রীমান লক্ষ্মণ দীক্ষিতকে বিশেষ ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। বালক অত্যন্ত বিনয় সহকারে যাদবের শাস্ত্রব্যাখ্যায় বহুস্থলে ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, ইহাও সর্বত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল। ফলে যাদবের ঈর্ষানল ক্রমশঃ দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল।

বৈষ্ণবের পাদোদকে গ্রহ-শাস্তি

অপর একদিন কাঞ্চীনগরের অধিপতির প্রিয়তমা কন্যা দুর্ভাগ্যক্রমে এক দুর্দান্ত পিশাচ কর্তৃক আক্রান্ত হন। রাজ-অমাত্যবর্গের ও দেশস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর পরামর্শানুসারে নৃপতি সর্ববিদ্যাবিশারদ ও বহু তন্ত্রমন্ত্রে পারদর্শী আচার্য্য যাদব প্রকাশকে আনাইয়া কন্যাবরের গ্রহশাস্তি করাইবার জন্ত আহ্বান করিলেন। আচার্য্য যাদব বহু চেষ্টা করিয়াও রাজ-দুহিতার কোনও উপকার করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু সেই ব্রহ্ম-রাক্ষস নানা প্রকারে যাদবকে তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং যাদবের ও তাহার নিজের পূর্ব জীবনের কথা ব্যক্ত করিতে লাগিল। যাদব পূর্বজন্মে একটি ‘গোসাপ’ ছিলেন। অজ্ঞাতসারে কোনও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মলাভ করেন এবং ব্রহ্মদৈত্যও পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণকূলে মায়াবাদীর গৃহে জন্মলাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব বিদ্বেষফলে তাহার প্রেতযোনি লাভ হইয়াছে। সে আরও চিৎকার করিয়া ঘোষণা করে যে পরম বৈষ্ণব লক্ষ্মণ দেশিকের পাদোদক পান করিতে পারিলেই সে উদ্ধার লাভ করিবে এবং রাজ-তনয়াকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

রাজপুত্রবর্গ প্রেতাশ্রম আদেশে তাহাই করিলেন। রামানুজের পাদোদক পান করাইয়া ব্রহ্ম-ব্রাহ্মসের মুক্তি ও রাজকল্যাণ শাস্তি বিধান করাইলেন। ইহাতে যাদব প্রকাশের মাৎস্যপূর্ণ চিত্ত যে কি প্রকার হিংসা ও ঘেঘানলে দগ্ধ হইতে লাগিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদপদে নিবেদন

প্রভুপাদ ! তব পদে এমিনতি মোর ।
 কৃপা করি আকর্ষহ গলে দিয়া ডোর ॥
 কৃষ্ণ ভজিবারে মতি নাহি চাহে মন ।
 সদাই রয়েছি হায় বিষয়ে মগন ॥
 রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ভোগ করিবারে ।
 ইন্দ্রিয়-সমূহ চেষ্টা করে বারে বারে ॥
 লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা-কনক-কামিনী ।
 লভিবারে ব্যস্ত আমি দিবস যামিনী ॥
 অতি হীন-দুরাচার তব দাসাধম ।
 কেমনে লভিবে বল তব শ্রীচরণ ॥
 তব কৃপা বিনা মায়া জয় নাহি হয় ।
 সে কৃপা তুল্লভ বলি শাস্ত্রে বাখানয় ॥
 কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-শক্তি তুমি কৃষ্ণময় ।
 কৃষ্ণেরে দানিতে হেথা হইলে উদয় ॥
 মায়াদাস্য ছাড়াইয়া মোরে কর পার ।
 লভিবে কুমুদ সন্ত চরণ তোমার ॥

—শ্রীভক্তি কুমুদ সন্ত

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার নিমন্ত্রণপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ,
(নদীয়া)

৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৮

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

আগামী ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৫৫, ইং ১৪ই মার্চ, ১৯৪৯ সোমবার, কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল-ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাবতিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরোক্ত ঠিকানায় আগামী ২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ, বুধবার হইতে ১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ, মঙ্গলবার পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহসেবা, মহা-প্রসাদ বিতরণ, শ্রীধামনবদ্বীপান্তর্গত ৯টি দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্তনমুখে বোলক্ৰোশ পরিক্রমা প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনদ্বারা বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যানুষ্ঠানে সবাঙ্কব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবানুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ পরিক্রমা-পঞ্জী পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্তকুপালেশপ্রার্থী—

সন্ত্যবন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দৃষ্টব্য :— কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্ত্ৰি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় অথবা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (ভগলী)—ঠিকানায় জ্ঞাতবা বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসবপঞ্জী

- ১। ২৫শে ফাল্গুন, বুধবার—(১) শ্রীগোক্রমদ্বীপ (কীর্তনাখ্য)—
গঙ্গা স্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে
দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ,
স্বানন্দসুখদকুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহর ক্ষেত্র, নৃসিংহদেব
পল্লী এবং (প্রসাদ-সেবান্তে)
(২) শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্বরণাখ্য) - মাজিদা,
হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।
- ২। ২৬শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—(৩) শ্রীকোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য)
—গদখালির কোল, তেঘবির কোল, কোলের আমাদ,
কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি
(শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর মন্দির) এবং
(৪) ঋতুদ্বীপ (অর্চনাখ্য)—রাহতপুর
বা রাতুপুর।
- ৩। ২৭শে ফাল্গুন, শুক্রবার—(৫) শ্রীজহুদ্বীপ (বন্দনাখ্য)—
জান্নগর (জহুমুনির স্থান), বিজ্ঞানগর (শ্রীসার্বভৌম
ভট্টাচার্য্যের পাট)। (৬) শ্রীমোদক্রমদ্বীপ (দাস্তাখ্য)—
মামগাছি (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা
একডালা, মাতাপুর বা মহৎপুর (পঞ্চ পাণ্ডবের
অজ্ঞাতবাস)।
- ৪। ২৮শে ফাল্গুন, শনিবার—(৭) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য)—পোড়ামা-
তলা ও শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি
দর্শনান্তে রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর, গঞ্জেরডাঙ্গা।
- ৫। ২৯শে ফাল্গুন, রবিবার—(৮) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবনাখ্য)—
সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর এবং
(৯) শ্রীঅমৃতদ্বীপ (আত্মনিবেদনাখ্য)—
শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-
ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন),
জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, চাঁদকাজীর সমাধি,
শ্রীধর-অঙ্গন (প্রসাদ-সেবান্তে) মুরারি গুপ্তের পাট।
- ৬। ৩০শে ফাল্গুন, সোমবার—শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব।
- ৭। ১লা চৈত্র, মঙ্গলবার—সাধারণ মহামহোৎসব (সর্বসাধারণে
মহাপ্রসাদ বিতরণ)।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

পূর্ব পূর্ব বৎসরের জায় এবংসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীগণের বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল। নবদ্বীপ সহরে পূর্ব বঙ্গের অর্ধ লক্ষাধিক অধিবাসী স্থায়ী বসবাসের জন্য সমাগত হওয়ায় পূর্বের জায়-গৃহাদি না মিলিলেও সমিতি বহু সংখ্যক শিবির স্থাপন করিয়া যাত্রীগণের অবস্থানের মনোরম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রসাদ, বাসস্থান এবং সেবা-শুশ্রূষাদির স্বব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যাত্রীগণ স্বচ্ছন্দে শ্রীধাম পরিক্রমা করিয়া নিন্ত্যকলাণ লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজ এবং অগ্রাগ্র বৈষ্ণবগণ যাত্রীগণের নিকট দৃষ্ট-স্থানসমূহের মাহাত্ম্য শাস্ত্রাদি হইতে পাঠ করিয়া এবং বক্তৃতা প্রদান করিয়া অবগত করান। বলা বাহুল্য যাত্রীগণ সংকীৰ্ত্তনমুখে শ্রীধাম পরিক্রমা করিয়াছেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে কীৰ্ত্তন, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এবং মহারাজ গণের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

পরিক্রমার প্রথম দিবস

২৫শে ফাল্গুন বুধবার পরিক্রমার প্রথম দিবস তাঁহার শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে বহির্গত হইল। গঙ্গার পূর্ব পারে উপস্থিত হন। তাঁহার গঙ্গা স্পর্শ করিয়া এবং শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া কীৰ্ত্তনাখ্য শ্রীগোক্রমদ্বীপে পরিক্রমণ আরম্ভ করেন। এই দ্বীপের বর্তমান অপভ্রংশ নাম গাদিগাছা। গঙ্গার সমীপবর্তী স্থান হইতে পরিক্রম করিতে করিতে যাত্রীগণ সুরভিকুঞ্জে উপস্থিত হন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দ্বিরচিত “শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য” গ্রন্থ হইতে শ্রীপত্রিকার সহকারী সজ্বপতি এই স্থানের মহিমা কীৰ্ত্তন করেন। এই স্থলে একটা বিস্তৃত অশ্বখ দ্রুম ছিল এবং সুরভি গাভী এই দ্রুমতলে অবস্থান করেন বলিয়া এই দ্বীপ গোক্রম নামে অভিহিত। মার্কণ্ডেয় মুনি এই স্থানে সুরভি গাভীর নিকট গৌর-ভজনের উপদেশ লাভ করিয়া শ্রীগৌর হরির ভজনা করেন। এই মার্কণ্ডেয় মুনি ব্রজ-লীলায় বারি বধনকারী ইন্দ্র ছিলেন। এই সুরভিকুঞ্জ শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত।

স্বরভি কুঞ্জের অনতিদূরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজনস্থলী “স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ”। এখানে শ্রীমন্দির মধ্যে শ্রীগৌরগদাধর-বিগ্রহ এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অর্চা-মূর্তিতে সেবিত হইতেছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজন কুটীরের পশ্চিম-উত্তর দিকে বায়ুকোণে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঔবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের ভজন কুটীর বিরাজিত রহিয়াছেন। শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজ ত্যাগী হইয়াও গৃহস্থ লীলাভিনয়কারী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট ভজন-শিক্ষার লীলা প্রদর্শন করিয়া জগদ্বাসীকে জানাইয়াছেন যে—“যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার”। ভজনে উন্নত হইলে গৃহীও ত্যাগীর ভজন গুরু বা শিক্ষা গুরু হইবার যোগ্য। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বক্তৃতা কালে এই বিষয়টী যাত্রীগণকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট সমস্ত বৈষ্ণব-জগৎ যে সর্বতোভাবে ঋণী তাহাও জানাইয়া দেন।

তৎপরে যাত্রীগণ স্বর্ণ বিহার মঠে উপস্থিত হন। এখানে পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য হইতে স্বর্ণ বিহার প্রসঙ্গ পাঠ করেন। এই স্থলে সত্যযুগে স্বর্ণসেন নামে এক নৃপতি বাস করিতেন। তাঁহার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের উপর এই মঠ প্রকটিত হইয়াছেন। গৌরলীলায় যিনি বুদ্ধিমন্ত খাঁ—তিনিই সেই স্বর্ণসেন। এই স্থান বর্তমানে স্বর্ণ-বিহার নামে পরিচিত।

অতঃপর পরিক্রমা-সম্মুখ গওকী নদীতীরে অলকানন্দার পূর্বপারে হরিহর ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এই স্থানে শিব গৌরীসহ শ্রীগৌরানন্দ ভজন করেন এবং নির্ঘাণ সময়ে জীবের কর্ণে গৌরনাম প্রদান করেন। ইহা বারাণসীধাম হইতে অভিন্ন। শ্রীহর শ্রীহরির হৃদয়স্বরূপ এবং শ্রীহরিও হরের হৃদয়। স্তবরাং হরি ও হর অভিন্ন ভেদাভেদ তত্ত্বরূপে এখানে বিরাজিত বলিয়া এই স্থলের নাম হরিহর ক্ষেত্র। অত্রস্থ শ্রীমন্দিরে যে বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ শুভ বর্ণ এবং অর্দ্ধাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ হরি ও হরের একত্র সমাবেশ। যাত্রীগণ নিকটবর্তী আশ্রয়স্থানে কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া পথপ্রাপ্তি দূর করেন এবং দধি, চিড়া ও সরবৎ-প্রসাদ পাইয়া নৃসিংহপল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। এইস্থানে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বিচার যাযাবর মহারাজ যাত্রীগণকে স্মধুর হরিকথা কীর্তন করিয়া উপদেশ দান করেন।

যাত্রীগণ **নৃসিংহপল্লীতে** উপস্থিত হইয়া শ্রীনৃসিংহ মন্দির পরিক্রমা করেন। নিয়ামক মহারাজ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে এই স্থানের মাহাত্ম্য সকলের নিকট কীর্তন করেন। নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ এবং প্রহ্লাদকে কৃপা করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের মধ্যে নৃসিংহদেবের প্রাচীন শ্রীমূর্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। এই স্থানে সূর্য্যটীলা, ব্রহ্মটীলা, ইন্দ্রটীলা প্রভৃতি উচ্চস্থানগুলি দেবতাদিগের ভজনস্থলীস্বরূপের নির্দেশ দান করিতেছে। দেবগণ এখানে বাস করিয়া ভজন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা দেবপল্লী নামে অভিহিত হয়। বর্তমানে **দেবপল্লী শব্দের অপভ্রংশ দেপাড়া নামই প্রচলিত**। এখানে মধ্যাহ্নকালে যাত্রীগণ নৃসিংহদেবের প্রসাদ সেবা করিয়া মধ্যদ্বীপ অভিমুখে অগ্রসর হন।

মধ্যদ্বীপ—স্মরণাখ্যদ্বীপ। ইহার অপভ্রংশ নাম মাজিরা। এই দ্বীপে **হাটডাঙ্গা** নামক স্থানটী সাক্ষাৎ কুরুক্ষেত্র। এই স্থানে সমস্ত দেবতাগণ হাট বসাইয়া অর্থাৎ সকলে একত্র মিলিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে শ্রীগৌর-কথা আলোচনা করিতেন। তখন হইতে ইহাকে হাটডাঙ্গা বলিয়া থাকে। ইহার নিকটবর্তী যে গ্রামের নাম **বামনপুরা** বা **শ্রীব্রাহ্মণপুষ্কর** সেখানে সত্যযুগে দিবোদাস নামক জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রীধামের কৃপায় ‘পুষ্কর’ তীর্থের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত ইহার নাম ব্রাহ্মণপুষ্কর, বর্তমান নাম বামনপুরা। যাত্রীগণ ক্রমশঃ **হংসবাহন** নামক স্থানে উপস্থিত হন। এখানে পঞ্চানন স্বীয় বাহন রূপে পরিত্যাগ করতঃ হংসরূপে হইয়া স্বর্গগম্য গৌরগুণগাথা শ্রবণ করেন। এখানে মধ্যাহ্ন সময়ে মাধ্যাহ্নিক শতসূর্য্যপ্রভাযুক্ত পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌর সুন্দর সপ্তর্ষিদিগকে দর্শন দান করিয়াছিলেন। সপ্তর্ষিগণের ভজনস্থলী **সপ্তটীলা** আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার দক্ষিণে যে সুপবিত্রা জলধারাটী দৃষ্ট হয় তাহা **গোমতী বলিয়া খ্যাত**। গোমতীর পার্শ্ববর্তী কাননগুলি **নৈমিষারণ্য** নামে অভিহিত। এখানে সূতগোস্বামীর নিকট শৌনকাদি ঋষিগণ গৌর-ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। যাত্রীগণ এই সমস্ত স্থান দর্শন করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া সহর নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

দ্বিতীয় দিবস যাত্রীগণ কোলদ্বীপের কিয়দংশ ৩৩ ঋতুদ্বীপ পরিক্রমা করেন। কোলদ্বীপ—পাদসেবনাখ্য দ্বীপ ; গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত। বর্তমান নবদ্বীপ সহরই কোলদ্বীপ বা কুলিয়া নামে অভিহিত। এই স্থানে শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীবাস

প্রভুর চরণে অপরাধী গুপ্তাল চাপাল নামক বিপ্র ও ভাঙ্গরত-বক্তা দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ভঞ্জন করেন; এইজন্ত ইহা অপরাধ ভঞ্নের পাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাত্রীগণ কোলদ্বীপের অত্র অংশ ৪র্থ দিবসে রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমাকালে দর্শন করিবেন। তাহার বিবরণ উপযুক্ত স্থলে প্রদত্ত হইবে। যাত্রীগণ ক্রমশঃ গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া সমুদ্রগড়ে উপস্থিত হন। এই স্থলে সমুদ্রসেন রাজা ভগবান কৃষ্ণের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় ভীমের অঙ্কুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোটক আবদ্ধ করায় ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ভীমসেনের বিপদ দর্শন করিয়া ভক্তবৎসল কৃষ্ণ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং সমুদ্রসেন রাজার ভক্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে দর্শন দান করেন। এই স্থানে সমুদ্র গঙ্গার আশ্রয়ে থাকিয়া শ্রীগৌরলীলা দর্শন করেন। সমুদ্রসেন রাজার গড় অথবা সমুদ্র গড়াইয়া আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন বলিয়া এই স্থলের নাম সমুদ্রগড়।

এস্থল হইতে আমরা অর্চনাখ্য ঋতুদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করি। পথিমধ্যে চম্পকহট্ট, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটী গ্রাম বিরাজিত। পূর্বকালে স্থানীয় হট্টে প্রচুর পরিমাণে চম্পকপুষ্প বিক্রীত হইত। স্থানটী চম্পক বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। ইহা বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের অত্রতম খদিরবন-স্বরূপ। এই স্থানে চম্পকলতা সখী চম্পক পুষ্পের মালা রচনা করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীগীতগোবিন্দ রচয়িতা শ্রীজয়দেব গোস্বামী, পত্নী পদ্মাবতী আহুত চম্পকপুষ্প দ্বারা এইস্থানে বহুকাল শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিয়াছিলেন এবং পুরুষসুন্দর-ত্বাতি, শ্রীগৌরহরির দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। এখানে জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ নিত্যলীলাপ্রসিদ্ধ ঠাকুরপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদভক্তিসিদ্ধান্ত সন্যস্ত পোষামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর মঠ বিরাজিত আছেন। এখানে গৌরপার্বদ শ্রীদ্বিজ বাগীন্দ্রাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর বিগ্রহ মঠস্থ ভক্তদ্বন্দ্ব কইক সেবিত হইয়া অটকিতছেন। এই স্থান হইতে ঋতুদ্বীপে আসিয়া ধামদ্বন্দ্বী কীর্ত্তনমুখে সকলকে জ্ঞানানন্দ হয়, যে বসন্তের সহিত বড় ঋতু শ্রীগৌর ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম ঋতুদ্বীপ হইয়াছে। পরিক্রমাসক্ত এই স্থান হইতে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

তৃতীয় দিবস পরিক্রমাসক্ত বিদ্যানগর—শ্রীসার্বভৌম ভট্টচার্য্যের পাটে উপস্থিত হন। বিদ্যানগরে শ্রীসার্বভৌম গৌড়ীয় মঠ বিরাজিত আছেন।

ইহারই নিকটবর্তী স্থানে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গাদী বৃক্ষমণ্ডপতলে শোভা পাইতেছেন। নিয়ামক মহারাজ তথায় সমবেত পরিক্রমাকারীগণের নিকট ধামমাহাত্ম্য পাঠান্তে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে যাবতীয় দর্শন বা বিজ্ঞা যখন ভক্তির আনুগত্য করে তখনই তাহার সার্থকতা সম্পাদিত হয়। এই বিজ্ঞানগরে যাবতীয় বিজ্ঞা ও দর্শন-শাস্ত্র অবস্থান করিয়া যথাসম্ভব শ্রীগৌরহরির পাদপদ্ম সেবা করিয়াছিলেন। স্বয়ং বৃহস্পতি গৌরান্জলীলায় শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম-রূপে অবতীর্ণ হইয়া এইস্থানে পরবিজ্ঞাপতি শ্রীমন্নহাপ্রভুর কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মসেবা করিতে সমর্থ হন।

এখান হইতে যাত্রীগণ **জহ্নু দ্বীপ—বন্দনাখ্যদ্বীপে** উপস্থিত হন। অপভ্রংশ ভাষায় ইহাকে জ্ঞানগর বলে। ইহা বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের অত্যন্তম ভদ্রবন। ভগীরথ-অনীত গঙ্গাকে জহ্নুমুনি এই স্থানে পান করিয়াছিলেন এবং ভগীরথের প্রার্থনায় জাহ্নুদেশ বিদীর্ণ করিয়া এই স্থান হইতে তাঁহাকে পুনঃপ্রকটিত করেন। তজ্জগ্ন ইহার নাম জহ্নু দ্বীপ। জহ্নুমুনি এইস্থানে শ্রীগৌরহরির দর্শন লাভ করিয়া ধন্ত হন।

এখান হইতে যাত্রীগণ **মোদক্রম—দাস্তাখ্য দ্বীপে** উপস্থিত হন। শ্রীরাম লীলায় ভগবান এই স্থানে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষতলে কুটীর নির্মাণ করতঃ বনবাস লীলা করিয়াছিলেন। এই স্থানটী দর্শনে ভক্তহৃদয়ে সেবামোদ বুদ্ধি পায় বলিয়া ইহা মোদক্রম নামে পরিচিত। এই দ্বীপের অন্তর্গত মামগাছি গ্রামে চৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীচৈতন্যভাগবত রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বাসস্থলী। এস্থানে শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী দেবীর পিত্রালয় ছিল। এইস্থানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত মঠে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর-সেবিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ সেবিত হইতেছেন। এখানে ধামমাহাত্ম্য পাঠের পরে পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর সকলে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

পরিক্রমার চতুর্থ দিবস

পরদিন পরিক্রমার চতুর্থ দিবসে যাত্রীগণ **কোলদ্বীপের** অবশিষ্টাংশ পরিক্রমা করিয়া রুদ্রদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহারা প্রথমে সহরস্থ শ্রীপোড়ামা তলায় অর্থাৎ প্রৌঢ়া মায়ার স্থানে উপস্থিত হন। ইনি বিশ্বপ্রসবিনী মহামায়া নহেন পরন্তু ভগবল্লীলা পরিপোষিকা যোগমায়া-স্বরূপিনী। ‘কোল’

শব্দের অর্থ বরাহ। ভগবান এই দ্বীপে সত্যযুগে বাসুদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কুমারকে কোল মূর্তিতে দর্শন দান করিয়াছিলেন বলিয়া এই দ্বীপকে কোলদ্বীপ বলে।

এস্থান হইতে যাত্রীগণ ঔ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীশ্রীমদ্ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দিরে উপস্থিত হন। বৈষ্ণব-সার্বভৌম বাবাজী মহারাজ শ্রীগৌর-জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর ধামের নির্দেশক এবং মহামন্ত্রের উচ্চ সংকীৰ্ত্তনের জলন্ত দৃষ্টান্ত। এ স্থানে শ্রীপত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক মহারাজ গুরু-পরম্পরা, ভাগবত-পরম্পরা ও মহামন্ত্রের অসংখ্যাত উচ্চ কীৰ্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

অতঃপর পরিক্রমা-সভ্য নিদয়া ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া **রুদ্রদ্বীপে** উপস্থিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণকালে এই ঘাট দিয়া পার হইয়া নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের প্রতি নিদয় হইয়া তাহাদিগকে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়া চলিয়া যান বলিয়া তাঁহারা এই ঘাটকে নিদয়া ঘাট অর্থাৎ প্রদান করিয়াছেন। অদূরে মোদক্রমাস্তর্গত **মাতাপুর বা মহৎপুর গ্রাম** অবস্থিত দেখা যায়। এইস্থলে মহৎ পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা মহৎপুর নামে খ্যাত।

রুদ্রদ্বীপ—সখ্যাখ্যদ্বীপ। এই স্থলে নীল-লোহিতাদি একাদশ রুদ্র গৌরভজন করিয়াছিলেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী এই স্থানে রুদ্ররূপা লাভ করতঃ সম্প্রদায়-প্রবর্তক আচার্য্যরূপে জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই দ্বীপটা গঙ্গার পশ্চিমতটে অবস্থিত। এখানে প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয় মঠের বিগ্রহগণকে দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া শ্রীধাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া যাত্রীগণ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

পরিক্রমার পঞ্চম দিবস ২২শে ফাল্গুন রবিবার গঙ্গা পার হইয়া সীমন্ত দ্বীপ—সখ্যাখ্য দ্বীপ এবং আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীঅমৃতদ্বীপ পরিক্রমা করেন। যাত্রীগণের সুবিধার্থ এই দিবস তাঁহারা সর্বপ্রথম শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলে **শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন** পরিক্রমা ও দর্শন করেন। অন্নভেদী মন্দির মধ্যে তিনটি প্রকোষ্ঠে বিষ্ণুপ্রিয়া ও লক্ষ্মীপ্রিয়া মধ্যবর্তী গৌরসুন্দর, মহাভাবে শ্রীগৌরসুন্দর ও রাধামাধব যুগলমূর্তি এবং শ্রীপঞ্চতন্ত্র বিরাজিত আছেন। নিকটে নিম্ববৃক্ষমূলে শ্রীশচীমাতার স্মৃতিকাগৃহ। ঈশান কোণে ক্ষেত্রপাল শিব এবং পূর্বদিকে শ্রীনৃসিংহ মন্দির অবস্থিত আছেন। যোগপীঠের শতধন্য উত্তরে **শ্রীবাস তর্জন** —

শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীৰ্ত্তনস্থলী। ইহার অণ্ড নাম খোলভাজার ভাঙ্গা।
সংকীৰ্ত্তনরত ভক্তগণের মুদঙ্গ এই স্থানেই চাঁদকাজী ভাঙ্গিয়া দেন।

ইহার দশ ধনু উত্তরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবন। যাত্রীগণ অদ্বৈত-ভবন পরিক্রমা
করিয়া শ্রীচৈতন্য মঠ অভিমুখে অগ্রসর হন। ক্রমে তাঁহারা ভক্তি-বিজয়-
ভবন অতিক্রম করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দিরে উপস্থিত হন।
তথায় দণ্ডবৎ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূৰ্ব্বক তাঁহারা চৈতন্য মঠে প্রবেশ করেন এবং
ঊনত্রিংশ চূড়াযুক্ত শ্রীমন্দিরে অবস্থিত শ্রীশ্রীবিনোদপ্রাণজিউকে দর্শন পরিক্রমা
করেন। এই মন্দিরের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে—অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বের
প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যূহস্বরূপে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের
আচার্য্যগণ চতুষ্কোণে বিরাজিত রহিয়াছেন। চৈতন্য মঠের দক্ষিণদিকে অবস্থিত
শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির পরিক্রমা
করিয়া ভক্তগণ চাঁদকাজীর সমাধিতে উপস্থিত হন।

পাষণ্ডী হিন্দুগণের প্ররোচনায় চাঁদকাজী প্রথমে শ্রীমন্নহাপ্রভুর সংকীৰ্ত্তন
প্রচারে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্নহাপ্রভু নৃসিংহমূর্তিতে তাঁহার
বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবার ভীতি প্রদর্শন করিলে তিনি মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হন
এবং মহাপ্রভুর রূপালাভে সমর্থ হন। এই সময় হইতে তিনি মহাপ্রভুর ভক্তমধ্যে
পরিগণিত হন। চাঁদকাজীর সমাধির উপর রোপিত গোলকচাঁপা বৃক্ষটি
চারিশত বৎসরেরও অধিক কাল যাবৎ বিরাজিত থাকিয়া শ্রীচাঁদকাজীর স্মৃতি
অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

পরিক্রমা-সজ্জ এখান হইতে সখ্যাখ্য সীমন্ত দ্বীপে শ্রীধর অঙ্গনে উপস্থিত
হন। শ্রীমন্নহাপ্রভু সঙ্কীৰ্ত্তনে বহির্গত হইয়া এই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম লাভ
করিয়াছিলেন এবং শ্রীধরের শতছিদ্র লৌহপাত্রে জলপান করিয়া ভক্ত শ্রীধরের
মহিমা প্রচার করেন এবং তাহার নিকট হইতে কলার থোড়, মোচা
প্রভৃতি কাড়িয়া লইতেন।

পরিক্রমাসজ্জ এস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীযুত ভূদেব ও অনন্তদেব ব্রহ্ম
মহাশয়দের বাটীতে উপস্থিত হন। আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীমায়াপুরের উৎসব
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রতিবৎসর এই ব্রহ্ম মহাশয়দের বাটীতে সম্পন্ন করিয়া
আসিতেছেন। পরিক্রমার যাত্রীগণ, ধামবাসীগণ এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের
সকলেই অকুণ্ঠচিত্তে এই দিবস এই স্থানে শ্রীমহাপ্রসাদ সন্মান করিয়া থাকেন।

এই অনুরোধে নানা-প্রকারে সাহায্য করিয়া ব্রহ্ম মহাশয়গণ সমিতির কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। যাত্রীগণ অপরাহ্নে শ্রীমুরারিগুপ্তের পাটে শ্রীশ্রীরামসীতার মন্দির দর্শন করেন এবং পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া সহর নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

আমরা বিশেষ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি বিচার ঘাষাবর মহারাজ সগোষ্ঠী পরিক্রমায় যোগদান করিয়া তাঁহার স্বভাব-স্বলভ স্থললিত স্তম্ভুর কণ্ঠে সর্বত্র সঙ্কীৰ্ত্তন করিয়া যাত্রিবর্গের বিশেষ আনন্দ বর্ধন করিয়াছেন।

—শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী (সহঃ সম্পাদক)

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার বক্তব্য

আমরা শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার বৰ্ত্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যার ৫ম পৃষ্ঠায় জগদগুরু ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীকরকমলাঙ্কিত একখানি পত্র পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছিলাম। সময় ও স্থানাভাবহেতু আমরা গত সংখ্যায় ঐ পত্রখানিতে যে উপদেশ-সার নিহিত আছে তাহা প্রকাশ করিতে পারি নাই। আমাদের অনেক সহদয় পাঠকবর্গ উহা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় এই সংখ্যায় উহা সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

সন ১৩২২ সালের ১১ই শ্রাবণ তারিখে লিখিত একখানি পত্রের উত্তরে জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ ইং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে তাঁহার ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ লীলার দুই তিন বৎসর পূর্বে উক্ত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। তাই পত্রখানিতে শ্রীল প্রভুপাদের পূজাশ্রমের নাম স্বাক্ষর করা রহিয়াছে। তাঁহার অতি শৈশব হইতেই অতিমর্ত্য জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা ক্রমশঃ তাহা আলোচনা করিব। পাঠ, বক্তৃতা, প্রবন্ধাদি অপেক্ষা মহাজনগণের পত্রই প্রকৃত প্রাণস্পর্শী হয়। অবশ্য সাক্ষাৎ উপদেশের কথা স্বতন্ত্র। যদিও উহা কোনও ব্যক্তিবিশেষকে লেখা হয় তথাপি উহাতে এত চেতনাশক্তি নিহিত থাকে যে তাহা সমষ্টি জীবনকেও আকর্ষণ করিয়া মঙ্গলের রুখে অনায়াসে আনয়ন করিতে পারে। আমরা তজ্জন্মই শ্রীল প্রভুপাদের পত্র মুদ্রিত করিয়াছি। অনেক সময় পত্র-প্রকাশক মহাজনের নামে পত্র প্রকাশ করিয়া নিজের ধারণাগুলি প্রক্ষিপ্ত করিয়া পত্রের পবিত্রতা নষ্ট করিয়া থাকেন। আমরা তজ্জন্ম মহাপুরুষের স্বহস্ত লিপিই মুদ্রিত করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও এইরূপ করিতে

যত্নের ক্রটি করিব না। বর্তমানে আপনাদের স্মরণের জন্ত উক্ত পত্রখানি এখানে মুদ্রিত অঙ্করে পুনরায় প্রকাশ করিলাম।

শ্রীশ্রীগৌরহরিঃ শরণম্

শ্রীমায়াপুর ব্রজপত্তন

২।৮।১৫



শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ—

আপনার ১১।৪।২২ তারিখের প্রেরিত পার্শ্বেল প্রাপ্ত হইয়াছি এবং দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট কিয়দংশ ও অত্রস্থ ভক্তধামবাসীগণকে কিয়দংশ প্রদান করিলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপায় আমি বিগত ২২ বর্ষকাল কোন প্রকার আত্মফল প্রসাদ পাই নাই এবং আশ্রমসভাদি ব্যবহার করি না। আপনার ভবিষ্যৎ জ্ঞাতকারণ নিবেদন করিলাম। শ্রীমান্ মধুসূদনের পত্র পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত সরোজবাসিনীর পত্রও পাইয়াছি।

সজ্জন তোষণী নাম্নী একথামি ঋাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইতেছেন। তাহাতে হরিকথা ব্যতীত অল্প বাজে কথা নাই। অনেক ভক্তপাঠ্য প্রবন্ধাদি তাহাতে সন্নিবিষ্ট থাকে। আপনারা উহা ঋথা-রীতি পাঠ করিতে পারেন। উহা পাঠ করিলে অল্প জ্ঞানী ও কর্মীসঙ্গে কষ্ট পাইতে হয় না। আশাকরি আপনার ভজন কুশল।

নিত্যাশীর্বাদক—

শ্রীবিমলপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী

আমরা পূর্ব পৃষ্ঠায় প্রকাশিত উক্ত পত্রের স্থূল ও স্পষ্ট মুদ্রিত অংশের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহা সর্বত্রই উপদেশপূর্ণ হইলেও আমরা উক্ত স্পষ্ট মুদ্রিত স্থলের একটি উপদেশ আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ “আমি বিগত ২২ বর্ষকাল কোন প্রকার আশ্রয় ফল প্রসাদ পাই নাই” এই কথার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের আত্মজীবনের যুক্ত-বৈরাগ্য, নিকাম-সেবা, কৃষ্ণার্থে ভোগ-ত্যাগের পরম আদর্শ নিহিত রহিয়াছে। একদিন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুরে গৌর-জন্মস্থানে যোগপীঠের সেবকগণ গৃহমধ্যে সন্ধ্যাবেলায় পদচারণ করিতেছেন এমন সময় মনে মনে ভাবিলেন এখন একটি পাকা আম পাইলে সেবা করা যাইত। তখন আদৌ আমার সময় নহে। অল্পমান পোষ বা মাঘ মাস চলিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে মন্দিরের পূজারী একটি পাকা আম হাতে করিয়া লইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া পূজারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আম কোথায় পাইলেন?” পূজারী বলিলেন—“এই মাত্র একটি বালক এই আমটি আমাকে দিয়া বলিয়া গেল যে এখনই ইহা সরস্বতী ঠাকুরকে দাও।” শ্রীল প্রভুপাদ ইহা শুনিবামাত্র এত হুঃখিত হইলেন যে দরদর ধারে তাঁহার অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল এবং গদগদ স্বরে আমটি ফেরৎ দিয়া পূজারীকে বলিলেন—“এখনই ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগে লাগাইয়া আপনারা প্রসাদ পাইবেন।” পূজারী ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই একটি গুঢ় রহস্য আছে।

ভক্তের ইচ্ছা ভগবান সর্বদাই পূরণ করিবার জ্ঞাত ব্যস্ত। কারণ ভক্ত কোনদিনই তাঁহার প্রীতি ব্যতীত নিজ-কামনা পূরণ জ্ঞাত কিছুই প্রার্থনা করেন না। এরূপ স্থলে ভক্তের যদি কিছু প্রার্থনীয় হইয়া পড়ে ভগবান তৎক্ষণাৎ স্বয়ং তাহা পূরণ করেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ মনে মনে ভাবিলেন—“এই অসময়ে আমার হৃদয়ে আম খাইবার কামনার উদ্বেক হওয়ায় শ্রীভগবানকে কষ্ট দিয়াছি, তাঁহাকে আমার নিজ ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিবার জ্ঞাত নিযুক্ত করা হইয়াছে; তাঁহাকে আমার কর্ম্মচারীরূপে ব্যবহার করিয়াছি। ইহা অত্যন্ত অগ্রায়া হইয়াছে; সুতরাং জীবনে আর আম খাইব না। ভগবানের প্রীতির জ্ঞানই আম সমর্পিত হইল।” তদবধি তিনি আর আম গ্রহণ করেন নাই। উহাই উক্ত পত্রে গুপ্তভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থ ভোগ-ত্যাগ। লোকশিক্ষার জ্ঞাত নিত্যমুক্ত-পুরুষ শ্রীল প্রভুপাদের কোনও কামনা না থাকিলেও এইরূপ একটি

লীলা স্বীকার করিয়া সকলকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইরূপ নিষ্কাম জীবনের আদর্শ আর কোথাও দেখা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের বিচার ব্যতীত অণু কোনও ধর্মে এরূপ সর্বোচ্চ চিন্তাস্রোত দৃষ্ট হয় না। তজ্জন্মই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব ‘শান্ত’।

ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধি-কামী, সকলি ‘অশান্ত’ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪২)

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

১। উচ্চ ইং বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্র :—

পরমপূজনীয় শ্রীপাদ কেশব মহারাজ,

আপনার শ্রীপত্রিকা ও রূপালিপি প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। আপনার পত্রিকা দর্শনে মনে হয় যেন অসীম রূপাময় শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় প্রকট হইলেন। সত্যই বৈষ্ণব জগতে আনন্দের দিন ফিরিয়া আসিল। আপনি ধন্য—আপনার প্রচেষ্টা চির সমুজ্জল-সাফল্য-গৌরব লাভ করুক—শ্রীল প্রভুপাদের চরণকমলে আমার এই প্রার্থনা। আমি কি করিয়া আপনার মহামহিমাময়ী শ্রীপত্রিকার সেবা করিতে পারিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। আশাকরি শ্রীল প্রভুপাদ শীঘ্রই দুই একটি প্রবন্ধ প্রেরণের শক্তি দিবেন।

স্বাঃ শ্রীনীলকান্ত মিশ্র, আশীকাটা, ত্রিপুরা, ২৮।৩।৪২

২। স্নকবি ও স্নগায়ক মাননীয় শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় :—

পতিত পাবন মহারাজ ! আপনার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা অণু দর্শন করিলাম। পত্রিকাটি চমৎকার হইয়াছে। পত্রিকার প্রবন্ধ এবং আপনার রচিত প্রভুপাদের আরতি গীতিটি অতি চমৎকার ও ভাবপূর্ণ হইয়াছে। ঐ আরতিটি আমি খোল করতালে কীর্তন করিব। আমি সত্তর গ্রাহক হইবার চেষ্টা করিব এবং অণু ২।১ জনকেও করাইব ইচ্ছা আছে। বহুদিনের পর জগতে পারমার্থিক পত্রিকার পুনঃ প্রচার হইল। ইহাতে আমাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার হইবার আশা হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতেছে। আপনি সর্বপ্রকারে শ্রীশ্রী গুরুদেবের আদর্শ সেবা করিতেছেন। তাঁহার রূপাশিস-ধারা যে কি প্রকারে কাঁহার প্রতি বর্ষিত হইয়াছে তাহা কার্যতঃ অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক আপনার সর্বাদীন জয় হউক ইহাই প্রার্থনা।

স্বাঃ শ্রীমোহিনী মোহন রায়, নারমা, মেদিনীপুর, ২০শে চৈত্র, ১৩৫৫

৩। Back to Godhead পত্রিকার সম্পাদক মাননীয়

শ্রীমুত অভয় চরণ দে মহোদয় :—

পূজ্যপাদ কেশব মহারাজ ! কৃপাপূর্বক আমার দণ্ডব্রজি গ্রহণ করিবেন। আপনার প্রেরিত শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা গতকল্য পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। পত্রিকার কলেবর মধ্যমাকার হইলেও বেশ সূত্রী হইয়াছে এবং কাগজ ও ছাপা ভালই হইয়াছে। পত্রিকায় মুদ্রাকর প্রমাদ খুব কমই দেখিতে পাওয়া গেল, যথাসম্ভব নাই বলিলেই হয়। ইহাতে পত্রিকার তত্ত্বাবধান ভালই হইতেছে মনে হয়। আপনার সর্বতোমুখী প্রচার চেষ্টা আমার চিত্তাকর্ষণ সর্বদাই করে। আপনি নিজে পূর্বাশ্রমের মহানুভাবোচিত সর্বদাই আমাকে স্মরণ করেন কিন্তু আমার এতই দুর্ভাগ্য যে আপনার সেবা কিছুই করিতে পারি না। তজ্জন্ত নিজগুণে আমার অপরাধ ক্রীমি মার্জনা করিবেন। আমার 'ব্যাক্-টু-গড্‌হেড' পত্রিকা প্রথম প্রকাশের সময় আপনি আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন এমন কি বহু কার্যের মধ্যে আমার দরিদ্র আশ্রমে আপনি পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। * * * *

আপনার শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সর্বপ্রথমেই শ্রীপাদ নরহরিদার কথা স্মরণ করিয়া আপনি সর্বতোমুখবান্দাই হইয়াছেন। শ্রীপাদ নরহরিদার স্নেহ মমতা ও স্নিগ্ধ ব্যবহার আমাদের চিত্তপটে চিরদিন জাজ্বল্যমান থাকিবে। তাঁহার বিরহ বেদনা শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ বেদনা অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। * *

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার প্রবন্ধগুলি যথাযথ সমাবেশ হইয়াছেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ ঠাকুরের প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়া খুব ভাল করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব পূর্ব আচার্য্যগণের একটি জীবনী পত্রিকায় বাহির হইলে সম্প্রদায়ের প্রভূত মঙ্গল হইবে।

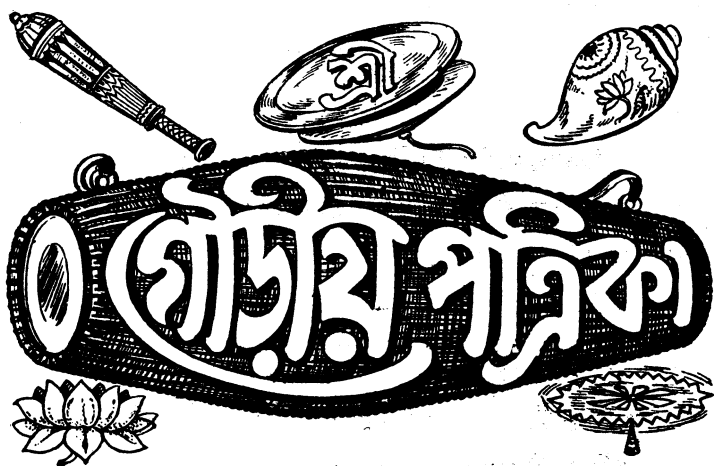
পরে আপনার শ্রীপত্রিকায় অত্রাত্ত ভাষায় প্রবন্ধাদি স্থান পাইবে এরূপ প্রস্তাবনা দেখিলাম। শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞায় ইংরাজী ভাষায় কিছু আলোচনা করিবার জন্ত আমি 'ব্যাক্-টু-গড্‌হেড' আরম্ভ করিয়াছিলাম। * *

* * আপনার পত্রিকায় ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের সময় আমার কিছু সেবা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। আমার ইংরাজী ভাষায় বহু প্রবন্ধাদি লেখা আছে ; সময় মত পাঠাইতে পারিব।

স্বাঃ শ্রীঅভয় চরণ দে, ৬নং সীতাকান্ত বানার্জী লেন

পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা, ২৭-৩-৪০

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিঃ শ্রম এব হি কেবলম্ ॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা। যয়াত্মা। সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥
অগ্নি ধর্ম সুষ্পষ্টরূপে পালে যেই জন । হরি কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১ম বর্ষ { ক্ষীরোদশায়ী, ২ ত্রিবিক্রম, ৪৬৩ গৌরাদ
শনিবার, ৩১ বৈশাখ ১৩৫৬, ইং ১৪১৫৪৯ } ৩য় সংখ্যা

ଉତ୍ତରକ

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-ঠাকুর-কৃত)

সংসার-দাবানল-লীড়-লোক-ত্যাগায় কারুণ্যঘনাম্বুজম ।

প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণାର୍ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ১ ॥

সংসার-দাবানলসম্পৃপ্ত লোকসকলের পরিত্রাণের জন্ত যিনি কারুণ্য-
বারিবারূপ প্রাপ্ত হইয়া কৃপাবারি বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণ-গুণনিধি
শ্রীকৃষ্ণদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ১ ॥

মহাপ্রভোঃ কীর্তন-নৃত্য-গীত-বাদিত্রমাত্মননসো রসেন ।

রোমাঞ্চ-কম্পাশ্র-তরঙ্গ-ভাজো বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥ ২ ॥

সকীর্তন, নৃত্য, গীত ও বাজাদি দ্বারা উন্মত্তচিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমরসে যাহার রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রুতরঙ্গ উদ্গত হয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥

শ্রীবিগ্রহাধন-নিত্য-নানা-শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জনা দৌ ।

যুক্তশ্চ ভক্তাংশ্চ নিযুক্ততোহপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥ ৩ ॥

যিনি শ্রীবিগ্রহের নিত্যসেবা, আত্মরসোদীপক নানাবিধ বেশ-রচনা ও শ্রীমন্দিরমার্জন প্রভৃতি সেবায় স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং (অভ্যুগত) ভক্তগণকে নিযুক্ত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

চতুর্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ স্বাদ্ব্যতৃপ্তান্ হরিভক্তসজ্জান্ ।

কৃৎস্ব তৃপ্তিং ভজতঃ সदैব বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥ ৪ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তবৃন্দকে চক্ষ্য, চূষ্য, লেহ ও পেয়—এই চতুর্বিধ রসসমম্বিত স্বেচ্ছাচ্ছ প্রসাদাদ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া (অর্থাৎ প্রসাদ সেবন-জনিত প্রপঞ্চ-নাশ ও প্রেমানন্দের উদয় করাইয়া) স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধিকামাধবয়োঁরপার-মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্যাম্ ।

প্রতিক্ষণ-স্বাদন-লোলুপশ্চ বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥ ৫ ॥

যিনি শ্রীরাধামাধবের অনন্ত-মাধুর্য্যময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহ আশ্বাদন করিবার জন্ত সর্বদা লুপ্তচিত্ত, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

নিকুঞ্জযুনো রতিকেলিসিদ্ধৌ যা যালিভিযুক্তিরপেক্ষণীয়া ।

তত্রাতিদাক্ষাদতিবল্লভশ্চ বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥ ৬ ॥

নিকুঞ্জবিহারী ‘ব্রজযুবদ্বন্দ্বের’ রতিক্রীড়া-সাধনের নিমিত্ত সখীগণ যে যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে অতিনিপুণতাপ্রযুক্ত যিনি তাঁহাদের অতিশয় প্রিয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

সাক্ষাৎকরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ।

কিন্তু প্রভোঃ প্রিয় এব তশ্চ বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥ ৭ ॥

নিখিলশাস্ত্র যাহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি—প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

যশ প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যশ্যপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোহপি ।

ধ্যায়ংস্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসম্ব্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৮ ॥

একমাত্র যাহার রূপাতেই ভগবদনুগ্রহ-লাভ হয়, যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথাও গতি নাই, আমি ত্রিসম্ব্য সেই গুরুদেবের কীর্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

শ্রীমদ্গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ ।

যন্তেন বৃন্দাবন-নাথ-সাক্ষাৎ-সেবৈব লভ্যা জন্মযোহন্ত এব ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি এই গুরুদেবাষ্টক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (অরুণোদয়ের চারিদণ্ড পূর্বকালে) অতিশয় যত্নের সহিত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন, তিনি বস্তুসিদ্ধিকালে বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবাস্বিকার প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

শ্রীভক্তিমার্গ

অভক্তিমার্গের সংক্ষেপ পরিচয় তন্মামশীর্ষক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছি, এক্ষণে শ্রীভক্তিমার্গের কথা পাঠকগণকে জানাইতেছি ।

অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি

যাহা অভক্তিপথ নহে যাহাতে অনুকূল অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবার কথা আছে তাহাই শুদ্ধভক্তি পথ । অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন বলিলে শুদ্ধজীবের কৃষ্ণেতরাভিলাষ নামক প্রতিকূল মায়িক ভোগের নিরাস করিয়া হরি-সেবন অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত বস্তু জীব অপ্রাকৃত উপাদান দ্বারা অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অনুশীলন করেন । সেই ভক্তিতে বৈকুণ্ঠের মায়ার কোন উপযোগিতা নাই । নারদপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে শুদ্ধ জীবের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়পতি কৃষ্ণের তৎপরত্ব সহকারে অর্থাৎ অনুকূল ভাবে সর্বোপাধিমুক্ত সেবন বা অনুশীলনকে ভক্তি বলে ।

মায়ার ধর্ম ও বৈকুণ্ঠের ধর্ম

মায়ার ধর্ম জীবকে ভোগে প্রবৃত্ত করায়, বৈকুণ্ঠের ধর্ম ভক্তি জীবকে কৃষ্ণদাশ্যে নিযুক্ত করে । মায়ার ধর্ম প্রাকৃত অর্থাৎ ভোগী জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ-ময় । মায়াতীত বৈকুণ্ঠধর্ম অপ্রাকৃত অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের বিষয়ক অপ্রাকৃত রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদিতে শুদ্ধ জীবানুভূতি । শুদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ দূরাশাবশে

ব্যতিরেকভাবে মায়াবাহ্য অর্থে নিযুক্ত হইলে জীবের ভোক্তাভিমান প্রবল হয় এবং তখনই তাহার স্বরূপ-বিভ্রান্তি ঘটে। তিনি নিত্য কৃষ্ণদাস্ত ভুলিয়া মায়াবাহ্য আশ্রয়ে ‘মা’-শব্দে নহে বা নিন্দনীয়, ‘যা’-শব্দে যাহা অর্থাৎ ‘যাহা কৃষ্ণ নহে’ অথবা ‘মীয়তে অনয়া’ অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর ভোক্তার অবলম্বনে প্রকৃতিজাত বা প্রাকৃত অভিমানে নিত্য সংসার-ভোগের পথ গ্রহণ করিয়া নিজ ভোগ্য বিষয় প্রাকৃত রূপ-রসাদির পরিমাণ করিতে ব্যস্ত হন। শুদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয় সমূহ অল্পকালে কৃষ্ণশাবশে কৃষ্ণেন্দ্রিয় সেবায় নিযুক্ত হইলে জীবের অপ্রাকৃত ভোগ্য-ভিমান প্রবল হয়; যাহা ভোগীগণ নির্বুদ্ধিতা বলিয়া নিতান্ত ঘৃণা করেন, যেহেতু উহাতে ভোক্তার আত্মভরিতা আদৌ নাই। এই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণ সেবা প্রবৃত্তিই জীবের স্বরূপ উপলব্ধি করায়।

নীলকণ্ঠীয় ভক্তি বা মায়াবাহ্য ভক্তি নহে

দাক্ষিণাত্যে নীলকণ্ঠীয় শৈব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে যে ভক্তের কথা কথিত হয় তাহা কখনই কোন ভক্তের বা রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ‘ভক্তি’ শব্দবাচ্য নহে। অপবর্গ লাভে শুদ্ধ জীবাত্মভূতি যে স্থলে বৈকুণ্ঠ বস্তুকে স্বীয় ভোক্তা জ্ঞানের পরিবর্তে ভোগ্য জ্ঞান করে তাহা অন্য কথায় প্রাকৃত ভোগ বা অবৈষ্ণব ধর্ম; সেখানে মায়াসহ এক ভগবান বস্তু ঘোষা, এবং জীব পুরুষ। অবৈষ্ণবের রুচির অনুকূলে মায়াকে কৃষ্ণ সংজ্ঞা দিয়া মায়াবাহ্য ভজন হইতেই প্রাকৃত সহজিয়া, থিয়সফি, বাউলাদির ধর্ম উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। উহা বৈষ্ণবের ভক্তিদ্বন্দ্ব নহে।

উপাস্য তত্ত্ব মাতৃহ আরোপ ভক্তি নহে

শ্রীমহাপ্রভু প্রেমভক্তিতে যে দাস্তাদি রস উপদেশ করিয়াছেন তন্মধ্যে অবৈষ্ণবগণের উপাস্ত মাতৃহ, কৃষ্ণ কোথাও আরোপিত হয় নাই; কেন না তাদৃশ সত্ত্বা ভক্তিদ্বন্দ্বের প্রতিকূল বিষয়। মায়াবাদীগণ মুখে গৌর ভক্ত হইয়া কৃষ্ণবস্তুতে মাতৃহ বা কৃষ্ণসহ মায়ৈকহ আরোপ করিতে গিয়া ভক্তিদ্বন্দ্বের পথ হারাইয়াছেন।

প্রাকৃত সহজিয়া :—(১) প্রাকৃত পুরুষ-দেহে যোষিৎ-কল্পনা

প্রাকৃত সহজিয়াগণ কৃষ্ণলীলার আদর্শে নিজ প্রাকৃত ভোগময় ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রবৃত্তিই ভক্তি বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়া দুই প্রকার। যাহারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণরত হইয়া কর্মফলবশে প্রাকৃত পুরুষ হইয়াও আপনাকে যোষিৎ কল্পনা মাত্র করিয়া স্থল ভোগে তৎপর এবং যোষিৎ গুরুকে কৃষ্ণ আরোপ করিয়া

রুচিমার্গে অবস্থিত মনে করে ও প্রাকৃত জড় সন্তোগকে হরিলীলার প্রকারভেদ মনে করে তাহারা একপ্রকার সহজিয়া।

প্রাকৃত সহজিয়া :-(২) স্তৈশ্ব গৃহবৃত্ত ধর্মদ্বারা কৃষ্ণপ্রেম লাভ

অন্য প্রকার সহজিয়া বলেন যে ভোগ্য্য স্ত্রী মাত্রেই অপ্রাকৃত। ভোক্তা পুরুষ মাত্রই অপ্রাকৃত। স্তৈশ্বভাব পোষণ করিয়া গৃহব্রতধর্ম বাজ্ঞন করিলেই পুরুষের প্রাকৃতত্ব লাঘবে কৃষ্ণপ্রেম উদ্ভিত হয়। ইহাদের মতে পরমহংস বৈষ্ণবগণ গৃহব্রত না হওয়ায় তাঁহারা বৈধী সাধন-ভক্ত্যাশ্রিত ন্যূনাধিকারী। গৃহব্রত না হইলে কৃষ্ণপ্রেমের উপলব্ধি হয় না। পবিত্র হরিসেবারত গৃহস্থ বৈষ্ণবকে ইহারা তাঁহাদের ত্রায় গৃহব্রত মনে করেন। স্তৈশ্ব না হইয়া গৃহস্থ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ হরিভজন ক্রীড়ে করিতে পারেন তাঁহারা বুঝিতে চান না। কৃষ্ণের সংসারে যাবতীয় অর্থ কেবল নিজের বহিস্মুখী বিষয় প্রবৃত্তি চরিতার্থের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত করেন এবং স্ত্রীপুত্রাদির মায়া-মমতায় আত্মবলিদান দিয়া থাকেন।

গৃহস্থ বৈষ্ণবের বৈরাগ্য ও স্তৈশ্ব বিষয়ীর সন্তোগরস এক নহে

ঝড়ু ঠাকুরের বা শ্রীবাসাদির শুদ্ধভক্তি, রামানন্দ রায়ের স্মৃতিত্ব বৈরাগ্য, মহাপ্রভুর ভক্তগণের কৃষ্ণেতর বস্তুতে বৈরাগ্যপ্রধান ভাব ও প্রভুর সন্ন্যাস বুঝিতে অক্ষম হইয়া নিজ গৃহধর্ম ও নিজ নিজ ইচ্ছিতত্বপূর্ণে আনন্দ লাভ করেন। হরিভক্তির নামে ইচ্ছিতত্বপূর্ণে খুব মজা মনে করিয়া স্তৈশ্ব বিষয়ীগণ স্বজাতিতে স্বদেশে স্বদলে থাকিয়া রসগান শুনিয়া ভক্তিকে পাখিব মাটিয়া বা প্রাকৃত জ্ঞান করেন এবং শুদ্ধ গৃহস্থ বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হন। এ সকল কথা সুন্দরভাবে “মতিন’ কৃষ্ণে” শ্লোকত্রয় দ্বারা আনন্দভরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সর্বদা বুঝাইয়া বলিতেন। নিজ ভোগতাপর্ষ্যপর সন্তোগ-রসের উদয় হইলেও তাদৃশ আনন্দের প্রতি ভক্তের মহাক্রোধ হয়। শ্রীচরিতামৃত আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২০১ সংখ্যা যথা :-

নিজপ্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।

সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥

অঙ্গস্তম্ভারস্তমুতু দয়স্তং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যানন্দং ।

কংসারাতেবীজনে যেন সাক্ষাদক্ষৌদ্রীয়ানস্তরায়ে ব্যাধায়ি ॥*

(ভক্তিরসামৃত সিদ্ধি, পঃ বিঃ—২য় লহরী ২৩ শ্লোক)

*শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যাজন করিবার সময় প্রেমানন্দ জনিত দেহের জড়তাকে সেবায় বাধাকর জানিয়া দারুক অভিনন্দন করিলেন না।

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম-সেবা বিনে ।

স্বস্থার্থ সালোকাদি না করে গ্রহণে ॥

(১৮: ৮: আ: ৪।২০৪)

আত্মান্তিক ভক্তিযোগ

শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে যে কপিল মাতাকে বলিলেন, নিহেতুক ব্যবধান রহিত কৃষ্ণভক্তি ঐহাদের উদয় হইয়াছে তাঁহাদের আমার সহ সমলোক লাভ, সমরূপ লাভ, সমৈশ্বর্য লাভ ও আমার সামীপ্য লাভ এই চারি প্রকার মুক্তি সন্তোষ দিলেও উহা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা কেবল আমার সেবা প্রার্থনা করেন ইহাই আত্মান্তিক ভক্তিযোগ।

রাগানুগা ভক্তির সাধন ও পরিচয়

ভক্তিরসের পরাকাষ্ঠা গোপীপ্রেম, তাহা প্রাকৃত ও কামগন্ধহীন। চরিতামৃতের কবিতা কয়েকটি এ বিষয়ে রাগানুগীয় ভক্তি-সাধকগণের নিদর্শন স্বরূপ। এই অপূর্ব ভাবসমূহ হইতে দূরে গিয়া কোন রাগানুগী সাধক নিজ মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা জড়রসে বিপ্রলম্বের অন্তুপাদেয়ত্ব দর্শন করিয়া যেন প্রাকৃত রসের আবাহন না করিয়া বসেন, তজ্জন্ত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কতই না নিজাপ্রিতজনগণকে সাবধান করিয়াছেন। ঐহারা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া অন্ত পথে গিয়াছেন আমাদের তাদৃশ ভক্তগণের প্রতি কিছুই বক্তব্য নাই। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত যথা :—

আত্ম-স্বথ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।

কৃষ্ণ-স্বথ-হেতু করে সব ব্যবহার ॥ ১ (আ: ৪।১৭৪)

কামের তাৎপর্য—নিজসন্তোষ কেবল।

কৃষ্ণস্বথতাৎপর্য—মাত্র প্রেম ত' প্রবল ॥ ২ (আ: ৪।১৬৬)

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাহ্য তারে বলি কাম।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ ১ (আ: ৪।১৬৫)

সর্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।

কৃষ্ণস্বথহেতু করে প্রেম-সেবন ॥ ৭ (আ: ৪।১৬৯)

অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।

কাম—অঙ্কতমঃ, প্রেম—নির্মল ভাস্বর ॥ ৩

অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।

কৃষ্ণস্বথ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥ ৬ (আ: ৪।১৭১—১৭২)

এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ ।

এই লাগি করে অঙ্গের মার্জন-ভূষণ ॥ ৭ (আঃ ৪।১৮৩)

গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন ।

সুখবাহু নাহি, সুখ হয় কোটা গুণ ॥ ৪ (আঃ ৪।১৮৬)

তাঁ'সবার নাহি নিজ সুখ-অহুরোধ ।

তথাপি বাড়েয়ে সুখ, পড়িল বিরোধ ॥ ৯ (আঃ ৪।১৮৮)

আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ ।

এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ-মুখ ॥ ১০ (আঃ ৪।১৯১)

অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে ।

এই হেতু গোপী-প্রেমে নাহি কাম-দোষে ॥ ১১ (আঃ ৪।১৯৫)

প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ ।

তাঁহা নাহি নিজ-সুখ-বাহুর সম্বন্ধ ॥ ১২ (আঃ ৪।১৯৯)

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন ।

কৃষ্ণসহ নিজ-লীলায় নাহি সখীর মন ॥ ১৩ (মঃ ৮।২০৭)

সহজ গোপীর প্রেম, নহে প্রাকৃত-কাম ।

কামক্ৰীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥ ১৪ (মঃ ৮।২১৫)

নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য ।

কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য গোপীভাব-বর্ষ্য ॥ ১৫

নিজেন্দ্রিয়-সুখবাহু নাহি গোপিকার ।

কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার ॥ ১৬

সেই গোপীভাবামৃতে ষাঁর লোভ হয় ।

বেদধর্ম্য ত্যজি' সে কৃষ্ণকে ভজয় ॥ ১৭

রাগাহুগমার্গে তাঁরে ভজে যেই জন ।

সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ (মঃ ৮।২১৭-২১৮, ২২০-২২১)

না গনি আপন-দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,

তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য ।

মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ.

সেই দুঃখ—মোর সুখবর্ষ্য ॥ (অঃ ২০।৫২) ১৭

নিজ-সুখে মানে লাভ, পড়ুক তার শিরে বাজ,

কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ । (অঃ ২০।৫৫) ১৮

বৈধী ভক্তির সাধন ও পরিচয়

যাঁহাদের নৈসর্গিক সম্বন্ধজ্ঞান উদয় হয় নাই তাঁহারা ভগবৎপ্রিয় বস্তুর অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রথমমুখে দেখিতে পান না ; তজ্জগুই তাঁহাদের বিধিমার্গে শাস্ত্রীয় বিচার ও গুরুর উপদেশের আবশ্যক। যাঁহারা শাস্ত্রার্থ শ্রদ্ধা সহকারে বিশ্বাস করিয়া গুরুর নিকট ভজন শিক্ষা করেন এবং ভজন প্রভাবে অনর্থের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান তাঁহাদের নিষ্ঠানাম্নী অবস্থা সাধনভক্তিতে অবস্থিতিকালে পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইতেই রুচি আসিয়া উপস্থিত হয়। বিধির অনুগত হইয়া ভজন করিবার জগু শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ উপদেশামুতে বলিয়াছেন—

শ্রাং কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাপ্যবিছা-

পিত্তোপতপ্তরসনশ্র ন রোচিকা হু।

কিস্তাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টী

স্বাদী ক্রমান্ববতি তদগদমূলহস্তী ॥ (উঃ ৭)

[অর্থাৎ—অহো, যাহার বাসনা অবিছাপিত্ত্বারা উত্তপ্ত অর্থাৎ যে অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতাবশতঃ অবিছাগ্রস্ত তাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণনামগুণচরিতাদিরূপ স্মৃতিশ্রী মিশ্রিও রুচিপ্রদ হয় না। কিন্তু যদি আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া নিরন্তর সেই কৃষ্ণনাম-চরিতাদিরূপ মিশ্রি সেবন করা যায়, তবে ক্রমশঃ তাঁহার আশ্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং কৃষ্ণবিমুখতারূপ জড়ভোগব্যাধিও উপশম হয়।]

রাগানুগা ভক্তির কপট অনুকরণ অপরাধময়

আবার রুচির উদয় হইয়াছে বিষয় প্রবৃত্তিরূপ অনর্থও প্রবল আছে এরূপ ঘটনা নিকপটতা বা নির্ব্যালীকত্বের ব্যাঘাত।

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ,

সর্কায়নাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যালীকম্।

তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং,

নৈষাং মমাহমিতি-ধীঃ শৃঙ্গালভক্ষ্যে ॥ * (ভাঃ ২।৭।৪২)

* ভাবার্থ—ভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি দয়া করেন যদি তাঁহারা কপটতা রহিত হইয়া সর্বতোভাবে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে তাঁহার শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। সেই শরণাগত ভক্তগণের কুক্কর-শৃঙ্গালভক্ষ্য দেহে “আমি ও আমার” বুদ্ধি থাকে না।

শ্লোকটী এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও বলিয়াছেন—

“বাহ্যভ্যন্তরয়োঃ সমং বত কদা বীক্ষ্যামহে বৈষ্ণবান্।”

যাহাদের কৃত্রিম রুচি তাঁহারা অচিরেই বিষয়ে প্রমত্ত হইয়া যান। তখন অপরাধই বৈষ্ণবকৃত্য জানিয়া রাগানুগ বাহ্য সাধন শ্রবণ-কীর্তনের আশ্রয়ে নিজ ভক্তিনতাকে অপরাধদ্বারা উপড়াইয়া ছিঁড়িয়া ও পাতা শুকাইয়া ফেলেন। সুতরাং অন্তশিক্ষিত তাঁহাদের সিদ্ধদেহ তৎকালে কৃষ্ণানুশীলনের বদলে কৃষ্ণেত্তর বস্তুর অনুশীলন করিয়া ফেলে। তখন বৈষ্ণবগণের বিবেচ্য করিতে করিতে জীব অতিবাড়ীদিগের হ্রায় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অপরাধ করিয়া বলেন।

• “শ্রুতি স্মৃতিপুৰাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিঃ বিনা। আত্মান্তিকী হরেভক্তিকং-পাতায়ৈব কেবলম্।” হইয়া বিধিভক্তির যোগ্যতাকে গর্হণ করিতে ব্যস্ত হন।

সাধন ভক্তি—বৈধী ও রাগানুগ

সাধন ভক্তিতেই বৈধী ও রাগানুগামার্গদ্বয় অবস্থিত। ভাবোদয়ে বৈধী অধিকারীও রাগানুগা মার্গে ভজন করিতে আরম্ভ করেন। বৈধ-ভক্ত ব্রজবাসীর ভাবে লুক্ক হইবার পূর্বে তিনি শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা করেন। তাঁহার সন্দেহ নিরসন হইলে বিচার-প্রধান মার্গের সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ হইয়া রুচিপ্ৰধানমার্গে প্রবেশ করেন। কপটতামূলে রুচিপ্ৰধানমার্গে অবস্থিত মনে করিয়া বৈধভক্ত-গণের সহ বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলে তাদৃশ রুচিপ্ৰধান পরিচয়াকাজীর স্বরূপ বিলান্তি হইয়াছে প্রতিপন্ন করাইবে। আবার রাগানুগমার্গীয় রূপানুগ আচার্য্য শ্রীজীবপাদের ভাগবত সন্দর্ভের সিদ্ধান্তে বিমুখ হইয়া নামশ্রবণ, অনর্থনিবৃত্তিতে ক্রমে রূপশ্রবণ, গুণশ্রবণ ও লীলাশ্রবণে অনাদর ঘটিলে রাগানুগা সাধনেরও ব্যাঘাত অবশ্যস্বাভাবী। যেহেতু বাহ্যে করিকথা শ্রবণ ও কীর্তন উভয়ই রাগানুগ-মার্গীয় অত্যাঙ্গ কৃত্যবিশেষ।

সাধন ভক্তির ক্রম-পর্যায়

শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন,—তদেবং নামাদিশ্রবণ—ভক্তাক্রমঃ। তথাপি প্রথমং নামঃ শ্রবণম্, অন্তঃকরণশুদ্ধার্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চাস্তঃকরণে রূপশ্রবণেন ততুভয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্প্রাপ্ততে। ততস্তেষু নামরূপগুণেষু তৎপরিকরেষু চ সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সূহৃ ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্তন-স্মরণয়োজ্যেয়ম্। ইদঞ্চ শ্রবণং শ্রীমহানুপ্রবিতং চেদ্রহামাহাত্ম্যং, জাতরুচীনাং পরমসুখঞ্চ।

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ - ২৫৬ সংখ্যা)

[অর্থাৎ—নাম-রূপ-গুণাদি শ্রবণ ভক্ত্যঙ্গক্রম। তথাপি অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জ্ঞাত প্রথমতঃ নামশ্রবণই অপেক্ষণীয় হয়। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপশ্রবণদ্বারা হৃদয়ে রূপের উদয় হয়; তদ্বারা গুণসমূহের স্ফূর্তি হয়। অনন্তর নাম, রূপ, গুণ এবং তদীয় পরিকর সমূহের সম্যক স্ফূর্তি হইলেই স্তম্ভরূপে লীলাসমূহের স্মরণ হইয়া থাকে এই অভিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইয়াছে। এইরূপ কীর্তন ও স্মরণবিষয়েও জ্ঞাতব্য। এই শ্রবণ শ্রীমহাজনমুখরিত হইলে মহামাহাত্ম্যযুক্ত এবং জাতরুচিপুরুষগণের পরমসুখপ্রদ হইয়া থাকে।]

নামগ্রহণ ফলেই নিজ সিদ্ধপরিচয়ের উদয়

যাহারা অনর্থময় জীবকে জাতরুচি জানিয়া কৃষ্ণনামরূপগুণপরিবর্তনশীল লীলাময় রসগ্রন্থ শ্রবণ করান ও শ্রবণ করেন তাঁহাদের যথেষ্টাচারিতা অবশ্যই বিশৃঙ্খলতা উৎপন্ন করিবে। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে সিদ্ধান্ত অবগত হইলেই শুদ্ধভক্ত নিজ পরিচয় স্তম্ভরূপে জানিতে পারেন। নাম ভজনে নামোচ্চারণকারীর অনুকূল প্রতিকূল বিচারে তাঁহার যুক্ত বৈরাগ্যাবিশিষ্ট গৃহস্থ বা পারমহংস ধর্ম্মগ্রহণের যেটা সুবিধা তাহাই তিনি গ্রহণ করিবেন। ইহাতে কাহারও বাধা দিবার নাই। তবে জড় গৃহে আসক্ত বা স্নেহ হওয়া ভক্তের সুবিধাজনক নহে এবং পরমহংস হইয়াও ফল বৈরাগ্যশ্রয়েও ভজনের ব্যাঘাত ঘটে।

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীঅর্থপঞ্চক

শ্রীমদ্রামানুজস্বামীর প্রশিষ্টা শ্রীলোকাচার্য্য মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংসারীজীবের তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির জ্ঞাত এই অর্থপঞ্চক নিতান্ত আবশ্যক। স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ, পুরুষার্থস্বরূপ, উপায়স্বরূপ ও বিরোধীস্বরূপ-রূপ পাঁচটি অর্থের জ্ঞান ও তদ্বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

(ক) জীবের স্বস্বরূপ—১। নিত্য, ২। মুক্ত, ৩। বদ্ধ, ৪। কেবল, ৫। মুমুক্শু।

(খ) ঈশ্বরের পরস্বরূপ—১। পর, ২। বাহ, ৩। বিভব, ৪। অন্তর্ধ্যামী,

৫। অর্চ্যবতাব।

(গ) পুরুষার্থস্বরূপ—১। ধর্ম্ম, ২। অর্থ, ৩। কাম, ৪। আত্মানুভব,

৫। ভগবদানুভব।

- (ঘ) উপায়স্বরূপ—১। কৰ্ম, ২। জ্ঞান, ৩। ভক্তি, ৪। প্রপত্তি, ৫। আচার্য্য-ভিমান।
- (ঙ) বিরোধীস্বরূপ—১। স্বরূপবিরোধী, ২। পরহরবিরোধী, ৩। পুরুষার্থ-বিরোধী, ৪। উপায়বিরোধী, ৫। প্রাপ্যবিরোধী।

জীবের স্বরূপ

- (১) নিত্যজীব ;—সর্বদা সংসারসম্বন্ধদোষ রহিত, ভগবদানুকূল্যমাত্র ভোগযুক্ত, বৈকুণ্ঠনাথের মন্ত্রণাযোগ্য ঈশ্বর নিয়োগ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারকরণে সমর্থ, ঈশ্বরের সর্বাবস্থায় কৈঙ্কর্য্যশীল বিশ্বকুসেনাদি অমরবৃন্দ।
- (২) মুক্তজীব ;—ভগবৎপ্রসাদে যাহাদের প্রকৃতিসম্বন্ধজনিত ক্লেশমল নিবৃত্ত হইয়াছে, ভগবদানন্দে উৎফুল্ল, স্তবপরায়ণ, সন্তোষানন্দ বৈকুণ্ঠে বর্তমান মুনিগণ।
- (৩) বদ্ধজীব ;—পাক্‌ভৌতিক অনিত্য সুখদুঃখানুভবী আত্ম-দর্শন-স্পর্শনে অযোগ্য, অশুদ্ধ, অজ্ঞান, অন্তথাজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞানজনক দেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত, স্বদেহ পোষণে রত, বর্ণাশ্রমধর্ম বিবর্তিত অসেব্য সেবা, ভূতহিংসা, পরদার পরদ্রব্যাপহরণ করতঃ সংসার বন্ধক ভগবদ্বিমুখ চেতনগণ।
- (৪) কেবল জীব ;—কেবল জীব এক। ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া অণু বস্তাভাবে আপনাকে আপনি ভক্ষণ পান করেন। যোগাদি বাসনাজ্জিত কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবই কেবলজীব।
- (৫) মুমুক্‌জীব ;—মুমুক্‌জীবসকল সংসারদাবান্নি-তপ্ত হইয়া সংসারদুঃখ নিবৃত্তির জগৎ জ্ঞানদ্বারা প্রকৃত আত্মবিবেক লাভ করতঃ প্রকৃতিকে দুঃখাশ্রয় হেয়পদার্থ সমূহ স্বরূপ, আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পরতত্ত্ব স্বরূপ এবং স্বয়ং প্রকাশ, স্বতঃস্বীয়, নিত্য অপ্রাকৃতস্বরূপ জানেন। আনন্দময় পরমাত্মবিবেকে অশক্ততা বশতঃ প্রকৃতির অল্পরসে আপনাকে পূর্বে দুঃখিত থাকি বোধ করেন। আত্ম-প্রাপ্তি সাধক জ্ঞানযোগ নির্ণায়ক স্বরূপ আত্মানুভবই একমাত্র পুরুষার্থ বোধে সিদ্ধ অপ্রাকৃত শরীর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই জগতে বর্তমান থাকেন। মুমুক্‌গণ উপাসক ও প্রপন্নভেদে দ্বিবিধ।

ঈশ্বরের পরম্বরূপ

- (১) পরতত্ত্ব ;—পরশব্দে পরমেশ্বর । নিত্যবর্তমান আদি জ্যোতিরূপ পরবাসুদেব ।
- (২) ব্যুৎপত্তি ;—সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্তা সংকর্ষণ, প্রত্যয়, অনিরুদ্ধঃ ।
- (৩) বিভবতত্ত্ব ;—রামকৃষ্ণাদি অবতার ।
- (৪) অন্তর্যামীতত্ত্ব ;—দুইপ্রকার । দাসের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট পরমাত্মা । বাসুদেব আমাদের প্রাণস্বরূপ এইরূপ চিন্তা হইতে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া বিচারবান্ পুরুষের অন্তঃকরণে সর্বদাসসুন্দর লক্ষ্মীর সহিত বর্তমান পরমসুন্দর নারায়ণ ।
- (৫) অর্চাবতার ;—দাসগণের অভিমত নাম ও রূপবিশিষ্ট উপাশ্রু মূর্তি । সর্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্বশক্তি হইয়াও অশক্তপ্রায়, পূর্ণকাম হইয়াও সাপেক্ষপ্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়, স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তের স্বামীপ্রায় মন্দিরে বর্তমান ।

পুরুষার্থস্বরূপ

- (১) ধর্ম ;—প্রাণিরক্ষার একমাত্র উপায়রূপ বৃত্তির নাম ধর্ম ।
অর্থ ;—বর্ণাশ্রমাত্মরূপ ধনধান্য স্তংগ্রহপূর্বক দেবতা পিতৃকর্মে ও প্রাণিরক্ষা বিষয়ে উৎকৃষ্ট দেশকালপাত্র বিচারপূর্বক ধর্মবুদ্ধিতে ব্যয় করার নাম অর্থ ।
- (৩) কাম ;—কাম দুই প্রকার, ইহলৌকিক ও পরলৌকিক । পিতৃ, মাতৃ, রত্ন, ধন, ধাত্র, অন্ন, পানীয়, দারা, পুত্র, মিত্র, পশু, গৃহ, ক্ষেত্র, চন্দন, কুমুম, তাম্বুল, বস্ত্রাদি পদার্থে শব্দাদি বিষয়ানুভব-জনিত সুখস্পৃহা ।
- (৪) আত্মানুভব ;—দুঃখ নিবৃত্তিমাাত্র অনুভব কেবলাত্মানুভব হয় । ইহাই এক প্রকার মোক্ষ ।
- (৫) ভগবদনুভব ;—ভগবদনুভবই পরমপুরুষার্থ লক্ষণ মোক্ষানুভব । প্রারম্ভ কর্ম ও পুণ্য পাপনাশে, অস্তি, জায়তে, পরিণমতে, বিবর্তিতে, অপক্ষীয়তে, বিনশতি, তাপত্রয়াশ্রিত এই ছয় বিকার রহিত হইলে ভগবৎস্বরূপ আবরণপূর্বক বিপরীৎ জ্ঞানোৎপাদক সংসার-বর্জক স্থলশরীর পরিত্যাগ করতঃ সুষ্মানাড়ী দ্বারে শিরঃ কপাল

ভেদপূর্বক নির্গত হইয়া সূক্ষ্মশরীরে অর্চিরাদি মণ্ডলে প্রবেশ-
পূর্বক বিরজা স্নানে সূক্ষ্ম শরীর ও বাসনা-রোগ দূরকরত, সকল
তাপ নিবর্তক শ্রীবিগ্রহ-করস্পর্শ লাভ করেন। তখন শুদ্ধসত্ত্ব-
স্বরূপ পঞ্চোপনিষদ্বয়, জ্ঞানানন্দ-জনক ভগবদভুববপর তেজোময়
অপ্রাকৃত দেহ-প্রাপ্ত হইয়া কিরীট-যুক্ত অমরগণমধ্যে মহামণি
মণ্ডপে ভূ-শ্রী-লীলাসহিত বর্তমান পরব্যোমনাথকে নিত্য অনুভব-
পূর্বক তদীয় নিত্য কৈঙ্কর্যে বর্তমান থাকেন।

উপায়-স্বরূপ

- (১) কৰ্ম :—যজ্ঞ, দান, তপঃ, ধ্যান, সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চমহাযজ্ঞাদি, অগ্নিহোত্র, তীর্থযাত্রা, পুণ্যক্ষেত্রবাস, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ, পুণ্যানদীস্নান, ব্রত, চাতুর্মাশ্র, ফলমূল্যশন, শাস্ত্রাভ্যাস, ভগবৎসমারাদন, জপ, তর্পণ, কায়শোষণ ও পাপনাশাদি কার্যে শব্দাদি বিষয় গ্রহণকে কৰ্ম বলা যায়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ অষ্টাঙ্কযোগও কৰ্ম্মান্ত।
- (২) জ্ঞান :—আত্মতত্ত্বালোচনার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞান যোগের সহকারী ঐশ্বর্যের প্রধান স্থান। হৃদয়মণ্ডল ও আদিত্যমণ্ডলে বর্তমান সর্বেশ্বরকে লক্ষীসহিত পদ্ম, শঙ্খ, চক্র, গদাধারীরূপে অনুভব এই শেযোক্ত জ্ঞান ভক্তিযোগের সহকারী।
- (৩) ভক্তি :—তৈলধারার ছায় অবিচ্ছিন্ন ভগবৎ স্মৃতিবিস্তাররূপ অনুভবকে প্রীতিরূপে আনিবার যোগ্যবৃত্তির নাম ভক্তি। ভক্তির স্বরূপ এই যে তাহা প্রারব্ধ কৰ্ম্মনিবৃত্তি উপায়রূপ সাধ্যসাধন অমুষ্ঠান দ্বারা আত্মার সঙ্কোচ বিকাশ করিতে যোগ্য হয়।
- (৪) প্রপত্তি :—ভক্তি উপায়স্বরূপ হইয়া ভগবদ্বিষয়ানুভবরূপ যে উপেয় ভাবকে উৎপন্ন করে তাহা প্রপত্তি। প্রপত্তি দুই প্রকার, আত্মরূপ-প্রপত্তি ও দৃষ্টরূপপ্রপত্তি। নিহেতুক ভগবৎ প্রসাদে শাস্ত্রাভ্যাসে, আচার্যোপদেশক্রমে জ্ঞানোৎপত্তি হইলে ভগবদভুব হয়। তখন ভগবদভুবের বিপরীত দেহসম্বন্ধ, দেশসম্বন্ধ ইত্যাদি দুঃসহ হইয়া উঠিলে শ্রীবেঙ্কটনাথের গর্তজন্ম-জরাধিব্যাধি-মরণাদি নিবর্তক বিচারপূর্বক গতাস্তরশৃঙ্খ আমি দাস এই বাক্যের সহিত শ্রীবেঙ্কটনাথের শরণাগত হইয়া নমস্কার করতঃ নিজ

আৰ্হি জ্ঞাপন করতঃ একান্ত অনুগত হওয়ার নাম আৰ্ত্তরূপ প্রাপ্তি। দৃষ্ট-প্রাপ্তি যথা, দৃষ্টপ্রাপ্ত পুরুষ স্বর্গ নরকে বিরক্তি-পূর্বক ভগবৎপ্রাপ্তি মানসে আচার্যোপদেশ ক্রমে উপায় স্বীকার-পূর্বক বিপরীত প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপূর্বক বেদবিহিত বর্ণাশ্রমাস্থান বাচিক, মানসিক ও কাষিক ভগবৎ কৈঙ্কর্যের অনুষ্ঠান করেন। ঈশ্বরের শেষত্ব, নিয়ন্তৃত্ব, স্বামিত্ব, শরীরিত্ব, ব্যাপকত্ব, ধারকত্ব, রক্ষকত্ব, ভোক্তৃত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিত্ব, সম্পূর্ণত্ব, পূর্ণকামত্ব এবং নিজের শেষত্ব, নিয়াম্যত্ব, স্বত্ব, শরীরত্ব, ব্যাপ্যত্ব, ধার্যত্ব, রক্ষত্ব, ভোগ্যত্ব, অজ্ঞত্ব, অশক্তত্ব, অপূর্ণত্ব অবগত হইয়া ঈশ্বরের কৃপাতুসন্ধান করেন।

- (৫) আচার্য্যাভিমান :—আমি অশক্ত ও দীন এই বুদ্ধিতে উপযুক্ত ভাগবত আচার্য্যের নিকট আপন দুঃখ জানাইয়া তাঁহার সহিত দৃঢ়সম্বন্ধে ভগবদ্ভজন করার নাম আচার্য্যাভিমান।

বিরোধী-স্বরূপ

- (১) স্বরূপবিরোধী :—দেহাত্মাভিমান অর্থাৎ এই জড়দেহে আত্মাভিমান, ভগবদ্ভাস বলিয়া আপনাকে না জানা এবং নিজের স্বতন্ত্রতা এই কয়টি স্বরূপবিরোধী।
- (২) পরত্ববিরোধী :—দেবতাস্তরে পরত্বপ্রতিপত্তি, সমত্বপ্রতিপত্তি, ক্ষুদ্রদেবতা বিষয়ে শক্তিসংযোগ প্রতিপত্তি, অবতারে মনুষ্যত্ব প্রতিপত্তি, অর্চ্যবতারে অশক্তিসংযোগ প্রতিপত্তি, এইগুলি পরত্ববিরোধী।
- (৩) পুরুষার্থবিরোধী :—ভগবৎকৈঙ্কর্য্যে অনিচ্ছা এবং ভুক্তিমুক্তিরূপ পুরুষার্থাস্তরে ইচ্ছা এই দুইটি পুরুষার্থবিরোধী।
- (৪) উপায়বিরোধী :—উপায়াস্তরে প্রতিপত্তি ও উপায়ে লাঘব বুদ্ধি এবং উপেষ্যত্বে গৌরব, এই তিনটি উপায়বিরোধী।
- (৫) প্রাপ্তিবিরোধী :—প্রারব্ধ শরীরে দৃঢ় সম্বন্ধ, অনুতাপশূন্য গুরুপদত্তি, ভগবদপচার, ভাগবতাপচার, গুরুতর অত্যাচার প্রভৃতি প্রাপ্তিবিরোধী।
- এই প্রকার অর্থপঞ্চকে জ্ঞানোৎপন্ন হইলে মুমুক্শু ব্যক্তির মোক্ষসিদ্ধি পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমাস্থরূপ অশনাচ্ছাদন স্বীকারপূর্বক সকল পদার্থ ভগবন্নিবেদিত করিয়া প্রসাদ প্রতিপত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিবেন। তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক গুরুর নিকট তাঁহার অভিমত আচরণ করিবেন। ঈশ্বরের নিকট সর্বদা দৈন্ত, আচার্য্যের

নিকট নিজের অজ্ঞতা, বৈষ্ণবের নিকট স্বীয় পারতন্ত্র্য, সংসারীর প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন। প্রাপ্যসাধনে অধ্যবসায়, বিরোধী বিষয়ে ভয়, ইতর বিষয়ে অকুচি, স্বদেহে অকুচি, স্বরূপজ্ঞান সংরক্ষণে আসক্তি করিবেন।

শ্রীমদগোড়ীয় মতে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ দাস্তুরস বিচারে এই সমস্ত উপদেশই গ্রাহ্য। ঐশ্বর্য্যমিশ্র নারায়ণ-দাস্তুরস ও মাধুর্য্যমূলক কৃষ্ণদাস্তুরসে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে তাহা শ্রীমন্নহাপ্রভুর সেবকেরা অবগত আছেন। কৃষ্ণদাস্তুরসেও এই অর্থ-পঞ্চকের উপদেশসকল সামান্য ভাবান্তর করিয়া লইলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। এই দাস্তুরসে বিশ্রুত ভাব হইলে সখ্যরস হয়। তাহাতে আবার স্নেহযুক্ত হইলে বাৎসল্য হয়। সেইভাবে অসঙ্কোচ স্বাত্মনিবেদন জন্মিলে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মধুরভাব হয়। সুতরাং শ্রীমদ্রামানুজস্বামীর সিদ্ধান্তসমূহ আমাদের গোড়ীয় প্রেমমন্দিরের ভিত্তিস্বরূপ জানিয়া আমরা তাঁহাকে বারবার দণ্ডবৎ প্রণাম করি।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

উত্তমা ভক্তি

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর মনোহরীষ্টসংস্থাপকবর তদীয় স্বরূপ শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্ৰভু উত্তমা ভক্তির লক্ষণ বলিতে গিয়া শ্রীভক্তিরসামৃত সিকুগ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

“অন্ত্যভিলাষিতাশুভং জ্ঞানকর্মাগুনাবৃতম্।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরন্তমা ॥”

এই শ্লোকটি শ্রীরূপানুগগণের আনুগত্যে পর্যালোচনা করিলে সাধকের “ভক্তি” সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভূতি নিশ্চয়ই লাভ হইবে। “সম্বন্ধি” তত্ত্ব বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” বাক্যটি যে রূপ পরিভাষা বাক্যরূপে গৃহীত হইয়াছে সেইরূপ অভিধেয়তত্ত্ব বিচারে এই শ্লোকটিও পরিভাষারূপে গ্রহণীয়। “সামান্যনিয়মে নিয়মকারিণী”—ইহাই পরিভাষা অর্থাৎ বহুপ্রকার বিধিবাচ্যের মধ্যে অস্তান্ত সমস্ত ব্যাক্যকে উপমর্দন করিয়া যে ব্যাক্যকে সর্বপ্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহাই পরিভাষা। ভক্তির সম্বন্ধে কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, কর্মপার্পণকারী, বিষয়ী, বিভিন্নমতাবলম্বী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুগামী—সকলের সকল প্রকার ধারণা, জ্ঞান ও অনুভূতিকে উপমর্দন করিয়া অর্থাৎ তত্ত্বদানুভূতিকে

খণ্ডিত, দোষদুষ্টি স্বভাব, ক্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করিয়া ভক্তির নিষ্কণ্ট লক্ষণরূপে এই শ্লোকটী উক্ত হইয়াছে।

জ্ঞান ও কৰ্ম্মদ্বারা অনাবৃত, অগ্নাভিলাষিতাশূন্য অনুকূলভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি। “আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনম্”—ইহাতে ভক্তির স্বরূপলক্ষণ, “অগ্নাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকৰ্ম্মানাবৃতম্”—ইহাতে ভক্তির তেটস্থ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে ক্রিয়াপদের ব্যবহার না থাকিলেও “অনুশীলন” এই পদের দ্বারা ধাত্বর্থ উক্ত হইয়াছে। অনুপূর্বক শীল্ ধাতু হইতে অনুশীলন শব্দ উৎপন্ন। চুরাদিগণীয় শীল্ ধাতুর অর্থ অভ্যাস, ইহা প্রবৃত্ত্যাত্মক, আর ভূদিগণীয় শীল্ ধাতুর অর্থ সমাধি, ইহা নিবৃত্ত্যাত্মক। ভক্তি চেষ্টারূপা ও ভাবনারূপা। শীল্ ধাতু প্রয়োগে উভয়বিধা ভক্তির স্মৃচনাই করা হইয়াছে। কৃষ্ণার্থে কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টারূপা ভক্তি আবার প্রবৃত্তিরূপা ও নিবৃত্তিরূপাভেদে প্রত্যেকটী দ্বিবিধ। ভক্তির স্বরূপাকার যে প্রধান নয়টি অঙ্গ তাহার কায়িক-বাচিক-মানসিকানুশীলনই প্রবৃত্ত্যাত্মক-চেষ্টারূপা আর সেবানামাপরাধাদি বর্জন প্রভৃতি নিবৃত্ত্যাত্মক-চেষ্টারূপা।

অনু উপসর্গ ‘পশ্চাৎ’, ‘সহ’, পুনঃ পুনঃ নৈরন্তর্য্য প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শীল জীবগোস্থামিপ্রভৃ শ্রীহরিনামায়ুত ব্যাকরণে কৃষ্ণপ্রবচনীয় (কৰ্ম্মপ্রবচনীয়) লক্ষণে ‘অনু’ উপসর্গের প্রয়োগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

লক্ষণবীপেখস্তুতেষভিভাগে পরিপ্রতী।

‘অনু’রেষু সহার্থে চ হীনে তুপশ্চ কথ্যতে ॥

এখানে শীল্ ধাতুর পূর্বে ‘অনু’ উপসর্গটি ‘নৈরন্তর্য্য’ অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ সেই অনুশীলন অন্তর, রহিত—বাধা রহিত। এই অনুশীলন কৃষ্ণার্থেই করিতে হইবে। কৃষ্ণার্থে চেষ্টারূপা ও ভাবনারূপা উভয়বিধ অনুশীলনই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তিই ভক্তি। যাহার উদ্দেশ্যে অনুশীলন করিতে হইবে, তাহার সেই অনুশীলন রুচিকর বা সুখকর হওয়া চাই। সুতরাং কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি—এই পর্য্যন্ত ভক্তির লক্ষণ পাওয়া গেল। কিন্তু তাহাতেও অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যে লক্ষণে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষ থাকিবে না তাহাই নিষ্কণ্ট লক্ষণ। কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার নামই ভক্তি ইহা বলিলে চানুর-মুষ্টি প্রভৃতি কৃষ্ণবিরোধী অস্বরূপও ভক্ত ইহা প্রমাণিত হইয়া যায়। তাহাতে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। কারণ কৃষ্ণ যখন কংসের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন চানুর-মুষ্টিকের মল্ল-ক্রীড়ার জগ্গ আহ্বান শ্রবণ করিয়া তাঁহার বীররসের উদয় হইয়াছিল। কোন

বীরের অঙ্গে অশ্রু বীর আঘাত দিলে তাহাতে আহত বীরের সুখ হয়। চান্দ্রমুণ্ডিক যখন কৃষ্ণের অঙ্গে মুষ্টিপ্রহার করিয়াছিল তখন কৃষ্ণের বীরবসানুভব-জনিত সুখ হইয়াছিল। সুতরাং চান্দ্রমুণ্ডিক কৃষ্ণভক্ত। কিন্তু তাহা বলা যায় না। কারণ তাহার কৃষ্ণকে মারিবার জন্তই তাঁহার অঙ্গে আঘাত করিয়াছিল, কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে করে নাই; আবার কৃষ্ণকে সুখী করার নামই ভক্তি—এই কথা বলিলে কোনও প্রকারে কৃষ্ণকে দুঃখ দেওয়া অভক্তি এবং তদ্রূপ দুঃখপ্রদানকারী কৃষ্ণের অভক্ত ইহা প্রমাণিত হয়। কারণ একদা মা যশোদা স্তন্যপানরত কৃষ্ণকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রোড় হইতে নামাইয়া চুল্লীর উপর স্থাপিত দুগ্ধ রক্ষা করিবার জন্ত দোড়াইয়া গেলেন। কৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হইয়া কম্পমান অধর দংশন করিতে করিতে দধিভাণ্ডটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং স্তন্যপানে অতৃপ্ততাহেতু কাঁদিতে লাগিলেন। মা যশোদার স্তন্যপান না করাইয়া দুগ্ধরক্ষার জন্ত গমনরূপ অনুশীলন বা কার্য্যটি কৃষ্ণের আদৌ কচিকর—সুখজনক হয় নাই। সুতরাং এখানে ভক্তির ‘কৃষ্ণানুশীলনম্’ এই লক্ষণের অব্যাপ্তি ঘটে। কারণ যিনি বিশুদ্ধ বাৎসল্য জাতীয় প্রেমভক্তির সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাহার সমগ্র চেষ্টাই কৃষ্ণের জন্ত হইয়া থাকে সেই মা যশোদার—“আমার স্তন্য পান করিয়া কৃষ্ণ রক্ষা পাইবে না, চুল্লীর উপর ঐ দুগ্ধ কৃষ্ণের জীবনস্বরূপ (মা যশোদা রাজরাণী হইয়াও—বহু দাসদাসীপরিবেষ্টিতা হইয়াও কৃষ্ণের জন্ত স্নলক্ষণযুক্তা গাভীর দুগ্ধ স্বয়ং দোহন করিতেন এবং ঐ দুগ্ধ নিজে জ্বাল দিয়া কৃষ্ণের জন্ত প্রস্তুত করিতেন, তাহা হইতে নিজেই মাখন প্রস্তুত করিতেন), সুতরাং সাময়িকভাবে কৃষ্ণকে দুঃখ দিয়াও তাহারই জন্ত দুগ্ধ রক্ষা করিতে হইবে”—ইত্যাদি চিন্তাজনিত যে প্রেমভক্তিবিশেষময় অনুশীলন, তাহা কখনও “অভক্তি” হইতে পারে না। লক্ষণে এই উভয়বিধ দোষ পরিহারের জন্ত “আনুকূল্যেন” এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। “আনুকূল্যেন”—এখানে বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তি। যিনি কৃষ্ণানুশীলন করিবেন, তিনি প্রথমেই আনুকূল হইবেন অর্থাৎ ‘কৃষ্ণকেই সুখ দিব’—এইরূপ ইচ্ছাবিশিষ্ট হইবেন। তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ প্রতিকূলতাশূন্য হইবে। আপাততঃ আনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও সেরূপ অনুশীলন যদি বাস্তবিকপক্ষে প্রতিকূলতাশূন্য না হয়—নিজস্ব-বাস্তবাহিত না হয় তবে তাহা ভক্তি হইবে না। অনুশীলনের মধ্যে অভীষ্টদেবের সুখবাস্তব ব্যতীত যদি নিজের কোন সুখানুসন্ধান থাকে, সেরূপ অনুশীলন অভীষ্টদেবের সাময়িক সুখকর হইলেও তদ্রূপ অনুশীলনকারী ভক্তির ফল যে প্রেম

তাহা লাভ করিতে পারিবেন না। তিনি নিজের বাসনানুরূপ ফলই লাভ করিবেন। জগদগুরু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেবকে বহুব্যক্তি কায়মনোবাক্য ও অর্থাতির দ্বারা তাঁহার মনোহীষ্ট পূরণের সহায়তা করিয়াছেন, শ্রীল গুরুদেবও তাহাদের সেই অনুশীলন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু বহুবর্ষ ঐরূপ সেবা করিয়াও অধুনা কাহারও গুরুত্যাগ করা প্রবৃত্তি, কাহারও বা গুরুভোগ করার প্রবৃত্তি অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মের নিরন্তর ভজনময় ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ না করিয়া কেবল তাঁহার বাহ্য ক্রিয়ার অনুকরণ করিয়া গুরু সাজিবার ধৃষ্টতা দেখা যাইতেছে—ভক্তির আবির্ভাবের প্রথম স্তরটাও তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহারা “শ্রীল গুরুদেব আমার সেবা অঙ্গীকার করিয়া স্থখী হইবেন, তাঁহার স্থখ সম্পাদনই আমার একমাত্র জীবাত্ম” এইরূপ ইচ্ছা লইয়া শ্রীগুরুদেবের সেবা করে নাই, কিন্তু তাঁহার একমাত্র স্থখকামনা ব্যতীত অন্য কামনা লইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে। ফলে সাধুসেবার মুখ্য ফল হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজ নিজ অহীষ্ট বস্তু লাভ করিয়াছে। কারণ উদ্দেশ্য সাধু হইলে ভক্তির আবির্ভাবের ফলে চিত্তে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসমূহ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে, ভক্তিবিরোধী কামনাবাসনা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

এখন “আনুকূল্য” এই বিশেষণকেই ভক্তি বলা যাইতে পারে না, কারণ “অনুশীলনম্” এই বিশেষ্য পদপ্রয়োগ যে নিরর্থক নহে তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রবৃত্তিও যদি প্রতিকূলতাপূর্ণ না হয়, তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে না, আবার অরুচিকর প্রবৃত্তিও যদি প্রতিকূলতাপূর্ণ হয় তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে। সুতরাং কেবল রুচিকর অনুশীলনই ভক্তি নহে, পরন্তু প্রতিকূলতাপূর্ণ কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। আবার অনুশীলন শব্দের চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ অর্থকে প্রকাশ না করিয়া কেবল প্রতিকূলতার অভাবও ভক্তি হইবে না। কারণ ঘটাদি জড় অচেতন বস্তুতেও প্রতিকূলশূণ্যতা আছে, কিন্তু তাহা অচেতন হওয়াতে তাহাতে চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ অনুশীলন নাই। সুতরাং “আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনম্” ইহাই ভক্তির চরম স্বরূপলক্ষণ। “তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং স্বরূপলক্ষণম্।” অর্থাৎ যাহা বস্তু হইতে অভিন্ন থাকিয়া বস্তুকে বুঝাইয়া দেয়, তাহা স্বরূপলক্ষণ; যেমন “আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনম্”—এখানে আনুকূল্যাবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনরূপ অসাধারণ ধর্ম কৃষ্ণভক্তি হইতে অভিন্ন থাকিয়া কৃষ্ণভক্তিকে বুঝাইতেছে, এজন্য ইহা “স্বরূপ-লক্ষণ”।

এখন তটস্থ-লক্ষণ দুইটির বিচার হইতেছে। “তদ্ভিন্নস্বে সতি তদ্বোধকঃ তটস্থ লক্ষণম্ ॥” অর্থাৎ যাহা বস্তু হইতে ভিন্ন থাকিয়া বস্তুকে বুঝায়, তাহাই তটস্থ-লক্ষণ। “অগ্নাভিলাষিতাশূণ্ডা জ্ঞানকর্মাণানাবৃতম্”—এই অংশে অগ্নাভিলাষিতা ও জ্ঞানকর্মাণা উত্তমা ভক্তি হইতে ভিন্ন বস্তু হইয়া উত্তমা ভক্তিকে লক্ষ্য করাইতেছে। এজন্য ইহা তটস্থ-লক্ষণ। অগ্নাভিলাষিতাশূণ্ডা অর্থাৎ ভক্তিভিন্ন স্বর্গস্থ বা দেহস্থ প্রভৃতি অগ্নি কোনও অভিলাষ না রাখিয়া নিরন্তর কৃষ্ণস্থানুসন্ধানতৎপর হইতে হইবে। অগ্নাভিলাষশূণ্ডা না বলিয়া অগ্নাভিলাষিতাশূণ্ডা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কোনও কোনও ভক্তের প্রার্থনার মধ্যে অগ্নাভিলাষের আকার দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অগ্নাভিলাষ পোষণ করার চিত্তবৃত্তি নাই অর্থাৎ অগ্নাভিলাষিতা নাই। যেমন শ্রীযুষ্টিং মহারাজ রাজচক্রবর্তী হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিবার জগ্ন শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাজসূয় যজ্ঞ করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজচক্রবর্তী হওয়ার অভিলাষটী অগ্নাভিলাষের আকারমাত্র, বস্তুতঃ ঐ অভিলাষের মধ্যে অগ্নাভিলাষিতা নাই। কারণ তিনি কৃষ্ণের মত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। নিজে বড় হওয়ার জগ্ন রাজচক্রবর্তী হইয়া আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। অগ্নাভিলাষ শব্দের উত্তর শীলার্থে গিন্ প্রত্যয় করিয়া অগ্নাভিলাষিতা। অন্যভিলাষ পোষণ করার স্বভাব বা প্রবৃত্তিই অন্যভিলাষিতা। আরও কোনও শুদ্ধভক্ত অকস্মাৎ কোনও বিপদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, তাহাও বাহিরে অন্যভিলাষের মত দেখা গেলেও তাহাতে তাঁহার ভক্তির কোন ব্যাঘাত হয় না।

জ্ঞানকর্মাণানাবৃতম্—জ্ঞান ও কর্ম আবৃত করে না এরূপ যে আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি। ‘জ্ঞান’ বলিতে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান, ‘কর্ম’ বলিতে স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম এবং ‘আদি’ পদে ফলবৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত অভ্যাসযোগাদি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ এগুলি সাধকের ভক্তিকে আবরণ করে, কারণ ইহাতে ভগবৎস্বথাত্মপর্য্য আদৌ নাই। ঐ সকল অনুষ্ঠানে সাধকের কিছু বিভূতি প্রভৃতি লাভ হয় এবং সেই বিভূতি ভগবৎস্বথানুসন্ধান স্পৃহার একান্ত পরিপন্থী। এই সব কারণে ভক্তিকে আবৃত করে এমন জ্ঞান বা কর্মানুষ্ঠান নিষেধ করিয়াছেন, তজ্জন্য ‘জ্ঞানকর্মাণানাবৃতম্’ বলিয়াছেন, “জ্ঞান কর্মাদিশূন্য” শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কারণ ভক্তিতে ভজনীয়রূপে অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞান ও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি ভক্তির অন্তর্গত বিশুদ্ধজ্ঞান এবং শ্রীমন্দিরমার্জন-ভোগ-রক্ষণাদি ভগবৎপরিচর্যা কর্মের

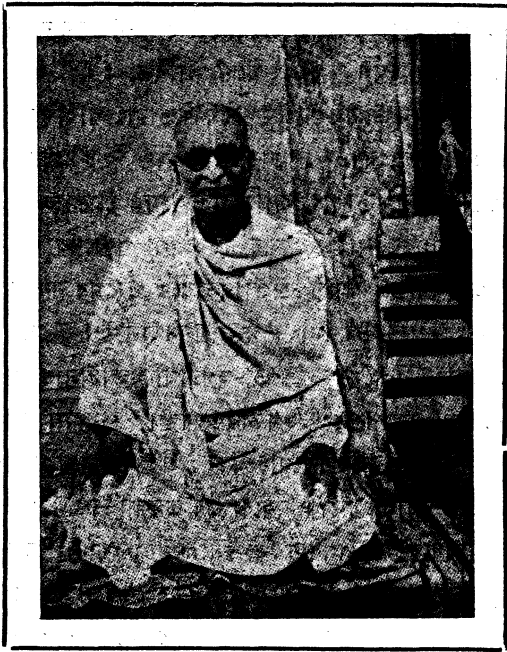
আকার নবধা ভক্তির অন্তর্ভুক্ত কিন্তু কর্ম নহে। জ্ঞান-কর্মাदिশূন্য বলিলে বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান ও ভগবৎপরিচর্যাदिও নিষিদ্ধ হইয়া যাইত। এই জ্ঞান ও কর্ম ভক্তির আবরণ নহে বরং ভক্তির একান্ত অপরিহার্য্য পরিপোষক।

কৃষ্ণানুশীলন বলিতে কৃষ্ণ ও রাম-নৃসিংহাদি তদীয় অবতার সকলের অনুশীলন বুঝিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষ্ণানুশীলন বলিতে যদি সকল অবতারের অনুশীলন বুঝায়, তাহা হইলে গৌড়ীয়গণের মূলগুরুপাদপদ্ম শ্রীল-রূপগোস্বামিপ্রভুকৃত উত্তমা ভক্তির এই চরম নিষ্কৃষ্ট লক্ষণে গৌড়ীয়গণের চরম ভজনের উত্তমভক্তির পরাকাষ্ঠার ইঙ্গিত থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। তাই শ্রীল-রূপগোস্বামিপ্রভুর একান্ত মর্ম্মী অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ শ্রীল-কবিরাজগোস্বামিপ্রভু উক্ত শ্লোকের নিজকৃত অনুবাদ “আনুকূল্যে সর্বোদ্যমে কৃষ্ণানুশীলন” এই বাক্যে “সর্বোদ্যমে” পদটির দ্বারা ভক্তির সর্বোত্তম অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন। সর্বোদ্যমে কৃষ্ণানুশীলন একমাত্র মধুররসে ব্রজগোপীগণের পক্ষেই সম্ভব। বাৎসল্য রসেও সর্বোদ্যমে কৃষ্ণানুশীলনের সর্বোত্তমতা সম্ভব নয়।

শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি এই উত্তমা ভক্তির আকার। এই সাধনভক্তি একমাত্র ভগবৎসুখানুসন্ধানতঃপর হইয়া যাজন করিলে সাধক অনায়াসে শীঘ্র সাধনের ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারেন এবং প্রেমপ্রাপ্তির পর উত্তরোত্তর প্রেমের প্রসারিতাবস্থা লাভ করিতে পারেন। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন;—

ভক্তিযোগো ভগবতি তন্মামগ্রহণাদিভিঃ।

এখানে “ভক্তিযোগো” বলিলেই হয়। “ভগবতি” বলিবার তাৎপর্য্য এই যে নামগ্রহণ-স্মরণাদি ভক্তির যে সব আকার সেইগুলি যখন একমাত্র ভগবৎসুখের জন্ম হয় তখনই তাহা “ভক্তিযোগ” আখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং এই ভক্তিযোগই প্রেম দিতে সমর্থ হয়। ভগবৎসুখ বিধান ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে নাম-গ্রহণাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইলেও তাহাকে ভক্তিযোগ বলা যাইবে না এবং তাহার ফলে প্রেম লাভ হইবে না।



শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাভিনাঃ শ্রীশ্রীপ্রভুপাদাঃ

যদা যদা ধর্মশ্চ গ্লানির্ভবতি, অধর্মঃ ধর্মরূপেণ পরিচীয়তে প্রবলশ্চ ভবতি, তদা শ্রীভগবান্ স্বীয় ধাম্না সহ প্রপঞ্চেহবতরতি, পার্থসারথ্যেঃ অবতারিণঃ স্বয়ং ভগবতঃ এষা প্রতিজ্ঞা (গীতা, ৪।৭-৮)। অধর্মশ্চ অভ্যুত্থানে সতি সাধবঃ উদ্বিজন্তে অসাধবশ্চ প্রভবন্তি। সাধুনাং রক্ষণার্থম্ অসাধুনাং ছুদ্ধতিবিনাশার্থং চ পরম-দয়ালোভগবতঃ ধরাধামনি স্বধাম্না সহ অবতরণম্। এতদুদ্দেশ্য-সাধনায় শ্রীভগবান্ স্বীয় গোলোকধাম্নঃ শ্রীবৃন্দাবনীয়লীলা-পরিকরসহিতঃ শ্রীকৃষ্ণনামগুণ-লীলাঃ প্রকটিতবান্ ভূতলে, তথা শ্রীশ্রীগৌরাক্ষমহাপ্রভুরূপং চ অঙ্গোপাঙ্গান্ন-পার্শ্বদৈঃ সহ তশ্চৈব ধাম্নঃ শ্রীনবদ্বীপপ্রকোষ্ঠং চ মর্ত্যভূমৌ অবতারয়ৎ। যদা ক্ষত্রিয়রাজাঃ বলদৃপ্তাঃ দেবদ্বিজসাধুনাং মর্যাদাম্ উল্লঙ্ঘিতবন্তঃ তদা সাধুজনানাং পরমেম্পিতমাদুর্ধ্যলীলারস-নিষেবন-সৌভাগ্যং প্রাদদাৎ তথা ভূভারহরণলীলাং চ প্রাদর্শয়ৎ। এবমেব যদা ভূয়ঃ শাস্ত্রাভ্যাসবলদৃপ্তা ব্রাহ্মণক্ৰবা ভক্তসাধুজনান্ অবজানন্তি স্ম তেষামনুকরণেন সাধারণজনবর্গশ্চ ভক্তিমাহাত্ম্যং নাপশ্যৎ ঘটপটবিচারণপরান্ এব পণ্ডিত-বুদ্ধ্যা সমাদৃত্য ভক্তাংশ্চ তদবরা অমম্বত,

তদৈব ভক্তেঃ শ্রেষ্ঠত্ব-প্রদর্শনার্থং প্রেমবন্তায়াং পণ্ডিতম্ভ্যাহ্ন নিমজ্জয়িতুং চ শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভোঃ ধাম্মা স্মেন অস্মাকং মধ্যে আবির্ভাবঃ ।

কদা কদা চ ভগবান্ শ্রীগীতায়াঃ উপরিকথিতায়াং পরিস্থিতৌ স্বীয়পার্ষদভক্তান্ এব অবতারয়তি । তে এব ভক্তাবতারাঃ । অস্মাকং গুরুমহারাজঃ **ওঁ বিষ্ণুপাদঃ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদঃ** তেষামেব একতমঃ ।

শ্রীভগবতঃ ভাগবতানাং চ অবতারকালে পূর্বমেব যুগপচ্চ অন্ত্বেহপি ভক্তাবতারাঃ প্রাহুর্ভবন্তি । শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্রাবির্ভাবাৎ প্রাগেব নন্দ-বশোমতী-দেবকী-বহুদেব-প্রমুখানাং পার্শদভক্তানাং মর্ত্যগমনমাসীৎ । তথা শ্রীশ্রীগৌরান্দ-মহাপ্রভোরবতরণাৎ পূর্বমেব শ্রীশচী-জগন্নাথাদ্বৈতাদীনাং পার্শদভক্তানাং চ । লীলাপুণ্ড্যর্থমেবৈতং অগ্রপশ্যাৎ জগত্যবতরণম্ । পুনরপি তথৈব চ শ্রীশ্রীপ্রভু-পাদাৎ পূর্বং শ্রীশ্রীল-ভক্তিবিনোদঠাকুরঃ শ্রীশ্রীমদ্বৈতাকিশোর-দাসগোস্বামি-মহারাজশ্চ জগতীহ আবির্ভূতৌ । সর্ব্বে এব ভক্তাবতারাঃ পার্শদাঃ শ্রীশ্রীমন্নহা-প্রভোঃ প্রাকট্যাবসরে তৎপশ্চাচ্চ শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপাদাঃ যাদৃশঃ ধনি-নির্ধন-পণ্ডিত-মুখ-কুলীনানভিজাতনির্ব্বিশেষেণ সর্ব্বানেব ক্রোড়ীকৃত্য প্রেমবন্তয়া প্লাবিত-বন্তঃ, তথৈব প্রভুপাদাশ্চ ভারতস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেষু স্বয়ং বিজয়েন বহু-দেশ-বিদেশেষু চ যোগ্যশিষ্ট্যপ্রেরণেন চ শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভোঃ তথা তস্ত ভক্তপ্রধানয়োঃ শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথয়োশ্চ কথাঃ প্রচার্য্য শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভোঃ “পৃথিব্যাং যাবন্তঃ নগরাঃ গ্রামাশ্চ বিত্তন্তে তত্র তত্র সর্ব্বত্র মম নাম প্রচার্য্যতাম্”, ইত্যাদেশম্ অপালয়ন্ । অতঃ সুস্পষ্টমেতং পরিলক্ষ্যতে যৎ শ্রীশ্রীপ্রভুপাদাঃ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপাদেভ্যঃ অভিন্নাঃ ।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুঃ পরমকৃপালুঃ দয়ালুনাং শিরোমণিঃ অক্রোধঃ পরমানন্দঃ ইতি খ্যাতঃ । শ্রীলজগদানন্দ-মাধবানন্দনাম্নোঃ ‘জগাই-মাধাই’ ইতি পরিচিতয়োঃ পূর্ব জীবনে অশেষ-পাপকৃত্যোঃ উদ্ধারলীলা অত্র উদাহরণম্ । শ্রীশ্রীপ্রভু-পাদস্তাপি দয়া অনন্তা । পাপশোধনাৎ পরং ভক্তমণ্ডল্যাম্ আশ্রিতেভ্যঃ উচ্চপদবী-প্রদানস্ত দৃষ্টান্তঃ ন বিরলঃ । সাধারণজনানাং চিত্তবিনোদনোপায়েন তেষাং ভক্তিমার্গে আনয়নন্ত তস্ত বৈশিষ্ট্যমেব । সর্ব্বত্র কীর্ত্তনগান-শাস্ত্রপাঠ-বক্তৃতাদিনা তথা বিভিন্নভাষাভিঃ প্রাঞ্জলব্যাক্যাসহিত-প্রামাণিক-গ্রন্থানাং তথা বিভিন্নভাষাভিঃ সাময়িক-পত্রাদীনাং চ প্রকাশনেন জীবহৃদয়ে ভগবদ্ভক্তে-ক্লেশ্বেষার্থমেব ঐকান্তিকী চেষ্টা, তথা পরমার্থ-প্রদর্শনীভিঃ শাস্ত্রশিক্ষণঞ্চ তস্ত যাদৃশান্ বদ্ধজীবান্ প্রতি বিপুলাহৈতুক-কৃপাময়তস্ত প্রভুতানি নিদর্শনানি ।

অতঃ প্রভুপাদস্ত অলৌকিকং দয়ালুত্বং সংস্থ্যত্বা শুদ্ধভক্তজনাঃ তং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-
প্রভোঃ অভিন্নমেব ভাবয়ন্তি ইতি ন বিচিত্রম্ । শ্রীশ্রীপ্রভুপাদঃ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-
প্রভোর্যেব অবতারঃ ইতি সর্বের নিষ্কপট-ভজনপ্রবৃত্তাঃ বৈষ্ণবগণাঃ স্বীয়া-
প্রাকৃতোপলক্ষ্যা স্তুষ্টু জানন্তি । বরাকোহধমোহপ্যাহং এতত্ত্বস্ত্য সমাগ্
হৃদয়ঙ্গমার্থং শ্রীশ্রীপ্রভুপাদস্ত তথা সাধুনাং চ চরণেষু তেষামহৈতুকীং কৃপাং যাচে
দন্তে নিধায় তৃণকম্ । ওঁ হরি ওঁ । ওঁ শান্তিঃ ।

—বৈষ্ণবজনকিঙ্করস্ত্য ভক্ত্যর্থ্যকিঙ্কনস্ত্য

শ্রীহরিপদ দাসস্ত্য বিহারত্নোপাহবস্ত্য

ভগবানের কথা

সেদিন এলাহাবাদ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় বড়ই দুঃখ করিয়া
তাহার সম্পাদকীয় প্রধান শীর্ষে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়াছিলেন । যথা :—

“The national week has begun. The memories of Jallian-
wallah Bagh and political serfdom no longer trouble us. But
our trouble is far from being at end. In the dispensation
of providence mankind cannot have any rest. If one kind
of trouble goes another quickly follows. India, politically
free, is faced with difficulties which are no less serious
than those troubled under a foreign rule…….”

কথাগুলির ভাবার্থ এই যে, “জাতীয় সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের
সেই জালিয়ানওয়ালা-বাগের স্মৃতি, পরাধীনতার কথা আর কষ্ট দেয় না। কিন্তু
আমাদের কষ্টের কিছুই লাঘব হয় নাই। ভগবানের বিধিতে এমনই নিয়ম যে
মানুষ কোনদিনই শান্তিতে থাকিবে না। যদি এক প্রকার দুঃখ অপগত হয়
তাহা হইলে অল্প প্রকার দুঃখ হাজির হয়। ভারতবর্ষ যদিও রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে স্বাধীন
হইয়াছে, তত্রাচ অল্প প্রকার বহুদুঃখের সহিত মুখোমুখী হইয়াছে এবং সেই
দুঃখগুলি তাহার পরাধীন থাকাকাল অবস্থার দুঃখ অপেক্ষা কোন অংশে
কম নয়।”

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আর পরাধীনতার খতিয়ান খুলিয়া দেখিলে আমরা
শাস্ত্রচক্ষুদ্বারা ইহাই দেখিতে পাই যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি

যুগের মোট বয়স ৪৩২০০০০ সৌর বৎসর। তাহার মধ্যে কলিযুগের বয়স ৪৩২০০০ বৎসর। কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে মহারাজ পরীক্ষিতের রাজ্য সময় হইতে অর্থাৎ কিছু বেশী ৫০০০ বৎসর। সেই ৫০০০ বৎসরের মধ্যেই প্রায় ১০০০ বৎসর পরিমাণ অর্থাৎ মহম্মদ ঘোরীর (১০৫০ খৃঃ) সময় হইতেই ভারতবর্ষ পরাধীন হইয়াছে ধরিয়া লইলেও শাস্ত্রীয় হিসাবে ভারতবর্ষের রাজ্যই মহারাজ পরীক্ষিত পর্য্যন্ত প্রায় ৩৭৭২০০০ বৎসর ধরিয়া সমাগরা পৃথিবীর শাসন করিয়া আসিয়াছেন। সে তুলনায় ভারতবর্ষ যে মাত্র ১০০০ বৎসর তথাকথিত পরাধীন ছিল বলিয়া বিশেষ দুঃখ করিবার আছে তাহা আমাদের মনিষীগণ চিন্তা করিতেন না বা করেন না। রাজনৈতিক স্বাধীনতার বা পরাধীনতার কতটুকু মূল্য তাহা ভারতবর্ষের মনিষীগণ জানিতেন এবং ভারতবর্ষের রাজত্ববর্গ মহারাজ পরীক্ষিত পর্য্যন্ত কি কারণে সমাগরা পৃথিবী শাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাহা ২০০ বা ৫০০ বৎসরের জন্ত নহে, পরন্তু লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া, তাহারও কারণ রাজনৈতিক নহে।

ভারতবর্ষের মনিষীগণ জানিতেন আমরা যে ত্রিতাপ যন্ত্রণার মধ্যে আছি তাহা রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা পরাধীনতার দ্বারা অপনোদন করিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পরাধীনতা লইয়া যে মহাভারতের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা তাৎকালিক এবং সেই যুদ্ধ আঠার দিনেই শেষ হইয়াছিল। এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবিক মাতুষের স্থখ দুঃখ কি এবং তাহা অপনোদন কি ভাবে সম্ভবপর হইতে পারে তাহাও যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবদগীতার আলোচনায় সমাধান করা হইয়াছে।

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় দুঃখ করিয়া যে লিখিয়াছেন—একটি দুঃখের পর অপর একটি দুঃখ আসিয়া হাজির হয়—তাহা ঐ গীতাশাস্ত্রে বহুদিন পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। যথা “দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়া তুরতয়া।” ভগবানের যে দৈবীমায়া তাহা স্ব-রজ-তম-রূপা ত্রিগুণময়ী এবং তাহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর ব্যাপার। এই দৈবী মায়াকে আধুনিক ভাষায় nature's law (প্রকৃতির নিয়ম) বলা যাইতে পারে। এবং সেই nature's law (প্রকৃতির নিয়ম) এতই দুর্কর যে তাহা আমরা ধবের কাগজে লেখালেখি করিয়া বা বড় বড় সভাসমিতিতে প্রস্তাবসমূহ পাশ করিয়া কোনদিনই অতিক্রম করিতে পারিব না। সেই দৈবী মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্ত (বা nature's law overcome করিবার জন্ত) আমরা যতই বৈজ্ঞানিক

গবেষণা করি না কেন সেগুলি সবই ঐ দৈবী মায়ায় অধীন তব্ব। এবং সেই জন্তই আমরা জড়বিজ্ঞান বলে দৈবী মায়াকে বশ করিতে গিয়া শিব গড়িতে বান্দর গড়িয়া ফেলি। আমরা বিজ্ঞানবলে জগতের দুঃখ তাড়াইয়া সুখ আনিবার পরিকল্পনায় এখন আণবিক যুগে (Atomic age) উপস্থিত হইয়াছি। আণবিক প্রক্রিয়ায় জগতের যে সর্বনাশ হইতে পারে তাহার ভবিষ্যৎ দেখিয়া পাশ্চাত্য দেশীয় মনিষীগণ চিন্তাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ স্তোক বাক্য দিয়া বলিতেছেন যে, আমরা আণবিক শক্তিকে জগতের সুখের জন্ত ব্যবহার করিব। কিন্তু ইহাও আর একটি দৈবী মায়ায় প্রহেলিকা। দৈবী মায়ায় আবরণাত্মিক এবং বিক্ষেপাত্মিক শক্তিদ্বয়কে অতিক্রম করা আমাদের সাধ্য নহে। যতই আমরা দৈবী মায়াকে নিজেয় কবলিত করিব বলিয়া মহিষাসুরের বিক্রম দেখাইতেছি ততই সেই দৈবী মায়া আমাদের বিপর্যস্ত করিয়া বজ্র গুণের দ্বারা বিচালিত এবং ত্রিতাপ যন্ত্রণাবদ্ধ করিয়া কালসর্পের অধীন করিয়া ফেলিতেছেন। এই প্রকার মহিষাসুরের সহিত দৈবী মায়ায় যুদ্ধ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাই বুঝিতে না পারিয়া আমরা দুঃখ করিতেছি যে “In the dispensation of providence mankind cannot have any rest”—অর্থাৎ ভগবানের বিধিতে এমনই নিয়ম যে মানব কোনও প্রকারে শান্তি পাইতে পারে না।

মহিষাসুরের গণ-সকল দৈবী মায়া কর্তৃক বহুপ্রকারে বিপর্যস্ত হইয়াও বুঝিতে পারে না যে কি ভাবে mankind can have any rest.—(মহুশ্য জাতি শান্তি লাভ করিতে পারে)। “দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়া দুঃখতয়া” এই কথা বলিয়া মহিষাসুরগণকে সাবধান করিয়া তাহার পরের পঙ্ক্তিতেই কি ভাবে ঐ দৈবী মায়ায় হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাহাও বলা আছে। যথা “মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তন্নস্তি তে।” অর্থাৎ যাহারা ভগবানের পাদপদ্মে প্রপত্তি স্বীকার করেন তাহারা এই প্রকার দৈবী মায়ায় কবল হইতে পরিত্রাণ পান।

মহিষাসুর বিত্তা, বুদ্ধি, তপস্তা, ধন, জন, জন্ম, ঐশ্বর্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই যেমন পারজত ছিলেন সেই প্রকার তাহার আধুনিক বংশধরগণও বিত্তা, বুদ্ধি, তপস্তা, ধন, জন ইত্যাদি বিষয়ে অধিকারী বড় কম নহে। তাহাদের দৈবী মায়াকে ভোগ করিবার উপায়-উদ্ভাবনী-শক্তি, বিত্তা, বুদ্ধি ও তপস্তা বড় কম নহে। তাহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া বহু বুদ্ধি, তপস্তা এবং ধন-জনের

অশব্যবহার করে কিছু ফলে বাহা আবিষ্কার করে তাহাতে জগতে সুখের নামে দুঃখের সৃষ্টি করে। ইহাই দৈবীমায়ায় বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির প্রভাব এবং কালসর্পের বিষোদগার। এই সকল দুষ্কার্যের দ্বারা জগতে যে মহা অনিষ্ট সাধিত হয় তদ্বারা ঐ সকল দৈবীমায়া-বিমোহিত বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায় যে মহাপাপ করে তাহার ফলে তাহারা চিরদিনই মূঢ় থাকিয়া যায় এবং সেই মূঢ়তা নিবন্ধন আর ভগবানে প্রপত্তি করিতে পারে না।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপত্তন্তে নরাধমাঃ ।

মায়াপন্থতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ (গীতা—৭।১৫)

অর্থাৎ— দুষ্কার্যপরায়াণ নরাধম বোকা লোকগুণি দৈবীমায়া কর্তৃক হৃতজ্ঞান হইয়া আসুরী ভাবে আশ্রয় করিয়া ভগবানে কখনই প্রপত্তি করে না। এই আসুরী ভাবাবিহীন লোকগুণি কিরূপ তাহা শ্রীভগবদগীতায় এইভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। যথা—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিজুরাসুরাঃ ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যাতে ॥

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহরনীশ্বরম্ ।

অপরম্পরসমুত্তং কিমন্তং কামহেতুকম্ ॥

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাআনোহন্নবুদ্ধয়ঃ ।

প্রভবন্ত্যাগ্রকল্মাশঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥

কামমাশ্রিত্য তুষ্পূরং দন্তমানমদাষিতাঃ ।

মোহাদ্গৃহীত্বাহসদ্গ্ৰাহান্ প্রবর্তন্তেহশুচিচরিতাঃ ॥

চিন্তামপরিমেয়াক প্রলয়াস্তামুপাশ্রিতাঃ ।

কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥

আশপাশশতৈর্বন্ধাঃ কামক্ৰোধপরাস্রবাঃ ।

ঈহন্তে কামভোগার্থমন্তায়ৈনার্ষসঙ্কয়ান্ ॥

ইদমগ্ৰ ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্তশ্চে মনোরথম্ ।

ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্জননম্ ॥

অসৌ ময়া হন্তঃ শত্রুর্হনিষ্ঠো চাপন্নানপি ।

ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিকোহহং বলবান্ অস্বখী ॥

আঢ্যোহভিজনবানপ্যি কোহস্তোহস্তি সদৃশো ময়া ।

বক্ষ্যে দাস্তামি মোদিস্তা ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃত্তাঃ ।
 প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহুচৌ ॥
 আত্মসম্ভাবিতা শুদ্ধা ধনমানমদাশ্রিতাঃ ।
 যজন্তে নামযজ্ঞেষু দন্তেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥
 অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।
 মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহত্মসুরকাঃ ॥
 তানহং দ্বিষতঃ ক্রুবান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
 ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিবুধাঃ ।
 আসুরীং যোনিমাপন্ন্য মৃঢা জন্মনি জন্মনি ।
 মামপ্রাপ্যৈব কোন্তেষু । ততো যাস্ত্যধ্মাং গতিম্ ॥

(গীতা ১৬।৭—২০) (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ দে,

সম্পাদক, ব্যাক্-টু-গড্ হেড্

পতিতের অশ্রু

শ্রুভৃগণ ! করি মোর দুঃখ নিবেদন ।
 বহুত ভাপ্যের ফলে, শ্রীশুক চরণ তলে
 লগ্নেছিহু পরম আশ্রয় ।
 কিন্তু নিজ ভাগ্য দোষে স্বতন্ত্রতা বুদ্ধি বশে
 হারাইহু হেন দয়াময় ॥
 শ্রীগৌর-করণা-শক্তি বিগ্রহ ধরিয়া ।
 কৃষ্ণসেবা দান কৈল রূপাত্ম হৈয়া ॥ ১ ॥
 জগৎ উদ্ধার লাগি কৃষ্ণ-প্রেম বর ।
 অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্বশক্তি ধর ॥ ২ ॥
 কুসিদ্ধান্ত নাশি' লব-সিদ্ধান্ত স্থাপিয়া ।
 শুদ্ধ-কৃষ্ণনাম দেন জগৎ ভরিয়া ॥ ৩ ॥
 অনন্ত বৈভব তাঁর কি বর্ণিতে পারি ।
 মূর্খাধম আমি মাত্র বৃদ্ধা চেষ্টা করি ॥ ৪ ॥

তথাপি প্রভুর গুণে উপজয় লোভ ।
 না বর্ণিলে মনে মোর হয় বড় ক্ষোভ ॥ ৫ ॥
 অখিল গুণের সিন্ধু করুণা অপার ।
 সর্বভূতে দয়াময় রূপার আধার ॥ ৬ ॥
 নিরন্তর কৃষ্ণনাম করি উচ্চারণ ।
 আশ্রিতেরে উপদেশ দেন সর্বক্ষণ ॥ ৭ ॥
 শ্রীগৌরান্ধ-মনোভীষ্ট স্থাপিয়া জগতে ।
 ডুবাইল ভক্তে ভক্তি-বিনোদ-ধারাতে ॥ ৮ ॥
 পারিষদগণ তাঁর সবে শক্তিমন্ত ।
 সর্বতত্ত্ববেত্তাগণ পরম মহান্ত ॥ ৯ ॥
 ব্রহ্মাণ্ড তারণ-শক্তি লভিয়া সকলে ।
 দেশে দেশে কৃষ্ণনাম দেন কুতূহলে ॥ ১০ ॥
 নানাস্থানে মঠাদি করি' বিগ্রহ পূজন ।
 শিখাইলে জগতেরে সেবা সর্বোত্তম ॥ ১১ ॥
 ধাম-পরিক্রমা আদি করিয়া ষতনে ।
 আকর্ষণ করেন সদা মো অধম জনে ॥ ১২ ॥
 তীর্থে তীর্থে করি' উজ্জ-ব্রত উদযাপন ।
 স্কন্ধুতি করান জীবের উদ্ধার কারণ ॥ ১৩ ॥
 নিতান্ত দুর্ভাগা আমি বড় দুরাচার ।
 আমা সম মহা পাপী খুঁজে পাওয়া ভার ॥ ১৪ ॥
 নিজকর্ম-দোষে সদা থাকি কুসঙ্কেতে
 কুকার্যে উৎসাহী, মজে' আছি বিষয়েতে ॥ ১৫ ॥
 মহাসৌভাগ্যের ফলে পেয়েছিছু সঙ্গ ।
 অসতৃষ্ণায় মত্ত হই, সব হৈল ভঙ্গ ॥ ১৬ ॥
 হরিনাম, হরিকথা, সেবায় বঞ্চিত ।
 নিরন্তর গ্রাম্য বাক্যে থাকি হরষিত ॥ ১৭ ॥
 দেখিয়া দুর্গতি মোর সন্ন্যাসীর গণ ।
 রূপা করি পাদপদ্মে করে আকর্ষণ ॥ ১৮ ॥
 দ্বারকাদি ধাম পরিক্রমণের কালে ।
 সঙ্গে করি' লইলেন মোরে রূপাবলে ॥ ১৯ ॥

(তাঁহে) নানা অপরাধ কৈলু কেশব চরণে ।

দাস বলি; ক্ষমা যেন কর নিজ গুণে ॥ ২০ ॥

কেহ বা কল্পণা করি-দেন উপদেশ ।

যাতে মোর খণ্ডে দুঃখ অস্ত্র হয় ক্লেশ ॥ ২১ ॥

কি মোর দুঃখের কথা কি বলিব আর ।

কোটা কোটা জন্মে মোর নাহিক নিস্তার ॥ ২২ ॥

এই কৃপা কর মোরে শ্রীপ্রভুর গণ ।

অস্তিমতে পাই যেন শ্রীগুরু-চরণ ॥ ২৩ ॥

বৈষ্ণবের কৃপা হ'লে গুরুকৃপা হয় ।

গুরু কৃপা কৈলে কৃষ্ণ-কৃপা স্থনিশ্চয় ॥ ২৪ ॥

দীনহীন কৃপাপ্রার্থী—

শ্রীমোহিনী মোহন দাসদিকারী (রাম),

নারায়ণ,

পোঃ মদনমোহন চক, মেদিনীপুর ।

আমার প্রভু কে ?

আমার প্রভু কে?— এই কথা জানিবার সৌভাগ্যভাবে জগতে মরু জঙ্গাল সৃষ্টি হইয়াছে । কনক-কামিনী-লাভ-পূজা ও প্রতিষ্ঠাদির কাকাল, অনাদি অবিজ্ঞানানুগত অনিত্য সাজা-প্রভুগণ নিজেদের অপস্বার্থ সিদ্ধির জন্ত, কলি-কলুষ-সমস্ত জীবগণের নিকট ধর্ম্মের কাচ কাটিয়া, তাহাদিগকে এই সংসার দাবানল হইতে উদ্ধার করিব বলিয়া, ছোতা পাখীর ছায় শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি শ্লোক আওড়াইতে থাকেন । ফলে ঐ বাক্যজালে পতিত ও মোহিত হইয়া স্বকৃতিহীন দুর্গত জীবগণ উক্ত সাজা-প্রভুগণের পদাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ভৃত্য স্বীকার ও বহুভাবে সেবা করিতে থাকে ।

দদাতি প্রতিগৃহাতি গুহমাখ্যাতি পৃচ্ছতি ।

ভুংক্তে ভোজয়তে চৈব বড়্ বিধং শ্রীতি-লক্ষণম্ ॥

(শ্রীরূপপাদের উপদেশামৃত)

শ্রীতিপূর্ব্বক ভক্তের প্রয়োজনীয় জব্য ভক্তকে দেওয়া, ভক্তদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ করা, স্বীয় গুপ্ত কথ্য ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা, ভক্তের গুপ্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করা,

ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা এবং ভক্তকে শ্রীতিপূর্বক ভোজন করান এই ছয়টি সংশ্রীতি বা সংসঙ্গের লক্ষণ।

উক্ত ছয়টি ব্যাপার অসং সংসর্গে প্রযুক্ত হইলে আত্মমঙ্গল হওয়া ত' দূরের কথা, উত্তরোত্তর নরকের দিকে অধোগতি হইয়া থাকে। 'আমার প্রভু কে?'—ইহার প্রকৃত অনুসন্ধানের অভাবে এইরূপ ফল হইয়া থাকে।

আমার প্রভু কে?—এ বিষয় জানিবার মত সৌভাগ্য আমাদের হয় না, যদি প্রভু রূপা করিয়া নিজেকে নিজে না জানান। প্রভু যখন অহৈতুকী রূপা বশতঃ ভৃত্যগণকে সেবাধিকার প্রদান করেন এবং যখন ভৃত্য প্রভু-রূপায় উদ্ভাসিত হইয়া তৎসেবা লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন, তখনই প্রভু-ভৃত্যের স্বর্গ পরিচয়ের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। প্রভু বস্তুটী পূর্বোক্ত সাজা-প্রভুগণের শ্রায় অনিত্য বস্তু নন। তিনি নিত্য সেবা-বিগ্রহ, করুণাময় পতিত-পাবন। আমাদের শ্রায় পতিত ভৃত্যগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই তাঁহার আচার্য্য-লীলা স্বীকার। সূর্য্য উদিত না হইলে বা সূর্য্য-কিরণ আমাদের চক্ষু-গোলকের মধ্যে আসিয়া পতিত না হইলে যেমন আমরা সূর্য্যের বিষয় অবগত হইতে পারি না—সূর্য্যের পরিচয় পাইনা, সেইরূপ স্বতঃপ্রকাশ প্রভু-বস্তুর রূপাপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রভু-রূপালোক ব্যতীত আমরা কখনও প্রভুর পরিচয় পাইতে পারি না। যখন প্রভুর রূপালোক ব্যতীত আমরা তাঁহার পরিচয় পাইতে পারি না, যখন প্রভুর রূপাই প্রভুকে জানিবার একমাত্র উপায়, তখন আমার শ্রায় রূপাবক্ষিত অযোগ্য পতিত রূপা-লাভাশা-পোষণকারী নরাধমের পক্ষে এই প্রশ্নের সমাধান করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব ও বামন হইয়া চাঁদ ধরার চেষ্টার শ্রায় তাহা বোধহয় স্বধীবর্গ সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। তবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মূক আমি উক্ত প্রশ্নের কিছু দিগদর্শন করিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র। এ বিষয়ে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব চরণে আমি ক্ষমা ভিক্ষা পূর্বক রূপা প্রার্থনা করিতেছি। আমার নিত্য-বান্ধব প্রভুপ্রিয় বৈষ্ণবগণের আশুগতো যখন শ্রীচৈতন্য ভাগবত আলোচনা করি, তখন দেখিতে পাই যে আমাদের পূর্বগুরু অভিন্ন ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে লিখিয়াছেন,—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।

এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি শ্রীগুরু ॥

(চৈতন্যভাঃ আঃ ১৭।১৩৩)

অতএব 'আমার প্রভু কে?'— এই প্রশ্নের উত্তর—আমার প্রভু তিনি যাঁহার প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভু অর্থাৎ যিনি সর্বক্ষণ গৌরসুন্দরের সেবায় ব্যস্ত—তাঁহার মনোভীষ্ট বাণী প্রচারে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। এক কথায় ভুবন মোহন সর্বৈশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্ত্য মহাপ্রভু যাঁহার সেবায় মুগ্ধ ও বশীভূত, যিনি শ্রীচৈতন্ত্য মহাপ্রভুর সবচেয়ে বেশী প্রিয়, মহাপ্রভুর নিত্য পার্শ্বদ, নিত্য সঙ্গী, লীলার সাথী বা প্রাণের প্রাণস্বরূপ। জগৎ-জন-মন বা সর্বজন-মন মোহিত করিতে পারেন একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র এবং সেই ভুবন-মোহন কৃষ্ণকেও মোহিত করিতে পারেন যিনি অর্থাৎ যাঁহার সেবা-সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া কৃষ্ণ নিজেই নিজে দিয়াও যাঁহার 'ঋণ শোধ করিতে পারিলাম না' এরূপ বলিয়া মনে করেন, তিনিই আমার প্রভু। আমার প্রভু যাঁহার, সেই শ্রীচৈতন্ত্য মহাপ্রভুই আমাকে আমার প্রভুর সন্ধান দিতে পারেন বা প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইতে পারেন। এ সামর্থ্য মহাপ্রভু বা প্রভুপ্রেষ্ঠ সেবকগণ ব্যতীত অপর কাহারও নাই, এমন কি মনুষ্য, দেবতারও নাই। তাই আজ আমি উপায়বিহীন হইয়া শ্রীগৌরহরি ও গৌরভক্তগণের রূপা-বল লাভের ধৃষ্টতা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি এবং পুনঃ পুনঃ আমার সহস্র অপরাধের জ্ঞান ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

জগতের লোক যে যাহা বলে বলুক, তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। তাহারা যখন আমার প্রভুকে জানেন না, তখন সেই মুখর জগৎ আমার প্রভুকে মানুষ্য বলিতে পারে, বন্ধু, পুত্র, ভ্রাতা, সহাধ্যায়ী, ছাত্র, শিক্ষক প্রভৃতি আখ্যা দিতে পারে বা যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারে। যখন কৃষ্ণ কংশ-সুভায় আসিয়াছিলেন তখন কংশ তাঁহাকে মৃত্যুস্বরূপ, মল্লস্বরূপ দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ভোগ্য দৃষ্টিতে প্রতীয়মান বস্তুটা নন্দের নন্দন, যশোদার বাছাধন গোপীগণের প্রাণনাথ, শ্রীদামের সখা বা শ্রীরাধার কৃষ্ণ নহেন।

সুতরাং আমার প্রভুকে যে যাহা বলে বলুক, আমি কিন্তু প্রভু রূপায় প্রভু-রূপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবগণের নিকট শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি যে কাহারও পতি, কাহারও বন্ধু, কাহারও পিতা, কাহারও ভ্রাতা আমার প্রভু নহেন; আমার প্রভু জগতের প্রভু। কেবল পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষলতাদি তৃণ গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু, মনুষ্য কেন, সমস্ত দেবতাগণেরও প্রভু তিনি। তাই এই কথা আলোচনা করিতে গিয়া মনে পড়ে আমাদের পূর্ব গুরু গৌরগত-প্রাণ আমার প্রভুর নিত্যসঙ্গী শ্রীল রঘুনাথ দাম্ গোস্বামী প্রভুর কথা—

অনাদি: শ্রীদেবী পটুরতিমুহুরী প্রতিপদ-

প্রমীলং কারিণাং প্রপঞ্চকরণাহীন ইতি বা।

মহাবৈকুণ্ঠেশাধিক ইহ নরো বা ব্রজপতে
বয়ং স্নুর্গোষ্ঠে প্রতিজ্ঞনি মমাস্ত্যং প্রভুবরঃ ॥

(স্বনিয়মদশকম্, ৫ম শ্লোক)

অনাদি, কারণরহিত, সর্বাবতারী স্বয়ং ভগবানই হউন, অথবা সাদি অর্থাৎ কারণযুক্ত অবতারই হউন, সর্ববিষয়ে নিপুণই হউন অথবা অনিপুণই হউন, প্রতিক্ষণ প্রকাশমান করুণাশালীই হউন, অথবা প্রকৃষ্ট গুণহেতুক করুণারহিতই হউন, আমার এই সমস্ত বিচারের আবশ্যকতা নাই, পরন্তু পরব্যোমাধিপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই নররূপী ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই এই ব্রজধামে প্রতিজ্ঞময় আমার আরাধ্য প্রভুরূপে প্রকাশিত হউন।

মুখর জগতের মুখে হাত দেওয়া যাইবে না। তাহারা এ দীনহীনের কথা শুনিবে না। ভগবদাস আমাকে যখন তাহারা কেহ পিতা, কেহ পুত্র, কেহ ভ্রাতা, কেহ সখা প্রভৃতি বলিয়া নিজেরা গৌরব অনুভব করিতে চাহে, তখন সর্বগুণের একমাত্র নিলয় সর্বোত্তম সর্বপূজ্য আমার প্রভুকে কেহ পিতা, কেহ ভ্রাতা, কেহ বন্ধু প্রভৃতি বলিয়া যে নিজেরা গৌরবাসিত হইতে চাহিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু গুরুর উচ্ছৃঙ্খলভাজী কুকুর হইতে অভিলাষী আমি তাহাদের ঐ সকল বাজে কথা শুনিতে প্রস্তুত নহি, তাই তাহাদিগকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া তক্ষণ থাকিতে চাই। যিনি আমাকে দিব্য জ্ঞানালোক প্রদান করিয়াছেন এবং পূর্ণ দিব্যালোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছেন এবং স্নেহা লাভের স্তবর্ণ স্বেযোগ দিতেছেন, আমার জ্ঞায় অযোগ্য পতিতাদমকে যোগ্য করিবার জন্ত যিনি অঘাচিত রূপা করিয়া নরকের দ্বারস্বরূপ স্থূল সংসার হইতে—সংসার জালরূপ বা হরিবিমুখতারূপ ফাঁসিকাঠ হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি আমার জন্মে জন্মে প্রভু। আমি যেন নিত্যকাল কাহারও কথা না শুনিয়া সেই হৃদয় দেবতাকে প্রভু বলিয়া বরণ করিতে পারি। নিত্যকাল তাহার কুকুর হইয়া—উচ্ছৃঙ্খলভাজী দাস হইয়া থাকিতে পারি। হতভাগ্য আমি, প্রভু-রূপালাভে বঞ্চিত আমি তাই আজ প্রভু-রূপাপ্রাপ্ত রৈক্ষ্যবর্ণের নিকট রূপা ভিক্ষা করিতেছি এবং যাহাতে মহাজনসম্মুখভোগে নিম্নলিখিত শাস্ত্রোক্ত শ্লোকটী গাহিতে পারি তজ্জন্ত বল প্রার্থনা করিতেছি।

পরিবদতু জনো যথা তথা বা

নমু মুখরো ন বয়ং বিচারমামঃ।

হরি-রস মদিরা-মদ্যতিমস্তা

ভুবি বিলুণ্ঠামো নটামো নিক্ষিপামঃ ॥

প্রভুর কথা বলিবার ইচ্ছা বহুদিন হইতেই আমি হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। জানিনা, কবে প্রভু আমার হ্রায় অযোগ্যকে তাঁহার স্বরূপ জানাইয়া এবং কৃপা-পূর্ব্বক সেবাধিকার প্রদান করিয়া তাঁহার অনন্ত গুণের কোট্যাংশের এক অংশও বর্ণনা করিবার সৌভাগ্য দিবেন। প্রভু-গুণগান এবং প্রভু-সেবকগণের গুণগান করিবার সৌভাগ্য লাভের আশা করিয়া নরাধম আমি আজ বিদায় লইতেছি।

বাঙ্গাকল্পতরুভাষ্যে কৃপাসিন্ধুভ্যে এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ নমঃ ॥

—শ্রীদীনাত্তিহর ব্রহ্মচারী

সহঃ সম্পাদক

সনাতন ধর্ম্ম

আমরা ভারতবাসী, সাধারণতঃ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া জগতে পরিচয় দিয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের অধিকাংশই সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। সনাতন শব্দের প্রকৃত অর্থটীও আমরা অনুধাবন করি না। কেবলমাত্র গতানুগতিকভাবে রুতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠানের অনুবর্তন করিয়াই আমরা সনাতনী বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করি।

সনাতন শব্দের অভিজ্ঞান লাভ করিলে অসনাতন শব্দেরও অভিজ্ঞান লাভ করা যায়। যাহা সনাতন তাহা কভু অসনাতন নহে এবং অসনাতন যাহা তাহাও কভু সনাতন নহে। যাহা নিত্যস্থিতিশীল, অপরিবর্তনীয় ও অবিনাশী তাহাকে সনাতন বলা হয়। ইহার বিপরীত যাহা তাহাই অসনাতন। সুতরাং কেবলমাত্র সনাতন বস্তুর ধর্ম্ম বা স্বভাবকে সনাতন ধর্ম্ম বলা হয়, অসনাতন বস্তুর ধর্ম্ম কখনও সনাতন ধর্ম্ম নহে।

আত্মা এবং আত্মার বাহ্যাবরণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দেহদ্বয় এক জাতীয় বস্তু নহে। আত্মা চেতন ও সনাতন। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দেহদ্বয় অচেতন ও অসনাতন। শরীর পরিবর্তিত হইলে আত্মা পরিবর্তিত হয় না। শরীর ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে আত্মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আত্মাকেই সনাতন বলিয়াছেন।
যথা—

“ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্মায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥”

(গীতা—২।২০, ২২৩-২৪)

অর্থাৎ জীবাত্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্তমান ; তাহার জন্ম-মৃত্যু নাই অথবা তাঁহার পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি কি বৃদ্ধি প্রভৃতি নাই । তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন ; জন্মমরণশীল শরীরের বিয়োগে তিনি হত হন না । তিনি অস্ত্রশস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে ক্লেদিত হন না এবং বায়ু দ্বারাও শুষ্ক হন না । এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য ; ইনি নিত্য, সর্বগত অর্থাৎ সর্বযোনিভ্রমী, স্থাগু ও অচল ; ইনি সনাতন অর্থাৎ সদা বিद्यমান ।

স্থূল ও সূক্ষ্মদেহদ্বয়কে গীতা অপরা অর্থাৎ জড়াশক্তিসম্ভূত বলিয়াছেন—

“ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

অপরেয়মিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্ষ্যতে জগৎ ॥

(গীঃ ৭.৪-৫)

অর্থাৎশ্রীভগবানের যে নিত্য-স্বরূপ তাহাতে তাঁহার শক্তির দুই প্রকার পরিচয় আছে ; শক্তির একটি পরিচয়ের নাম—বহিরঙ্গ বা মায়াশক্তি, তাঁহাকে ‘অপরা শক্তি’ও বলা যায় । ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অপরা শক্তি-জাত । এতদ্ব্যতীত তাঁহার একটি ‘তটস্থা-প্রকৃতি’ আছে, যাহাকে ‘পরা-প্রকৃতি’ বলা যায় । সেই প্রকৃতি—চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা ; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে ।

সুতরাং স্থূলদেহ পঞ্চভূতনির্মিত এবং সূক্ষ্মদেহ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-সম্ভূত হওয়ায় ইহার পরিবর্তনশীল ; নিত্য নহে । এই অনিত্য শরীরকে উদ্দেশ্য করিয়া যে ধর্ম বিহিত হয় তাহা অনিত্য বা অস্নাতন । পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন, দেশবাসী প্রভৃতির প্রতি কর্তব্য এই শরীরকে উদ্দেশ্য করিয়াই জাত হয় । আমাদের শরীর ইহাদের সহায়তায় রক্ষিত এবং বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া

আমরা কৃতজ্ঞতাসূত্রে ইহাদের প্রীতি বিধান করিয়া থাকি। দেবতাগণ বায়ু, জল, রৌদ্র, বৃষ্টি এবং নানাপ্রকার শরীর রক্ষণীয় বস্তু প্রদান করেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকি। তাঁহারা আমাদিগকে জাগতিক বস্তু প্রদান করতঃ আমাদের শারীরিক ও মানসিক সুখ বিধান করেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের আরাধনা করি। সুতরাং এ সমস্ত দৈহিক অনিত্য ধর্ম। আমরা নানাপ্রকার দেবদেবী প্রভৃতির পূজা করিয়া সনাতন ধর্ম পালন করিতেছি মনে করিয়া থাকি, কিন্তু ইহার দ্বারা অসনাতন দেহেরই অনুশীলন হওয়া হেতু ইহা প্রকৃত সনাতন ধর্ম নহে।

“কামৈশ্চৈশ্চৈত্বজ্ঞানাঃ প্রপদন্তেহুদেবতাঃ।

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥”

(গী: ৭/২০)

কৃতজ্ঞান অর্থাৎ যখন আমাদের চিন্তে ভোগবাসনা প্রাবল্য লাভ করে তখন আমরা আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া পড়ি। সুতরাং আত্মধর্ম যে নিষ্কাম বিষ্ণুসেবা তাহাও সঙ্কে সঙ্কে বিস্মৃত হই। তখনস্থল সূক্ষ্মদেহের কামনামূলে সেই সেই কামনা পরিপূরণকারী আধিকারিক দেবতার উপাসনা করি। ইহা স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের আরাধনা হইয়া যাওয়ায় ইহা অসনাতন ধর্ম, প্রকৃত সনাতন ধর্ম বা আত্মধর্ম নহে।

কিন্তু কামনাশূন্য বিষ্ণুসেবা অর্থাৎ একমাত্র বিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যেই বিষ্ণুসেবা সনাতন ধর্ম। বিষ্ণু পরিপূর্ণ চেতন বস্তু এবং আত্মা তাঁহাবই ক্ষুদ্র অংশ। যথা—

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীরভূতঃ সনাতনঃ।”

(গী: ১৫.৭)

অর্থাৎ জীবসকল আমারই অংশ (বিভিন্নাংশ) ও নিত্য।

বিষ্ণু শক্তিমান, জীবাত্মা তাঁহারই শক্তি। পূর্বোক্ত “অপরেয়মিতস্ত্বাত্মাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্”—এই গীতাবাক্য হইতে তাহা আমরা পাইয়াছি। শক্তি সর্বদাই শক্তিমানের অধীন। শক্তিমান্ বাহা ইচ্ছা করেন শক্তি তাহা সম্পাদন করিয়া শক্তিমান্কেই আনন্দ দিয়া থাকেন। এই কার্য্য করিয়া শক্তি শক্তিমানের নিকট হইতে কোনপ্রকার বিনিময় প্রত্যাশা করেন না। সুতরাং এই শক্তিশূলীয় চেতন জীবাত্মার বা সনাতন জীবাত্মার যে বিষ্ণুসেবা, তাহাতে বিষ্ণুসেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কামনা বা অন্ত্যভিলাষ থাকিতে পারে না।

এইরূপ অন্তাভিলাষিতাশূন্য ভগবদ্ভক্তিই সনাতন ধর্ম। শ্রীভাগবত বলেন—

“স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্প্রসীদতি ॥”

(ভাঃ ১।২।১)

অর্থাৎ যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভিসম্ভান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যকরূপে প্রসন্নতা লাভ করে।

—শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী

সহঃ সম্পাদক

বোস সাহেবের পত্র ও প্রশ্ন

পাঠক মহোদয়গণের মনে থাকিতে পারে শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার প্রথম সংখ্যার ৩৩ পৃষ্ঠায় মাননীয় শ্রীযুত জিতেন্দ্র নায়ায়ণ বসু (Mr. J. N. Bose, B. E., C. E., AMIE (IND), Chief Engineer, B. D. R. Ry., Bankura) মহাশয়ের সেবা সম্বন্ধে কিছু লেখা হইয়াছিল। তাহার উত্তরে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক মহারাজের নিকট তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত নিম্নে মুদ্রিত হইল। বোস সাহেব পূজ্যপাদ নিয়ামক মহারাজের সহপাঠী ও বাল্য-বন্ধু। তিনি Milton এর “Paradise Lost” এর অমৃতাক্ষর ছন্দে অনুবাদ করিয়া “স্বর্গ-বিহীন” নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ লেখেন। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ আদৃত হয়। তিনি বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। পত্রিকার নিয়ামক মহারাজের পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার সম্পাদনায় “প্রস্থান” নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। জিতেন বাবু তাহাতে বহু প্রবন্ধাদি লিখিয়া তাঁহার প্রচুর সহায়তা করিতেন। বর্তমানেও তাঁহার প্রশ্নগুলি পূর্বের বাল্যজীবনের ছায়া শ্রীগৌড়ীয়ের সহায়তা করিবে। আমরা আগামী সংখ্যা হইতে তাঁহার প্রশ্নগুলির উত্তরমুখে কিছু কিছু আলোচনা আরম্ভ করিবার আশা রাখি।

Bankura,

Dated 31. 3. 49.

শ্রীচরণেষু—

প্রণতি ও সাদরসম্ভাষণান্তে বিনীত নিবেদন— ভাই! তুমি আজ স্তমহান। তোমার সঙ্গে আমার যে বহু পুরাতন সখ্যসুত্রবন্ধন আছে তাহার অবলম্বনেই তোমার উপর হৃদয়তার দাবী জানাইয়া আজ এই পত্রখানি লিখিতেছি। জানি যে সন্ন্যাসীদের বৈষয়িক কালহুঁষ্ট স্বৃতির তর্পণ নিষিদ্ধ, কিন্তু সেই স্বৃতির দ্বার রুদ্ধ করিলেও তাহার জীর্ণবস্থায় সামান্য করাঘাতেই খুলিয়া যাইবে এবং স্বতিগৃহের পূর্ণ এবং আনন্দময় শুভ দিনগুলির আলেখ্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। তাই আশা করি যে যৎসামান্য অজ্ঞ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ৬' এক কথা লিখিলে ক্ষমা পাইব। কিন্তু সম্পূর্ণ দাবী রহিল যে দর্শনমাত্রেই এ পামণ্ডের কেশাকর্ষণ পূর্বক উত্তম মধ্যম দিতে পারিবে। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীশ্রীমদ্বক্তা প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের চরণে শতকোটি প্রণিপাত রহিল।

পত্রিকার নাম *

অনেক দিন পূর্বে শ্রীশ্রীগৌরভক্ত আমার অগ্রজের নিকট হইতে মাঝে মাঝে “সজ্জনতোষণী” পত্রিকাটি পাঠ করিতাম। কিন্তু অসজ্জন বলিয়া এ জ্বরদস্ত অধিকারে সন্দেহ জাগিত। ভাবিতাম যে ধর্ম-প্রচারক পুস্তিকায় যদি শুধু সজ্জনেরই অধিকার বর্তায় তবে পাপী-তাপীদের উপায় নাই। এবার তোমার পত্রিকার স্বচিস্তিত নামে মুগ্ধ হইয়াছি। “গৌড়ীয় পত্রিকায়” শুধু শ্রীগৌড়েশ্বর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ও তদীয় ভক্তগণের বিষয়ই লিপিবদ্ধ থাকিবে। ইহা সর্বগ্রাহ্য এবং বেদবর্ণিত বৈষ্ণবের সহজ কর্তব্য। কিন্তু ইহার ব্যত্যয় হইয়াছে এই পত্রিকার ১ম সংখ্যার ৩৩ পৃষ্ঠার “ধাকুড়ায়” এই শিরোনামায়। এই অকিঞ্চন প্রথমতঃ শ্রীগৌর ও গৌড়ীয়-প্রসাদ-বর্জিত ভক্তিহীন, তাহার নাম উল্লিখিত হওয়া অশোভন হইয়াছে। তারপর ধনুবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি বৈষয়িক শব্দ বিত্যাগে ‘প্রচার প্রসঙ্গকে’ অপ্রাসঙ্গিক করিয়া ফেলিয়াছে।

অতি অল্প সেবাতেই পরিতুষ্ট হওয়া বৈষ্ণবের মহান উদারতা। কিন্তু এই পরিতুষ্টির অভিব্যক্তি বেদতত্ত্ব-পত্রিকার অঙ্গ লাঙ্ঘিত করিয়াছে। প্রার্থনা করি পরবর্তী সংখ্যায় ভুল সংশোধন করাইবে।

*পত্রলেখকের দৈন্ত বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রকৃতই “বিত্যাগ দদাতি বিনয়ং” এই নীতিবাক্যের আদর্শ তাঁহাতে প্রস্ফুটিত।

কয়েকটি প্রশ্ন

আমার সংশয়-প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিয়া দিলে আনন্দিত হইব। তুমি আমার মহা গর্বের বস্তু। তাই বিশ্বাস আছে যে বাচালতা মনে করিয়া প্রশ্ন সম্পর্কে নিরুত্তর থাকিবে না।

১। মানবজাতি সহজাত বৈষ্ণব। যদি কেহ শ্রষ্টার অনভিপ্সিত কর্মে রত হয় তবে সে অবৈষ্ণব এবং অসুর আখ্যা পায়। কিন্তু বৈষ্ণবগ্রন্থে “শুদ্ধ বৈষ্ণব” কথার তাৎপর্য কি? অশুদ্ধ বৈষ্ণব অর্থাৎ অবৈষ্ণবকেও কি বৈষ্ণব বলা হ’বে? এই মধ্যপন্থী ভাষা কেন?

২। আবার “পর্য ভক্তি”, “অপর্য ভক্তি”, “হৈতুকী ভক্তি”, “অহৈতুকী ভক্তি”র উল্লেখ দেখা যায়। ভক্তির আবার প্রকার ভেদ কেন? শ্রীভগবানকে সম্পূর্ণ আত্মদান যদি ভক্তি হয় তবে অপরদিকে ভক্তিহীন ছাড়া কি হইতে পারে? স্ত্রবিধাবাদীর ভক্তিকে ভক্তি আখ্যা কেন দেওয়া হয়? ভক্ত এবং অভক্ত বা ভক্তিহীন এই দুইএর মধ্যে আবার গুণগোল কেন?

আমার মত পতিতাদ্বৈতের মনে হয় যেন এই সব শব্দদ্বারা অতি সূক্ষ্ম বিচার করিতে গিয়া বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে একটা রফা নিষ্পত্তি করার চেষ্টা হইয়াছে। অবৈষ্ণবদের একদম দলছাড়া করার বা তাহাদের রাগান্বিত করার একটা ভয় নিহিত আছে। ধর্মমার্গেও যে সাম্প্রদায়িক দল গঠনের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রহিয়াছে। বজ্র-কঠিন সত্যশ্রয়ীদের এ কেমন সৌজন্ম? এই কারণেই বোধ হয় সরল সহজ বিষ্ণুতত্ত্ব ও সম্বন্ধজ্ঞানকে জটিল করিয়া তোলা হইয়াছে। “নান্নঃ পশ্চৎ বিদ্যতে অয়নায়” উপনিষৎ-বাক্যের স্বার্থকতা কোথায় রহিল? সম্প্রদায়-দোষদুষ্ট সমস্তাপূর্ণ ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ এ কেমন বিচার করিয়াছেন?

ধর্ম—সনাতন, কিন্তু যাহাদের আশ্রয় করিয়া ধর্ম পরিস্ফুট ও সত্যজ্যোতিতে আলোকিত তাহাদের মন ও মনীষা অনিত্য এবং যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। সেইজন্য নিয়ামকগণ কি বজ্রকঠিন ভাষায় ত্রিগুণাতীত একই পন্থার সরল নির্দেশ দিতে পারেন না? বাধা কোথায়? তাঁহারাও কি রাজনীতিবিদগণের মত ভোটাধিকারে বঞ্চিত হইবার ভয় রাখেন? সত্যাসত্যের মাঝে ধাপের সংযোগ থাকিলে সত্যের নিয়োগমনের খুব সম্ভাবনা।

৩। বর্ণাশ্রম কি এযুগেও শুধু গৃহীর পক্ষেই প্রযোজ্য? শুদ্ধ-বৈষ্ণব ও গৃহী-বৈষ্ণবের ভেদনীতি কোন সূত্রে কি বিদূরিত করা যায় না? শুদ্ধ-বৈষ্ণব কি যজ্ঞ, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ইত্যাদি করেন না? আবার তাঁহারা

কি রাজ্য-শাসন করিতে পারেন না ? তাঁহারা ধর্ম্মাধিকরণের সাহায্য গ্রহণ ও জমীদারী রক্ষা এবং তাহার আয় দ্বারা লোকসেবা প্রভৃতি করেন না কি ? তাঁহারা চাষ, গোরক্ষা কি করেন না ? করিলে কি তাঁহারা অপরাধ করিবেন ? সর্ব্ব রকমের লোকের সেবা ও তুষ্টিবিধানও তাঁহারাই করেন। তাই তাঁহারা কি একই জীবনে, একই অবস্থায় কখনও ব্রাহ্মণ, কখনও ক্ষত্রিয়, কখনও বা বৈশ্য ও শূদ্র হইয়া যান ? হিমাচলবাসী এক শুদ্ধ-বৈষ্ণব যদি শিক্ষাদ্বারা উপজীবিকার্জন না করিয়া নিজের শরীর রক্ষার্থে চাষ করেন তবে বহুদূর শিক্ষার জগৎ যাতায়াতের সময় বাঁচাইয়া ভগবানের নাম করিতে পারেন। তিনি কি গৃহী ?

৪। কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ কি বিভিন্ন ব্যক্তির জগৎ নির্দিষ্ট হইয়াছে, না একই ব্যক্তির জগৎ বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন বৃত্তির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে—যাহাদ্বারা সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে শ্রীভগবান প্রকটিত করেন। লীলাময়ের লীলার পুতুল সকলেই। সার্বভৌমত্বে অস্বীকার করিয়া এককত্বের বা আমিষের ভেদ দর্শন, শাস্ত্রকারকগণের টীকা ভাষ্যের জগৎই মানব মনে প্রায়সঃই উদয় হয়। আমার বিশ্বাস পৌরাণিক দিনে যে কোন কারণেই ইউক উহার প্রয়োজন ছিল। কেননা মহর্ষিগণ ভুল করেন নাই। কিন্তু আজ এ যুগেও সেই একই নিয়মতান্ত্রিক ধারার ব্যত্যয় করিতে কেহ সাহস করিতেছেন না কেন ? হিটলারের ভয়ে জার্মানী মুক ছিল কিন্তু ফলও ভোগ করিল। তাই ভাবি এ যুগের বৈষ্ণব-তিলকগণ কি নিজেদের চিরদিনই মহর্ষিদের কাছে হিটলারের মত বুদ্ধি ও শক্তিতে অপরাজেয় বিবেচনায় যুগান্তযায়ী একমাত্র সত্য ও গ্রায্য ভাষ্য প্রচার করিতে ভীত থাকিবেন ? যুগ যখন পরিবর্তনশীল—ধর্ম্মেও বিপ্লবের প্রয়োজন নাই কি ? এই জগৎই যুগাবতারের প্রয়োজন।

নিজস্ব কথা

তুমি আমার স্বহৃদ, মিত্র, সখা বা বন্ধুর নাগালের বাহিরে—অতি উচ্চে। লাগাম ধরিয়া বসিলে চালক ক্রমেই পিছনে চলিয়া যায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন হইয়া যায় ; পরিচিত দৃষ্টির বহির্ভূত হয়। এ যুগের সৈন্য বাহিনীর অধিনায়ক সর্ব্ব পিছনে থাকে। কিন্তু পূর্ব যুগে অধিনায়কের স্থান ছিল সর্ব্বাগ্রে। এখন তাই ইংরাজী কথায় leaderই follower হইয়াছে। এও যুগেরই ধারা। তাই আমার সন্দেহ হয় যে আগামী এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে চুঁচুড়া যাইয়া তোমার মুহিত সাক্ষাৎ লাভ হইবে কিনা। আমার ইচ্ছা আছে এবার শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠ দর্শন করিয়া ধন্য হইব। তোমারও

পুণ্যপাদ দর্শন মুখ্য উদ্দেশ্য। আশাকরি এই সময় তোমার যেন কোথাও অন্ত্র বা ওয়ার প্রয়োজন না হয়।

যাহা হউক আমার একটা প্রার্থনা যে মহান্ ভক্তগণের নিকট আমার অজ্ঞতা প্রকাশিত হইবে না। উহাতে আমার এমন কোন দর্প নাই যে চূর্ণ হওয়ার ভয় আছে, তবে আমি যে তোমার সান্নিধ্যের একান্ত অনুপযুক্ত ইহা প্রতীয়মান হওয়ার চিন্তা আমাকে ব্যাকুলিত করে। উপরোক্ত প্রশ্ন ও বিষয়গুলির শুদ্ধ বিচার আশাকরি এই পত্রিকার মারফৎ ক্রমশঃ পাইব। কেননা এ প্রশ্ন শুধু আমার একার নয়। অনেকেই ইহার সমাধানে উপকৃত ও আনন্দিত হইবেন। এখানকার মঙ্গল। ভক্তগণকে আমার শ্রদ্ধা জানাইয়া তুমি আমার প্রণাম নিও ও মাঝে মাঝে পত্রদ্বারা আমাকে আনন্দিত করিও। ইতি—

তোমার বিশেষ অনুগ্রহপ্রার্থী—

(স্বাঃ) শ্রীজিতেন্দ্র নারায়ণ বসু

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা সম্বন্ধে অভিমত

হুগলী জেলার প্রাচীনতম সাপ্তাহিক চুঁচুড়া বার্তাবহ :—

“শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীদের জ্ঞান-সঞ্চারিণী সারগর্ভ ধর্মবিষয়ক আলোচনায় সমুজ্জ্বল। এই পক্ষপাতশূন্য পত্রিকাখানি সত্যানুসঙ্গানী মাত্রেরই সহায়ক হইবে।

ফাল্গুনে আলোচ্য প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—“এই পত্রিকা সমগ্র ভারতে যাহাতে সমাদৃত হইতে পারে, তজ্জন্ম প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় প্রবন্ধাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে। প্রধানতঃ বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, আসামী, উৎকল, ইংরাজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি ইহাতে স্থান পাইবে।” এইরূপ গুরুদায়িত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এতদ্বারা অদূর ভবিষ্যে পত্রিকাখানি আদর্শস্থানীয় হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং অপ্রীতিকর বিভেদ-বিদ্বেষবিহীন পবিত্র মিলনের সন্ধান দিবে।

“শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা”র পরিচালকবর্গের এই শুভ উদ্যম ও সাধু-প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক।

স বৈ পুংসাং পদরাধনৌ যতে। ভক্তিরথোক্ষজে।



নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিঃ শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা। যয়াহ্ম। সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥
 অগ্নি ধর্ম সুষ্করূপে পালে যেই জন । হরি কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১ম বর্ষ { প্রহ্মায়, ৪ বামন, ৪৬৩ গৌরাক
মঙ্গলবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, ইং ১৮১৬৪৯ } ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ-সুবকঃ

(त्रिदश्वामी-श्रीमङ्गलिरङ्गक-श्रीधर-महाराज-कृतः)

সুজনাব্দুদরাখিতপাদযুগং যুগধর্মধুরন্ধর-পাত্রবরম্ ।

বরদাভয়দায়ক-পূজাপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১॥

কোটি কোটি সৃজনকর্তৃক আরাধিত শ্রীপাদপদ্মযুগ, (কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনরূপ)
 যুগধৰ্ম্মসংস্থাপক, (বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার) পাত্ররাজ, (নিখিল জীবের) ভয়হরণ-
 কারিগণের মনোহভীষ্টপ্রদাতা সৰ্ব্বপূজ্য শ্রীপাদপদ্মে আমি প্রণাম করি—আমার
 প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥১৥

ভজনোজ্জিতসজ্জনসজ্জপতিং পতিতাদিককারণিকৈকগতিম্ ।

গতিবঞ্চিতবঞ্চকাচিন্ত্যপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥২॥

ভজনসমৃদ্ধ সজ্জনগণের অধিপতি, পতিতজনের প্রতি অধিক করুণাময় ও তাঁহাদের একমাত্র গতি এবং বঞ্চকগণের বঞ্চনাকারী গতিবিশিষ্ট অচিন্ত্যচরণে আমি প্রণাম করি—আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥২॥

অতিকোমলকাঞ্চনদীর্ঘতনুঃ তনুনিন্দিতহেমমৃণালমদম্ ।

মদনার্ব্বদবন্দিতচন্দ্রপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৩॥

অতি কোমল সূবর্ণবর্ণ দীর্ঘতনুকে আমি প্রণাম করি—যাঁহার তনু কর্তৃক স্বর্ণময় মৃণালের মত্ততা নিন্দিত হইতেছে। কোটি কোটি মদন কর্তৃক বন্দিত নখচন্দ্রসমূহ যে শ্রীগুরুপাদপদের শোভা বিস্তার করিতেছে, প্রভুর সেই পদনখ-জ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৩॥

নিজসেবকতারকরঞ্জিবিধুং বিধুতাহিত-ভৃঙ্কতসিঃহবরম্ ।

বরণাগতবালিশ-শন্দপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৪॥

তারকরঞ্জন চন্দ্রের স্তায় যিনি নিজ সেবকমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের চিত্ত প্রফুল্লিত করিয়া থাকেন, ভক্তিদেষিগণ যাঁহার হৃদয়ে বিদ্রাবিত হয় এবং নিরীহ জনগণ যাঁহার পাদপদ্ম বরণ করিয়া পরম কল্যাণ লাভ করেন, তাঁহাকে প্রণাম করি ; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৪॥

বিপুলীকৃতবৈভবগৌরভুবং ভুবনেষু বিকীর্ণিত-গৌরদয়ম্ ।

দয়নীয়গণাপিত-গৌরপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৫॥

যিনি শ্রীগৌরধামের বিপুল বৈভবশোভা প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীগৌরান্বয়ের মহাবদান্ততার কথা যিনি নিখিল ভুবনে বিঘোষিত করিয়াছেন এবং নিজ রূপাভাজন জনের হৃদয়ে যিনি শ্রীগৌরপাদপদ্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি ; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৫॥

চিরগৌরজনাশ্রয়বিশ্বগুরুং গুরুগৌরকিশোরকদাস্ত্রপরম্ ।

পরমাদৃতভক্তিবিনোদপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৬॥

যিনি গৌরাশ্রিত জনগণের নিত্য আশ্রয়স্থল ও জগৎগুরু, যিনি নিজ গুরু শ্রীগৌরকিশোরের সেবাপরায়ণ এবং যিনি শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধমাত্রে পরমাদরবিশিষ্ট, তাঁহাকে প্রণাম করি, আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৬॥

রঘুরূপসনাতনকীর্তিধরং ধরণীতলকীর্তিতজীবকবিম্ ।

কবিরাজ-নরোত্তমসংখ্যাপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৭॥

যিনি শ্রীরূপসনাতন ও রঘুনাথের কীর্তিকেতন উত্তোলন করিয়া বিরাজমান, এই ধরণীতলে যাহাকে পাণ্ডিত্যপ্রতিভাময় শ্রীজীবের অভিন্নতত্ত্ব বলিয়া অনেকে কীর্তন করিয়া থাকেন এবং যিনি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও ঠাকুর নরোত্তমের সমপ্রাণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি ; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৭॥

কৃপয়া হরিকীর্তনমূর্তিধরং ধরণীভরহারক-গৌরজনম্ ।

জনকাধিকবৎসলস্নিগ্ধপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৮॥

জীবের প্রতি কৃপা করিয়া যিনি মূর্তিমান হরিকীর্তন-স্বরূপে প্রকাশিত, ধরণীর অপরাধভার-বিদূরণকারী শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ এবং জীবের প্রতি জনকাপেক্ষাও অধিক বাৎসল্যের স্নেহময় আকরকে আমি প্রণাম করি ; আমার প্রভুর পদনখ-জ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি প্রণাম করি ॥৮॥

শরণাগতকিঙ্করকল্লতরুং তরুধিকৃতধীরবদানুবরম্ ।

বরদেহগগাচ্ছিতদিব্যপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৯॥

শরণাগত কিঙ্করগণের (অভীষ্টপ্রদানে) যিনি কল্লতরুসদৃশ, বৃক্ষকেও ধিকারকারী ষাঁহার বদানুতা ও সহিষ্ণুতা এবং বরদশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও ষাঁহার দিবা শ্রীপাদপদ্মের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে প্রণাম করি ; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৯॥

পরহংসবরং পরমার্থপতিং পতিতৌদ্ধরণে কৃতবেশযতিম্ ।

যতিরাজগণৈঃ পরিসেব্যপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১০॥

পরমহংসকুলতিলক, পরমপুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসম্পত্তির যিনি অধিপতি, পতিতকুলের উদ্ধার নিমিত্ত যিনি যতিবেশ (ভিক্ষুবেশ) ধারণকারী এবং শ্রেষ্ঠ ত্রিদণ্ডী যতিগণ ষাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিতেছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি ; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি প্রণাম করি ॥১০॥

ব্যভাতানুস্মৃতা দয়িতানুচরং চরণাশ্রিত-রেণুধরস্তমহম্ ।

মহদদ্ভুতপাবনশক্তিপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১১॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রভুতানন্দিনীর পরম প্রিয় অনুচর, ষাঁহার শ্রীচরণরেণু আমি মস্তকে ধারণ করিবার মৌভাগ্যের অভিমান করিতেছি, সেই অদ্ভুত পাবনীশক্তিসম্পন্ন শ্রীপাদপদ্মে আমি প্রণাম করি—আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥১১॥

প্রতিকূল মতবাদ

প্রবন্ধলেখকের প্রতিকূল বিচার

এক মাননীয় পত্র লেখক লিখিয়াছেন “আমার মতে ভক্তির অনুশীলন কেবল নীরবে এবং নির্জনে সম্পাদিত হইতে পারে। তদুদ্দেশ্যে কোনরূপ সভা-সমিতি বা আন্দোলন ভক্তির বিরোধী বলিয়া আমার মনে হয়; কারণ উহা দ্বারা প্রচার বা প্রতিষ্ঠা আসিতে পারে।”

মহাভাগবত ও ভাগবতের অধিকার

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তদেব জীবকে অমানী হইতে উপদেশ দিয়াছেন এবং জগতের সকলকে মাননীয় জানিয়া সম্মান দিতে বলিয়াছেন। জীবমাত্রকে সম্মান দিবার একমাত্র মহাভাগবতগণেরই অধিকার। তদনুগত অধিকারে আমরা দেখিতে পাই কৃষ্ণে প্রেম, হরিজনে মিত্রতা, অনভিজ্ঞ জনে অনুগ্রহ ও বিদ্বেশীর উপেক্ষাই ভাগবত জীবনের আদর্শ। জীব যে অধিকারে থাকিয়া কৃষ্ণানুশীলন করেন সেই অধিকারে নিষ্ঠাই তাঁহার অনুকূল বিষয়। অধিকার বিপর্যয় ঘটিলে তাহাই দোষ বলিয়া পরিণত হয়।

অজ্ঞান-অপসারণ মধ্যম ভাগবতেরই কৃত্য

যাঁহারা নিরপেক্ষভাবে ভক্তির স্বরূপ আলোচনা করিবার অবকাশ পান নাই তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা মহাবদান্তবর শ্রীগৌরমুন্দর নিজ মুখে সেই সকল কথা প্রচার করিয়াছেন এবং স্বশিক্ষিত অপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃপাদি আচার্য্যবর্গ দ্বারা জগতে প্রচার করিয়াছেন। সেই সকল অবিতর্কিত সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের অভাবে আমরা অনেক সময় নিজ আত্মসন্তোষিতার বশবর্তী হইয়া নিজ কল্পিত নাপেক্ষ বিচারসমূহ ব্যক্ত করিয়া অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিই। আবার তাদৃশ বিচারের অনৈপুণ্য সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য উদয় হইলে নিরপেক্ষ হইতে পারি। ভক্তির প্রতিকূল সিদ্ধান্তগুলির অসম্পূর্ণতা ও অনুপযোগিতা প্রদর্শন করিলে কেহ যেন নির্দয় হইয়া মনে না করেন যে কোন মাননীয় ব্যক্তির বিচারে দোষ দেখাইতে গেলে তাঁহার মাত্রেয় খর্ব্ব করা হইবে এবং নিজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা মধ্যম ভাগবতাদিকারকে ব্রিহন্ন করা হইবে। মধ্যম ভাগবতাদিকারে অনভিজ্ঞ জনে উপেক্ষার বিধান নাই, পরন্তু জীবের ভক্তিবাদক অজ্ঞান সমূহের অপসারণ-কৃত্য নিশ্চয়ভাবে আছে।

অহৈতুকী উত্তমাভক্তিই অভিধেয় ও পঞ্চম পুরুষার্থ

শ্রীগৌড়ন্দরের মহামূল্য শ্রীমুখবাণ্য হইতে আমরা জানি যে কৃষ্ণ ব্যতীত অপর মায়িক অভিলাষ বর্জিত হইয়া নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানাদির আবরণ, নিত্য নৈমিত্তিকাদি জীবের কৰ্ম্মফলপ্রসূ ভোগাবরণ ও শৈথিল্যাদির আবরণ উন্মুক্ত হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলনকে শুদ্ধা অহৈতুক উত্তমা ভক্তি বলে। কৃষ্ণপ্রেম লাভরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির অভিধেয় নিরপেক্ষ জীবের একমাত্র পরম পুরুষার্থ ভক্তিই চতুর্কর্গাতীত পঞ্চম পুরুষার্থ। সেই ভক্তির অবস্থা ত্রিবিধ। সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা।

অগ্ৰাভিলাষ, কৰ্ম্ম, জ্ঞান, শৈথিল্যাদি অনর্থসমূহ ভক্তির বাধক এবং সাধুসঙ্গ প্রভাবে তাহার দূরীকরণ

সাধনাবস্থার প্রথম মুখে কৃষ্ণ-বৈমুখ্যরূপ অনর্থসমূহ জীবকে ভক্তিনিষ্ঠ হইতে বাধা দেয়। অনর্থগুলি অগ্ৰাভিলাষ, ফলভোগময় কৰ্ম্মাবরণ, ফলত্যাগময় জ্ঞানাবরণ, কৃষ্ণসেবায় ঔদাসীন্যরূপ শৈথিল্যাবরণ বলিয়া শ্রেণীত হইয়াছে। জীব অনর্থের হস্তে পড়িয়া প্রলাপগ্রস্ত রোগীর ন্যায় কত প্রকার রোগ মুক্তির কল্পনা-সমূহ নিজ চিকিৎসার জন্য উদ্ভাবনা করে, কিন্তু তাহাতে রোগোপশম হওয়া দূরে থাকে উত্তরোত্তর রোগোপাধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। সেজন্য আত্মস্তরিতা ছাড়িয়া নিষ্কিঞ্চন সাধুর আনুগত্য হইতেই কৃষ্ণানুশীলনের ব্যবস্থা, গৌরহরির প্রকাশিত পারলৌকিক রহস্য। সাধুসঙ্গ করিলে অসাধুসঙ্গের আকর্ষণ জীবকে পরাভূত করিতে পারে না। কেবলাদৈত পন্থীর নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান, ষাণ্মেচ্ছাচারীর অথবা পুণ্যময় কৰ্ম্মীর ইহামুত্র ফলভোগ বা শৈথিল্য জীবের অনর্থ। ঐ অনর্থগুলি সাধুসঙ্গ প্রভাবে অপসারিত হয়।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় নির্জ্ঞান-জ্ঞান ভক্তিপথ নহে

তাদৃশ অনর্থের মলসমূহ উদরে পূর্ণ রাখিয়া নির্গমন পন্থারোধ করতঃ জীবের নীরব ও নির্জ্ঞান হইবার সামর্থ্য নাই। নীরব বা নির্জ্ঞানের অভিনয় দেখাইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ভক্তির অবাস্তব ফল রবরাহিত্য বা জনরাহিত্য সম্ভবপর নহে। কৃত্রিম সাধনসমূহের অকৰ্ম্মণ্যতা জগতে সভ্যতা বিস্তারের আদিম কাল হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ইতিহাসে জাজ্জ্বল্য প্রতিপন্ন আছে, স্তবরাং তাদৃশ বঞ্চনশীল মার্গ ভক্তিপথে স্বীকৃত হয় নাই।

প্রাকৃত নির্জনতা ও প্রাকৃত নীরবতা ভক্তিবিরোধী

অজ্ঞানের গরিমা, ভীমভট্টাদি কস্মীগণের আড়ম্বরফলে বৈরাগ্যের প্রতিভা, হৃদয়ে পোষণ করিয়া কিরূপে ভক্তিবিরোধী জীব রবরহিত মুকধর্ম এবং জনরহিত নির্জন কারাবাস স্বীকার করিয়া কৃষ্ণভক্তি হইল মনে করিবে? নীরব ও নির্জন অবস্থা কর্মফলাধীন জীবের আকাশকুসুম বা শশবিষাণের ন্যায় অসম্ভব। জীবে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ হইলেই ভাগবতাধিকারে প্রাকৃত জনসঙ্গ ও প্রাকৃত উপদেশক বা বিচারকগণের বাদ সঙ্গ আপনা হইতে পরিত্যক্ত হইয়া দুঃসঙ্গমুক্ত ভক্ত হরিজন-গোষ্ঠীতে কৃষ্ণালাপপর হইতে পারিবেন। ভক্তগণ প্রাকৃত নিঃসঙ্গ বা প্রাকৃত মুকধর্মকে ভক্তির বিরোধী জানেন। তাদৃশ নীরব ও নির্জন ধর্মহীন কখনই ভক্তির অমুকুল হইতে পারে না, কেননা উভয় ধর্মই অসং অর্থাৎ নিত্যকাল স্থায়ী নহে। যাহা কালক্ষুর তাহা আবার বৈকুণ্ঠ কিরূপে হইবে? সাধুসঙ্গ, নিঃসঙ্গ অপেক্ষা ভক্তের উপাদেয়। সাধুসঙ্গ হইতেই দুঃসঙ্গের হেয়ত্ব ও নানা বাদের মূঢ়তা বিদূরিত হয়। নির্বিশেষবাদী হট্টকারিতার আশ্রয়ে যে সকল মতবাদ প্রচার করেন, তাহা ভক্তগণের সম্মুখে আদৌ প্রযুক্ত হইতে পারে না। “ন নির্বিশ্ণো নাতিসক্তঃ ভক্তিয়োগোহস্ত সিদ্ধিদঃ” শ্লোক, এবং “আধিক্যে ন্যূনতয়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ” এতৎ প্রসঙ্গে ধীরভাবে অনুশীলনীয়।

ভক্তির প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই সভাসমিতির সার্থকতা

জগতে সভা-সমিতির যদি কোন ফল থাকে তাহা হইলে হরিভক্তির প্রচার ও প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত। সভা-সমিতি যদি হরিভক্তির উদ্দেশ্যে অহুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে তাৎক্ষণিক সভা-সমিতির কোন আবশ্যকতা নাই। কতিপয় সে-কেলে ফলকামী কস্মীগণ মনে করেন যে সভা-সমিতি পূর্বকালে ছিল না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠক ইষ্টগোষ্ঠীর কথা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক ভাগবত-শ্রবণ-সভার কথা আপনাদের অবিদিত নাই। শ্রবণ ও কীর্তনই সাধনের পরম পরাকাষ্ঠা বলিয়া শ্রীগৌরহরি ও শ্রীমদ্ভাগবতগণ নিরন্তর জগৎকে উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু এত কথা বলিবার পরও মাননীয় লেখক মহাশয় ভ্রূজের বিচারফলে নির্বিশেষবাদী বিষয়মদাক্ত তार्কিকগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা হঃখিত। পঞ্চরাত্র বলেন,—

স্বরর্ষে বিহিতা শপ্পে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।

সেব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥

প্রাকৃত সরব-নীরব ও প্রাকৃত সজন-নির্জন ধর্ম ভক্তির প্রতিকূল

মুক ও জড় হইলেই যে কেবল ভক্তি হয় একথা কোন বিজ্ঞ লোকে বলেন না। নীরব ও নির্জন উভয়ই প্রাকৃত ধর্ম। ভক্তি অপ্রাকৃত বস্তু, সুতরাং প্রাকৃত রবত্যাগ বা প্রাকৃত রবযুক্ত হওয়া উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল; প্রাকৃত জনসঙ্গ বা প্রাকৃত জনবাহিত্য উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল। তজ্জন্ত পরমোচ্চতরে অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্তন কর। “আমি জানী বিচারক” এতাদৃশ নিজভোগ-পর অব্যক্ত বাথেকরূপ-বিষয়কথা ছাড়িয়া মৌন হও—ইহাই সকল বিচারের শেষ কথা—গৌরহরি গান করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ১২৮-৩০ সংখ্যায় ভগবদুক্তি—

“ধারে দেখ, তারে কহ ‘কৃষ্ণ’-উপদেশ।

আমার আঞ্জায় গুরু হঞা তার’ এই দেশ ॥

কতু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।

এই মত যার ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।

সেই এছে কহে, তাঁরে করায় এই শিক্ষা ॥”

নীরব-ভজনের প্রতিপক্ষে শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ

শ্রীজীব গোস্বামীপাদ নীরব অনুশীলনের প্রতিপক্ষে কীর্তন বিষয়ে লিখিয়াছেন, “নামকীর্তনঃঋদং উচ্চৈরেব প্রশস্তং। নামান্তনস্তশ্চ হতব্রপঃ পঠন্নিত্যাদৌ। অত্র যথোপদিষ্টং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা—‘তুণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি’-রিতি। ষষ্ঠ্য ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্য তদা কীর্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈবেতু্যজ্ঞম্।”

মায়াবাদের প্রচার-প্রতিষ্ঠাই প্রচার-প্রতিষ্ঠার হেয়ত্বের চরম

হরিকথা কীর্তন যেখানে নাই, হরিকথার প্রচার যেখানে নাই, সেই খানেই খ্যানাদি কৃত্রিম বিষয়-কথা প্রবল। হরিজনের সঙ্গ যেখানে নাই, সেখানেই মায়াগ্রস্ত আবদ্ধ-জীবের সঙ্গময় সভা-সমিতি। যেখানে কীর্তন নাই, শ্রবণ নাই, পক্ষান্তরে ফল্গু-বৈরাগ্যের কথা বঙ্কিত-সমাজকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছে, সেখানে অপ্রাকৃত যুক্ত-বৈরাগ্য নাই। ফল্গু-বৈরাগ্য প্রাকৃত বিষয়, সুতরাং উহা জীবের কোন মঙ্গল আনয়ন করিতে সমর্থ নহে। ফল্গু-বৈরাগ্যের বশবর্তী হইয়া কৃষ্ণানুশীলনকে প্রাকৃত বিষয়ান্তর্গত মনে করিলে যে অপরাধ হয়, বিষয়কে এবং

কৃষ্ণকে সমজ্ঞান করিলে যে বিষমপূর্ণ মায়াবাদ আশ্রয় করা হয়, তাহা সাধুসঙ্গ ব্যতীত কিরূপে জীবের উপলব্ধি হইবে? ভক্ত, সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কল্পিত বিচাররূপ অসাধু ভাবসমূহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া নিঃসঙ্গ ও নীরব মনে করিলে কি মায়িক প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের সেবা হইতে রক্ষা পাইবেন? মায়া প্রচার বা মায়াবাদ প্রচারের ফলে ভক্তিপ্রচার ও ভক্তিপ্রতিষ্ঠা উন্মূলিত করিবার অসম্ভাবনা কি প্রচার বা প্রতিষ্ঠার হেয়ত্বের চরম সীমা নহে?

শুদ্ধাভক্তির প্রচারকে প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা থাকিতে পারেনা

ভক্ত-ভগবানে ভক্তিযোগে অচিন্ত্য-দৈতাদৈত নিত্য ভাবময়। নিত্য-ভক্তি বিমুখ হইয়া অভক্তির আদর্শ নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান, নিত্যনৈমিত্তিক ভোগ্য কর্মবাদ ও সেবা-শৈথিল্যবাদকে বহুমানন করিয়া ভগদ্বিরোধী আত্মস্তরিতা বৃত্তিরূপ অবৈধস্বাধন করিলে জীবের কিরূপে শ্রেয়ঃ লাভ হইবে? জীব যদি অনাত্মবিবেকবলে বিরূপ বুদ্ধিতে আপনাকে মুমুক্শু, ববুক্ষু বা উদাসীন মনে করিয়া নিজ মায়িক প্রতিষ্ঠা বা প্রচারের উৎকট তাড়নার বশবর্তী হইয়া অপ্রাকৃত শ্রবণ-কীর্তনাত্মা ভক্তির প্রতিকূল ভাব হৃদয়ে ভ্রমক্রমে পোষণ করেন এবং ভক্তগণে প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠা থাকিতে পারে, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আত্মঘাতী কানিস ভক্ত নীরব হইবেন। এস্থলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'।

ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি ॥

শ্রীল প্রভুপাদ

নাড়া

“নাড়া” শব্দের অর্থ কি?

অনেকের বিশ্বাস, অদ্বৈত প্রভুর মস্তকে কেশ ছিল না, এজন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে কখন কখন “নাড়া” বলিয়া ডাকিতেন। এ বিশ্বাস কতদূর সমীচীন দেখা যাউক। কালনা হইতে যে সচিত্র চরিতামৃত বাহির হইতেছে, তাহাতে অদ্বৈত প্রভুর যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, ঐ বিশ্বাসেই বোধ হয়, সে চিত্রের মস্তক কেশশূন্য হইয়াছে। কেশ মস্তকের প্রধান ভূষণ, এবং মহাপুরুষের সৌন্দর্যের একটি লক্ষণ। অদ্বৈত প্রভু মহাপুরুষ, তাঁহার উত্তমাজ স্বাভাবিক ভূষণশূন্য ছিল না বলিয়া কেহ কেহ বোধ করেন।

‘নাড়া’ শব্দের ‘নেড়া’-অর্থের প্রথম আপত্তি

চৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে, সর্বপ্রথম যে দিন মহাপ্রভু “নাড়া” “নাড়া” শব্দে শান্তিপুৰপতিকে আহ্বান করিলেন, তখন শ্রীবাসাদি বুঝিতে পারিলেন না যে, কাহাকে আহ্বান করা হইতেছে। প্রভু পরে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, অদ্বৈত প্রভুকে তিনি “নাড়া” বলেন। এখন কথা এই যে, “নেড়া” শব্দের রূপান্তরই যদি “নাড়া” হইত—অদ্বৈত প্রভুর মন্তকে যদি যথার্থই কেশ না থাকিত, তবে শ্রীবাসাদির বুঝিতে কষ্ট হইত না।

দ্বিতীয় আপত্তি

দ্বিতীয় আপত্ত্য অদ্বৈতপ্রভুর একটা ধ্যান। তাহা এই ;—

তিলতগুলকেশাভং সূক্ষ্মশ্বেতাধ্বরং বিভূং ।

প্রেমানন্দময়ং শান্তং চন্দনাক্তকলেবরং ॥

(গোরগোপীজনবল্লভার্চন চল্লিকা)

অদ্বৈত প্রভুর কেশ ছিল, এই ধ্যানটীতে তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। অদ্বৈত প্রভু বৃদ্ধ ছিলেন, সুতরাং মন্তক “তিলতগুলকেশাভং” যুক্ত ছিল।

এই “তিলতগুলকেশাভং” শব্দের শ্রীজীবকৃত অর্থ এই ;—“তিলমিশ্রিত-তগুলবদাচরন্তিঃ শ্যামমিশ্রশ্বেতৈরিত্যর্থঃ।”

তৃতীয় আপত্তি

মহাপ্রভু অদ্বৈত প্রভুকে গুরুবুদ্ধি করেন। ইহাতে আচার্য্য প্রভু মনে মনে মহা দুঃখিত, একদা মনে ভাবিলেন,—‘আমি প্রভুকে এরূপভাবে রাগাইব,—যাহাতে—

(ক) “প্রভু মোর শাস্তি করিবেন চূলে ধরি’।” (চৈঃ ভাঃ মঃ ১২।১৬)

(খ) “যাতে মোর শাস্তি প্রভু করে চূলে ধরি’।” (ভক্তি রত্নাকর)

মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করতঃ শান্তিপুরে গিয়া তিনি বাশিষ্ঠ (ভক্তিবিরুদ্ধ-মতে) ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

“অন্তর্ধ্যামী গৌরচন্দ্র জানেন সকল”

অদ্বৈত প্রভুর এই মনোগত ভাব অবগত হইয়া তিনি তদীয় সঙ্কল্পসিদ্ধি মানসে শান্তিপুরে গমন করিলেন। প্রভু আসিতেছেন জানিয়া অদ্বৈত প্রফুল্ল

হইলেন এবং মন্ত হইয়া জ্ঞান ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্বৈতের ত্রায় ভক্ত-শ্রেষ্ঠের একরূপ কার্য্যদর্শনে—

‘প্রভু ক্রোধে অদ্বৈত আচার্য্যে জিজ্ঞাসয়।

জ্ঞান ভক্তি হইতে কেবা শ্রেষ্ঠ হয় ?

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হয় অদ্বৈত কহিলা।

‘তুনি’ মহাক্রোধে প্রভু বাহু পাসরিলা ॥

মহা বলবান্ প্রভু শ্রীগৌর স্বন্দর।

লাফ দিয়া উঠে শীঘ্র পীড়ার উপর ॥

অদ্বৈতের চুলে ধরি’ পাড়ে উঠানেতে।

অদ্বৈতে কিলায় স্বকোমল দুই হাতে ॥ (ভক্তি রত্নাকর)

অদ্বৈত প্রভুর অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, বাঞ্ছাকল্পতরু কি নিরর্থক নাম ? বাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ায় আনন্দের ভরে—

“হাতে তালি দিয়া নাচে শ্রীঅদ্বৈত রায়।

প্রভুর চরণ-ধূলি লইলা মাথায় ॥”

আজ “চরণ-ধূলি” লইতে মহাপ্রভু আর নিষেধ করিতে পারিলেন না, যাহাকে মারিতে পারিলেন। সে ধূলি লইতে বাধা কি আছে ? এই জন্তই অদ্বৈতের এই জ্ঞান-ব্যাখ্যারূপ রঙ্গ !

সে যাহা হউক, চৈতন্যভাগবত ও ভক্তিরত্নাকর, এই দুইখানি প্রামাণ্যগ্রন্থে চুলের প্রসঙ্গ পাওয়া যাইতেছে। অদ্বৈত প্রভুর সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্ত, মহাপ্রভু সে চুলে ধরিয়াছিলেন। তবে আর কথা কি ?

চতুর্থ আপত্তি

অদ্বৈত প্রভুর যে কেশ ছিল, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সাক্ষী গোবিন্দদাস, ১৪৩০ শকে ইনি মহাপ্রভুর বাড়ী আগমন করেন। নবদ্বীপে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই তিনি শ্রীমহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু, শ্রীবাস, গদাধর ও দামোদর এই কয়েক-জনকে গঙ্গাস্নানে গমন করিতে দর্শন করিলেন। অদ্বৈতপ্রভুকে কিরূপ দেখিলেন, তাহা তিনি স্বরচিত “কড়চা” গ্রন্থে বলিয়াছেন, তাহাতে অদ্বৈত-প্রভুর পক্ষ কেশের কথা এইরূপ লিখা রহিয়াছে, যথা—

“অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গৌসাই।

এমন তেজস্বী মুই কভু দেখি নাই ॥

পক্ষ কেশ পক্ষ দাড়ী বড় মোহনিয়া ।

দাড়ী পড়িয়াছে তার হৃদয় ছাড়িয়া ॥”

এই প্রত্যক্ষ সাক্ষির বর্ণনার উপর যাহারা অনুমান করিতে যাইবেন, তাঁহাদের সহিত আর কথা নাই ।

জানা গেল—অদ্বৈত প্রভুর কেশ ছিল ; তবে “নাড়া” শব্দের অর্থ কি ? “নেড়া” শব্দের পরিবর্তে “নাড়া” ব্যবহৃত হয় নাই, হওয়া সম্ভব নহে । যদি পূর্বোক্ত প্রমাণ সত্ত্বেও কেহ বলেন যে, অদ্বৈত প্রভুর কেশ ছিল না বলিয়াই “নেড়া” শব্দের পরিবর্তে “নাড়া” ব্যবহৃত হইত । তবে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, মহাপ্রভু কি অদ্বৈত প্রভুকে বিদ্রূপ করিতেন ? যে অদ্বৈতকে মহাপ্রভু গুরুর ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, তাঁহাকে “নাড়া” (কেশশূন্য) বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া ডাকা অসম্ভব । তবে “নাড়া” শব্দের অর্থ কি ?

এসম্বন্ধে একটি কথা মনে হয়, অদ্বৈত প্রভুকে মহাপ্রভু “নাড়া” বলিলেন— অবশ্যাবস্থায় । সহজ সময়ে কখনও “নাড়া” বলিয়া ডাকেন নাই, একথা চৈতন্যভাগবতের পাঠক অবগত আছেন ।

মহাপ্রভুর যত অলৌকিক কান্তি বা প্রকাশ ঐশী-ভাব-অভিব্যক্তি, ঐ আবেশাবস্থায়ই দেখা যাইত । এই সময়েই তিনি বলিতেন—

শুতিয়া আছিলু ক্ষীরসাগর-ভিতরে ।

মোর নিদ্রা ভাঙ্গিলেক নাড়ার হৃদয়ে ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।১৬)

অর্থাৎ অদ্বৈতপ্রভুর আরাধনাতে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন । ভাব—তিনি নিদ্রিত ছিলেন, অদ্বৈতপ্রভু (কঠোর আরাধনায়) তাঁহাকে নাড়িয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া আনিয়াছেন । অতএব অর্থ হইল—‘যে নাড়িয়া আনিয়াছে, সেই নাড়া ।’ অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছেন, চৈতন্যভাগবতে পুনঃ পুনঃ তাহা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন ;—অবশ্য আবেশাবস্থায়, সহজ সময়ে নহে ।

এই এক “নাড়া” শব্দের প্রয়োগে (১) জীবের প্রতি অভয় দান, (২) তাঁহার ভগবত্বা, (৩) অদ্বৈত প্রভুর মহত্ব, এবং (৪) ভক্তের শক্তি কতদূর পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে, তাহা বুঝাইয়াছেন । এতদ্ব্যতীত আর একটি কথাও বুঝাইত, সেটি (৫) অদ্বৈত প্রভুর উপর তাঁহার প্রীতি প্রকাশ । “নাড়া” শব্দের প্রয়োগে অদ্বৈত প্রভুর উপর তাঁহার প্রীতি কেমনে বুঝাইত, তাহা ৪০৮ গৌরাম্বের ১৬ই জৈষ্ঠ তারিখের বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার “প্রভুর গুটি দুই প্রীতি-সন্তোষণ” শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছি ।

‘নাড়া’-শব্দের প্রকৃত অর্থ

শ্রীল অদ্বৈত প্রভুকে নাড়া শব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত করিয়াছেন, ঐ নাড়াশব্দের অনেক প্রকার অর্থ শুনিয়াছি। কোন বৈষ্ণব-পণ্ডিত বলিয়াছেন যে ‘নার’ শব্দে জীবসমষ্টি, তাহাতে অবস্থিত মহাবিশ্বকে ‘নারা’ বলা যায়। সেই ‘নারা’ শব্দের অপভ্রংশ নাড়া, রাঢ়দেশীয় লোকেরা অনেকস্থলে “র স্থানে ড” বলিয়া থাকেন। তাহাতেই ‘নারা’ শব্দ ‘নাড়া’ বলিয়া লেখা হইয়াছে। এই অর্থটা অনেক অংশে ভাল বলিয়া বোধ হয়।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

ঐকান্তিকতা

একটামাত্র অন্ত ষাহার, তিনি ঐকান্তিক। এক বা অদ্বিতীয় বস্তু শ্রীভগবানের প্রতি নিষ্ঠা বা সম্পূর্ণ নির্ভরতাই ঐকান্তিকতা বা দৃঢ় নিশ্চয়তা। অব্যভিচারিত্ব বা সত্যত্ব ইহার নিত্য সহচর। শরণাগতি থাকিলে ঐকান্তিক বা একনিষ্ঠ হওয়া যায়। একনিষ্ঠ হওয়া বা সত্যসাধনী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা হইলে আর ইতর-বস্তুতে নিষ্ঠা থাকে না। শ্রীগুরু-গৌরান্দের রূপায় জীব যতদিন ঐকান্তিক বা ভগবন্নিষ্ঠ না হইতে পারে, একের দিকে বা অদ্বয়জ্ঞানবস্তুর দিকে গতিবিশিষ্ট না হয়, ততদিন জীব শান্ত হইতে পারে না। ঐকান্তিক হইবার উপদেশ সকল শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

ব্যবসায়্যাত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।

বহুশাখা হনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥২।৪।১॥

হে অর্জুন! একমাত্র ব্যবসায়্যাত্মিকা বুদ্ধি করিবে, অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবিশিষ্ট হইবে; অব্যবসায়িগণ নানাপ্রকার বুদ্ধিধারা চালিত হইয়া অসংখ্য বিষয় সৃষ্টি করে।

ব্যবসায়্যাত্মিকা বুদ্ধির কথা বলিতে গিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—সৰ্বাভোহপি বুদ্ধিভো ভক্তিযোগবিষয়িণোব বুদ্ধিরুৎকৃষ্টেত্যাহ,—ব্যবসায়েতি। ইহ ভক্তিযোগে ব্যবসায়্যাত্মিকা বুদ্ধিরেকৈব। মম শ্রীমদগুরুপদিতঃ ভগবৎকীর্তন-স্মরণ-চরণপরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধন-মেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধন-সাধ্য-দশায়োক্তন্তুমশক্যমেতদেব

মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্তর মে কার্য্যং নাপ্যভিলক্ষীয়ং স্বদুঃখীত্যত্র
সুখমন্ত, দুঃখং বাস্ত, সংসারো নশ্যতু, বা ন নশ্যতু, তত্র মম কাপি ন
ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির্যেকতব—ভক্তাবেব সম্ভবেৎ; যদুক্তং—“ততো
ভজত মাং প্রীতঃ শঙ্কালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ” ইতি। ততোহন্যত্র নৈব বুদ্ধিরেকेत্যাহ,—
বহ্নিতি।

মদীয় শ্রীগুরুদেব আমাকে যে ভগবন্মাম ও ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্তন ও
স্মরণাদি ভগবৎসেবার কথা উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই আমার সাধন, তাহাই
আমার সাধ্য, তাহাই আমার জীবাতু। তাহাই আমার কাম্য, তাহাই আমার
কার্য্য, এতদ্ব্যতীত আর আমার কোন কার্য্য নাই বা স্বপ্নেও অথ কোন আকাঙ্ক্ষা
নাই। ভগবৎসেবা করিতে গিয়া আমার সুখই হউক, বা দুঃখই হউক, সংসার
নাশ হউক, বা না হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। আমি কিন্তু
ভগবৎ-সেবা কখনই ছাড়িতে পারিব না। ইহারই নাম দৃঢ়তা, ঐকান্তিকতা
বা নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধি। এইরূপ সদবুদ্ধি একমাত্র সদগুরুচরণাশ্রিত অকপট
ভক্ত্যাভিলাষীর পক্ষেই সম্ভব। ভগবদ্ভজন ব্যতীত অন্যত্র এই ঐকান্তিকতা
সম্ভব নয়। সংস্কৃতক্রমে ভগবৎকথায় রুচিপরায়ণ সজ্জনেরই এই সৌভাগ্য লাভ
হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর। তিনি সকলের একমাত্র রক্ষক, পালক, প্রভু,
নিয়ামক ও আশ্রয়। আর সকলেই তাঁহার দাস বা সেবক। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের
প্রতি নিষ্ঠাই জীবের ধর্ম্ম, স্বভাব বা কৃত্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভূত।

যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪২)

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।

যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৮৩)

একের প্রতি নিষ্ঠা না থাকিলে ব্যভিচার অবশ্যস্তাবী। লক্ষবস্তুর এক না
হইয়া বহু বা দুই হইলে ‘দুই নৌকায় পা দেওয়ার’ ন্যায় দুঃখ বা অশান্তিই লাভ
হয়। ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হয়।
ব্যভিচার আচারের অপব্যবহার; লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের তাহাই কাম্য হয়। অসংযত
ব্যক্তিগণ বহু লক্ষ্যের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া পরবস্তুর লোভ করিতে পারে না।
অধিকন্তু তাহারা হতাশ হইয়া কেবল দুঃখই ভোগ করে।

ভগবচ্চরণে শরণাগত ভক্তগণের চিত্ত অলুক্ষণ ভগবৎসেবায় রত থাকায় তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তের কৃপায় ভাগ্যবান জীব ভগবৎ-প্রপত্তিরূপ মহাসম্পত্তি লাভ করিয়া পরমানন্দে মগ্ন থাকেন। তখন তাঁহাদের হৃদয়ে দুঃখকর কাম বা আশা থাকেনা। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

একান্তিনো যস্ত ন কঙ্কনার্থং

বাহুস্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।

অত্যদুতং তচ্চরিতং স্তম্ভনং

গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥ (ভাঃ ৮।৩২।০)

ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ অত্যদুত মঙ্গলপ্রদ ভগবলীলাদি কীর্তন করিয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন থাকেন বলিয়া তাঁহারা ভগবানের নিকটে জাগতিক কোন কিছু বাঞ্ছা করেন না।

একাভিনিবিষ্ট ব্যক্তিই ঐকান্তিক, সুখী, নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়। যেখানে দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা বহুর দিকে দৃষ্টি, সেখানেই ভয়, চিন্তা ও দুঃখ। ভগবৎপার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি

হইলু পরম সুখী।

দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না বহিল,

চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥

অশোক-অভয় অমৃত-আধার

তোমার চরণদ্বয়।

তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া

ছাড়িলু ভবের ভয় ॥

উপাস্তবস্ত কখনই বহু হইতে পারেন না। অলুপ্তাগের অভাব হইতে বহুশীশ্বরের প্রবর্তন হয়। একজন সেবক যেমন বহু প্রভুর সেবা করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ ঐকান্তিক-ভক্ত কখনও বহুশীশ্বরবাদের বা নানা চিন্তার প্রশ্রয় দিতে পারেন না। অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই মানব দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হয়। এই অভিনিবেশই তাহাকে অভয়পদ বিস্মরণ করাইয়া ঐকান্তিকতা হইতে ভয়রূপ ব্যভিচারের হস্তে নিক্ষেপ করে। বিষয়ের বহুত্ব-জ্ঞানই ভয়ের কারণ। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বিষয় বা উপাস্ত—এই জ্ঞানের

অভাবেই জীব লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নানা কামনার বশবর্তী হয় এবং নিজ নিজ কাম-পূর্তির জন্ত নানা দেবদেবীর উপাসনায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সাধুগুরুরূপায় বহু কামনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জীব ঐকান্তিক হইবার সুযোগ পায়। সেকালে তাহার বাসনাবশে বিভিন্ন উপাসনা থাকে না। জড়কাম বা ইতর আশাই দুঃখের মূল। কৃষ্ণবিশ্বুতিবশতঃই জীবের এই দুর্গতি। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরানন্দেব বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহিস্মুখ।

অতএব মায়া তাহা দেয় সংসার-দুঃখ ॥

সাধু-শাস্ত্র-রূপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।

সেই জীব নিস্তার, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

মায়ামুক্ত জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।

জীবেরে রূপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥

শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।

‘কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা’—জীবের হয় জ্ঞান ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭, ১২০, ১২২-২৩)

ঐকান্তিকতা ও অনুরাগের স্বরূপ ষাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা নানাত্ব, বহুত্ব ও সাধারণী কোন ভাবের আদর না করিয়া ভগবানই আমার সর্বস্ব, ভগবানে আমার ষোল আনা অধিকার, তিনিই একমাত্র প্রীতির পাত্র ও ধন—ইহা দৃঢ়ভাবে জানেন। ঐকান্তিকতার মধ্যে অপরের কোন অংশ থাকিতে পারে না। এজন্য ঐকান্তিক-ভক্ত অনুক্ষণ প্রভুসেবায় ব্যস্ত হন। তিনি একলসেবাপরায়ণ, আবার তাঁহার স্বজাতীয়াশয়সিদ্ধ উদ্দেশ্যের অনুকূল সহচর-গণকে নিজ হইতে অপৃথক বুদ্ধি করেন। সেখানে “মদগুরুঃ জগদগুরুঃ মন্ত্রাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ” এই বিচারই প্রবল।

কৃষ্ণভক্তই ঐকান্তিক ও শাস্ত্র, ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী—সকলেই অশাস্ত। যেখানে কৃষ্ণেতর বস্তুতে জীবের অনুরাগ ও সহানুভূতি দেখা যায়, সেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই। কৃষ্ণভক্ত কখনই সাধারণী বহুবীশ্বর-দেবীর সঙ্গ করেন না। তবে তাঁহাদিগকে সংপথে আনয়নের জন্ত, তাঁহাদের বিষয়-উন্মুক্ত করিবার জন্ত যত্ন করেন ; কিন্তু তাদৃশ সাধারণী কৃষ্ণেতর দেবোপাসকের বিমুখ-চেষ্টার আদর করেন না।

নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতাই ভক্তি বা প্রীতির প্রাণ। ভজনে ঐকান্তিকতা; দৃঢ়তা ও সরলতা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা শাস্ত্রে ঐকান্তিকের এইরূপ লক্ষণ শুনিতে পাই,—

একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদ্ভবে পরায়ণাঃ ।

তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তান্তদ্ভাগবতচেতসঃ ॥ (গরুড় পুরাণ)

একান্তভাবে নিরন্তর পরমেশ্বর বিষ্ণুর শরণাগতি বলিয়াই সেই ভক্তগণ “একান্তী” নামে কথিত। তাঁহারাই ভগবদ্গতচিন্ত। এইরূপ একান্তী ভক্তগণই সর্বশ্রেষ্ঠ,—

ব্রাহ্মণানাং সহস্ৰেভ্যঃ সত্ৰযাজী বিশিষ্ঠ্যতে ।

সত্ৰযাজিসহস্ৰেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ ॥

সর্ববেদান্তবিন্ধকোট্য বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্ঠ্যতে ।

বৈষ্ণবানাং সহস্ৰেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্ঠ্যতে ॥

(ভক্তিসম্বর্ত ১৭৭ সংখ্যা-স্থত গারুড়বাক্য)

“সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ববেদান্তবিন্ধ শ্রেষ্ঠ। এইরূপ বেদান্তবিন্ধ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন ‘একান্তী’ ভক্ত শ্রেষ্ঠ।”

গৌরপার্বদ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু চারিপ্রকার ঐকান্তিকতার কথা বলিয়াছেন,—“তদেকনিষ্ঠতারূপা একান্তিতা চতুর্দ্ধা চতুভিঃ প্রকারৈঃ। একো ধর্ম্মানাদয়ঃ অশ্লশ্চ কর্ম্মজ্ঞানাত্মশেষ-নিরপেক্ষতা অপরো বিদ্বাকুলত্বেহপি রতিপরতাপরশ্চ প্রেমৈকপরতেতি।”

অর্থাৎ ঐকান্তিকতা চারিপ্রকার,—(১) ধর্ম্মে অনাদর, (২) কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্বাদি প্রতি অশেষ নিরপেক্ষতা, (৩) বহু বিদ্বদ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও ভক্তির প্রতি একান্ত রতি, (৪) প্রেমৈকপরতা।

ঐকান্তিকতার প্রথম লক্ষণ—ধর্ম্মে অনাদর কিরূপ, তাঁহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভু (১) শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধবগীতার বাক্য এবং (২) শ্রীমহাভারত হইতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন,—

(১) আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্ঠানপি স্বকান্ ।

ধর্ম্মান্ সন্তুজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজ্যেৎ স চ সন্তমঃ ॥

(ভাঃ ১১।১১।৩২)

(২) **সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য** মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ (গী: ১৮।৬৬)

শ্রীউদ্ধবগীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—“ধর্মশাস্ত্রে আমি যাহা ধর্ম বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার দোষগুণ বিচারপূর্বক সেই সকল ধর্মপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে একান্তভাবে ভজন করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু ॥”

শ্রীগীতায়ও শ্রীভগবান্ অজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া লোকশিক্ষাকল্পে বলিয়াছেন,—
“সর্বপ্রকার নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মলক্ষণযুক্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে ঐ সকল ধর্মানুষ্ঠান হইতে বিরতি-জনিত কোনপ্রকার প্রত্যাবায়ই তোমার হইবে না। আমি তোমাকে রক্ষা করিব।”
শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের আর একটা বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

যদা যন্তানুগৃহ্ণাতি ভগবান্নানুভাবিতঃ ।

স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্টিতাম্ ॥ (ভাঃ ৪।২৯।৪৬)

“যখন পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যশালী ভগবান্ কোন জীবাত্মার আত্মসমর্পণ-দর্শনে প্রসন্ন হইয়া অথবা আত্মবৃত্তিবারা সেবিত হইয়া জীবের প্রতি রূপা করেন, তখন সেই ভক্ত লৌকিক ব্যবহার ও বেদ-প্রতিপাত্ত কর্মকাণ্ডে আসক্ত মতি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।”

ঐকান্তিকতার দ্বিতীয় লক্ষণ—অনুসর্বনিরপেক্ষতার প্রমাণ-প্রসঙ্গে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত বাক্য হইতে বলিতেছেন,—

সন্তোহনপেক্ষা মচ্চিন্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ ।

নির্ম্মমা নিরহংকারা নির্দ্বন্দ্বা নিম্পরিগ্রহাঃ ॥

তত্র তে সাধবঃ সাধ্বি সর্বসঙ্গবিবর্জিতাঃ ।

সঙ্গশ্চেষথ তে প্রার্থাঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—“নিরপেক্ষ, মদগতমনাঃ, প্রশান্ত, সমদর্শী, নির্ম্মম, নিরহংকার, নির্দ্বন্দ্ব ও নিম্পরিগ্রহ সাধুগণই সং ।” কপিলদেব দেবহুতিকে বলিতেছেন—“হে সাধ্বি, সর্বসঙ্গ-বিবর্জিত মহাপুরুষগণই সাধু। সাধুসঙ্গই আপনার প্রার্থনীয়। কেন না সাধুগণই সঙ্গদোষ বিদূরিত করেন; অতএব সাধুসঙ্গই নির্জন-সঙ্গ বা সর্বসঙ্গনিরপেক্ষতা।”

ঐকান্তিকতার তৃতীয় লক্ষণ—বিঘ্নাকুলতাসত্ত্বেও হরিসেবায় চিত্তের রতিপরতা। যাহারা ঐকান্তিক নহেন, তাঁহারা ভক্তিপথকে নানা প্রকার বিঘ্নসঙ্কুল দেখিয়া গণমতের ধুবহনকারী তথাকথিত সমন্বয়বাদী উদারপন্থী হইয়া

পড়েন। সব পথই সমান, ভক্তি ও অভক্তি সকলই সমান—ইহা বলিলে বহু লোকেরই মনোরক্ষা হয়। কাজেই বহু বিপ্লবদ্বারা আক্রান্ত হইতে হয় না। অধিক কি, একান্তভাবে শ্রীমুকুন্দের ভজন করিবার জন্ত জগতের বিচার হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে দেবতাগণ পর্য্যন্ত বিম্ব করিতে আরম্ভ করেন।

বিপ্রস্ত বৈ সন্নসতো দেবা দারাদিরূপিণঃ।

বিপ্লবান্ কুর্কৃত্যং হান্মানাক্রমা সমিয়াং পরম্ ॥ (ভাঃ ১১।১৮।১৪)

“ব্রাহ্মণের সন্ন্যাসকালে স্ত্রীপুত্রাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবতাগণ বিপ্লব উৎপাদন করিতে আরম্ভ করেন, কারণ তাঁহারা মনে মনে চিন্তা করেন, এইব্যক্তি আমাদের অতিক্রম করিয়া ভগবল্লোকে গমন করিতেছে।”

শুদ্ধভক্তিপথ ক্রোটিকটকরুদ্ধ। ইহাতে জগতের লোকের তাড়না-গঞ্জনা, দেবতাদিগের নানা প্রকার অত্যাচার-অবিচার, এবং প্রতি পদে পদে বাধা-বিপত্তি রহিয়াছে। এজন্য শুদ্ধভক্তিপথের গ্রাহক খুবই কম। আবার যাহারা প্রথমতঃ গ্রাহক হইবার অভিনয় দেখান, তাঁহারা কার্যক্ষেত্রে নানা প্রকার বিপ্লব দেখিয়া সরিয়া পড়েন—‘পুনর্মুখিকো ভব’ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গণগড্ডালিকার রুচিপ্ৰদ ধর্ম্ম ও পথে গা? ভাসাইয়া দেওয়াই বিপ্লব হইতে উদ্ধারের আশু প্রতিকার বলিয়া বরণ করেন। কিন্তু যাহারা একমাত্র কৃষ্ণকেই ‘নিত্যরক্ষাকর্তা’ বলিয়া বরণ করেন, সেইরূপ শরণাগত ক্ষুদ্রলভ অধিকারীই ঐকান্তিক হইতে পারেন। বিপ্লবসমূহ তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবা হইতে বিচ্যুত করা দূরে থাকুক, অধিকতর সংলগ্নই করিয়া দেয়। কামাতুর পুরুষ কামিনীপ্রাপ্তির পক্ষে যতটা অধিক বিয়ে আচ্ছন্ন হয়, তাহার অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্ত সে ততটাই অধিক ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তদ্রূপ ঐকান্তিক প্রেমিকভক্ত ভগবৎসেবায় যতটা অধিক বিপ্লব দেখিতে পান, কৃষ্ণসেবায় ততই অধিক নব-নবায়মান আশ্চর্য্য ও চেষ্টা প্রদর্শন করেন। ইহা কেবল কথার কথা মাত্র নহে, ভগবৎ-কৃপাবলে আমাদের অভীষ্টদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদর্শে ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছিলাম—কর্ম্মবীর নেপোলিয়ানের সৈন্য তাহাদের অভিযান পথের সম্মুখে আল্প্‌স্-পর্বত দেখিতে পাইয়া যখন তাহাদের গতি অবরুদ্ধ করিতে বাধা হইয়াছিল, তখন বীর নেপোলিয়ান্ সিংহহৃদয়ে জানাইয়াছিলেন যে সেখানে আদৌ আল্প্‌স্‌ নাই। বীরের আঙ্গুলি-হেলনে নেপোলিয়ানের সৈন্য বাস্তব পর্বতকেও সমতল-ভূমির ছায় জ্ঞান করিয়া আল্প্‌স্-পর্বত অতিক্রমের চেষ্টা করিয়াছিল। জাগতিক অভ্যুদয়ের উদাহরণে এইরূপ উত্তেজনাময় কর্ম্মবীরত্বের

কথা শুনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু হরিসেবার পথে প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি
বিল্লের হিমালয় যে আচার্য্যের ছঙ্কারের নিকট সমতল-ভূমিতে পরিণত হয়,
সেইরূপ আচার্য্যের পাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্যাণ্ড আমাদের হইয়াছে । শ্রীল
সনাতন গোস্বামিপ্রভু সেইরূপ ভাগবতের লক্ষণ শাস্ত্রবাক্য হইতে
জানাইয়াছেন,—

আপদ্ গতস্ত যন্তেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

নান্তত্র রমতে চিন্তং স বৈ ভাগবতো নরঃ ॥

“আপদ্ হইলেও হরির প্রতি ষাঁহার অব্যভিচারিণী ভক্তি বিজ্ঞমান, ষাঁহার
চিত্ত হরি ব্যতীত অল্প কোন বিষয়ে আসক্ত নহে, তাঁহাকেই ‘ভাগবত’ বলা
যায় ।”

ঐকান্তিকতার চতুর্থ লক্ষণ—প্রেমৈকপরতা সম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামি-
প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদ্যার্থী জনেষু দেহন্তরবার্ত্তিকেষু ।

গৃহেষু জায়াঅজরাতিমংস্থ ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥ (ভাঃ ৫।৫।৩)

“ষাঁহারা সর্ব্বেশ্বর আমাতে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া আমার প্রীতিকেই একমাত্র
পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীতি ব্যতীত অল্প বস্তুকে পুরুষার্থ
বলেন না, ষাঁহারা ভোজন-পানাদিতে রত বিষয়িগণের অসদ্ব্যবহার এবং ধন-জন-
স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে প্রীতি করেন না, ষাঁহারা ইহলোকে দেহ-নির্দাহোপযোগী অর্থ
ব্যতীত অধিক ধনে স্পৃহা করেন না, তাঁহারাই মহৎ ।”

প্রেমের তারম্যাত্মসারে এই প্রেমৈকপরতা তিন প্রকার—উত্তমা, মধ্যমা ও
কনিষ্ঠা । যথা,—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।

ভূতানি ভগবত্যাগ্রেণ ভাগবতোত্তমঃ ॥ (ভাঃ ১।১।৪৫)

স্বেষ্টদেবস্তস্ত ভাবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যতি ।

ভাবয়ন্তি চ তাত্ত্বিম্নিত্যথঃ সম্মতঃ সতাম্ ॥

শ্রীকপিল দেবহৃতি সংবাদে—

মহ্যন্থেন ভাবেন ভক্তিং কুর্কন্তি যে দৃঢ়াম্ ।

মংকুতে ত্যক্তকর্মাণস্তত্ত্বজনবান্ধবাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

বিস্ময়জতি হৃদয়ং ন যশ্চ সাক্ষাদ্

হরিরবশাভিহিতোহপ্যঘোষনাশঃ ।

প্রণয় রশনয়া ধৃতাজ্জিহ্বপদঃ

স ভবতি ভগবত-প্রধান উক্তঃ ॥

“যিনি নিখিল বস্তুতে জড়াভীত অপ্রাকৃত ভূতগণের ভগবৎ-সেবোপযোগী সিদ্ধস্বরূপ দর্শন করেন এবং নিজ সিদ্ধস্বরূপের দ্বারা নিত্যসেবাপর ভূতসমূহ দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি ভাগবতোক্তম, অর্থাৎ মহাভাগবতগণের বহিস্মুখ-দৃষ্টির অভাব-নিবন্ধন সর্বত্রই শেব্য-সেবকভাবে অবস্থিত কৃষ্ণ-কাম্যদর্শন ।”

“যিনি সর্বদৃঢ়ে নিজ অস্তীষ্টদেবের সেবাময় ভাব দর্শন করেন, এবং তাঁহার অস্তীষ্ট-বস্তুতেই ভূতগণ সেবকরূপে অবস্থিত, ইহা নিত্য ভাবনা করেন, সজ্জনগণের মতে তিনিই ভগবত ।”

শ্রীকপিলদেব দেবহৃতিকে বলিলেন, যাঁহারা অনন্তভাবে অর্থাৎ কোন প্রকার ফলাহুসন্ধান না করিয়া প্রেমের সহিত আমার প্রতি সুদৃঢ়া ভক্তি করেন এবং আমার জগু সমস্ত কর্ম তথা স্বজন-বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তি যাজন করেন, তাঁহারাই সাধু ।”

“যাঁহার নাম অবশেও উচ্চারণ করিলে নিখিল পাতক অনায়াসে ধ্বংস হয়, সেই ভগবান্ বাসুদেব যে ব্যক্তির হৃদয় ত্যাগ না করিয়া প্রেমরূপ রজ্জ্বদ্বারা বদ্ধপদ হইয়া অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই ব্যক্তিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তিত ।”

মধ্যমা ও কনিষ্ঠা প্রেমৈকপরতার লক্ষণ-নির্ণয়ে শ্রীল সনাতন প্রভু মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভাগবতের শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন । যাঁহারা ঐরূপ ঐকান্তিকতাকে আদর করেন না, তাঁহারা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-পিপাসারূপ কপটতা-বর্জিত হইতে পারেন নাই । তাঁহাদের নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম উদিত হয় নাই । তাঁহাদের এক অদ্বয়তত্ত্ব ভগবানে প্রেম নাই । হরিপ্রেমৈকপরতা অপেক্ষা লোকৈকপরতাই তাঁহাদের অধিকতর উপাশ্র ।

শ্রীমদ্ব্যহাঙ্গপ্রভুও শ্রীতপনমিশ্রকে একান্ত হইয়া হরিভজনের উপদেশ দিয়াছেন,—

শুন, মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ ।

যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য ॥

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণভজ গিয়া ।
 কুটিনাটি পরিহরি' একান্ত হইয়া ॥
 সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল ।
 হরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনে মিলিবে সকল ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৪১-৪৩)

ভক্তকুল-চূড়ামণি নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

থণ্ড থণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ ।
 তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ।
 অশেষ দুর্গতি হয়, যদি যায় প্রাণ ।
 তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৪, ১৩৯)

ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,—

সেই 'শুদ্ধভক্ত,' যে তোমা ভজে তোমা লাগি' ।
 আপনার স্বথ-দুঃখে নহে ভোগ-ভাগী ॥
 তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ ।
 অচিরাত্ মিলে তাঁরে তোমার চরণ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২।৭৫-৭৬)।

ভগবান্ শ্রীগৌরানন্দদেব শ্রীমুরারীগুপ্তের নিষ্ঠার সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—

মুরারী-গুপ্তেরে প্রভু করি' আলিঙ্গন ।
 তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহেন, শুন ভক্তগণ ॥
 পূর্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বার বার ।
 পরম মধুর, গুপ্ত ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
 স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্বাংশী, সর্বাশ্রয় ।
 বিশুদ্ধ-নির্মল-প্রেম, সর্বরসময় ॥
 সকল-সদগুণ-বৃন্দ-রত্ন-রত্নাকর ।
 বিদগ্ধ, চতুর, ধীর রসিক-শেখর ॥
 মধুর-চরিত্র কৃষ্ণের মধুর-বিলাস ।
 চাতুর্য্য, বৈদগ্ধ করে যার লীলা-রস ॥
 সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয় ।
 কৃষ্ণ বিনা অক্স-উপাসনা মনে নাহি লয় ॥

এইমত বার বার শুনিয়া বচন ।
 আমার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন ॥
 আমারে কহেন,—আমি তোমার কিস্কর ।
 তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর ॥
 এত বলি' ঘরে গেল, চিন্তি' রাত্রিকালে ।
 রঘুনাথ-ত্যাগ-চিন্তায় হইল বিকলে ॥
 কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ !
 আজি রাত্রে প্রভু মোর করাহ মরণ !
 এই মত সর্ব-রাত্রি করেন ক্রন্দন ।
 মনে সোয়াস্তি নাহি, রাত্রি করেন জাগরণ ॥
 প্রাতঃকালে আসি' মোর ধরিল চরণ ।
 কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন ॥
 রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা ।
 কাড়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা ॥
 শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায় ।
 তব আজ্ঞা-ভঙ্গ হয়, কি করি উপায় !
 তাতে মোরে এই রূপা কর, দয়াময় ।
 তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয় ॥
 এত শুনি' আমি বড় মনে স্থখ পাইলু' ।
 ইহায়ে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈলু' ॥
 সাধু সাধু, গুপ্ত, তোমার স্তূট ভজন ।
 আমার বচনেহ তোমার না টলিল মন ॥
 এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায় ।
 প্রভু ছাড়াইলেহ, পদ ছাড়ান না যায় ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৩৭-৫৪)

শ্রীল সনাতন পোস্থামিপ্রভু শ্রীঅনুপমের রামনিষ্ঠার কথা এইরূপ বলিয়াছেন,—

সেই অনুপম-ভাই শিশুকাল হৈতে ।

রঘুনাথ উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে ॥

রাত্রি-দিনে রঘুনাথের 'নাম' আর 'ধ্যান' ।
 রামায়ণ নিরবধি শুনে, করে গান ॥
 আমি আর রূপ—তার জ্যেষ্ঠ-সহোদর ।
 আমা-দৌহা-সঙ্গে তেই রহে নিরন্তর ॥
 আমা-সবা-সঙ্গে কৃষ্ণকথা, ভাগবত শুনে ।
 তাহার পরীক্ষা কৈলু আমি-দুইজনে ॥
 “শুনহ, বলভ, কৃষ্ণ—পরম-মধুর ।
 সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রেম-বিলাস—প্রচুর ॥
 কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা-দুইহার সঙ্গে ।
 তিন ভাই একত্র রহিমু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥
 এইমত বারবার কহি দুইজন ।
 আমা-দুইহার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন ॥
 “তোমা-দুইহার আজ্ঞা আমি কেমনে লজ্জিমু ?
 দীক্ষা-মন্ত্র দেহ', কৃষ্ণ-ভজন করিমু ॥”
 এত কহি' রাত্রিকালে করেন চিন্তন ।
 কেমনে ছাড়িমু রঘুনাথের চরণ ॥
 সব রাত্রি ক্রন্দন করি' কৈল জাগরণ ।
 প্রাতঃকালে আমা-দুইয় কৈল নিবেদন ॥
 ‘রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা ।
 কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাণ্ড বড় ব্যথা ॥”
 ক্রূপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ' দুইজন ।
 জন্মে-জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ ॥
 রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায় ।
 ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি' যায় ॥’
 তবে আমি-দুইই তারে আলিঙ্গন কৈলু ।
 ‘সাধু, দৃঢ়ভক্তি তোমার’ কহি' প্রশংসিলু ॥
 গোসাঞি কহেন,—“এইমত মুরারি-গুপ্ত ।
 পূর্বে আমি পরীক্ষিলু তার এই রীত ॥
 সেই-ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ ।
 সেই—প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন ॥

জুর্দৈবে সেবক যদি যায় অস্ত-স্থানে ।

সেই ঠাকুর ধন্ত তারে চূলে ধরি' আনে ॥

(টৈ: চ: অ: ৪।৩০-৪৩, ৪৫-৪৭)

নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতা ব্যতীত প্রেমলাভ হয় না । নৈষ্ঠিক ব্যক্তিই প্রেমলাভ করিতে পারেন । শ্রীগৌরানন্দদেব বলিয়াছেন,—

ভুক্তি-মুক্তি আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয় ।

সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥ (টৈ: চ: ম: ১৯।১৭৫)

শ্রবণাদি-ক্রিয়া—তার 'স্বরূপ'-লক্ষণ ।

'তটস্থ'-লক্ষণে উপজয় প্রেমধন ॥ (টৈ: চ: ম: ২২।১০৩)

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ ।

মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥

সকলসাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥

'এক' অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে 'বহু' অঙ্গ ।

'নিষ্ঠা' হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥

(টৈ: চ: ম: ২২।১২৫-২৬, ১৩০)

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুকে নৈষ্ঠিক ভজন সম্বন্ধে শ্রীমন্নহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে ।

ভাল না পাইবে আর ভাল না পরিবে ॥

অমানী, মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে ।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥ (টৈ: চ: অ: ৬।২৩৬-৩৭)

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীৰ্তন ।

মাগিয়া পাঞা করে জীবন রক্ষণ ॥

বৈরাগী হঞা যেনা করে পরাপেক্ষা ।

কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥

বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস ।

পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বস ॥ (টৈ: চ: অ: ৬।২২৩-২৫)

জগদগুরু শ্রীরূপ-সনাতনের ঐকান্তিক ভক্তনের কথাও এইরূপ লিখিত আছে,—

“অনিকেত ছুঁহে, বন যত বৃক্ষপল্লব ।

এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন ॥

‘বিপ্রগৃহে’ স্থলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী ।

শুক-কটী-চানা চিবায় ভোগ পরিহরি’ ॥

করোঁয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্বাস ।

কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম; নর্ত্তন-উল্লাস ॥

অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারি দণ্ড শয়নে ।

নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন-প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে ॥

কতু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন ।

চৈতন্তকথা শুনে, করে চৈতন্ত-চিন্তন ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯:১২৭-৩১)

গৌরপার্বদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও জানাইয়াছেন,—

অন্ত অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞানকৰ্ম্ম পরিহরি,

কায়মনে করিব ভজন ।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা,

এই ভক্তি পরম কারণ ॥

মহাজনের যেই পথ তাহে হ’ব অনুরত,

পূৰ্ব্বাপর করিয়া বিচার ।

সাপন-স্মরণ-লীলা, হাতে না কর হেলা,

কায়মনে করিয়া স্মার ॥

অসংস্ক সদা ত্যাগ, ছাড়ি অন্ত গীতরাগ,

কন্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে ।

কেবল ভকত সঙ্গ, প্রেমকথা-রসরঙ্গ,

লীলাকথা ব্রজরসপুরে ॥

না করিহ অসংচেষ্টা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা,

সুদা চিন্ত গোবিন্দ-চরণ ।

সকল সন্তাপ বাবে, পরানন্দ সুখ পাবে,

প্রেমভক্তি পরম কারণ ॥

আপন ভজন-পথ, তাহে হব অনুরত,
ইষ্টদেবস্থানে লীলা গান ।

নৈষ্টিক-ভজন এই তোমারে কহিল তাই,
হনুমান্ যাহাতে প্রমাণ ॥

শ্রীহনুমান্জী বলিয়াছেন,—

শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদে পরমাত্মনি ।

তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ॥

ঐকান্তিকগণের জন্ত একমাত্র শ্রীভগবন্রাম-কীর্তন ও কীর্তনমুখে স্মরণই উপদিষ্ট হইয়াছে । কেননা, তাহাই আত্মার নিত্য-ধর্ম । শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সংক্ষেপে ঐকান্তিকগণের কৃত্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

প্রাক্ প্রেমভক্তিসম্পত্তেশ্চিহ্নানি লিখিতানি হি ।

তাগ্নেবৈকান্তিনাং প্রায়ো জ্ঞাপকানি বিদ্ববুধাঃ ॥

সর্বত্যাগেহপ্যহেয়া যাঃ সর্বানর্থভুবশ্চ তে ।

কুর্য়ুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমম্পর্শনে বরম্ ॥

উক্তমেকাদশে ভগবতা,—

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্বক্তো বানপেশ্বকঃ ।

সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্তা চরেদবিধিগোচরঃ ॥

একান্তিতাং গতানাং তু শ্রীকৃষ্ণচরণাঙ্কয়োঃ ।

ভক্তিঃ স্বতঃ প্রবর্তেত তদ্বিধৈঃ কিং ব্রতাদিভিঃ ॥

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ ।

সাধুনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেষুসাম্ ॥

তথা ব্রহ্মবৈবর্তে,—

যথা কথমপি শ্রীমান্ শ্রীকান্তং সমুপাশ্রিতঃ ।

কুরুতেহখিলপাপানাং প্রলয়ং কিং পুনর্ব্রতৈঃ ॥

বিষ্ণুরহস্তে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে—

ইন্দ্ৰিয়ার্থেষুসক্তানাং সর্দৈব বিমলামতিঃ ।

পরিতোষয়তে বিষ্ণুং নোপবাসোহজিতাত্মনঃ ॥

কিং তস্মৈ বহুভিস্তীর্থৈঃ স্নানহোমজপব্রতৈঃ ।

যেনৈন্দ্ৰিয়গণো ঘোরো নির্জিতোহহুষ্টিচেতসা ॥

জিতেন্দ্ৰিয়ঃ সদা শান্তঃ সর্বভূতহিতে রতঃ ।

বাসুদেবপরো নিত্যং ন ক্লেশং কৰ্ত্তু মরহতি ॥

যে স্মরন্তি সদা বিষ্ণুং বিম্বদেনান্তরাশ্রনা ।
 তে প্রযান্তি ভয়ং ত্যক্তা বিম্বলোকমনাময়ম্ ॥
 প্রভাতে চার্দ্ররাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে ।
 কীর্তয়ন্তি হরিং যে বৈ তে তরন্তি ভবার্ণবম্ ॥
 এবমেকাশ্রিনাং প্রায়ঃ কীর্তনং স্মরণং প্রভোঃ ।
 কুর্ক্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্ত্রম্ রোচতে ॥

তাৎপর্য :—ইতঃপূর্বে প্রেম-সম্পত্তির লক্ষণসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, সুধীগণ তাহাকেই একান্ত ভক্তগণের লক্ষণ বলিয়া জানেন, সকল ত্যাগ করিয়াও যাহা ত্যাগ করিতে পারা যায় না এবং যাহা অনর্থের মূল, সেই প্রতিষ্ঠাশারূপ বিষ্ঠার যাহাতে স্পর্শ না হয়, তদ্বিষয়ে সমধিক যত্ন করাই শ্রেয়ঃ । এইজন্ত শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, যিনি বাহু-বিষয়ে উদাসীন, যিনি সম্বন্ধ-জ্ঞাননিষ্ঠ, যিনি মুক্তি-কামনাকে উপেক্ষা করিয়া মদন্ত হন, তিনি ত্রিদণ্ডাদিসহ আশ্রমধর্মসমূহ বিসর্জনপূর্বক শাস্ত্রের বিধিনিষেধে নিরপেক্ষ হইয়া সর্বত্র হরিকীর্তন করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন । শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে একান্তভাবে পরিনিষ্ঠিত হইলে ভক্তি স্বতঃই প্রবর্তিত হইয়া থাকে, স্ততরাং তাঁহাদের আর ভক্তি-বিঘ্নকর ব্রতাদির অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি ? আমার ঐকান্তিক ভক্তগণ প্রকৃতির অতীত, তাঁহারা সমচিত্ত ও সাধু, বিধিনিষেধ-জনিত পাপ-পুণ্যাদি সেই অপ্রাকৃত পুরুষগণকে স্পর্শ করিতে পারে না । যে কোনরূপে শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই মানব শ্রী-যুক্ত হইয়া সমস্ত পাপ ধ্বংস করিতে পারে, স্ততরাং তাহাদের আর ব্রতাদির প্রয়োজন কি ? জিতেন্দ্রিয়গণের মতি শ্রীহরির প্রীতিকারিণী; অজিতেন্দ্রিয়গণের উপবাসাদি দ্বারা কিছু আত্যস্তিক মঙ্গল হয় না, কেননা সতত হরিসেবা-বিমুখ তাহাদের হরিপ্রীতি নাই ।

জিতেন্দ্রিয়ের পক্ষে তীর্থ-স্নান, হোম, জপ ও তপস্শরই বা আবশ্যক কি ? যিনি শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া হরিপ্রীতির জন্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশীভূত করিয়াছেন, যিনি সতত শান্ত, সর্বভূত-হিতৈষী ও হরিপরায়ণ তাঁহাকে কখনও ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না । যে সকল ব্যক্তি প্রাতঃকালে, অর্দ্ধরাত্রে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে হরিসঙ্কীর্তন করেন, তাঁহারা অনুষঙ্গিকভাবেই সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন । যে সকল একান্তি-ভক্ত এই প্রকারে পরমানন্দভরে শ্রীহরির কীর্তন ও স্মরণ করেন, অল্প কোন আনুষ্ঠানিক কৃত্যে তাঁহাদের রুচি হয় না ।

—শ্রীভক্তিবিলাস দীক্ষিত

শ্রীগুরুপাদপদ্ম

কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ

সর্বসম্ভোপকারকঃ ।

নিম্প্রহঃ সর্বতঃ সিদ্ধঃ

সর্ব-বিভা-বিশারদঃ ॥

সর্বসংশয় সচ্ছেদা-

হননসৌ গুরুরাহিতঃ ॥

কৃপার সাগর গুরু, ভক্ত-বাহু-কল্পতরু,

স্ব-স্বভাবে গুরু হ'ন পূর্ণ ।

পূর্ণ-বস্ত্র ভগবান, গুরুর হৃদয়-ধন,

তাঁ'র কিছু নাহিক অপূর্ণ ॥

গুরু সর্বগুণে গুণী, জীব-কল্যাণেতে তিনি

সচেষ্ট থাকেন নিরন্তর ।

অন্য স্পৃহা কভু তাঁ'রে পরশ করিতে নারে,

তাই তিনি নিম্প্রহ-অন্তর ॥

গুরুদেব সদবৈভ, সর্ব বিষয়েতে সিদ্ধ,

ভবরোগ নাশিতে নিপুণ ।

অভাব নাহিক তাঁ'র, সর্ব বিভা আছে যাঁ'র

হেন গুরু সর্বরাধ্য হ'ন ॥

সর্ববিভা বলে যারে ব্রহ্মবিভা কহে তারে

শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী নাম ।

শিষ্যের সন্দেহ চয় নাশিতে শক্তি হয়,

গুরুদেবে সদা পরণাম ॥

অলসতা নাহি যাঁ'র, অবিরাম সেবা তাঁ'র,

কৃষ্ণ-প্রীতি বিনা নহে চিত ।

হেন গুরু মহাজনে কর আত্ম-সমর্পণে,

কৃষ্ণপ্রেম পাবে সুনিশ্চিত ॥

—ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীভক্তিকুমুদ সন্ত

বস্তু-নির্ণয়

বস্তু শব্দটী বসু ধাতুতে সংজ্ঞার্থে 'তু' প্রত্যয় ক'রে নিষ্পন্ন হ'য়েছে, অর্থাৎ যা'র অস্তিত্ব আছে তা'কেই বস্তু বলা হ'য়ে থাকে। এই বস্তু বাস্তব ও অবাস্তব-ভেদে দু' প্রকার। বাস্তব-বস্তু মিত্যস্থিতিশীল ও চেতন, স্ততরাং Initiative নিতে পারেন, আর এর বিপরীতগুলিই অবাস্তব-বস্তু বা জড়বস্তু—Initiative নিতে পারে না। আবার বাস্তব ও অবাস্তব-বস্তু ত্রিবিধ লক্ষ্য করা যায়। 'তু' হচ্ছে ঈশ্বর, চেতন ও জড়।

ঈশিতা অর্থাৎ সর্বাধিক্রমিত্ব যা'তে আছে তিনিই ঈশ্বর। সমস্ত ঐশ্বর্য, বীৰ্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য তাঁ'তে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। তিনি পূর্ণ চেতন-বস্তু ও মায়াধীশ এবং যে ভূমিকায় অবস্থান করেন তাঁ'ও চেতন-ভূমিকা। তাঁ'র লীলার উপকরণাদি সমস্তই চেতন এবং সম্পূর্ণরূপে হেয়-বর্জিত; তিনি স্বরাট লীলাপুরুষোত্তম। তাঁ'র সমান বা তাঁ'র চেয়ে বড় কেউ নাই। তাঁ'র তটস্থ-শক্তিস্বরূপ অণুচেতন জীব তাঁ'র সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। তিনিই সকলের সেবা এবং জীব তাঁ'র সেবক, এক্ষেপে নিত্য যোগযুক্ত।

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভূত্যা।

যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥ (চৈ: চৈ: আ: ৫।১৪২)

স্ততরাং আমরা সকলেই স্বরূপতঃ তাঁ'র দাস এবং তাঁ'র সেবকস্বত্বে নিত্য বৈকুণ্ঠবাসী। ভোগবাহ্যমূলে আমাদের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ক'রে বর্তমানে যে জগতে এসে প'ড়েছি এটা সেই বৈকুণ্ঠ জগতেরই **Perverted reflection** অর্থাৎ হেয়-প্রতিফলন। স্ততরাং এখানকার যা' কিছু সবই হেয় ও নশ্বর, কোনটাই সর্বাঙ্গমন্দর নয়। এসমস্ত অবাস্তব বস্তুতে আসক্তি হ'লে দুঃখ ব্যতীত আর কিছু লাভ হয় না। ক্ষণিক জড়ানন্দ লাভ হ'লেও পরক্ষণেই দুঃখ দান ক'রে থাকে। স্ততরাং এখানে যা'কে মুখ ব'লে মনে করা যায়, সেটা দুঃখেরই ক্ষণিক নিবৃত্তিমাাত্র।

অনাদিকাল থেকে ভগবদ্বহিষ্মুখতাকলে ভগবন্মায়ী কর্তৃক আমরা এজগতে প্রেরিত হ'য়েছি,—**rectified** (সংশোধিত) হ'বার জন্ত। এস্থানটী জীবের কারাগার-সদৃশ। ছুট লোকদিগকে কারাগারে সংশোধনের জন্ত বহু প্রকারের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। স্ততরাং এই ভবকারাগারের রক্ষয়িত্রী দুর্গা বা মায়াদেবী আমাদিগকে নানাপ্রকারে ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধীভূত ক'রে সংশোধনের

চেষ্টা করেন। কিন্তু আমাদের ভোগ-প্রবৃত্তি এতই বেশী যে আমরা 'উটের কাঁটা খাওয়ার' স্থায় এই সংসারটাকে 'ভোগ ক'রবার জন্ত উঠে প'ড়ে লেগে গেছি, ফলে আমাদের বুদ্ধি মায়াকর্ষক এমনই আচ্ছন্ন হ'য়েছে যে ভগবানের সম্বন্ধে বর্তমানে কোন ধারণাই ক'রতে পারছি না। সর্বক্ষণ মায়িক-ধর্ম্মে অবস্থিত-ব'লে-মেপে নেওয়াটাই আমাদের স্বভাবগত ধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যে সমস্ত বস্তু আমাদের মেপে নেওয়া ধর্ম্মের jurisdiction এর মধ্যে আসে, সেগুলিকেই বস্তু ব'লে স্বীকার ক'রে থাকি, আর যেগুলি আমাদের আয়ত্নের বাইরে সেগুলিকে স্বীকার করি না। মায়িক-বুদ্ধির বশবর্তী হ'য়ে সবই মেপে নিতে চাই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা বুঝে নিতে চাই। এ জগতের এমন অনেক বস্তু আছে যা' শ্রোতপথে স্বীকার করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। ভ্রম, প্রমাদ, করুণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—এই দোষগুলি আমাদের স্থায় বদ্ধজীবমাত্রেরই আছে। বর্তমানে ইন্দ্রিয়গুলি যেভাবে তৈরী হ'য়েছে তা'তে জড়বস্তু ছাড়া আর কিছু দেখতে পারছি না বা বুঝতে পারছি না। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি defective অর্থাৎ অপটু; এক বুঝতে আর বুঝে ফেলে। হ' একটা দৃষ্টান্ত দিলে বেশ বোঝা যাবে। সম্মুখে একটা বৃহৎবস্তু থাকলে তা'র অপর পারের বস্তু দর্শন অসম্ভব। সেক্ষেত্রে আমি যদি মন্তব্য প্রকাশ করি যে ওদিকে কোন বস্তু নেই, তা' হ'লে সেটা আমার পক্ষে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হ'বে না। স্বর্ঘ্য অত্যন্ত বৃহৎ বস্তু, একখণ্ড মেঘ তাঁ'কে আচ্ছাদিত ক'রতে পারে না, বরং আমার ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয়কে আচ্ছাদিত ক'রতে পারে। আমি যদি মনে করি একখণ্ড মেঘ পৃথিবী অপেক্ষা চৌদলক্ষ-গুণ বৃহত্তর স্বর্ঘ্যকে আচ্ছাদিত ক'রেছে, তা'ও যুক্তিসঙ্গত হ'বে না। এরকম ভুরি ভুরি দৃষ্টান্তদ্বারা দেখান যেতে পারে যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কিরূপ defective. অতএব আমাদের এরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই জগতের জিনিষই যখন মেপে নেওয়া অসম্ভব, তখন বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের কথা আর কি ব'লব? তবে Serving temperament নিয়ে অর্থাৎ সেবাবুদ্ধি নিয়ে যদি অগ্রসর হ'বার চেষ্টা করা যায়, তা' হ'লে সেই অতীন্দ্রিয়-বস্তুর সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা হ'বে। কারণ শাস্ত্র বলেন,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্ৰাহমিচ্ছিয়ৈঃ ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব ক্ষুরত্যদঃ ॥ * (ভঃ রঃ সিঃ ২।১০২)

* অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষু কর্ণরসনাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং ক্ষুণ্ণিলাভ করেন।

বৈকুণ্ঠ-জগৎ জড়াতীত ও চিন্ময়; সুতরাং সেখানকার সংবাদ জানতে হ'লে সেখান হ'তে আগতজনের কাছে **Submissive attitude** নিয়ে অর্থাৎ শয়নাগতভাবে ও সেবাবুদ্ধি নিয়ে অগ্রসর হ'য়ে পরিগ্রহ ক'রলে এবং তিনি কৃপা ক'রে জানা'লে, জ্ঞান হ'তে পারা যাবে। এখানে শ্রবণেন্দ্রিয়ই একমাত্র পথ। সেখানে **challenging mood** অর্থাৎ তিনি আমাকে জানাতে বাধ্য বা আমি নিজ-চেষ্টায় জেনে' নিতে পারুব এরকম ধরণের চেষ্টা বা আরোহ-পথ কার্যকরী হ'বে না। কারণ সে বস্তু আমার মেপে নেওয়া ধর্মের বাইরে। সুতরাং বাস্তববস্তুদর্শনে একমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ই সহায়কারী।

ভগবান্ সচ্চিদানন্দ রস ও সর্বশক্তিমান্। সুতরাং আমাদের হৃদয়ের ভাব তিনি অবগত আছেন, তাঁ'র অজ্ঞাতসারে আমরা কিছু ক'রতে পারি না। আমরা **earnest seeker after truth** অর্থাৎ প্রকৃত সত্যাত্মসন্ধিস্থ হ'লেই তিনি কৃপা ক'রে আমাদের কাছে আত্ম-প্রকাশ ক'রে থাকেন, আর হৃদয়ে তিলমাত্র কপটতা থাকলে তিনি তা'ও ধ'রে ফেলতে পারেন।

আমরা অণুচৈতন্য জীব, বিভূচৈতন্য ভগবানের সেবা করাই আমাদের স্বরূপের ধর্ম। তাঁ'র পাদপদ্ম হ'তে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুণই আমাদের বর্তমান দুর্দশা উপস্থিত হ'য়েছে। এখন এই দুর্দশা উপলব্ধি ক'রে তাঁ'র (ভগবানের) সেবায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারলেই নিত্য-আনন্দের অধিকারী হ'তে পারা যাবে। **Transcendental plane**—অধোক্ষজ-ভূমিকায় না উঠতে পারলে **face to face** তাঁ'র দর্শন হয় না। আবার তাঁ'র কৃপা ছাড়া তথায় যাওয়াও যায় না। সুতরাং তাঁ'র কৃপা পা'বার জগ্ন আমাদের সর্বক্ষণ উৎকণ্ঠিত হ'তে হ'বে এবং নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধি নিয়ে অসংসঙ্গ ত্যাগ করতঃ সাধুসঙ্গ গ্রহণ ক'রে সাধন করতে হ'বে। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-রচিত এই শ্লোকটি এতৎসহ আলোচ্য,—

উৎসাহান্নিশ্চয়ান্বৈধ্যং তত্ত্বংকর্ম্যপ্রবর্তনাং।

সঙ্গত্যাগাং সতোবৃত্তে: ষড়্ভিত্তিক্তি: প্রসিদ্ধতি ॥ *

(উপদেশামৃত—৩)

জন্ম-জন্মান্তরের দুষ্কৃতির ফলে যে সমস্ত আবিলতা আমাদের হৃদয় অধিকার ক'রে র'য়েছে তা' হটাৎ যা'বার নয়। অরুণ ভগবান্ ও ভক্তের কৃপায় যে

* কৃষ্ণসেবায় উৎসাহ, সেবাবিষয়ে নিশ্চয়তা, কৃষ্ণসেবায় অচঞ্চলতা, কৃষ্ণ-সেবার উদ্দেশ্যে তত্ত্বদৃষ্টান, কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য সঙ্গ পরিবর্জন, কৃষ্ণভক্তের অনুসরণ—এই ছয় প্রকার অন্তর্গত ভক্তি বুদ্ধি হয়।

কোন মুহূর্তে এ সমস্ত ধ্বংস হ'তে পারে, কিন্তু তাঁদের অহৈতুকী কৃপা-সাপেক্ষ। সুতরাং তাঁকে দর্শন করিতে হ'লে মদন্তক পাদাঙ্গয়ে শাস্ত্রবিধি পালন ক'রে চলিতে হ'বে এবং যে মুহূর্তে তাঁর কৃপাদৃষ্টি আমাদের উপর পড়'বে সে মুহূর্তেই তাঁর কৃপালোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে তাঁকে দেখ'তে সক্ষম হ'ব। যেমন সূর্য্যের আলোকের সাহায্যেই সূর্য্যের দর্শন সম্ভব হ'য়ে থাকে তদ্রূপ। সূর্যালোক সকলের প্রতিই সমানভাবে পতিত হয়, যা'রা সেই আলোক পা'বার জন্ত উৎকণ্ঠিত হ'য়ে অপেক্ষা ক'রে থাকেন তাঁ'রাই উহা প্রাপ্ত হন, অপরে বঞ্চিত হয়। তদ্রূপ কৃপাময় ভগবান সকলের প্রতি সমানভাবেই কৃপা বর্ষণ করেন; যিনি যে পরিমাণে চা'ন তিনি সে পরিমাণে পেয়ে থাকেন। নিম্নলিখিত গীতারাক্যই তাহার প্রমাণ—

“যে যথা মাং প্রপদ্যতে তাং তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বস্তুভাবভক্তে মনুষ্যাঃ পার্থসর্কশঃ॥” (গীতা—৪।১১)

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ভগবানের আরাধনার কথা শাস্ত্রে লিখিত হ'য়েছে,—

“কৃতে যদ্ব্যয়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ।

দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাং॥” (ভাঃ ১২।৩।৫২)

অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যানযোগে, ত্রেতায় যজ্ঞদ্বারা, দ্বাপরে পরিচর্যা দ্বারা ভগবদারাধনা ক'রে যা' লাভ হ'য়ে থাকে, এই কলিযুগে ভগবান্নাম-সঙ্কীর্তন দ্বারা তাই লাভ হ'বে।

বর্তমান কাল কলি। ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণ অত্যন্ত বলবান্ এবং ভগবন্তজনের পথ কোটি কণ্টকদ্বারা রুদ্ধ। জীবগণ অন্নাগ্নি, মন্দবুদ্ধি প্রভৃতি নানাপ্রকারের দোষভূষ্ট। সুতরাং অতীত যুগের স্তায় এযুগে ভগবানের আরাধনা অসম্ভব দেখে স্বয়ং ভগবান্ ভক্তরূপ ধারণ ক'রে শ্রীধাম নুবদীপে শ্রীজগন্নাথ-শচীগৃহে শ্রীগৌরান্ধ নাম ধ'রে অবতীর্ণ হ'য়ে, আমাদের মঙ্গলের পথ দেখাতে গিয়ে ব'লেছেন, যে ‘কলিযুগের জীবের পক্ষে একমাত্র মঙ্গলময় ভগবান্নাম সংকীর্তনই পরম ধর্ম্ম।’ এটা তিনি নূতন আবিষ্কার করেন নি। সমস্ত শাস্ত্রই যে তারঃস্বরে এই কথাই ব'লেছেন তা' তিনি আচরণমুখে জগজ্জীবকে জানিয়েছেন। নাম-সঙ্কীর্তনের দ্বারা কতপ্রকার মঙ্গল সাধিত হ'তে পারে তা' তিনি নিজ-রচিত শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই ব্যক্ত ক'রেছেন। যথা,—

“চেষ্টাদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্কপণং।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিজ্ঞাবধুজীবনম্।

আনন্দাশ্রুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং ।

সর্বাত্মসম্পদং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনম্ ॥”

অর্থাৎ নামসংকীৰ্ত্তনের দ্বারা চিত্তরূপ দর্পণ মার্জিত হয়—আমাদের হৃদয় ভগবানের সেবাভিলাষ ছাড়া যে সমস্ত অজ্ঞাভিলাষ ও জ্ঞান-কর্মের বাসনায় ভরপুর র’য়েছে তা’ দূরীভূত হ’য়ে দর্পণের দ্বারা নির্মল হয়, ভবমহাদাগ্নি-সদৃশ ত্রিতাপ-জ্বালার অবসান হয়, পরম শ্রেয়োলাভ হয় ও চক্রেয় দ্বারা শ্লিষ্টতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভগবান্নাম সঙ্কীৰ্ত্তনই বিঘ্নাবধূ যে সরস্বতী, তাঁ’র জীবন-স্বরূপ অর্থাৎ পরা-বিঘ্নার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী সর্বক্ষণই সেই ভগবানের নামসঙ্কীৰ্ত্তনানন্দে নিমগ্ন। ইহাতে প্রতি পদে পদে আনন্দ-সমুদ্র বর্ধিত হয়, পূর্ণামৃত আশ্বাদনের বিষয় হয় এবং আত্মা এই আনন্দ-সমুদ্রে সর্বক্ষণ নিমজ্জিত থাকেন। সুতরাং শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনেই সর্বার্থসিদ্ধি হ’বে। এ জগতের জড়ানন্দ তাঁ’র কাছে তুচ্ছ মনে হ’বে। আনন্দের ভিত্তারী আমরা, নিত্যানন্দ লাভের আর দ্বিতীয় কোন পথ নাই। সদগুরু-পাদপদ্ম হ’তে দীক্ষা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ ক’রে তৃণাপেক্ষা স্থনীচ, তরুর দ্বারা সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হ’য়ে সর্বক্ষণ হরিকীৰ্ত্তনে মগ্ন থাক’লে ‘দুনিয়াদারীর’ সব কথা থেমে যা’বে, সমস্ত অভাবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যা’বে, পরম মঙ্গল সাধিত হ’বে। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সমস্ত শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ না ক’রে দুনিয়ার মরণশীল ও ভ্রমপ্রমাদাদি দোষদুষ্ট জীবের উপদেশ গ্রহণ ক’রলে কোন বাস্তব মঙ্গল হ’বে না, কেবল বর্ধিত হ’য়ে যেতে হ’বে।

চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক’রতে ক’রতে এই দুর্লভ মহাশয় জন্ম লাভ হ’য়েছে। এই মহাশয় জন্মটা কেবল ভগবদ্ভজনের জন্ত, অজ্ঞ কোন কাজের জন্ত নয়। এরূপ দুর্লভ জন্ম লাভ ক’রেও যদি পশুর দ্বারা আহাৰ, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যয়িত হয়, তা’ হ’লে শ্রেয়োলাভের আর সময় কোথায়? থাওয়া-দাওয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ সকল জন্মেই পাওয়া যা’বে, এটা ত’ reserved র’য়েছেই, সুতরাং এগুলির জন্ত চেষ্টা ক’রে বৃথা সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমান্ মহাশয়ের কোন রকমেই উচিত নয়। এ জগতে আমরা ক’দিনের জন্ত এসেছি, পরেই বা কোথায় যাব, তা’র সন্ধান করা দরকার। এ স্থানটা আমাদের permanent abode অর্থাৎ নিত্য-বসতিস্থল নয়। আজ বা কাল বা দু’দিন পরেই হো’ক্ আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন ঐশ্বরিক শক্তি আমাকে জোর ক’রে এখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অতীত ফেলে দেবে। সুতরাং এখানে খুঁটা গে’ড়ে নিত্য কালের জন্ত

অবস্থান ক'রবার চেষ্টা বৃথা—পশুশ্রম মাত্র। এই পরিবর্তনশীল জগতের পরিবর্তন প্রত্যহ চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তথাপি মোহাক্ষ জীব সেই অনিত্য বস্তুগুলিকেই আঁকড়ে ধ'রবার জ্ঞান ছুটোছুটি ক'রছে, ফলে কি লাভ ক'রছে তা' তলিয়ে দেখ'বারও সময় পর্য্যন্ত পায় না। অধিকন্তু কেউ ভগবদ্ভজন ক'রলে তাঁ'কে হীনচক্ষে দর্শন করে। এ'টা আমাদের দুর্দৈব ছাড়া আর কি? জগতের বিচারে আমরা খুব শিক্ষিত ও বড় বুঝ'দার হ'তে পারি, এবং সেজ্ঞা খুব লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাও সংগ্রহ ক'রতে পারি; কিন্তু তা'র মূল্য কতটুকু, ক'দিনের জ্ঞান এসমস্ত স্থায়ী হ'বে, তা' চিন্তা করি না। দু'দিন পরে সব ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। কিন্তু হরিভজনকারী একরূপ অনিত্য-জিনিষে প্রমত্ত থাকেন না। তাঁ'রা জানেন এ জগৎটা আমার ভোগের জ্ঞান নয়। একমাত্র ভোক্তা স্বরাট পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান, আর বাদবাকী সব তাঁ'র সেবার উপকরণ। স্নতরাং সমস্ত বস্তুদ্বারা তাঁ'রই সেবা ক'রে থাকেন এবং নিজ জীবন-ধারণ জ্ঞান যতটুকু দরকার সেইটুকু তাঁ'র প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ ক'রে থাকেন। এ'দের জীবন-ধারণ ভগবৎসেবার জ্ঞানই জানতে হ'বে, বন্ধজীবের স্থায় ভোগের জ্ঞান নয়। সমস্ত বস্তুতেই তাঁ'দের ভগবদর্শন থাকায় তা'র প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে কোন সুখ বা দুঃখ হয় না। তাঁ'রা ভগবানের উপর নির্ভরশীল, তজ্জ্ঞান সর্বক্ষণ নিত্যানন্দে মগ্ন থাকেন। বিষয়-মদাক্ষ জীবগণ এ সমস্ত বিষয় বুঝে উঠতে পারে না বা বুঝ'বার চেষ্টাও করে না। জগতের লোক কি চিরদিনই একরূপ মোহাক্ষকারে প'ড়ে থাকবে? এ সব জিনিষ কি একবারও তা'রা বুঝ'বার চেষ্টা ক'রবে না?

নির্মৎসর সাধুগণ জীবের মঙ্গলের জ্ঞান দ্বারে দ্বারে গিয়ে হরিকথা কীর্তন ক'রে তা'দিগকে স্বরূপে উদ্ধৃত্ত ক'রবার জ্ঞান কত চেষ্টা ক'রছেন। তাঁ'রা জগতে এত বড় জিনিষ দিতে ব'সেছেন যা', চতুর্দিশ-ভুবনের কোন জিনিষের সঙ্গে তুলনাই হ'তে পারে না। সেজ্ঞা এই সাধুগণই প্রকৃত বদান্ত। কিন্তু এ'দের বদান্ততা ভোগাসক্ত জীব দেখতে পায় না,—

“দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।

উল্কে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥” (চৈ: চ: আ: ৩।৮৫)

বিষয়মদাক্ষ সব কিছুই না জানে।

বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥” (চৈ: ভা: ম: ২।২৪১)

সাধুগণ কর্তৃক প্রচারিত নিছক সত্যকথা যদি কখনও তা'দের কানে প্রবেশ ক'রবার সুযোগ হয়, তা' হ'লে তা'রা একদিন না একদিন এর উপাদেয়তা

উপলব্ধি ক'রবার সুযোগ লাভ ক'রবে। তখন তা'রা বুঝতে পারবে যে পরম-শ্রেয়ঃ লাভের জন্য যত্ন করাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র সার্থকতা।

ভগবানের অনুশীলন বাদ দিয়ে যা' কিছু করা যা'বে সবই বন্ধনের কারণ হ'বে এবং কালের করাল-কবলে প'ড়ে বিপন্ন হ'তে হ'বে। বাস্তব ও অবাস্তব বস্তুর অনুশীলনমুখে অবাস্তব বস্তুর হেয়ত্ব উপলব্ধি ক'রে বাস্তব-বস্তু একমাত্র ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে জীবন ধন্য করাই প্রকৃত বস্তু-নির্গম।

—শ্রীকৃষ্ণকারণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্তিমণ্ডপ

কার্য্যাধ্যক্ষ ও সহঃ সম্পাদক

পত্রিকা-প্রশস্তি

(ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমৎ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজের পত্র)

শ্রী শ্রীভাগবত চরণে দণ্ডবন্দতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

কেশব মহারাজ ! নব বর্ষের দণ্ডবৎ গ্রহণ করুন। আপনার নব নব উদ্ভাবনী শক্তি প্রচার-কার্য্যে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। গত পরিক্রমায় সুবন্দোবস্তের কথা শ্রীমান্ সুবোধের পত্রে জ্ঞাত হইয়াছি। প্রথিত-যশা আপনি, আপনার কৃতিত্বের কথা কেইবা না কীর্ত্তন করেন। বাঞ্ছা না করিলেও অবাঞ্ছিতভাবে প্রতিষ্ঠা আপনার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে বিরত নহে। এতাদৃশী মহিমান্বিত হইয়াও মাদৃশ বরাকের প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি তুল্লভ হইলেও শুলভ দেখিতেছি।

পত্রিকা-প্রশস্তি

পরমারাধ্য প্রভুপাদ পতিত-পাবন।

প্রচ্ছদ পটে পাঠকের তুল্লভ দর্শন ॥

যাঁহার স্বরণে সর্ব্ব বিষ় বিনাশন।

অনায়াসে ভবক্ষয় পায় প্রেমধন ॥

শিরোভাগে শ্রীশের আয়ুধ সকল।

কলি-কলুষ বিনাশিতে ধরে সর্ব্ববল ॥

পদ্ম-গদা-শঙ্খ-চক্রে পত্নী সুশোভিত ।
 মধুর মৃদঙ্গ অঙ্কে গোড়ীয় অঙ্কিত ॥
 শিরোদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগবতের বাণী ।
 সম্পাদক সঙ্কেতে এঁকেছে হৃদয়খানি ॥
 ভগবানে ভক্তি বিনা সব পণ্ডশ্রম ।
 দুই পার্শ্বে দুই চরণে বাণী সর্বোত্তম ॥
 ঐশ্বর্য্য-ঔদার্য্য-মাধুর্য্যের উদ্দেশ ।
 মঙ্গল আচরণে তার হয় সমাবেশ ॥
 কাগজ, কালী, ছাপাদি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ।
 অক্ষরেতে কৃষ্ণ-কারণ্য ক্ষরে নিরন্তর ॥
 ধন্য ধন্য কার্য্যাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী বর ।
 ভক্ত্যালোকে ভক্তি-মণ্ডপ সদা শোভাকর ॥
 প্রবন্ধে নিবন্ধে পত্নী হয়ে সুসজ্জিত ।
 প্রতিষ্ঠাতার প্রজ্ঞান করে বিঘোষিত ॥
 প্রতি পক্ষে পত্নী যদি হন প্রকাশিত ।
 সুপ্ত-জীবের লুপ্ত-ধর্ম্ম হয় জাগরিত ॥
 হেন পত্নী পাঠাইয়াছ অনুগ্রহ করি ।
 কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ তাহা সদা যেন স্মরি ॥

পত্রোত্তরে আপনাদের কুশল প্রার্থনা । ইতি—

বৈষ্ণব দাসাতাস—শ্রীভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

প্রচার-প্রসঙ্গ

মেদিনীপুর জেলায় কেশিয়াড়ী গ্রামে :—

এই স্থানে শ্রীগৌরান্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন । বর্তমানে শ্রীবিগ্রহগণ যে গৃহে অবস্থিত আছেন তাহারই নিকটবর্তী সমুখস্থিত প্রাঙ্গণে গ্রামস্থ ভক্তবর শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তন্দর মহাপাত্র মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে একটি সুন্দর উচ্চ মন্দির নিৰ্ম্মিত হইতেছেন । সমাপ্তি-কার্য্য সামান্তের জন্তই অবশিষ্ট রহিয়াছে । মহাপাত্র মহাশয় কর্তৃক অল্পদিন মধ্যেই ইহা সম্পন্ন হইয়া যাইবেন ।

উক্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি কুমুদ সন্ত মহারাজ পূর্ব পূর্ব বৎসরের স্থায় এ বৎসরও বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে সর্বত্র ভক্তবৃন্দকে সাদরে আহ্বান করেন। তাঁহার সাদর আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ এ বৎসর তথায় শুভবিজয় করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্বস্ব গিরি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি গৌরব বৈখানস মহারাজও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বৃন্দাবন, টাটানগর, গঙ্গাম এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু গণ্যমান্য ভক্তগণ আগমন করিয়াছিলেন। বিগত ৮ই বৈশাখ ১৩৫৬, ২১শে এপ্রিল ১৯৪৯, বৃহস্পতিবার উৎসবটী অনুষ্ঠিত হয়। কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টির উৎপাত থাকিলেও অনুষ্ঠানটী সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ অতি যত্নে প্রচুর সেবাকরণ সংগ্রহ ও সুদৃশ্য অধিবেশন-মণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। অপরাহ্নে শোভাযাত্রা সহযোগে চৌদ্দমাদলের বিরাট নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন বাহির হয়।

সন্ধ্যার পর মঠের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। মাননীয় শ্রীপাদ সন্ত মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীমদ্ভক্তি সর্বস্ব গিরি মহারাজের অনুমোদনে শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার নিয়ামক ও প্রতিষ্ঠাতা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে ৬ইটী শিশু-ব্রহ্মচারী উদ্বোধন সঙ্কীৰ্ত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের রূপা ভিক্ষা করেন। সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশক্রমে শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ শ্রীগৌরঙ্গ মঠের উদ্দেশ্য বর্ণনা ও তাঁহার সেবার একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণী প্রদানমুখে বক্তৃতা এবং শ্রীমঠের পৃষ্ঠপোষকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীপাদ গিরি মহারাজ বক্তৃতায়, ধর্মবিরোধী-ভাবসমূহ ও ভগবদনুশীলন-বর্জিত সুখচেষ্টা যে অতীব গর্হণীয়, তদ্বিষয়ে স্মৃতিপূর্ণ আলোচনা করেন। শ্রীপাদ বৈখানস মহারাজ ভক্তিধর্মের বিচারমূলে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অবশেষে সভাপতি মহোদয়, নিত্য মঙ্গল বিধানে কর্মের অসম্প্রদায়তা, উপাসকের ভূমিকার পার্থক্যহেতু ফললাভেরও পার্থক্য এবং কর্ম-জ্ঞানাদি হইতে ভগবদ্ভক্তির উৎকৃষ্টতা বিষয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলে অধিবেশনকার্য্য সমাপ্ত হয়। তৎপর সমাগত সহস্রাধিক ভক্তগণ ও গ্রামবাসীগণকে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হইলে লোক সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইত যে সামলান দায় হইত। যাহা হউক, শ্রীগৌরঙ্গ মঠের এই সাধু-প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করুক—ইহাই আমরা প্রার্থনা করি।

সাঁওতাল পরগণা জেলার অন্তর্গত মধুপুরে :—

গত ১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার হইতে ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ শনিবার পর্য্যন্ত সাঁওতাল পরগণার অধীনস্থ মধুপুর সহরে স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্ততম প্রচারক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল মহোদয় পার্টিসহ প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীহরিসঙ্কীর্তন করিয়া তত্রস্থ সজ্জনবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীযুত সুরেন্দ্র কুমার বসু, আমিন, পাথরোল এষ্টেট; শ্রীযুত গুরুপদ চট্টোপাধ্যায়, গুড্‌স ক্লার্ক; শ্রীযুত গৌরপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ বসু, রিটার্ডেড শ্রেনশপ; শ্রীযুত অবনী মোহন মুখার্জি, আই, ডব্লিউ; পরলোকগত রায়সাহেব মতিলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত ফনীভূষণ সেন, শ্রীযুত রামলাল সাউ, শ্রীযুত আর, এন, বল, স্থানীয় উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত মুক্তিনাথ পত্রলেখক এবং উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত রামলাল বাবু প্রভৃতি সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুব বিমল প্রেমধর্ম প্রচারের সহায়তা করিয়া সমিতির ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। রাণী টিকয়িটনী ফলদানী কুমারী—ঘাটওয়ালী, পাথরোল এষ্টেট, পণ্ডিতজীর শাস্ত্রযুক্তিমূলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে প্রীতিলাভ করেন ও প্রচারকার্যে বিশেষ সহায়তা করেন।

মোহজুরী ও মার্গমুণ্ডায় :—

৮ই জ্যৈষ্ঠ ববিবার পণ্ডিতজী পার্টিসহ মধুপুর হইতে প্রায় ২ মাইল দূরবর্তী মোহজুরী গ্রামের শ্রীশ্রীরামসীতা মন্দিরে শুভবিজয় করিয়া তত্রস্থ ভক্তমণ্ডলীর আগ্রহে শ্রীহরিসঙ্কীর্তন ও ভাগবত-ধর্ম প্রচার করিয়া সকলকে নিত্যমঙ্গললাভে উদ্বুদ্ধ করেন। পরে মার্গমুণ্ডা গ্রামে বিশিষ্ট সজ্জন ও শ্রীশ্রীরামসীতাজীর সেবক শ্রীযুত বাবুলাল সাউ ও শ্রীযুত রামলাল সাউ মহোদয়গণের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্তন করিয়া তাঁহাদের ও গ্রামস্থ সজ্জন ভক্তমণ্ডলীর আনন্দ বিধান করেন। ব্রহ্মচারীজীর সুসিদ্ধাস্তপূর্ণ শাস্ত্রব্যাখ্যা ও স্থূললিত কীর্তন শ্রবণে তাঁহারা ধর্মজগতের অভিনব পরম নিত্যকল্যাণময়ী বার্তার আভাস লাভ করিয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং প্রতি বৎসরই যাহাতে তাঁহারা ঐরূপভাবে ভগবৎকথা আলোচনার সুযোগ পান তদ্বিষয়ে অনুরোধ করেন।

শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসবে আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় ঈর্ষ,

চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ,

জেঃ হুগলী (পশ্চিম বঙ্গ)

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬, ইং ২১।৫।৪৯

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যকুলতিলক ঔবিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে আগামী ১২ই আষাঢ়, ১৩৫৬, ইং ২৬শে জুন, ১৯৪৯, রবিবার হইতে ২১শে আষাঢ়, ১৩৫৬, ইং ৫ই জুলাই, ১৯৪৯, মঙ্গলবার পর্যন্ত দশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীৰ্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ আরাট্রিক, মহা-প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যানুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদানুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্তকুপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :— কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্ত্ৰি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১২ই আষাঢ়, ২৬শে জুন রবিবার অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ঔষিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্তন**।

১৩ই আষাঢ়, ২৭শে জুন সোমবার **নগর-সংকীৰ্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ, ও গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন, গঙ্গাতীরে কীর্তন ও স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন, পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা**।

১৪ই আষাঢ়, ২৮শে জুন, মঙ্গলবার **শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**। সংকীৰ্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীগুণ্ডিচা বাড়ী শ্রীশ্রামসুন্দর মন্দিরে গমন—পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত। পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও কীর্তন**।

১৫ই ও ১৬ই আষাঢ়, ২৯শে ও ৩০শে জুন বুধবার ও বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাজ লীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

১৭ই আষাঢ়, ১লা জুলাই, শুক্রবার **হেরাপঞ্চমী** দিবসে **শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব**। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রামসুন্দর মন্দিরে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সংকীৰ্ত্তন**। অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্তন**।

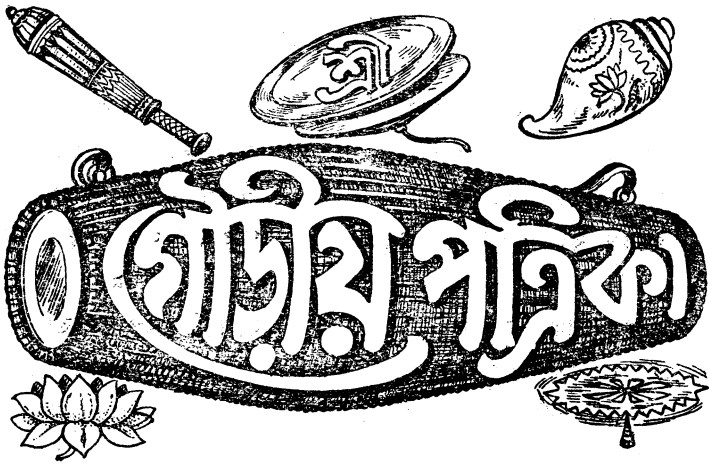
১৮ই আষাঢ়, ২রা জুলাই, শনিবার হইতে ২০শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই, সোমবার পর্য্যন্ত তিন দিবস প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্র ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীমদ্ব্যহাঙ্গভূর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

২১শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই, মঙ্গলবার **সংকীৰ্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত। পরে আরাত্রিকান্তে **সর্বসাদারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ**।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্মঃ স্মৃষ্টিতঃ পুংসাং বিশ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ ।

নোংপাদয়েদ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥
অত্র ধর্ম স্মৃষ্কপে পালে যেই জন । হরি কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১ম বর্ষ } ক্ষীরোদশায়ী, ৬ শ্রীধর, ৪৬৩ গৌরাঙ্গ { ৫ম সংখ্যা
 } শনিবার, ৩২ আষাঢ় ১৩৫৬, ইং ১৬।৭।৪৯ {

শ্রীশ্রীপ্রভুগাদাষ্টকম্

(১)

আনন্দসচ্চিদ্বন্দেবমুন্নি-
ব্রহ্মাণ্ড-সম্মণ্ডিতশুদ্ধকীর্তিঃ ।
সংসারসিদ্ধ-তুরণৈকপোতঃ
পশ্চেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্ ॥

(২)

প্রতপ্তচামীকরগৌররূপঃ
সদ্বক্তিসিদ্ধান্তবিচারভূপঃ ।
শ্রীবৈষ্ণবাচাধ্যসমাজরাজঃ
পশ্চেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্ ॥

(৩)

গৌড়ীয়গৌড়ীগণপ্রাণবন্ধুঃ
 প্রপন্নহুঃখার্ভপ্রসাদসিন্ধুঃ ।
 বিতণ্ডিপাষণ্ডিপ্রচণ্ডদণ্ডঃ
 পশ্চেম কিং তং প্রভূপাদপদম্ ॥

(৪)

শ্রীরাধিকাপ্রেমতড়াগহংসো
 হংসবিজপ্রাজ্জকুলাবতংসঃ ।
 সংকীৰ্ত্তনপ্রেমমধুপ্রমত্তঃ
 পশ্চেম কিং তং প্রভূপাদপদম্ ॥

(৫)

চণ্ডালশূদ্রাধমভক্তিশব্দঃ
 সৰ্ব্বংসহাবন্দ্যপদারবিন্দঃ ।
 প্রেমাক্ষিচন্দ্রো ভজ্ঞনদ্রকন্দঃ
 পশ্চেম কিং তং প্রভূপাদপদম্ ॥

(৬)

গৌরাদ্ভগোবিন্দবরেণ্যভক্তো
 বিশুদ্ধসঙ্কর্মপ্রচাররক্তঃ ।
 রাধাযশোগানসহস্রবক্তৃঃ
 পশ্চেম কিং তং প্রভূপাদপদম্ ॥

(৭)

বেদান্তবেদাঙ্গপূরণদক্ষো
 বিখণ্ডিতপ্রাজ্জকুতর্কলক্ষঃ ।
 শাস্তপ্রশান্তোপরতান্নিষ্ঠঃ
 পশ্চেম কিং তং প্রভূপাদপদম্ ॥

(৮)

হরেঃ কথাযাত সমস্তযামো
 রোমাঞ্চকম্পাশ্রমুদাভিরামঃ ।
 শ্রীধামমায়াপূরবাসযত্নঃ
 পশ্চেম কিং তং প্রভূপাদপদম্ ॥

(৯)

হা কাসি মৎপ্রাণপ্রভো ! ক গুপ্তো
 গৌরাখ্য-দাসস্তবহুঃখতপ্তঃ ।
 প্রপন্নভক্তাতিহরস্বমেব
 দ্রক্ষ্যামি কিং চন্দ্রমুখং সন্ধ্য তে ॥

(১০)

হে দীনবন্ধো ! করুণৈকসিন্ধো !
 কুরু প্রসাদং ! ময়ি মন্দমূঢ়ে !
 লক্ষ্যপরাধে বহুপাপগাঢ়ে !
 তৎপাদপদ্যেহস্ত মতিশ্চ কৃক্ষে ॥

চন্দ্রবাববেদবিমিতে গৌরাদ্ভে সৌরপৌষশ্রু ষষ্ঠবাসরে শ্রীপাদ-গৌরদাস-
 ব্রজ্জচারি-কাব্য-ব্যাকরণতীর্থেন বিরচিতম্ ।

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদাষ্টকের বচনানুবাদ

যিনি সচ্চিদানন্দ শ্রীবলদেববিগ্রহ, ব্রজাণ্ডে ষাঁহার অলৌকিক বিশুদ্ধ কীৰ্ত্তি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, যিনি জীবগণের সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারের একমাত্র বৃহৎ নৌকাশ্রয়, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥ ১ ॥

যিনি অগ্নিদগ্ধ স্ববর্ণের ত্রায় গৌরবর্ণ, যিনি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বিচারের নৃপতি, যিনি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের রাজা, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥ ২ ॥

যিনি গৌড়ীয় ভক্তগণের প্রাণের বন্ধু, যিনি শরণাগত দীনহুঃখিগণের প্রতি অল্পগ্রহের সাগর, যিনি কুতর্কিক-ধর্ম্মধ্বজি-পাষাণিগণের প্রতি প্রচণ্ড দণ্ড-বিধানকারী, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥ ৩ ॥

যিনি শ্রীরাধিকার প্রেমসরোবরের হংস, যিনি পরমহংস, বিপ্র ও পণ্ডিতগণের শিরোভূষণ, যিনি নামসংকীর্ণনের প্রেমরূপ মত্তপানে প্রমত্ত, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥ ৪ ॥

যিনি চণ্ডাল ও শূদ্রাধমগণকে ভক্তিরূপ মঙ্গলপ্রদাতা, বাঁহার পাদপদ্ম সমগ্র জগতের বন্দনীয়, যিনি প্রেম-সাগরের চন্দ্র এবং ভজনরূপ তরুর মূল, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥ ৫ ॥

যিনি গৌরান্ধ-গোবিন্দের নিত্যসিদ্ধ পার্শ্বদ-প্রধান, যিনি বিশ্বক্ৰ ভক্তিদর্শ প্রচারে সর্বদা অম্বরক্ত, যিনি শ্রীরাধিকার গুণাবলী কীর্ত্তনে সহস্রবদন, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥ ৬ ॥

যিনি বেদান্ত, বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিকৃষ্ট, জ্যোতিঃশাস্ত্র) ও পুরাণশাস্ত্রে নিপুণ, যিনি পণ্ডিতাভিমানী প্রাকৃত পণ্ডিতগণের কুতর্করাশি খণ্ডনকারী, যিনি শমগুণযুক্ত, প্রশান্ত, বিষয়বিরক্ত, ও পরমাত্মনিষ্ঠ, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥ ৭ ॥

বাঁহার শ্রীহরিকথাকীর্ত্তনে অষ্টপ্রহর অতিবাহিত হইত, যিনি হরিকথাকীর্ত্তনে রোমাঞ্চ, কম্পাশ্র ও হর্ষাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকারে বিবশ হইয়া পড়িতেন, যিনি শ্রীধাম মায়াপুরবাসে পরমানন্দিত হইতেন, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥ ৮ ॥

হা! হা! আমার প্রাণের প্রভু! আপনি কোথায়? অকস্মাৎ আপনি কোথায় লুপ্ত হইলেন? এ অধমদাস আপনার বিরহ-দুঃখে অমৃতশূন্য, আপনি শরণাগত ভক্তগণের একমাত্র আর্তিনাশকারী, অতএব শরণাগত আমি একবার কি আপনার ঐ চন্দ্রবদন দেখিতে পাইব? ॥ ৯ ॥

হে দীনজনের বন্ধু, হে গুরুদেব, আপনি করুণার একমাত্র সিন্ধু, অতএব আমি মহামূর্খ, বহু অপরাধী, বহুপাপে অভিভূত আমায় আপনি কৃপা করুন, যেন আপনার পাদপদ্মে ও কৃষ্ণের প্রতি মতি থাকে ॥ ১০ ॥

অর্থ ও অনর্থ

রুচি ও বিশ্বাসভেদে অর্থের তারতম্য

অর্থ ও অনর্থ-নিরূপণ বিষয়ে মানবের রুচিভেদে, বিশ্বাসভেদে মিমাম্বসা ভিন্ন ভিন্ন। অত্যাভিলাষীর অর্থ কন্মী ও জ্ঞানীর অর্থের সহিত এক নহে; আবার ভগবদ্ভক্ত পূর্বোক্ত তিন সম্প্রদায়ের সহিত এক হইতে পারেন না। তাঁহার ধারণা অভক্তগণ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতেও অসমর্থ।

অর্থের স্বরূপ-নিরূপণ

সাধুগণ বলেন ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবমাত্রেরই অর্থ। কৃষ্ণ ব্যতীত অত্ৰ বস্তুর ধারণা মায়িক, স্ততরাং কৃষ্ণেতর বস্তুই অনর্থ। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবের একমাত্র অর্থ হইলেও তাঁহার প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীবলদেব এবং শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রতুম্, অনিরুদ্ধ ব্যূহচতুষ্টয়, কারণদোকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী, মংশ-কুশ্মাদি নৈমিত্তিক অবতারসমূহ বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া তাঁহারাও অর্থ। কৃষ্ণের বিলাস, সহচর, তদ্রূপ-বৈভব, গোলোকাদি ধামসমূহ, কৃষ্ণোন্মুখ জীবাদি নিত্যসিদ্ধ পার্শ্বদসমূহও অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

অনর্থের স্বরূপ-নিরূপণ

যেখানে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই, সেখানে অর্থ বা অর্থ্যভাব পরিদৃষ্ট হয়; তাহাই জীবের বিষয় বলিয়া অভিহিত হয়। বিষয়ের মধ্যে অর্থ বা কৃষ্ণ নাই; যেখানে কৃষ্ণ বা অর্থ আছেন তথায় অনর্থ-স্বরূপ সংসার বা বিষয় নাই। কৃষ্ণসংসারে অনর্থ বা বিষয় নাই, কৃষ্ণবিমুখ জীব অর্থহীন হইয়া বিষয়রূপ অনর্থের সেবায় দিনাতিপাত করেন। কৃষ্ণপ্রেম—রত্নসদৃশ মহাধন, বদ্ধজীবের বিষয়—অনর্থ বা অধন। জীব কৃষ্ণসেবা বিমুখ হইলে অনর্থ প্রবৃত্ত হন এবং কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিজ ভোগকেই বহুমানন করেন। সাংসারিক অনর্থজড়িত জীব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের প্রকৃত মঙ্গল করিতে পারেন না; মঙ্গলের জ্ঞান ধাবিত হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণসেবা তুলিয়া বান; তজ্জগত তাহার আর দুঃখের সীমা থাকে না।

অনর্থ-মুক্তির উপায়

সংসারদুঃখমগ্ন জীব দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে অসংখ্য প্রকার যত্ন করেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সফলপ্রয়াস হন না। জীব নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বিষয় হইতে বিরত হইবার বাসনা করেন, কিন্তু তিনি কোন প্রকারেই বিষয়ের

হস্ত হইতে রক্ষা পান না। যে-কাল পর্যন্ত না তিনি কৃষ্ণের শরণাগত হন, তৎকালবধি তাঁহার অনর্থের হস্ত হইতে রক্ষা নাই।

অত্যাভিলাষ, কৰ্ম্ম, জ্ঞানের দ্বারা অনর্থ-নিবৃত্তি হয় না

একসময় এই জীব সুখান্বেষী হইয়া বাহাতে তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণ সিদ্ধ হয় তৎক্ষণাৎ স্বর্গ ও মর্ত্যভূমি প্রকল্পিত করিতে ক্রটি করেন না [অত্যাভিলাষ]। কখনও বা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আমৃতিক সুখান্বেষণে জৈমিনির শরণাগত হন, মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রের সেবা করেন এবং নৈতিক-চরিত্র উন্নত করিবার বাসনা করেন [কর্ম্ম]। কোন সময় জীব বেদান্তাদি শাস্ত্রকুশল হইয়া কোপীন্দ্র গ্রহণপূর্বক যতিধর্ম্মে অবস্থিত হন এবং আপনাকে নির্ব্বষী জীবমুক্ত মনে করিয়া অহংগ্রহোপাসনায় নিযুক্ত করেন [জ্ঞান]। এত করিয়াও তাঁহার অনর্থ-নিবৃত্তি হয় না।

পাশ্চাত্য দার্শনিক মতানুসরণে অনর্থ-নিবৃত্তি হয় না

জ্ঞান-মদে মত্ত হইয়া হেগেল, ক্যান্ট, সপেনহায়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক চিকিৎসকবর্গের অধীন হইয়া রোগোপশান্তির আকাঙ্ক্ষা করেন। কখনও বা কন্ফুচি, শাক্যসিংহ, কোমত প্রভৃতি মনিষীকুলের অনুসরণ করিয়া কল্যাণ লাভ করিবেন মনে করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদৃশ জ্ঞানীমহাত্মাগণের অনর্থসমূহ তাহাকে বেষ্টন করিয়া ভবসংসারের বিষয়ে ডুবাইয়া দেয়।

বিভিন্ন বাদাবলম্বিদিগের কৃষ্ণে প্রবৃত্তি না থাকায়

বিষয়-বাসনা প্রবল

কর্ম্মবাদের আশ্রয়ে জন্মান্তরবাদের প্রবল তরঙ্গে দৌল্যমান হইয়া জীবগণ কোন সময় পরোপকার, বন্ধুবর্গের চিকিৎসা, পশুবর্গের অহিংসা, বিত্বাদানের আনুকূল্য প্রভৃতি ভীমভট্টীয় পন্থার অনুসরণ করিতে থাকেন। কখনও বা কুমারিল ভট্ট, উদয়নাচার্য্য অথবা অর্হত-সম্প্রদায়ের মতানুকূলে অনুগমনপূর্বক তাঁহাদিগকে প্রধানতম আচার্য্যজ্ঞানে তাঁহাদের ধুর বহন করেন। দুঃখের বিষয় তাদৃশ তপস্তাচরণে তাঁহাদের কোন কল্যাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ বা অজ্ঞেয়তাবাদ, সন্দেহবাদ, নিরীশ্বরবাদ, বহুশীশ্বরবাদ বহুমানন করিয়া এপিকিউরাস ও চার্কাসাদির দাশ্ত্রে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়া উলুকামতের পোষণ করেন। ইহারা ইহা যে বিষয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন আমরা এরূপ বলিতে পারি না। সকলেই নিজ নিজ বিষয়ে মুগ্ধ, কৃষ্ণের জন্ত কাহারও কোন সেবা-প্রবৃত্তি দেখিতে পাইলাম না। ঐ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে বাধা করিয়াছে, বিষয়ের কবল হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা দূরে থাক, বিষয়গুলিই প্রবল করিবার বাসনা দেদীপ্তমান। তাই ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন,—

বিষয় বিষম বিষ সতত খাইহু ।

গৌর-কীর্তন-রসে মগন না হৈহু ॥

শ্রীগৌর-কীর্তনে সর্বার্থ-সিদ্ধি

এক্ষণে আমরা জানিতে পারিলাম যে শ্রীগৌরকীর্তনে জীবের সর্বার্থ-সিদ্ধি হয়। যেখানে বিষয় নিরস্ত হইয়াছে, অধন সংগ্রহের পিপাসা হ্রাস হইয়াছে, নিজের কর্মফল ক্ষয় হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেম লাভের যত্ন হইয়াছে, অসাধু-সঙ্গ পরিবর্জিত হইয়া শুদ্ধ সাধুসঙ্গে প্রবৃতি হইয়াছে, সেখানেই শ্রীগৌরকীর্তন আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীগৌর-কীর্তনে সমর্থ কে ?

যেখানে কপটতা-ধর্মক্রমে অনর্থকে অর্থবোধ, সেখানেও কোন মঙ্গল নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিষয়াবিষ্ট জীবকে বিষয় হইতে স্বীয় অহৈতুকী করুণা দ্বারা উত্তোলন করিতে পারেন। তখন জীব বিষয়মুক্ত হইয়া শ্রীগৌর-কীর্তন করিতে সমর্থ হন।

অনর্থ-নিবৃত্তির ফল—নবদ্বীপে গৌর-সেবা।

জীবের অনর্থ বিদূরিত হইলে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপে প্রবেশ লাভ ঘটে। শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত ভূমিতে অনর্থের কোন পূর্ব-পুরুষ পর্য্যন্তও প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে কেবল গৌরসেবা, উহাই জীবের একমাত্র নিজার্থ।

শ্রীনবদ্বীপ-ধামের মহিমা

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের রত্নসমূহ শ্রীনবদ্বীপ-ধামের এক বালুকণের মূল্য দিয়া উঠিতে পারে না। বিরজা-নদীর সমগ্র জলশ্রোত নিগুণ জীবকে শ্রীনবদ্বীপধামে প্রবেশাধিকার দিতে সমর্থ নহেন। প্রকৃতাভীত ব্রহ্মলোকের সমগ্র জ্যোতি শ্রীনবদ্বীপের পথ স্তম্ভরূপে আলোকিত করিতে পারে না। স্বতরাং নিবিশেষ জ্ঞানিগণ, সত্য, মহা, জন ও তৎলোকবাসী সাধুগণ, স্বর্গলোকবাসী দেবগণ নিজ নিজ ধনাগারে প্রভূত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌর-চরণরূপ অর্থ লাভ করিতে কোন দিনই সক্ষম হইবেন না।

শ্রীগৌরভক্তের চরণাশ্রয়ে কৈবল্যাদি অনর্থ হইতে মুক্তি

নিষ্কিঞ্চন, অনর্থ-নিবৃত্ত, কৃষ্ণসেবাপর, গৌরভক্তের চরণাশ্রয় করিলেই সর্ব-সম্পৎ ধামে বাস ঘটিবে এবং অনর্থের কোন লোভ কিছুই করিতে পারিবে না। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ বলেন,—

“কৈবলাং নরকায়তে ত্রিংশপূরাকাশ পুষ্পায়তে

দুদ্দান্তেস্ত্রিয়কালসর্পপটলী প্রোংখাতদংষ্ট্রায়তে ।

বিশ্বং পূর্ণস্থায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে

যং কারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং তং গৌরমেব স্তমঃ ॥ (চৈঃ চন্দ্রামৃতম্-১।৫)

[যে গৌরসুন্দরের রূপাকটাক্ষ-সম্পদে সম্পত্তিশালী গৌরভক্তগণের নিকট যোগিজন্মসাধ্য কৈবল্য বা ঈশ্বর-সায়ুজ্য নরকতুল্য, সন্ধ্যা স্বধর্মনিষ্ঠ-জনের বাঞ্ছিত বা লব্ধ-ফল অমরাপুরী আকাশ-কুসুমের ত্রায় অলীক, কালসম্পর্কপ দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল উৎপাটিত-বিষ-দন্ত অহিকুলের মত, পরিদৃশ্যমান বিশ্ব পূর্ণস্থায়ময়-ধাম অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবানন্দময় এবং ব্রহ্মা-সুরেশাদির পদবীও কীটপদবীবৎ প্রতীত হয়, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি।]

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীঅচ্যুতানন্দের নির্যাতন

অচ্যুতের সংক্ষেপ-জীবনী

শকাব্দা ১৭৮২, ৮ই ভাদ্র তারিখে উৎকলদেশে ভদ্রক নামক গ্রামে অচ্যুতানন্দের জন্ম হয়। নবজাত-শিশুর নাসিকার উপরে একটি তিলক দেখা যাইত। তাহা দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্যায়িত হইতেন। শিশু যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিলকটি অদৃশ্য হইল। শিশুর পিতা কার্য্যগতিকে মেদিনীপুর নগরে আসিলে, বালকের দশমাস বয়সে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। তাহার অল্পদিন পরে অচ্যুতানন্দের পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। অচ্যুত ক্রমশঃ বিমাতা ও পিতামহী কর্তৃক প্রতিপালিত হইলেন। বাল্যকালে অচ্যুত ইংরাজী-বিজ্ঞা অভ্যাস করিয়াছিলেন। অষ্টাদশবর্ষ বয়সে অচ্যুতের বিবাহ হয়। ক্রমশঃ তাঁহার তিনটি কন্যা ও একটি পুত্র হইল। ইংরাজী-বিজ্ঞা অভ্যাস সমাপ্ত করিয়া তিনি দুইবৎসর প্রায় গভর্নমেন্টের চাকরী করেন। চাকরী উপলক্ষে রংপুর জেলায় অবস্থিতিকালে অচ্যুত পাগল হইলেন। পাগল অবস্থায় তিনি এগার বৎসর অবস্থিতি করিয়া ২৫শে বৈশাখ তারিখে দেহ পরিত্যাগ করেন।

অচ্যুতের কাব্য-রচনা ও সাহিত্যালোচনা

এই অল্পবয়সের মধ্যে অর্থাৎ পাগল হইবার পূর্বে অচ্যুত বঙ্গভাষায় 'মাধবীলতা' বলিয়া একখানি কাব্য রচনা করেন। যে সময়ে তিনি যশোহর জেলায় কর্ম করেন, তখন 'তারার' নামে একখানি সাময়িক-পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইংরাজী-ভাষায় 'হাবড়া জেলার বিবরণ' এবং 'পাণ্ডব' নামক একখানি পঞ্চ রচনা করেন।

কোন সময়ে অচ্যুতের কোন প্রকার ভজন-প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই, কেবল পাগল থাকার সময়ে বাহা আহ্বার করিতেন তাহাই 'প্রসাদ পাইতেছি' এই কথা বলিতেন এবং সময়ে সময়ে "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" এবং "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে" এই দুইটি নাম-পদ্য উচ্চারণ করিতেন। স্বভাবত: তিনি উদার ও লোকপ্রিয় ছিলেন।

উদ্ভব-অবস্থায় অচ্যুতানন্দ

মরণসময়ে অচ্যুতের একটি অলৌকিকভাব দেখা গিয়াছিল। পাগলের অন্ত পীড়া হইলে শেষদশায়েরূপ ঘটনা হয়, অচ্যুতেরও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। চিত্তপীড়া প্রায় দ্বাদশ বৎসর থাকায় অচ্যুত ক্রমশ: দুর্বল হইয়া আসিতেছিলেন। বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে তাহার ইনফুয়েঞ্জা-জ্বর হয়। জ্বর ভাল হইল, কিন্তু দৌর্বল্য ক্রমশ: বাড়িতে লাগিল। নিজে কোন সময়ে ঘরের বাহির হইয়া দৌর্বল্যক্রমে পড়িয়া গেলেন। সেইদিন হইতে অচ্যুতের আত্মীয়বর্গ তাঁহার জন্ত চিন্তিত হইয়া অধিকতর যত্ন করিতে লাগিলেন। প্রথমে ইংরাজী চিকিৎসা হইল, তাহাতে বিশেষ উপকার না হওয়ায় আয়ুর্বেদমতে ঔষধাদি প্রয়োগ করা হয়।

নির্যাতনের প্রাক্কালে আত্মীয়বর্গের পারমার্থিক-সেবা

২৪শে রাত্রে যখন তাঁহার জীবন-ভরসা বিগত হইল, তখন তাঁহার ভ্রাতা-ভগিনীগণ তাঁহার নিকট বসিয়া মধুরস্বরে হরিনাম মহামন্ত্র গান করিতে লাগিলেন। নামগান একরূপ হইয়া উঠিল যে যেন তাঁহার ঘরে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ উদয় হইয়া পড়িল। লক্ষ্যনাম উচ্চারিত ও গীত হইলে সেই মৃত্যুগৃহ পরমানন্দ-পরিপূর্ণ ভগবদ্ধামরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। শুদ্ধ-হরিনামের মাহাত্ম্য যে কি তাহা সেই গৃহ-মধ্যস্থিত সকলেই জানিতে পারিলেন। শাস্ত্রে কথিত আছে যে শুদ্ধ-কৃষ্ণনামে কৃষ্ণের সর্বশক্তি নিহিত আছে। যজ্ঞাদি কর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানে সেরূপ বল নাই। এই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শেষরাত্রে সকলেই প্রত্যক্ষ করিলেন।

শ্রীঅঙ্গে সিদ্ধ-ভিলকের আবির্ভাব

অচ্যুতের বিমাতা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহভাবে শ্রীগিরিধারীর চরণামৃত, ব্রজরজ, শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ ও শ্রীচরণতুলসী মিলিত করিয়া অচ্যুতকে পান করাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে সময়ে অচ্যুতের কোন তরল দ্রব্য পর্য্যন্তও গলাধঃকরণ হইতেছিল না। চরণামৃত তিনবার পান করিতে করিতে উদরমণ্ডল হইতে একটি তেজ উথিত হইয়া কণ্ঠ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলে অচ্যুত অনায়াসে "হরেকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় মুদ্রিত

চক্ষুদ্বয় হইতে ঘন ঘন অশ্রুধারা বাহির হইতে লাগিল। লক্ষাবধি শ্রদ্ধ হরিনাম শ্রবণ করিয়া এবং রজ-তুলসী-মহাপ্রসাদমিশ্র-চরণামৃত পানে তাঁহার কপালে, বাহুমূলে, উদরে, বক্ষে ও কর্ণদেশে বৈষ্ণব-তিলক উজ্জ্বলিত হইল।

পূর্ব-জন্মের পরিচয় ও শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা-প্রকাশ

অচ্যুতের “চতুর্থ ভ্রাতা” সেই সময়ে মহাপ্রেমে হরিনাম বলিতে লাগিলেন, তাহাতে অচ্যুতের মুখ হইতে স্বীয় পরিচয়সূচক অনেকগুলি তত্ত্বকথা বাহির হইল। আবার অনেকগুলি মাল্য-তিলকধারী চিন্ময়-বৈষ্ণবমূর্ত্তি সেই গৃহমধ্যে দেখা দিয়াছিলেন। গৃহস্থিত প্রদীপের জ্যোতি বৈষ্ণবজ্যোতিতে পরাজিত হইয়া পড়িল। যে তত্ত্বকথা তিনি বলিলেন তন্মধ্যে প্রকাশযোগ্য এই একটা কথামাত্র আছে। অচ্যুত কহিলেন, “আমি রামানুজ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। শ্রীমন্নমহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের উপদিষ্ট-তত্ত্বে আমার কিছু অপরাধ ছিল, সেই অপরাধ ক্ষয় করিবার জন্য আমি এষাবৎ এই গৃহে বর্ত্তমান ছিলাম। সকল ভজনের সার কৃষ্ণনাম। যে নাম, সেই কৃষ্ণ। নিরপরাধে নাম করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। ভ্রাতৃগণ, তোমাদের উচ্চারিত নিরপরাধ-নাম মরণসময়ে শ্রবণ করিয়া আমার অপরাধ ক্ষয় ও সর্ব্বসিদ্ধি হইল। তোমরা একথা স্মরণ রাখিবে।”

শ্রীমন্নমহাপ্রভুর দর্শন-লাভ

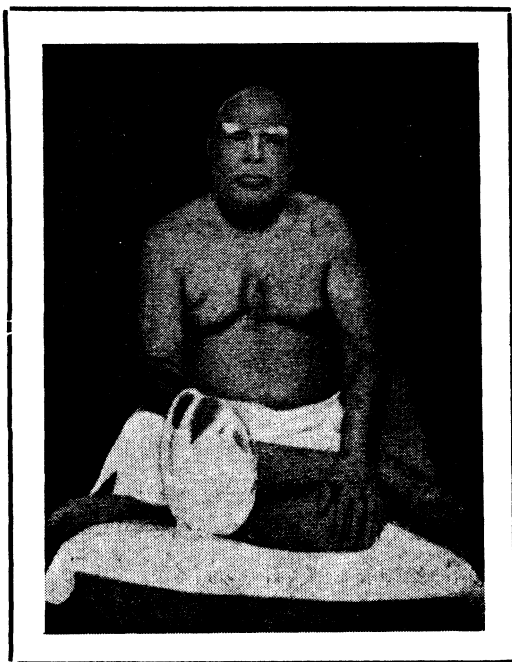
এক সপ্তাহকাল সমস্ত ইন্দ্রিয়কার্য্য প্রায় স্থগিত ছিল। চক্ষু বদ্ধ ছিল। বাক্য রুদ্ধ ছিল। কেহ কিছু বলিলে শুনিতে পাইতেন না। এক প্রহরকাল হরিনাম করিতে করিতে কর্ণরুদ্ধ পরিষ্কৃত হইল, কণ্ঠে হরিনাম আসিলেন এবং ভগবদ্ভূষণ দেখিবার জন্য স্পৃহা জন্মিল। শ্রীমহাপ্রভুর প্রতিকৃতি তাঁহার সন্মুখে আনিবামাত্র গলদশ্রুসহিত নয়ন প্রস্ফুটিত হইয়া একাগ্রহে শ্রীমূর্ত্তি-সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন।

রামানুজ-তিলক ক্রমে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তিলকে পরিণত

কপালের তিলক প্রথমে চারিটা দণ্ডবিশিষ্ট উর্দ্ধপুণ্ড্ররূপে দেখা দিয়াছিল, ক্রমশঃ শুদ্ধ হরিনামের উর্দ্ধপুণ্ড্র হইল, অবশেষে প্রণব মূর্ত্তি হইয়া পড়িলে, কপালের উর্দ্ধভাগে একটা বসে যাওয়ার চিহ্নের সহিত প্রাণবিরোগ হইল। ইহাতে অমুমিত হইল যে সিদ্ধযোগিদিগের মৃত্যুর ছায় তাঁহার আত্মা স্বঘৃণা-নাড়ী ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন। শ্রীরামানুজের মতে সিদ্ধিপ্রাপ্তির লক্ষণও এইরূপ। উত্তরায়ণ, শুক্লপক্ষ, আপ্যায়মান চন্দ্র, ব্রাহ্মমুহুর্ত্তে প্রাণত্যাগ এবং চিত্রানক্ষত্র—এই সমস্ত যোগই যোগিদিগের মৃত্যুকাল। আমরা সেইস্থানে উপস্থিত থাকিয়া

ভালরূপে অনুভব করিলাম যে অচ্যুতানন্দ একপ্রকার অলৌকিক বৈষ্ণবগতি লাভ করিলেন। এত দিবস বিষয়ী ও পাগলের হ্রায় থাকায় কেবল বৈষ্ণব-অপরাধ ক্ষয় করিবার উপায়মাত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ



শ্রীল ঠাকুর সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের বিরহ-স্মরণে প্রবৃত্তি

সচ্চিদানন্দ বস্তু লোকলোচনের অন্তরালে থাকিলে আমরা তাঁহার প্রকাশের বিষয় ধারণা করিতে পারি না। যাহা চক্ষুর অন্তরালে থাকে, তাহাকেই আমরা অপ্রকটিত অবস্থা বলি। বস্তুতঃ শুদ্ধসত্ত্ব বস্তুর অভাব বলিয়া কোন ব্যাপার নাই। অভাবের অভাবদ্বারা যখন সাধ্যবস্তুর প্রতীতি হয়, তখনই তাহাকে আমরা নিত্য সনাতন বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকি। সুতরাং সচ্চিদানন্দ

বস্তু নিত্য ও সনাতন। সচ্চিদানন্দ-অনুবাদের ঠাকুর ভক্তিবিনোদই বিধেয়। তাঁহার সম্বন্ধে প্রতি-নিয়তই বিভিন্নভাবে আলোচনা হইলেও, অথ সচ্চিদানন্দের বিরহে তাঁহার লীলার কয়েকটা বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়া আমরা তাঁহার পাদ-সেবনরূপ স্মরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঠাকুর বর্তমান আষাঢ় মাসের দ্বাদশ দিবসে আত্মগোপন করেন, সে আজ পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ অতীতের স্মৃতি।

অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বস্তু-বিচারে শব্দই সমর্থ

আমরা চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছি ও আলোচনা করিতেছি—“অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।” “ঋহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।” এই সকল বাক্য আমাদের মানসক্ষেত্রে গ্রথিত থাকিলেও হৃদয়গত অভিব্যক্তি নাই। যে সাধনে সনাতন বস্তুর হৃদয়-প্রাকট্য হয়, যে সাধনের প্রথম ইঙ্গিতই উক্ত বাক্যদ্বারাই আমাদের মানসক্ষেত্রে প্রথিত থাকিলেও হৃদয়গত অভিব্যক্তি নাই। যত্নে আকাশোথ শব্দ বা বাক্যসমূহকে আশ্রয় করিয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া ‘সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের’ শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইতেছে। আমার ইদম্ জ্ঞান তদজ্ঞানের দ্বারা বিদমিত না হইলে আমার চিত্তগত ভাষা কখনই শ্রীল ঠাকুরকে প্রকাশ করিতে পারিবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে স্তব্ধ হইয়া থাকাই আমার পক্ষে মঙ্গলদায়ক হইলেও শ্রীল ঠাকুরের আশ্বাসবাণী আমাদের আত্মপ্রাণিত করিতেছে। তিনি বলেন, অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-বিচারে শব্দই একমাত্র সমর্থ।

ঠাকুরের কথিত শব্দ-তত্ত্বের স্বরূপ

শব্দ বলিতে আকাশোথ শব্দ নহে, বৈয়াকরণিকগণের ওষ্ঠ, দন্ত বা কণ্ঠোথ শব্দ নহে, বৈজ্ঞানিকগণের বায়ুবিলোড়নোথ শব্দ নহে, বা সাধারণ দার্শনিকগণের বিশ্বস্ত লোকের বাক্যরূপ শব্দও নহে। এ শব্দ ভ্রম-চতুষ্টয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক— নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, অতিমর্ত্য, বেদ ও আশ্রয়-বাণী। এই বাণী-পরম্পরা বদ্ধজীবগণের উদ্ধারকল্পে তাহাদের বিশুদ্ধ-চিত্তে প্রকাশিতা হন। এই বাণী ঋহাভাগ্যে উদ্ভিত হইয়াছেন তিনিই সকল সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছেন। সিদ্ধান্তবাণীর প্রকাশই শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যিনি নদীয়া-প্রকাশ, তিনিই সিদ্ধান্তবাণী-প্রকাশ।

ঠাকুর প্রাচীন-নদীয়ার প্রকাশক-সূত্রে অর্চনীয়

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় নদীয়া-শশী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও আদিলীলাক্ষেত্র নদীয়ার প্রকাশকসূত্রে তিনিই নদীয়া-প্রকাশ। তাই আমরা নদীয়া-প্রকাশের সেবা, পূজা ও তাঁহার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চন করিয়া

থাকি। শ্রীনাম-হটে বা অপ্ৰাকৃত স্বরূপ-গঞ্জে স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জে নিত্য বিগ্রহে ঠাকুর সেবা-সেবক-ভাবে বর্তমান আছেন এবং “মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে” বাক্যটী স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সিদ্ধান্ত-বাণীর জনক

তিনিই সরস্বতীরূপা যে বাণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সিদ্ধান্তবাণী বা **সিদ্ধান্ত-সরস্বতী**। আমরা ঠাকুরের জীবনী হইতে, তাঁহার নিখিল গ্রন্থাদি হইতে এবং তাঁহার সাক্ষাৎ বাণী-পরম্পরা হইতে ইহাই জানিয়াছি যে, আমায়-বাণীর আশ্রয় ব্যতীত বা শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত সচ্চিদানন্দ-ভক্তির বিনোদন হইতে পারে না। তাই শ্রীল ঠাকুরের পূজা—অর্থাৎ তৃপ্তিসাধনকে লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধান্ত বাণীরই পাদপদ্মে অর্ঘ্য বিতরণ করি।

“তাতে কৃষ্ণে ভজে, করে গুরুর সেবন।

মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ (টঃ চঃ মঃ ২২।২৫)

ঠাকুরের আত্মীয় ও পরিচিতের লক্ষণ

শ্রীল ঠাকুরের দ্বিতীয়াশ্রমের অতি নিকট-আত্মীয় পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের মুখে অনেক সময় শুনিয়াছি—তাঁহারা শ্রীল ঠাকুরের কাছে অতি নিকটে ছিলেন এবং তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধেও তাঁহারা অভিজ্ঞ। এইরূপ কথা মদীয় পরমারাধা আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শুনিবামাত্রই বলিতেন—“তাঁহার নিকটে থাকা বা তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে জানা দূরের কথা, তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতেও পান নাই।”—এই সমস্ত বাক্যের সফলতা ও সার্থকতা আমরা শ্রীল ঠাকুরের নিজ-লিখিত “জৈবদন্দ” গ্রন্থের প্রমেয়ান্তর্গত জীব-বিচারের অধ্যায়ে ২৭০ পৃষ্ঠায় এইরূপ দেখিতে পাই—“বাক্য ও মন উভয়ই জড়-সম্বন্ধে উৎপন্ন। তাহারা অধিক চেষ্টা করিয়াও চিৎস্ব স্পর্শ করিতে পারে না। যথা বেদ বলিয়াছেন—“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্ৰাপ্য মনসা সহ।” ঠাকুর সর্বদাই আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন—শূল-ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিৎস্বস্তুর জ্ঞান অসম্ভব। শ্রীল ঠাকুর স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ। তাহাতে অচিৎস্বস্তুর আচ্ছাদন কোথায়? স্তবরাং বাহ্য ইন্দ্রিয়-সমষ্টিযুক্ত শূলশরীর বা সূক্ষ্মশরীর তাঁহার নিকটে থাকিতে পারে না বা তথা হইতে তাঁহার পরিচয় জানাও যুক্তিবিরুদ্ধ; স্তবরাং অত্যন্ত অসম্ভব। তিনি নিত্য-মুক্ত, অতিমর্ত্য মহাপুরুষ, তাঁহার সম্বন্ধে মায়াবদ্ধ মর্ত্যজীব ধারণা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

ঠাকুরের অতিমর্ত্যত্বের অনুভূতি

শ্রীল ঠাকুর উক্ত গ্রন্থে উক্ত অধ্যায়ে জীব-বিচার সম্বন্ধে যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অতিমর্ত্যতা ও সর্বজ্ঞতা প্রকাশ পায়। জড়-বিলাসে ভীত হইয়া চেতন-বিলাস হইতে নিরস্ত থাকার অর্থোক্তিকতা তিনি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন—অনুমিতিকার্য্যে হেতুত্ব বিষয়ে ‘ব্যাপ্তিজ্ঞান’ ও ‘পরামর্শ’ উভয়ই প্রয়োজন। এরূপক্ষেত্রে শুক্লিতে রজত ও রজ্জ্বতে সর্পভ্রম দ্বারা জৈব-জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের যুক্তিও ত্রায়-বিরুদ্ধ হইতেছে। শ্রীল ঠাকুরের উক্ত বিচারের চমৎকারিতা হইতে তাঁহার অতিমর্ত্য আচার্য্যত্ব অনুভব করিতেছি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদের আচার্য্যত্ব

দার্শনিক বিচার-জগতে “আচার্য্য” বলিলে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তদ্বিস্তারিত আচার্য্য। তাঁহার বেদান্তভাষ্য, উপনিষদভাষ্য, সহস্র-নাম-ভাষ্য, গীতভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্যসমূহ হইতে তিনি আচার্য্য-সমাজে নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা আমরা সহজে অনুভব করিতে পারি। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বৈদান্তিক সামাজিকতা লইয়া যে অমূলক বিবাদ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীল আচার্য্য বলদেব বিষ্ণুভূষণ প্রভু বিনষ্ট করিয়াছেন; তাহার পর ঠাকুর ভক্তিবিনোদই সমাজ-সংস্কারের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। শ্রীল ঠাকুরের আজও বহু গ্রন্থ অপ্রকাশিত থাকায় তাঁহার লেখনীর পূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি না। সজ্জনগণ তদ্বিষয়ে যত্ন করিলে জগতের বহুল পরিমাণে হিত সাধন হইবে।

শ্রীল সচ্চিদানন্দের পরোপকার বিচার

আচার্য্যের শিক্ষা হইতে আমরা পরোপকার সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা সদসদ-বিলক্ষণ-অনির্বচনীয় বস্তুদ্বারা আচ্ছাদিত বা বিদ্বিত বস্তু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। জীবকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার নিত্য সত্যায় আস্থা স্থাপন করানই ঠাকুরের ভাষ্যসমূহের উদ্দেশ্য। ‘পর’-শব্দে অনাদি শ্রেষ্ঠ বস্তুকে লক্ষ্য করে। যে-কার্য্যের দ্বারা আমাদের শ্রেষ্ঠতা বিনষ্ট হয়, তাহাকে পর-উপকার বলা যায় না। নিত্যানন্দময় বস্তুই শ্রেষ্ঠ। জীব নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইলেই পর-উপকারের ফল লাভ করিল। জ্ঞাতার অভাবে জ্ঞান স্বীকারের সার্থকতা কি, এবং জীবের পক্ষে তাহা কি-প্রকারে মঙ্গলদায়ক হয়? আনন্দস্বরূপ বলিয়া স্তব্ধ

হইয়া উহার প্রাপ্য-প্রাপকের বিনাশ-সাধনে আনন্দ কাহার? উপকারই বা কাহার? সুতরাং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত প্রকার কোন উপকারকে উপকার না বলিয়া অপকার আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ব্যবহারিক মিথ্যা বস্তু হইতে পারমাণ্বিক সত্যানন্দ মিথ্যা নিরানন্দের প্রতীক।

পরিবর্তনশীল ফল-লাভ পর-উপকারের লক্ষ্য নহে

যাহার ফলের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে পরিবর্তন-যোগ্যতা লক্ষ্য করা যায়, তাহার অনুসন্ধিৎসা বা অনুগত্য করা শ্রীল ঠাকুরের শিক্ষা বা ‘পরোপকার’-সংজ্ঞা হইতে বিলক্ষণ। ফল-বিচারে তিনি আনন্দের প্রাপকস্বরূপে তত্ত্ব-বস্তুকেই জ্ঞাপন করিয়াছেন। জীব তাহাতে অভিলাষ করিয়াই স্থূল-সূক্ষ্ম-প্রাকৃতিক তত্ত্বকে অঙ্গীকার করায় প্রয়োজন-বিচারে যে অনিত্যতা আনয়ন করিয়াছে তাহা শ্রীল ঠাকুরের পরোপকার সম্বন্ধে শিক্ষার বহির্ভূত হইতেছে। ঐ প্রকার কল ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষীণভাব ধারণ করে। এমন কি, পরে অনুশোচনাবারা প্রাপ্য নষ্ট হইয়া যাওয়ায় উহা হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

প্রয়োজন-বস্তু সাধনাধীন নহে—কিন্তু কৃপাধীন

ঠাকুরের যাহা প্রয়োজন বিচার, তাহা যে-সাধনে লাভ করা যায় তাহা সাধন ও সাধ্য উভয় পর্যায়যুক্ত। যাহা সাধনের দ্বারা লাভ করা যায় তাহাই সাধ্য অর্থাৎ সাধনাধীন। কিন্তু ঠাকুরের শিক্ষা হইতে আমরা সাধ্যবস্তু সম্বন্ধে যে কথা সিদ্ধান্ত-বাণীমুখে শ্রবণ করিয়াছি তাহা সাধনাতিরিক্ত বস্তু হওয়ায় তত্ত্ববস্তুর কৃপা-সাপেক্ষ হইতেছে। অথচ তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে গেলে ‘সাধ্য’-শব্দরূপ ভাষামল প্রবিষ্ট হইবেই। সুতরাং ইহা সম্যগ্রূপে আরাধনায় প্রকাশ পায়। বেদান্তসূত্র বলেন,—“অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষ লুমানাভ্যাম্”—অর্থাৎ সম্যগ্রূপে, শ্রীমতী রাধারাণীর অনুগত্য প্রভাবে তত্ত্ববস্তু বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত জীবসমূহের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অর্থাৎ অনুশীলন ও ধ্যানের বস্তু হইয়া থাকে। যেখানে জড়-প্রতীতি ও মিথ্যাজ্ঞান, সেখানেই চেতনের ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহার বিধায় তত্ত্ববস্তুর সম্যক্ আরাধনা বা শুদ্ধভক্তির অভাব।

তত্ত্ব-বস্তুর অনুশীলনই অভিধেয়

বেদান্তের, ‘প্রকাশশ্চ কর্ম্মং ভ্যাশাস্য’ সূত্র হইতে আমরা যে অনুশীলনের কথা জানিতে পারি তাহা কর্ম্ম বা অধ্যাস প্রভৃতি বৃত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। উক্ত সূত্র জ্ঞানমাত্রই ফলপ্রাপ্তির উপায়স্বেদ মন্ত্ৰ। আমরা কোন বিষয়ে জ্ঞান-কুশলতা লাভ করিলেই যেরূপ ফললাভ করিতে পারি না অর্থাৎ তাহার প্রকৃষ্ট

অনুশীলনই ফললাভের উপায় হয়, তদ্রূপ জ্ঞানই আমাদের কাছে লইয়া যাইবে না ; তাহার স্তূৰ্ণ ও পুনঃ পুনঃ অনুশীলনেই তত্ত্ববস্তু প্রকাশিত হন। এইজন্তই উক্ত সূত্রে ‘প্রকাশশ্চ’—অর্থে তত্ত্ববস্তুর প্রকাশ। ‘কস্মিণি অভ্যাসাৎ’ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন হইতে ফলপ্রাপ্তি—এইরূপ বুঝিতে হইবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতি-গ্রন্থের অভিধেয়-অধ্যায় বিচার করিলে আমরা উক্ত তত্ত্বের অনুসন্ধান পাইব।

বীরনগরে ঠাকুরের আবির্ভাব

শ্রীল ঠাকুর সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধে আমাদের কোন বিষয় বলিতে বাওয়া অপেক্ষা আমরা যদি সিদ্ধান্তবাণী-প্রকাশের আশ্রয় গ্রহণ করি তাহা হইলেই আমরা শ্রীল ঠাকুর-সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিব। জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্বন্ধে জৈবধর্মগ্রন্থের উপোদ্বাতে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই শ্রীল ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের জানিবার বিষয়। তিনি জানাইয়াছেন—চৈতন্যবস্তু (মহাপ্রভু) ও অদ্বৈতবস্তুর (অদ্বৈতপ্রভুর) আবির্ভাব-ক্ষেত্রেই সচ্চিদানন্দ বস্তুর আবির্ভাবক্ষেত্র। আত্মতত্ত্বে এই প্রকার আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্যময় একত্র সর্বদাই লক্ষ্য করা যায়। বলহীন স্থলে আত্মপ্রকাশ অসম্ভব বিধায় বীরনগরে তিনি আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অপ্রাকৃত তত্ত্বেই বিরুদ্ধ ধর্মের সামঞ্জস্য

প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে আরও অধিক কথা আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অগ্ণ তিরোভাব-দিবসে তাঁহার আবির্ভাবের উল্লেখমাত্র করিয়াই নিরস্ত হইলাম। ইহা প্রাকৃত-বিচারে অসামঞ্জস্য হইলেও ঠাকুরের লিখিত তত্ত্বসূত্রের “বিরুদ্ধধর্মং তস্মিন্ ন চিত্রম্” সূত্র আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বস্তুতে বিরুদ্ধ-ধর্মের স্তূৰ্ণরূপ সামঞ্জস্য নিত্য বর্তমান। এতদ্ব্যতীত মহাজনগণের আবির্ভাব-তিরোভাব একই উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। তাই বিরহ-দিবসও উৎসব দিবস ; মঙ্গল বিধানের জন্ত মঙ্গলময়ী তিথি—সমাবস্থা।

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।

গৌরশক্তিধরুপায় রূপান্তরবরায় তে ॥

দীক্ষায় উপবীতের আবশ্যকতা

সদগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়ন-সংস্কার প্রদানের প্রথা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। ভারতের পারমার্থিক ইতিহাসে এসম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমমহাপ্রভুর কৃপাশক্তি লাভ করিয়া যে বৈষ্ণব-স্মৃতি সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টভাবে এই তত্ত্বসাগর-বচনটি উল্লেখ করিয়াছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংশ্চং রসবিদানতঃ ।

তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

দ্বিজত্বং অর্থে টীকায় লিখিয়াছেন—**বিপ্রতা**। যেমন রসবিদানে অর্থাৎ রাসায়নিক-প্রক্রিয়া দ্বারা কাসা স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেয়ই বিপ্রতা সাধিত হয়।

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে যে অচাৰ্য্যগুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্র প্রভাবে শিষ্যের পুনর্জন্ম হয়। বিনীত পুত্র-শিষ্যাদিকে বৈদিক-দশসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। তৎপ্রমাণ—

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিষ্কিপ্তান্ জাতানেব হি মন্তৃতঃ ।

বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ ॥ (ভঃ সংহিতা ২।৩৪)

শ্রীমহাভারতে—

এতৈঃ কৰ্ম্মফলৈর্দেবি নানজাতিকুলোদ্ভবঃ ।

শূদ্রোহপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ ॥

(মঃ ভাঃ অমুশাঃ পঃ ১৪৩।৪৬)

হে দেবি, নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও এই সকল কৰ্ম্মদ্বারা আগমসম্পন্ন অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব সংস্কার লাভ করিয়া দ্বিজ হন।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু বৈষ্ণবের দশবিধ সংস্কার বিষয়ক ‘সংক্রিয়া সার-দীপিকা’-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহাতে উপনয়ন-সংস্কারেরও পদ্ধতি আছে।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিকুতে পূর্ব-লহরী ১।১৩শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

“ব্রাহ্মণকুমারাণাং শৌক্রে জন্মনি দুর্জ্জাতিত্বাবেহপি সননযোগ্যত্বায় পুণ্য-
বিশেষময়-সাবিত্র্য-জন্মসাপেক্ষত্বাৎ । ততশ্চ অদীক্ষিতস্ত স্বাদস্ত সননযোগ্যত্ব-
প্রতিকূলদুর্জ্জাত্যারম্ভকং প্রারম্ভমপি গতমেব, কিন্তু শিষ্টাচারাবাবাৎ অদীক্ষিতস্ত
স্বাদস্ত দীক্ষাং বিনা সাবিত্র্যং জন্ম নাস্তীতি ব্রাহ্মণকুমারাণাং সননযোগ্যত্বা-
ভাবাবচ্ছেদকপুণ্যবিশেষময়-সাবিত্র্যজন্মসাপেক্ষাবদস্ত অদীক্ষিতস্ত স্বাদস্ত সাবিত্র্য-
জন্মাস্তরাপেক্ষা বর্তত ইতি ভাবঃ ।” অর্থাৎ প্রকৃত ব্রাহ্মণকুমারগণের শৌক্রে-জন্মে
দুর্জ্জাতিত্বের অভাব থাকিলেও সননযজ্ঞে যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য
পুণ্যবিশেষময় সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা করে (ব্রাহ্মণপুত্রের উপনয়ন-সংস্কার না
হইলে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ায় অধিকার হয় না), তদ্রূপ চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত অদীক্ষিত
ব্যক্তির সননযজ্ঞে যোগ্যতাপ্রাপ্তির প্রতিকূল দুর্জ্জাতিত্বাবস্থা দীক্ষা ব্যতীত নাশ
হয় না বলিয়া তাহারও ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তির ত্বায় সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা
আছে অর্থাৎ উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত না হইলে ব্রাহ্মণত্বের কুলে জন্ম-
গ্রহণকারীর অর্চন-যজ্ঞাদিতে অধিকার হয় না ।

অধিক কথা কি, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও শ্রীভগবানের নিকট সংস্কৃত হইয়া দ্বিজ
হইয়াছিলেন, ইহা ব্রহ্ম-সংহিতা গ্রন্থে উল্লিখিত আছে—

গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ ।

সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ ॥

পদ্মবোনি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বেণুনিদাদদ্বারা গীতি-গায়ত্রী প্রাপ্ত হইয়া
আদিগুরু ভগবানের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন ।

জড়বদ্ধ জীবদিগের মায়িক-সংসারে বংশ অনুসারে যে অযথা দ্বিজত্ব পরিচয়
হয়, তাহা অপেক্ষা অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশরূপ এই দ্বিজত্ব-লাভ কোটিগুণে
উৎকৃষ্ট ।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্রাগবতায়ুত গ্রন্থের ২য় খণ্ড ৪র্থ অঃ ৭ম
শ্লোকের “দীক্ষা-লক্ষণধারণঃ” পদের স্বলিখিত টীকায় দীক্ষিত মাত্রেই
যজ্ঞোপবীত ধারণের কর্তব্যতা জানাইয়াছেন—“দীক্ষায়াঃ সাবিত্রাদিবিষয়কায়
ভগবন্মন্ত্র-বিষয়কশ্চ যানি লক্ষণানি ক্রমেণ যজ্ঞোপবীত-কমণ্ডলু-ধারণাদীনি
ধর্ত্বাং শীলমেবাং ইতি তথা তে ।”

নির্দোষ লোকেরা বৈষ্ণবদিগকে অচ্যুতগৌড়ীয়-ব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝিতে পারে
না, তজ্জনা শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর বংশে, শ্রীখণ্ডের শ্রীমুকুন্দ দাসের বংশে,
শ্রীনবনী হোড়ের বংশে সাবিত্র-সংস্কার চলিয়া আসিতেছে । ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীবশিক্ষার্থে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন ;
 আবার ঐকান্তিকের বিচারে বাহ্যে পরমহংস-বেশাশ্রয়-লীলাও প্রকাশ
 করিয়াছিলেন । বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর (পরলোকগত) মধুসূদন
 গোস্বামী সার্বভৌম মহাশয়ও পরলোকগত আশুতোষ ঘোষ বা প্রেমানন্দ
 ব্রহ্মচারীকে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন । কাশীর ভাস্করানন্দ স্বামী
 ঢাকার ডেপুটী চণ্ডীচরণ বসু মহাশয়কে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিয়া তাঁহার
 পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন । পাক্ষরাত্রিক-দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির
 উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ শৌক-ধারাপ্রবলিত সামাজিক দ্বিজগণের উপনয়ন-সংস্কার
 গ্রহণ অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ ও শাস্ত্র-যুক্তি সম্মত । যাহারা উপনয়ন-সংস্কার
 প্রদানে বা গ্রহণে কুণ্ঠিত, তাঁহারা অবশ্যই কৰ্ম্মজড়স্মার্ত্ত-পদাবলেহী অথবা জড়-
 অভিমান বজায় রাখিতে ব্যস্ত । পারমার্থিক-পন্থায় চলিতে যাহারা একমাত্র
 বদ্ধপরিকর, তাঁহারা কখনও তাদৃশ সমাজের ভয়ে ভীত নহেন । তাঁহাদের
 ইহাই মূলমন্ত্র—

তজন্তু বান্ধবাঃ সর্বো নিন্দন্তু গুরবো জনাঃ ।

তথাপি পরমানন্দো গোবিন্দো মম জীবনম্ ॥

(শ্রীমুকুন্দ মালাস্তোত্রম্)

—ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীভক্তি ভূদেব শ্রোতী মহারাজ

কামনা

জগ-মাঝে নর ভ্রমে নিরন্তর

অশেষ কামনাবশে ।

যাহা কিছু চায় তাহে ছুঃখ পায়,

তবু ধায় আশাপাশে ॥

স্বথের লাগিয়া আনন্দে হাঁসিয়া

বাঁধি' মনোরম ঘর ।

দারুণ অনল কোথা হ'তে এল,

ছাই হ'ল আশা মোর ॥

অনেক যতনে সঞ্চিহু কাঞ্চনে
 হ'বে ইহকালে ভোগ ।
 গলা চেপে' ধরি চোরে কৈল চুরি,
 অথবা জন্মিল রোগ ॥
 ভোগে প্রতি অহঃ করিতে নিৰ্বাহ
 বিবাহ করিছে সুখে ।
 গিল্লির হু'বেলা খায় বাকা-জালা,
 পড়িছে বিষম দুঃখে ॥
 বহু স্তাস্ত্রত হইলে আগত
 বাড়িবে বিষম ভার ।
 তবে নিশিদিনে মরে ঘানি টেনে
 ঘুরে দুঃখে চারিধার ॥
 কত দুঃখ পাই তবু লজ্জা নাই,
 পাজি-মন সদা ধায় ।
 ভোগ সুখতরে যবে যাহা ধরে
 তাহে শোক-তাপ পায় ॥
 সুখ-ভোগ তরে ভব-কারাগারে
 ধনজন যাহা চায় ।
 কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-বাধিনী
 প্রদানে অসুখ ভায় ॥
 গুরে রে কামনা, চেয়োনা চেয়োনা,
 কৃষ্ণেতর যত ধন ।
 ভীষণ অনলে যুতান্তি দিলে
 তাহা কি নিভে কখন ?
 দাউ দাউ রবে জলিবে পুড়িবে,
 দহিবে সকল অঙ্গ ।
 যদি চাও শান্তি তাজ সব ভ্রান্তি,
 কর সদা সাধু-সঙ্গ ॥

ওরে মোর কাম, ছাড়ি জড় কাম
কামদেবে সদা ভজ ।

মদন-মোহন ব্রজেশ-নন্দন

চরণ-সরোজে মজ ॥

—সেবক শ্রীহরিদাস রায় (নারায়ণ)

শরণাগতি

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্বদপ্রবর ষড়্গোষ্ঠাস্বামীৰ অন্ততম শ্রীশ্রীমদ্ জীব গোষ্ঠাস্বামি-পাদ ভাগবতসন্দর্ভান্তর্গত ভক্তিসন্দর্ভে গুরুভক্তি বর্ণন-প্রসঙ্গে অনন্ত প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে একাদশ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের প্রাধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মধ্যে প্রথম হইল “শরণাগতি”। শরণাগতিই ভক্তের প্রাণ—অর্থাৎ জীবন। শরণাগতি অর্থাৎ ভগবন্নির্ভরতাকে বাদ দিয়া ভগবদ্ভক্তি অসম্ভব।

শরণ অগতি অর্থাৎ অগতির শরণকেই শরণাগতি বলে। সাধারণতঃ জীব দুইভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে। এক হইতেছে নিজেকে পতিত অসহায় নিরাশ্রয় জানিয়া ভগবানের শরণ গ্রহণ করা। আর এক হইতেছে অস্ত্রের শরণ গ্রহণকারী পরম সমর্থ ভগবানকেই একমাত্র শরণ্য জানিয়া অস্ত্রকে ত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণ গ্রহণ করা। ভয় ও শোকে নিমজ্জিত মরণশীল মানবের সুখলাভের শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র উপায় হইতেছে অশোকাত্তরায়িত শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করা। সুখমূর্তি আনন্দ-লীলাময় বিগ্রহ শ্রীভগবানের আশ্রয় লাভ ব্যতীত কেহই সুখলাভ করিতে পারে না। সুখের দিকে পিছন করিয়া সুখের অন্বেষণ বিড়ম্বনামাত্র। আজ মানব সুখের জন্ত আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিয়াও সুখ পাইতেছে না; কারণ সুখের দিকে পিছন করিয়াছে। সেইজন্ত যাহারা অফুরন্ত সুখ, নিত্যসুখ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে পরমানন্দ-মুক্তি নিত্যসুখ-বোধ-তত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধাসুন্দরীর শ্রীচরণাশ্রয় করিতেই হইবে। এই সুখময় চরণকে বাদ দিয়া কেহই সুখ লাভ করিতে পারিবেন না। কেবল মরীচিকার পিছনে ছুটাই সার হইবে। পরদুঃখকাতর করুণাসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—হে অর্জুন! আমি তোমাকে গুহা, গুহ্যতমাদি কস্ম, জ্ঞান, যোগ

ও কৰ্ম্মার্পণের কথা বলিয়াছি, তুমি আমার প্রিয় ও বন্ধু। প্রিয়-ব্যক্তিকে কখনও বঞ্চনা করা উচিত নয়, তাই তোমাকে এখন সৰ্ব্বগুহ্যতম কথা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

সৰ্ব্বধৰ্ম্মান পরিত্যাগ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং হ্যং সৰ্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

অর্থাৎ সমস্ত ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব, শোক করিও না। কৰ্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি সমস্তই “সৰ্ব্বধৰ্ম্ম”। কারণ ভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত যাহা কিছু সমস্তই সৰ্ব্বধৰ্ম্ম। এই সমস্ত ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেবল ত্যাগ নহে—পরিত্যাগ অর্থাৎ সৰ্ব্বতোভাবে ত্যাগ, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় “পরিত্যাগ্য” শব্দের অর্থে বর্ণাশ্রমাভিমান ত্যাগের কথাই বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন “হে অর্জুন, তুমি শঙ্কা করিতে পার যে ‘আপনি বেদাদি শাস্ত্রে যে কৰ্ম্মাদি করার কথা উপদেশ করিয়াছেন তাহা পরিত্যাগ করিলে প্রত্যবায় হইবে,’ তাই বলিতেছি—তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব। আর পূর্বে বেদাদিরূপে আমি কৰ্ম্মাদি উপদেশ করিয়াছি, এখন সাক্ষাৎ ভাবে তাহা পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি। পূর্ববিধি হইতে পরবিধি বলবান্। তুমি আমার এই পর এবং সাক্ষাৎ আজ্ঞাকে অবমাননা করিয়া বেদাদির উপদেশ পালন করিতে গেলে কোন ফল ত’ হইবেই না, বরং আমার সাক্ষাৎ আদেশ লঙ্ঘনজনিত অপরাধে তুমি অপরাধী হইবে। সেইজন্ত তুমি সমস্ত ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর। তোমার পাপ-মোচনের ভার, আমার চরণ-প্রাপ্তির ভার, এবং তোমার দেহ-রক্ষণের ভারও আমি গ্রহণ করিব। তুমি কোন চিন্তা করিও না, শোক করিও না।”

তাহা হইলে আমরা শ্রীভগবানের শ্রীমুখের উক্তি হইতে পাইতেছি যে একমাত্র শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগতি জীবের শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম, পরম ধৰ্ম্ম, সৰ্ব্বগুহ্যতম ধৰ্ম্ম, একমাত্র ধৰ্ম্ম। শ্রীভগবান্ ব্যতীত কেহই শরণ্য হইতে পারেন না, কারণ গিনি শরণ্য হইবেন, তিনি আশ্রিত-বৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ ও বদান্ত হইবেন। এই সমস্ত গুণ না থাকিলে শরণাগতের আশা কেহ মিটাইতে পারিবেন না। এই জগতের শ্রেষ্ঠ মানবগণের দূরের কথা, দেবতাগণের দূরের কথা, এমন কি পরিপূর্ণ মাত্রায় এসমস্ত গুণ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অগাধ বহু অবতার-

গণেরও নাই। সেইজন্ত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র শরণ্য। তাঁহার মত আশ্রিতের সকল আশা কেহই পূরণ করিতে পারেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-বর শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—

“ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্ত।

হেন কৃষ্ণ ছাড়ি’ পণ্ডিত নাহি ভজে অন্ত ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২২)

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন—

“কঃ পণ্ডিতস্তদপরং শরণং সমীয়া-

দুত্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ স্নহদঃ কৃতজ্ঞাং।

সর্বান দদাতি স্নহদো ভজতোহভিকামা-

নাঅ্যানমপ্যুপচর্যাপচর্যৌ ন যন্ত ॥” (ভাঃ ১০।৪৮।২৬)

অর্থাৎ হে ভগবন্! প্রিয়, সত্যবাক, স্নহৎ, কৃতজ্ঞরূপ আপনাকে ছাড়িয়া এমন কোন্ পণ্ডিত আছেন যিনি অপরের শরণাপন্ন হইবেন? আপনি ভজনশীল স্নহদ ব্যক্তিগণকে সমস্ত কাম, এমন কি নিজেকে পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন। অথচ আপনার তাহাতে হ্রাস ও বৃদ্ধি নাই। এইজন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই সব কৃষ্ণগুণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া, অন্ত সকলকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের মত আশ্রিত-বৎসল আর কেহ নাই। তিনি আশ্রিতের জন্ত করেন না এমন কোন কার্যই নাই। তিনি ভক্তের বশীভূত হইয়া যান। তিনি নিজেকে লঘু করিয়াও নীতি-বিগহিত পরম দুর্নীতি হইলেও, আশ্রিতের জন্ত সবই করিয়া থাকেন। সেইজন্ত তাঁহার মত আশ্রিত-বৎসল বাস্তবিকই কেহ নাই। তিনি “কৃতজ্ঞ”—কৃতং জানাতীতি কৃতজ্ঞঃ। শ্রীশ্রীমদ্রূপ গোস্বামি-প্রভু তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের কৃতজ্ঞতা গুণ বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

“অমুগতিমতিপূর্বাং চিস্তয়ন্নৃক্ষমৌলে-

রকুরুত বহুমানং শৌরিরাদায় কণ্ঠাম্।

কথমপি কৃতমল্লং বিশ্বরম্ভৈব সাধুঃ

কিমূত স খলু সাধুশ্রেণিচ্ছাড়াগ্রবত্তম্ ॥”(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১।৪৪)

অর্থাৎ ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ যুদ্ধে পরম স্নহকোমলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করিয়া মহা অপরাধ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রামাবতারকালীন সেবা স্মরণ করিয়া তদীয় কণ্ঠার পাণিগ্রহণপূর্বক তাঁহাকে বহু সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। সাধুগণ অল্পসেবা করিলেও যখন সাধু তাহা কখনও বিশ্বৃত হইতে পারেন না, তখন

সাধুগণোপাস্ত্রমণি শ্রীকৃষ্ণের আর কথা কি ? তাঁহার মত এত কৃতজ্ঞ আর কেহই নাই। আমরা তাঁহার জন্ত যদি সামান্য কিছুও করিয়া থাকি, সর্বাস্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ কখনও তাহা বিস্মৃত হন না।

তিনি সমর্থ—কেবল সমর্থ নহেন পরম সমর্থ। তিনি ইচ্ছামাত্রে সমস্তই করিতে পারেন। তিনি ঈশ্বর। তাঁহার সর্বতত্ত্ব-স্বতত্ত্বতার উপর কাহারও হাত নাই। ‘কর্ত্তুমকর্ত্তুমগ্ণথাকর্ত্তুঃ সমর্থ ঈশ্বরঃ’—তিনি করিতে পারেন, না করিতে পারেন, অগ্ন্যপ্রকার করিতে পারেন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তাই তিনি পরম সমর্থ। আশ্রিতের সকল আশা মিটাইবার মত অত সামর্থ্য আর কাহারও নাই।

তিনি বদান্ত—মহাবদান্ত। তাঁহার দয়ার কথা চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি রসিকশেখর আর পরমকরণ। পরম করুণাবতায়ী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরানন্দ্রন্দ্রের অবতীর্ণ হইয়া অশেষ দুঃখ-জর্জরিত জীবকে নাম-প্রেম দান করিলেন। তাঁহার মত দয়াল আর কেহই নাই। তিনি দয়াময় অর্থাৎ দয়ার মূর্ত্তি। তাই মহাভাগবত শ্রীল উদ্ধব বলিয়াছেন—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং

জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যাস্বধী।

লেভে গতিং ধাক্র্যচিতাং ততোহন্তঃ

কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ (ভাঃ ৩।২।২১)

অহো ! বকাসুর-ভগ্নী পূতনা, যাহাকে বধ করিবার জন্ত কালকূট-মিশ্রিত স্তন পান করাইয়াছিল এবং তাহা করিয়াও ধাতৃযোগ্যা গতি লাভ করিয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর এমন দয়াল কে হইতে পারেন যাহার শরণ গ্রহণ করা যাইবে ? তাই কৃষ্ণই একমাত্র শরণ্য।

শরণাগত ব্যক্তি নিশ্চিন্ত, সুখী ও নির্ভীক। তাঁহার কোন ভয় নাই। তিনি মাটিয়া-জগতের কাহাকেও আশ্রয় করেন নাই, তাই তিনি নির্ভীক। তিনি নিরপেক্ষ, তিনি জগতের কোন বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না। তিনি নিরপেক্ষ বলিয়া দাস্তিক নহেন। কারণ তিনি জানেন যে আমার মত পতিত ও নিষ্পণ্য আর কেহই নাই। তিনি সকলকে ভগবানের দাস বলিয়া সম্মান করেন এবং বিপদ সম্পদ সবই ভগবানের রূপা বলিয়া জানেন। তিনি মঙ্গলময় ভগবানের রূপা ব্যতীত কিছুই দেখেন না। শরণাগত ব্যক্তি শান্ত। ভগবৎ-সুখ-কামনা ব্যতীত তাঁহার আর কোন কামনা নাই। যাহারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকামী

তাহারাই অশান্ত । শরণাগত নিজে ত' শান্তই, এমন কি তাঁহাকে দর্শন করিলে মহা অশান্ত-জনও শান্তি লাভ করে । শরণাগত জানেন যে ভগবানই আমার একমাত্র পালনকর্তা । তিনি শ্রীহরিনামে রুচিই একমাত্র জীবন ও বাঁচিবার উপায় বলিয়া জানেন । তাই তিনি প্রার্থনা করেন—হে ভগবন্ !

“বিনোদ সেবক, কাদিয়া শরণ, ল'য়েছে তোমার পায় ।

ক্ষমি অপরাধ, নামে রুচি দিয়া, পালন করছে তায় ॥” (শ্রীশরণাগতি ১৭:৬)

শরণাগত কায়, মন ও বাক্য তিনটিতেই শরণাগত হইয়াছেন । কায়ের দ্বারা ভগবদ্ধাম আশ্রয় করিয়া থাকেন, মনের দ্বারা নিজকে ভগবানের আশ্রিত-দাস বলিয়া জানেন এবং বাক্যদ্বারা আমি ভগবানের দাস, তাঁহার ইচ্ছায়ই সমস্ত কার্য্য হইতেছে, ইহা বলেন এবং নিজে অনুভব করেন । যাহার নিজের জন্ত বিন্দুমাত্র চিন্তা আছে তিনি কখনও শরণাগত নন । শরণাগত ব্যক্তি প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক অবস্থাকে রূপাময়ের রূপা বলিয়া দেখেন । তিনি সর্বক্ষণ কেবলমাত্র ভগবানের রূপার দিকে তাকাইয়া থাকেন । তিনি অগ্র কাহারও কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না । তিনি বলেন—

তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার ।

তোমার ইচ্ছায় বিশ্বের সৃজন সংহার ॥

তব ইচ্ছামত ব্রহ্ম করেন সৃজন ।

তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন ॥

তব ইচ্ছামত শিব করেন সংহার ।

তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার ॥

তব ইচ্ছামতে জীবের জনম মরণ ।

সমৃদ্ধিনিপাত দুঃখ স্তম্ভসংঘটন ॥

মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে ।

তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে ॥

তুমি ত রক্ষক আর পালক আমার ।

তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর ॥

নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া ।

তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া ॥

বিনোদ-সেবক অতি দীন অকিঞ্চন ।

তোমার ইচ্ছায় তার জীবন মরণ ॥ (শ্রীশরণাগতি—২১)

এখন শরণাগতি কাহাকে বলে এবং তাহার লক্ষণ কি ইহাই আলোচিত হইতেছে। শরণাগতির ছয়টি লক্ষণ আছে। যথা, বৈষ্ণবতন্ত্র-বাক্যে—

“অনুকূল্যস্ত সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্।

রক্ষিণ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।

আত্মনিষ্কেপকার্পণ্যে যড়বিধা শরণাগতিঃ ॥”

(১) আনুকূল্য-সংকল্প অর্থাৎ ‘কৃষ্ণভক্তির যাহা অনুকূল’ তাহাই আমি অবশ্য স্বীকার করিব। (২) প্রাতিকূল্য-বিবর্জন অর্থাৎ ‘কৃষ্ণ-ভক্তির যাহা প্রতিকূল’ তাহা আমি অবশ্য ত্যাগ করিব। (৩) তিনি রক্ষা করিবেন অর্থাৎ ‘কৃষ্ণ ব্যতীত আমার কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই’—এই বিশ্বাস। (৪) কৃষ্ণকে ‘গোপ্তা’ ও ‘পালয়িতা’-রূপে বরণ অর্থাৎ ‘কৃষ্ণই আমার একমাত্র পালন-কর্ত্তা এবং দেবমনুষ্যের মধ্যে আর কেহই আমার পালনকর্ত্তা নাই’—এইরূপ স্থির বিশ্বাস। (৫) আত্মনিষ্কেপ অর্থাৎ ‘আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র নয়, উহা কৃষ্ণেচ্ছা-পরতন্ত্র’—এইরূপ বুদ্ধিই আত্মসমর্পণ। (৬) কার্পণ্য অর্থাৎ আপনাকে দীন বুদ্ধি।

শরণাগতির তারতম্যানুসারে ভক্তের তারতম্য হয়। শরণাগত-ভক্তের সঙ্গ বা রূপা ব্যতীত কেহই শরণাগত হওয়া ত’ দূরের কথা, শরণাগতি কাহাকে বলে তাহা বুঝিতেও পারে না। আমি যেইরূপ শরণাগতের সঙ্গলাভ করিব আমার সেইরূপ শরণাগতি হইবে। সমস্ত শরণাগতির মধ্যে প্রহ্লাদের শরণাগতি শ্রেষ্ঠা, তাহা হইতে শ্রীহনুমান্জীর শরণাগতি, তাহা হইতে পাণ্ডবগণের, তাহা হইতে যাদবগণের এবং তাহা হইতে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধবের শরণাগতি—উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। ব্রজদেবিগণের শরণাগতি সর্বশ্রেষ্ঠা, তাহার মধ্যে আবার বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীবৃষভানুন্দিনীর শরণাগতি অসমোদ্ধা। তাঁহার শরণাগতির সমান ও উর্দ্ধ আর কেহ নাই। - শ্রীবৃষভানুন্দিনী ও তন্নিজজনগণের রূপা ব্যতীত কেহই সেই শরণাগতির এক বিদ্ধুও লাভ করিতে পারেন না। তাই জীবশিক্ষার জ্ঞান রূপাঙ্গবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দৈন্তবশে রাধা-নিত্যজন শ্রীরূপ-সনাতনের পাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছেন—

রূপ-সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি’।

ভকতিবিনোদ পড়ে ছুঁই পদ ধরি’ ॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে,—“আমি ত’ অধম।

শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম ॥”

—শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী

বোস-সাহেবের প্রশ্নের উত্তর

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৬ পৃষ্ঠায় “বোস-সাহেবের পত্র ও প্রশ্ন” শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটি প্রশ্নের উত্থাপন করা হইয়াছে। উহা পাঠ করিয়া তাহার উত্তর দিতে আমার বিশেষ ইচ্ছা হওয়ায় নিম্নলিখিতভাবে নিবেদন করিতেছি। পাঠক-পাঠিকাগণ এবং প্রশ্নকর্তা স্বয়ং সকলেই আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিজগুণে মার্জনা করিবেন। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার মারফত এইভাবে প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদানদ্বারা ইষ্টগোষ্ঠী সাধন হইলে সকলেরই মঙ্গল হইবে এরূপ আশা করা যায়।

প্রথম প্রশ্ন—[মানবজাতি সহজাত বৈষ্ণব। যদি কেহ স্রষ্টার অনভিপ্সিত কর্মে রত হয়, তবে সে অবৈষ্ণব এবং অস্বর আখ্যা পায়। কিন্তু বৈষ্ণবগ্রন্থে “শুদ্ধ-বৈষ্ণব” কথার তাৎপর্য কি? অশুদ্ধ-বৈষ্ণব অর্থাৎ অবৈষ্ণবকেও কি বৈষ্ণব বলা হ’বে? এই মধ্যপন্থী ভাষা কেন?]

প্রশ্নকর্তার প্রথম প্রশ্নের উত্তর এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে। যথা—কেবল মানবজাতি নহে, পরন্তু জীবমাত্রই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব। সর্বযোনিতে যে-সকল মূর্তি দেখা যায়, সে-সমুদায়েরই বীজপ্রদ পিতা শ্রীভগবান, আর মাতা মহৎ-ব্রহ্ম প্রকৃতি। সূতরাং ভগবানের সন্তানগণ সহজাত বৈষ্ণব ভিন্ন আর কি হইতে পারেন?

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু বারাণসীধামে যখন শ্রীগৌরসুন্দরকে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু পদ্মপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা পরা-শক্তি বলিয়া বিচার করিয়াছিলেন এবং “জীবের ‘স্বরূপ’ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস” এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ বিষ্ণুতত্ত্বের আদি ও মূল-পুরুষ। সূতরাং কৃষ্ণের ‘নিত্যদাস’ সকলেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভাগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এইভাবে জীবতত্ত্বের নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃ ষষ্ঠানীজ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কথতি ॥ (গী: ১৫।৭)

ভগবান্ স্বয়ং নিজেকে যে প্রভাব-বৈভব-বিলাসাদি দ্বারা স্বাংশরূপে বিস্তার করেন তাহা সমস্তই ভগবানের অংশ-কলা ইত্যাদি বিষ্ণুতত্ত্ব। আর যে

বিভিন্নাংশ দ্বারা ভগবান্ নিজের বিলাসপুষ্টি-সাধন করেন তাহাই বিভিন্নাংশ জীব-তত্ত্ব। স্বাংশতত্ত্বে ভগবানের ভগবদ্ধারূপ অহং-তত্ত্ব পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু বিভিন্নাংশে ভগবানের অহং-তত্ত্বের পরিবর্তে জীবের স্বসিদ্ধ অহং-তত্ত্বের উদয় হয়। যে-সকল জীবের স্বসিদ্ধ অহং-তত্ত্বের বিপর্যয় ঘটে নাই তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ মুক্তজীব, আর যাহাদের বিপর্যয় ঘটিয়াছে তাহারাই বদ্ধজীব। এই প্রকার বদ্ধ এবং মুক্ত উভয় অবস্থাতেই জীব অজ, নিত্য, শাস্ত, পুরাণ এবং অবিনাশী। বদ্ধাবস্থায় জীব জড়াপ্রকৃতির কবলিত হইয়া তাহার স্বরূপগত বৈষ্ণবতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া, মনকে কেন্দ্র করিয়া জড়েন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করে। কিন্তু প্রকৃতি এতই শক্তিসম্পন্ন যে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে জীবেরই পরাজয় ঘটে। এইপ্রকার যুদ্ধ-লিপ্ত জীবই অশুর বা মায়া-মোহিত। জীব যখন কোনও স্কৃতিফলে বৃদ্ধিতে পারে যে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার ভোক্তা হইবার বাসনা জীবের ভ্রমাত্মক অবস্থা, তখনই সে প্রকৃতি ও জীবের নিয়ন্তা শ্রীভগবানের চরণে প্রপত্তি করে। শ্রীভগবানে প্রপত্তি হইলে, প্রকৃতি বা মায়া আর জীবকে গুণত্রয়ের দ্বারা যন্ত্রনা দেন না। জীব তখন পুনরায় মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইপ্রকার প্রপত্তিময় জীবনই জীবের দৈব বা বৈষ্ণবীয় অথবা ব্রাহ্মীস্থিতি-অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়।

দৈবী হেবা গুণময়ী মম মায়া দূরতয়া ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ (গীঃ ৭।১৪)

প্রকৃতির কবলিত জীবকে উদ্ধার করিবার মানসে শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, তত্ত্বজ্ঞানী গুরুদেব যখন প্রণত, জিজ্ঞাসু ও সেবাপরায়ণ জীবকে কৃপা করেন, তখন জীবের যোগ্যতা বিচার করিয়া কৰ্ম্মাধিকারে কৰ্ম্মযোগ, জ্ঞানাধিকারে জ্ঞানযোগ এবং ভক্ত্যাধিকারে ভক্তিযোগ শিক্ষা দেন। অবশ্য সমস্ত যোগেরই লক্ষ্যবস্তু ভক্তি ও পরমপদ শ্রীবিষ্ণু।

শুদ্ধ-ভক্তির সংজ্ঞা এইরূপ। যথা :—

অন্ত্যভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকৰ্ম্মাত্মনাবৃতম্ ।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূপম্ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।২)

সর্বপ্রকার বাসনা-বর্জিত হইয়া জ্ঞান ও কৰ্ম্মের দ্বারা অনাবৃত অবস্থায় অনুকূলভাবে যাহারা শ্রবণাদি কেবল-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই শুদ্ধভক্ত বা শুদ্ধ-বৈষ্ণব; কিন্তু সেইপ্রকার 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব' কোটি কোটি মুক্তগণের মধ্যেও

দুল্লভ। ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞান লাভ হইলে ‘শুদ্ধ-বৈষ্ণব’ পর্যায়ে পরিগণিত হওয়া যায়। যথা :—

মনুষ্যাণাং সহশ্রেষু কশ্চিদ্ব্যততি সিদ্ধয়ে।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ (গীঃ ৭।৩)

কোটি কোটি কর্ম্মীর মধ্যে একজন জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, আর কোটি কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন মুক্ত শ্রেষ্ঠ। সেই প্রকার কোটি কোটি মুক্তগণের মধ্যে একজন ‘শুদ্ধ-ভক্ত’ও বিরল। এইপ্রকার শিক্ষা আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। সেই প্রকার শুদ্ধভক্তাবস্থায় যাহারা পঁছান নাই অথচ ভগবানে কোন হেতুবশতঃ প্রপত্তি আছে, তাঁহারা ভক্ত্যুন্মুখী চারি প্রকার স্ক্রুতিবান্ জীব। যথা :—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্ক্রুতিনোহজ্জুন।

আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ (গীঃ ৭।১৬)

ভক্ত্যুন্মুখী স্ক্রুতিবান্ আর্ত ও অর্থার্থী ভক্তগণ কর্ম্ম-মিশ্র বলিয়া এবং জ্ঞানী ও জিজ্ঞাসু জ্ঞানমিশ্র বলিয়া উভয়েই ‘শুদ্ধ-ভক্ত’ হইতে পারেন না। কিন্তু ইহারা সকলেই ক্রমবিকাশে শুদ্ধ-ভক্ত বা শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইবার উপযুক্ত। এই সকল মিশ্রভক্ত বা বিদ্ধবৈষ্ণবগণ অস্বর-পর্যায় হইতে পৃথক্ জানিতে হইবে। অস্বর-সম্প্রদায় আর্ত ও অর্থার্থী হইলে ভগবানের শরণাপত্তি না করিয়া মায়া-মোহিত হইয়া মূঢ়তাবশতঃ নরাধম হইয়া যায়। স্তবরাং অস্বরপর্যায় এবং বৈষ্ণবপর্যায় পৃথক্ জানিতে হইবে। বিদ্ধবৈষ্ণবগণও ভগবদ্বিদ্বেষী অস্বরগণ অপেক্ষা কোটি কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুভক্তমাত্রেই দেবতা এবং অস্বর তাহার বিপরীত। “বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আস্বরস্তদ্বিপর্যায়ঃ”—(পদ্মপুরাণ)। “ওঁতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ”—(১।২২।২০ ঋক্)। অস্বরগণের শুদ্ধ বা বিদ্ধ-বৈষ্ণবতার কোনই আখ্যা নাই।

জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও সে মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া নিজেকে অবৈষ্ণব মনে করে বা অজ্ঞাভিলাষী হইয়া বহুপ্রকার উপাদি দ্বারা পরিচিত হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু যাহাদের স্বরূপোপলব্ধি হইয়াছে তাঁহারা নিজেকে এবং সকলকেই নিত্য-কৃষ্ণদাস দর্শন করেন। তাঁহারা জানেন—

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম ‘সাধ্য’ কভু নয়।

শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১০৪)

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শুনি চৈব স্থপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ (গীঃ ৫।১৮)

স্বরূপসিদ্ধ বৈষ্ণবের সর্বত্রই বৈষ্ণবদর্শন স্বাভাবিক। শুদ্ধবৈষ্ণব ভগবানের প্রতি প্রেম, শুদ্ধবৈষ্ণবের সহিত মিত্রতা, বিদ্ধবৈষ্ণবকে দয়া এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণবদ্বেষ্টী অস্তুরগণকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই প্রকার ব্যবহার দ্বারাই শুদ্ধবৈষ্ণব-গণের সমতা অভিব্যক্ত হয়।

শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মভূত-অবস্থা প্রাপ্তির পর শুদ্ধভক্তি বা পরাভক্তি লাভ হয়। যথা :—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্জতি।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদুক্তিং লভতে পরাম্ ॥ (গীঃ ১৮।৫৪)।

এই পরাভক্তি সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

বৈষ্ণব-জগতে বা পারমার্থিক-জগতে কোন প্রকার মধ্যপন্থী কথা হইতে পারে না। জড়-বৈজ্ঞানিক-জগতে যেমন কোন প্রকার মধ্যপন্থী কথার অবকাশ নাই, সেই প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্মত পারমার্থিক জগতেও কোন রক্ষা-নিষ্পত্তির কথা নাই। যাহারা পারমার্থিক জগতে প্রবেশ করেন নাই বা শ্রোত্রীয়-ব্রহ্মনিষ্ঠ-গুরুপাদপদ্মের দর্শন পান নাই, তাঁহারাই একটা পারমার্থিক রক্ষা-নিষ্পত্তি করিয়া “তুম্ভি আচ্ছা, হম্ভি আচ্ছা” সিদ্ধান্ত করিয়া বঞ্চিত হইয়া যান। জড়-বৈজ্ঞানিক-জগতে যেমন কোদালকে কোদালই বলা হয়, পারমার্থিক বিজ্ঞানেও সেই প্রকার যিনি যাহা তাঁহাকে তাহাই বলা হয়। শাস্ত্রবিচারে ভক্ত, অভক্ত, প্রাকৃত ভক্ত, অপ্রাকৃত ভক্ত, বিদ্ধ ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত, কনিষ্ঠ ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, উত্তম ভক্ত ইত্যাদি বহু প্রকার স্তর বা তারতম্য আছে। সেই প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান বাদ দিয়া অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পাঞ্চরাত্রিকী-বিধি বাদ দিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব মোটামুটি সহজভাবে বুঝিয়া লইতে গেলে অনেক সময় প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া যাইতে হয় এবং তাহারা উৎপাতেই স্থিতি হয়। সেই-ভাবে মধ্যপন্থী কথার বিচার করিয়া পারমার্থিকগণ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দক্ষা রক্ষা-নিষ্পত্তি করিতে রাজী হইবেন না।

—শ্রীঅভয়চরণ দে,

এডিটর, ব্যাক-টু-গড্‌হেড্

[মাননীয় উত্তর-দাতা আমাদের শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার একজন স্বেযোগ্য গ্রাহক। তিনি প্রশ্নকর্তার প্রথম প্রশ্নের যেরূপ উত্তর দিয়াছেন তাহাতে প্রশ্ন-কর্ত্তা ও পাঠকবর্গ বিশেষ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। আমরা লেখক মহোদয়কে এজন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। আশা করি অন্ত প্রশ্ন-

গুলিরও উত্তর তাঁহার নিকট হইতে পাইব। যাহা হউক, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা এসম্বন্ধে সময়ান্তরে আরও আলোচনা করিবেন। —সম্পাদক]

চাতুর্মাশ-ব্রত

এই বৎসর বর্তমান আষাঢ় মাসের ২৬শে তারিখ রবিবার হইতে কার্তিক মাসের ১৯শে তারিখ পর্যন্ত চাতুর্মাশ-ব্রতের কাল নিরূপিত হইয়াছে। চন্দ্রের গতিবিধি অনুসারে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ যে মাসের বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে ২৬শে আষাঢ় পূর্ণিমা হইতে কার্তিক মাসের পূর্ণিমা পর্যন্ত উক্ত ব্রত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি পালন করিবেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত সেবকগণ ও অনুগত ভক্ত-মহিলাবৃন্দ সকলেই ঐ দিবস হইতে চাতুর্মাশ-ব্রত পালন করিবেন। এই চাতুর্মাশ-ব্রত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সকলেরই পালনীয়। এই ব্রত বৈধী-ভক্তির অন্তর্গত। শাস্ত্রে ভক্তির বিধি শত-সহস্র প্রকার থাকিলেও চৌষটি প্রকার ভক্ত্যঙ্গই শ্রীকৃপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আদরণীয়। সাধন-ভক্তি বাদ দিয়া হটাৎ ইহার উল্লঙ্ঘন করিলে উচ্ছলিত হইয়া প্রকাশ পাইবে। যদিও উক্ত চাতুর্মাশ-ব্রত-উদ্ঘাপন উক্ত চৌষটি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু চাতুর্মাশ-ব্রত-পালন শিক্ষা দিবার জন্য পুরী ও দক্ষিণদেশ প্রভৃতি স্থানে অবস্থানকালে নিজে স্বয়ং ইহা পালন করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং এই ব্রত পালন অবশ্য কর্তব্য। চাতুর্মাশ-ব্রত কেবল গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণেরই কৃত্য এমন নহে, ইহা কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অগ্ন্যভিলাষী প্রভৃতি যাবতীয় স্মার্ত্ত-বিধানানুগামী সকলেরই পালনীয়। সুতরাং আমাদের বিশেষ অনুরোধ পাঠক-পাঠিকাবর্গ সকলেই বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই ব্রত পালনে কৃতসঙ্কল্প হইবেন।

বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে সাধক-জীবন রক্ষিত হয় না। বৈধ-ভক্তি অপেক্ষা রাগানুগ-ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বশাস্ত্রেই পরিণীত হইয়া থাকে। তজ্জন্তু রাগের ভাণ দেখাইয়া আমাদের বিধির আবশ্যকতা নাই। আমরা ‘উন্নতমার্গে পহঁছিয়া পরমহংস হইয়াছি’ এইরূপ অকাল-পকতা লাভ করিলে সমূহ অমঙ্গল জানিতে হইবে। “সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্তা চরেদবিধিগোচরঃ”—শাস্ত্রের এই বাক্য পরম-হংস মহাভাগবতগণের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা তাঁহাদের আচরণ

অনুসরণ করিলে বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িব। রাগমার্গে প্রবেশ করিতে হইলে বিধি উল্লঙ্ঘন করা চলিবে না। “বিধিমার্গ-রত জনে, স্বাধীনতা-রত্ন দানে, রাগমার্গে করান প্রবেশ।”—মহাজনগণের এই বাক্য সর্বদা হৃদয়ে অবরুদ্ধ রাখিতে হইবে। স্মতরাং অনুরাগের সহিত বিশেষ প্রীতিযুক্ত হইয়া এই চাতুর্মাশ্ত্র-ব্রতের ষাণ্ডীয় বিধিসমূহ পালন করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য।

“যো বিনা নিয়মং মর্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।

চাতুর্মাশ্ত্রং নয়েনমূর্খো জীবন্নপি মৃতো হিঃ সং ॥” (হঃ বিলাস-১৫।৬০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত কিংবা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্মাশ্ত্রাদি ষাপন করে, সে মূর্খ এবং জীবিত অবস্থায় মৃততুল্য। স্মতরাং বিনা নিয়মে জীবন ষাপনকারীর উচ্ছ্রালতাকে শাস্ত্রকারগণ মঙ্গলের পথ বলিয়া অনুমোদন করেন নাই।

কেহ কেহ ক্রমপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া অনধিকার-চর্চার মেয়েলী ধারণার বশবর্তী হইয়া পড়েন। আজকাল উচ্ছ্রাল-সমাজ স্ত্রীজাতির পূজায় আত্মনিয়োগ করিতে গিয়া যে অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছেন, তাহার ফল সকলেই অনুভব করিতেছেন ও করিবেন। অধোক্ষজ-ভক্তির উল্লঙ্ঘন করিয়া কাহারও অপ্রাকৃত হইবার বাসনাকে আমরা উচ্ছ্রালতা-স্বৈগ্ৰবুদ্ধি বলিয়া মনে করি। শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে অপ্রাকৃত তত্ত্বের অনধিকারী বিচার করিয়াছেন। অপ্রাকৃত বস্তুই অধোক্ষজ। আবার অধোক্ষজ বস্তুই অপ্রাকৃত। স্মতরাং আমরা সকলেই কাঞ্চ হইলেও বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণব সংজ্ঞাই আমাদের মাধুর্যের উন্নততম স্থানে স্থাপন করিয়া থাকেন। স্মতরাং আমরা বৈষ্ণব নহি—এইরূপ বিচার মেয়েলী-বিচার। জীব মাত্রই স্বরূপতঃ প্রকৃতি হইলেও শ্রীমন্নহা-প্রভুর গুণদামলীলায় আমরা তাহা হইতে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। কৃপালুগ-ধারায় ষাঁহার স্নাত তাঁহার বিষ্ণুপ্রিয়া অপেক্ষা কৃষ্ণপ্রিয়ারই আদর করিয়া থাকেন। তাই শ্রীমন্নহা-প্রভুর পিতৃদেব শ্রীজগন্নাথ মিশ্রবরের সেবিত ‘অধোক্ষজ’ বস্তুর সেবকসূত্রে আমরা বলিতে চাহি,—

সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ’র হিয়া,

বিনোদের সেই সে বৈষ্ণব।

স্মতরাং আমরা গুরুপাদপদ্ম-গুণ্ডা-সরস্বতী-স্বরূপিনী কৃষ্ণপ্রিয়ারই আনুগত্য করিব। বিষ্ণুপ্রিয়া আমাদের মস্তকে থাকেন থাকুন।

গুণ্ডা-সরস্বতীর নির্দেশমত আমরা চাতুর্মাশ্ত্র-ব্রতাদি পালন করিব। অনধিকার-চর্চায় প্রবেশ করিব না। শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিন

মাসে দুগ্ধ এবং কার্তিক মাসে আমিষ (মাষকলাই) ভোজন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

“শ্রাবণে বর্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।

দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্তিকে চামিষং ত্যজ্যেৎ ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস-১৫।৬১)

এতদ্ব্যতীত চারি মাসের জন্ত শিম, বরবাটি, পটোল, পুঁইশাক, কলসী শাক, লাউ, বেগুন প্রভৃতি সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। গৃহস্থগণের পক্ষে চারিমাস ক্ষৌর কন্দাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে ত্যাগী সন্ন্যাসিগণের পক্ষে ভাদ্র পূর্ণিমায় বিশ্বরূপ-ক্ষৌর অবলম্বন করা চলিতে পারে। এই ব্রত পালনকালে যাবতীয় বিলাসসম্ভার সম্পূর্ণরূপে বর্জ্যনীয়।

চাতুর্দশ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরবর্তী সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিব।

স্বধামে অতীন্দ্রিয় প্রভু

অবরুদ্ধ বিরহ-প্রকাশ ও নির্য্যাণ-দিবস

যাঁহারা শ্রীধাম-মায়াপুরের ধামসেবার বৈশিষ্ট্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীল অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর পরিচয় অবগত আছেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অবগুষ্ঠিতা নবাগতা কুলবধূর ত্রায় নির্জনে নিভূতে ভক্তবর শ্রীল অতীন্দ্রিয় প্রভুর বিরহ আর কতদিন লোক সমাজের অবগতির অন্তরালে রাখিবেন? উচ্ছ্বাসময়ী বেদনা আজ আপনা হইতেই প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার বিরহ-বার্তা আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার শুদ্ধবৈষ্ণবোচিত গুণাবলী আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে। তাঁহার আচার-বিচার ও ব্যবহার তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি বিগত তেরশত পঞ্চাশ (১৩৫৫) সালের ৩০শে চৈত্র তারিখে বর্ষান্তে দেহান্তলীলা প্রকাশ করিলেন। এই সৌরবর্ষ অশ্রুবর্ষণযোগেই সমাপ্ত হইল।

বৈষ্ণবের বিরহস্মৃতি আত্মশোধক

বৈষ্ণবের বিরহস্মৃতি আমাদের হৃদয়ে যাবতীয় ময়লা মুছিয়া মায়ামোহের মত্ততা হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। তাঁহার সেবোন্মুখী সেবা-প্রবৃত্তিগুলি আমাদের জীবন-পথে অন্ধের যষ্টির ত্রায় অবলম্বন হইয়া থাকে। তাই আজ অতীন্দ্রিয় প্রভুর

বহু গুরুসেবা প্রণালীর মধ্যে দুই একটি মাত্র আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিব।

বড়বাবুর চাকুরী-জীবন

তিনি ই,আই, রেলওয়ে কোম্পানীর অধীনে ধানবাদ বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিনটেন্ডেন্ট (District Traffic Superintendent) আফিসের চিফ ক্লার্ক (chief clerk) পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত আফিসের যাবতীয় কার্য সুসম্পন্ন করিয়া যেটুকু সময় লাভ করিতেন, তাহা দ্বারাই শ্রীল প্রভুপাদের সেবার ও প্রচারের জন্ত আশ্রয় চেষ্টা করিতেন। তাঁহার পদমর্যাদার দিকে লক্ষ্য করিয়া ধানবাদবাসী, ধামবাসী প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে “বড়বাবু” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি স্বনামে তত পরিচিত না হইলেও “বড়বাবু” নামে সকলের নিকট আদরের সহিত সুপরিচিত। চাকুরী-জীবনে সংগৃহস্থের কর্তব্যবোধে যতটুকু তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের জন্ত প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত কোন ব্যয় বাহুল্যের দ্বারা তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্ত এক কপর্দকও খরচ করিতেন না। সর্বদাই মঠের সন্ন্যাসী-বৈষ্ণবগণের সেবার জন্ত এবং তাঁহাদিগকে ধানবাদে আনাইয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য লোক সমাজে কীর্তন করাইতেন ও নিজেও কীর্তন করিতেন। তাঁহার সেবাচেষ্টায় ধানবাদবাসী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করিয়া ধন্ত হইয়াছেন এবং সেবার সুযোগ পাইয়া প্রচুর সেবোন্মুখী-স্বকৃতি অর্জন করিয়াছেন। ধানবাদে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-বাণী প্রচারের মূলপুরুষ এই বড়বাবু শ্রীল অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর।

বড়বাবুর জীবন্ত চেতন-মৃদঙ্গ সংগ্রহ

বড়বাবু শ্রীগুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের সেবার জন্ত যে জীবন্ত চেতনমৃদঙ্গসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে। তিনি চিরতরে চর্মচক্ষুর অন্তরালে বিচরণ করিলেও, আমরা তাঁহার অকৈতব সেবার কথা আলোচনা করিলে, তিনি আমাদের হৃদয়ে সর্বদা অবরুদ্ধ থাকিবেন। তাঁহার সংগৃহীত জীবন্ত-মৃদঙ্গসমূহ মধ্যে মাত্র একটীর কথা আমরা এখানে আলোচনা করিয়া নিরন্ত হইব। শ্রীল প্রভুপাদ সেই মৃদঙ্গটী লাভ করিয়া এমনভাবে তাহার বাদনধ্বনি করিয়াছিলেন, যাহার অপ্রাকৃত শব্দ প্রাচ্যাদেশ অতিক্রম করিয়া হৃদয় পাশ্চাত্য-দেশ পর্যাস্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই মৃদঙ্গবাণ, শুনিতে মন, অবসর সদা যাচে।” জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তির ‘সার’ গান করিতে এই অপ্রাকৃত চেতন-মৃদঙ্গের সহায়তা গ্রহণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তাই মৃদঙ্গ-

যজ্ঞ সারঙ্গ-যন্ত্রে মিলিত হইয়া অপূর্ব “অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ” আখ্যা লাভ করিল। শ্রীল অতীন্দ্রিয় প্রভু এই চেতন-মুদঙ্গ শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর সংগ্রাহক।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনিষ্টিটিউটের মূল-ইচ্ছন

বড়বাবুর চাকুরী-জীবন শেষ হইবামাত্রই তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করিলেন। শ্রী-পুত্রের গ্রামবাসে পারমাথিক মঙ্গললাভের কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া শ্রীশ্রীগৌর-জন্মভিটার সংলগ্নস্থানে শ্রীধামে ইষ্টক-নির্মিত দ্বিতলগৃহ স্থাপন করিয়া সপরিবারে বসবাস করিতে লাগিলেন। ইহা তাঁহার বাহ্য উদ্দেশ্য হইলেও মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রীধামে বাস করিয়া সর্বদা শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা করা। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালাবধি তাঁহার সেবার কখনও ত্রুটি করেন নাই। একদিন তাঁহার পুত্রত্রয়ের মধ্যে নিমাই ও সীতানাথ একটু বড় হইয়া বিশ্বপুষ্করিণী গ্রামের উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত। তাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—ছেলেগুলি আজকালকার আত্মরিক শিক্ষালাভ করিয়া অধঃপাতে যাইতেছে। আপনি কি ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে পারেন না? তখনই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট এই কথা নিবেদন করিতেই তিনি একটা সেখর উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করেন এবং তাহা তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত করা হয়। দুঃখের বিষয় তখন শ্রীল প্রভুপাদের গণ্যমান্য বহু সেবকাভিমাত্রী ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করিয়া তাহাতে অসহযোগ-বৃন্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কালচক্রে আজ সেই আদর্শ-বিদ্যালয়ের তাঁহারাই নিয়ন্তা। আজ সেই বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র শ্রীমন্নহা-প্রভুর সেবায় সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ লাভ করিয়াছে। বলাবাহুল্য বৈষ্ণববর এই শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনিষ্টিটিউটের উন্নতিকল্পে প্রভূত চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হইয়াছিলেন। উক্ত বিদ্যালয় হইতে অগ্রাণু ছাত্রদের সহিত তাঁহার প্রথম পুত্র নিমাইচরণও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

অতুলবাবুর সত্যানুরাগ

বড়বাবুর পিতৃদত্ত নাম শ্রীঅতুলচন্দ্র এবং শ্রীগুরুদত্ত নাম শ্রীঅতীন্দ্রিয়। অতুলবাবুর সংসাহসিকতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের কিছুকাল পরে শ্রীধাম মায়াপুরে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের তাণ্ডব-নৃত্য শ্রীধামকে প্রকম্পিত করিয়া তুলে। এমন কি শ্রীল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ ঐকান্তিক সেবকগণের নিষিদ্ধ-সেবাধিকার সর্বতোভাবে ব্যাহত হইতে

লাগিল। ফলে কতকগুলি গুরুদ্রোহী পাষণ্ডী কিশোরীভজা, কৰ্ত্তাভজা ও ভজনখাজা-সম্প্রদায় শ্রীমায়াপুরচন্দ্রকে রাহুর গ্রাস করিয়া ফেলিল। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের প্রতি অমায়ুষিক অত্যাচার হইতেছিল। এমন সময়ও তিনি নির্ভীকভাবে তথায় অবস্থান করিয়া সেই দানবগণের কার্যের কঠোর প্রতিবাদ করেন। সত্যের জ্ঞান তিনি একদিকে একা, অপরদিকে অন্যান্য পাঁচ শত ভজন-খাজা দানব। অম্বরগণ সদলে বাহ রচনা করিয়া যখন অভিমত্যুর গ্রাস তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, তখন তিনি অনন্তোপায় হইয়া পাষণ্ডদলনবান্না, দুর্জন-চপেটিকা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দানবদলনকল্পে তাঁহার চির আদরের প্রাকারবেষ্টিত ইষ্টক-নির্মিত দ্বিতল বাসগৃহ উক্ত সমিতিতে নিবৃত্তিহীন দান করেন। তিনি ৮৬ বৎসর কাল জগতে প্রকট থাকিয়া ধর্ম-জগতের যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, জগতের দুর্দৈব মোচন করিতে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিই সক্ষম। শ্রীধাম মায়াপুরের আপাত কল্যাণ নাশ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছামুরূপ তাঁহার স্বরূপের পূর্ণ-অভিব্যক্তি করিতে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিই উপযুক্ত শুদ্ধ বৈষ্ণব-সম্মত। পরম পূজনীয় শ্রীল অতীন্দ্রিয় ভক্তি গুণাকর প্রভু সরল অন্তঃকরণে নিজ বাসগৃহের মায়ামোহ ত্যাগ করিয়া একথণ্ড দানপত্র দলিল সম্পাদন করিয়া কৃষ্ণনগরে রেজিষ্টারী করিয়াছেন।

অতীন্দ্রিয় প্রভুর সঙ্কলিত “গৌড়ীয়-কণ্ঠহার”

অতুলবাবু পিতৃদত্ত নাম অপেক্ষা গুরুদত্ত নামের দ্বারাই আত্মপরিচয় দিতেন। তিনি শ্রীঅতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী বলিয়া সর্বত্র নিজ নাম ব্যক্ত করিতেন। তাঁহার ভক্তি-সাহিত্যানুরাগ দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের পণ্ডিতগণের উপকারার্থে তিনি একখানি অপূর্ব-গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। গৌড়ীয়গণ তাহা তাঁহাদের কণ্ঠের হার-স্বরূপ পরিধান করেন বলিয়া উক্ত গ্রন্থের নাম “গৌড়ীয়-কণ্ঠহার”। এই কণ্ঠহার গুরুত্ব হইতে প্রয়োজনতত্ত্ব পর্য্যন্ত ১৮টা তত্ত্বেরে গ্রন্থিত এবং তাহাতে প্রমাণ-তত্ত্ব নামক একটি দোলক ও গুরুশীর্ষাদে মধ্যমণি সন্নিবিষ্ট আছে। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিতে যে কত যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা যাহারা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা ইহা অমুভব করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইহার পরিচয় দিতে গিয়া যে “মুত্র”-শীর্ষক ভূমিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সকলেরই অবগত হওয়া কৰ্ত্তব্য। পরপৃষ্ঠায় তাহা প্রদত্ত হইল।

গৌড়ীয়-কণ্ঠহারের “সূত্র”-শীর্ষক ভূমিকা

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় গাহিয়াছেন—

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম-মাঝে ।

“গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে” এই বাক্যের সার্থকতা সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব শাস্ত্রবাক্য ব্যতীত অল্পকথা কীর্তন করেন না, ‘শাস্ত্র’ শ্রীগুরুমুখ ব্যতীত অল্প কীর্তিত হন না। শ্রীগুরুদেব ‘সাধু’ বা পূর্ব মহাজনগণের বর্ত্তমানবর্তন ব্যতীত অল্প বিষয়ের উপদেশ প্রদান করেন না। সাধুগুরুর আচরণই—শাস্ত্র, সাধুগুরুর শ্রীমুখবিগলিত শ্রৌতবাণীই—শাস্ত্র; ‘শাস্ত্রই’—‘সাধু’, ‘শাস্ত্রই’—‘গুরু’, ‘সাধুই’ ‘শাস্ত্র’ বা ‘ভাগবত’, ‘গুরুই’—‘শাস্ত্র’ বা আদর্শ মূর্ত্ত-ভাগবত। সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য একসূত্রে গাঁথা, পরস্পরে এক মহান ঐক্যতান। প্রণিপাত, পরিগ্রহ ও সেবারুত্তি-সহযোগে এই ‘ঐক্য’ আত্মার সেবানুখ-বৃত্তিতে উপলব্ধির বিষয় হয়। “গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে”র যাবতীয় সিদ্ধান্ত সাধু বা মহাজনগণের আচার-সম্মত—শাস্ত্র-সম্মত—গুরু বা আচার্য্যানুমোদিত শ্রৌত-বিচার।

এই “গৌড়ীয়-কণ্ঠহার” এইরূপ একটি ঐক্যতানের সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। অষ্টাদশটী ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন ও তন্মধ্যে একটি দোলক ও মধ্যমণি লইয়া—এই কণ্ঠহারটী রচিত। রত্নসমূহ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-পর্য্যায়ে গুপ্তিত এবং স্থান-নির্দেশ ও ভাষানুবাদসহ গ্রথিত। গৌড়ীয়গণ এই কণ্ঠহার তাঁহাদের কণ্ঠের ভূষণ করিয়া নিত্যকাল প্রেমামৃত আনন্দন করুন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

ভক্তিগুণাকরের গুরুভক্তি

ভক্তিগুণাকর প্রভু গৌড়ীয়-কণ্ঠহার গ্রন্থখানি রচনা করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবকেই উহা অর্ঘ্য-স্বরূপ উৎসর্গ করেন। প্রাকৃত গ্রন্থ-লেখকগণের উৎসর্গের পাত্র, ভক্তি ও ভাষা অপেক্ষা বৈষ্ণববরের তৎপক্ষে কোটীগুণে উন্নততম বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে। তিনি যে ভাব ও ভাষায় গুরুপাদপদ্মে ভক্ত্যর্ঘ্য বিতরণ করিয়াছেন, তাহা ধীরভাবে পাঠ করিলে লেখকের হৃদয়ের গভীর উন্নততম-উজ্জল-গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা সমূহরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। আমরা তাঁহার হৃদয়ের স্রষ্টা পরিচয় দিতে অক্ষম—তাঁহার লেখনীই তাঁহার পরিচয় দিবে। পরপৃষ্ঠায় তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

গৌড়ীয়-কণ্ঠহারের “ভক্ত্যর্থ্য”-শীর্ষক উৎসর্গ পত্র

পরমারাধ্য-পরমাতীষ্টদেব পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্ষ্য অষ্টোত্তরশতশ্রী চিহ্নিলাস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীকর-কমলেশু—

পরমার্চনীয় প্রভুপাদ,

আপনি সাক্ষাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী—কীর্তনাখ্যভক্তি,—ইহা আপনার কৃপায় আমার গায় হরিবিমুখ ব্যক্তিও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের—“কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ”—এই বাণীর মূর্তবিগ্রহ আপনি। ভবদাবদন্ধ জীবকুলকে অনুক্ষণ হরিকথা শাস্তি-সলিল-সেচনে স্নানিষ্ঠ করিবার জগুই এই প্রপঞ্চে সম্প্রতি আপনার আবির্ভাব। আপনি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ কীর্তন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশ্রয়; আপনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বাস্তব-সত্য।

আপনার শ্রীমুখে অনুক্ষণ বীৰ্য্যবতী—দীপ্তিমতী সিদ্ধান্ত-সুধা-সরিৎ প্রবাহিত। আপনি অপার-অতল-ভক্তিসিদ্ধান্ত-রত্নাকর। তাহাতে অবগাহন-সামর্থ্য মাদৃশ ক্ষুদ্রজীবের নাই। তবে আপনি আপনার স্বভাবসুলভ বদান্ততা-ক্রমে যে সকল রত্ন বেলাভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহারই কয়েকটিমাত্র আহরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আপনার শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথামৃত-তরঙ্গিণী-শ্রোতবাণী শ্রীগৌড়ীয়-পত্রে প্রবাহিত। তাহা হইতেই আমি অষ্টাদশটি রত্নগুচ্ছ সংগ্রহ করিয়া আপনার কৃপাসম্বন্ধিত শ্রী * * প্রমুখ সতীর্থ-গণের সাহায্যে এই ‘কণ্ঠহার’ রচনা করিয়াছি।

হে স্বরূপদামোদরানুগবর, হে গৌড়ীয়বর্ষ্য, এই ‘কণ্ঠহার’ আপনার প্রীতি আকর্ষণ করিলেই বুঝিবে যে, ইহা গৌড়ীয়গণের কণ্ঠভূষণের যোগ্য হইয়াছে। এই ‘কণ্ঠহার’ আপনার শ্রীকরকমলে সমর্পণ করিতেছি—আপনার বস্তুই আপনার করে ‘ভক্ত্যর্থ্য’-রূপে অর্পণ করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন। আপনার করপল্লবস্পর্শ-প্রসাদোদ্ভাসিত রত্নহারের দ্যুতি মাদৃশ বহুজীবের অবিচ্ছিন্ন-অন্ধকার বিদূরিত করিবে, সন্দেহ নাই।

হে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, আমি নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আমার একটি আশাবন্ধ আছে যে, আপনার শ্রীকরকমলে যে বস্তু সমর্পিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই শ্রীহরিকর্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে। আশা করি, আপনার শ্রীকরকমলস্থ রত্নমালা কৃষ্ণপাদ-পঙ্কজান্ত নীরাজন করিয়া গৌড়ীয়গণের কণ্ঠশোভা বন্ধন করিবে। গৌড়ীয়গণ সেই প্রসাদ নিত্যকাল কণ্ঠে ধারণ করিয়া আমার প্রতি যে আশীর্বাদ বর্ষণ করিবেন, তাহাই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

প্রভো, আপনি প্রসন্ন হউন, আপনার প্রসাদেই ভগবানের প্রসাদ।
কীর্তনাখ্যা-ভক্তিই আমার সাধ্য-সাধন হউক। আপনি জয়যুক্ত হউন।

শ্রীরাধাষ্টমী-বাসর

শ্রীগৌরাক্ষ, ৪৪০

}

ভবদীয় চরণসেবাভিখারী অযোগ্য-দাসভাস

শ্রীঅতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী

জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের আনন্দাশীর্বাদ

আমরা অনেক সময় শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিয়া থাকি। সেবার স্থখ
বিধানই সেবকের সেবার উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি স্থখী হইয়াছেন
কি, সেবা করিয়া আমিই স্থখী হইয়াছি ইহাই বিবেচনার বিষয়। অধিকাংশ
ক্ষেত্রে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিই হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীল ভক্তিগুণাকর প্রভুর উৎসর্গ-
পত্রের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি তাঁহার প্রতি যে
কতদূর প্রীত হইয়াছেন তাহা ইহা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কবে
আমরা শ্রীল প্রভুপাদের এইরূপ কৃপাভাজন হইতে পারিব, তাহার অপেক্ষায়
জীবন ধারণ করিতেছি। তাঁহার কৃপাপাত্রগণের একান্ত কৃপালাভ করিতে
পারিলেই গুরুকৃপা লাভ হইবে। তাই প্রার্থনা—হে অতীন্দ্রিয় প্রভো! হে
বৈষ্ণববৃন্দ! আপনারা মাদৃশ পতিতের প্রতি সর্বতোভাবে করুণা করুন
যাহাতে আপনার আনুগত্যে শ্রীগুরুপাদপদের কৃপালেশ লাভ করিতে পারি।

অতীন্দ্রিয় প্রভুর প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

শুদ্ধভাগবতবর শ্রীমদঅতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী ভক্তিগুণাকরেষু—

সেহবিগ্রহ,

আপনার গুপ্তিত “কণ্ঠহার” পাইয়া আমার যে কত আনন্দ হইল, তাহা
বর্ণন করিবার ভাষা আমার নাই। তবে গৌড়ীয়ের কণ্ঠহার নিকপট-গৌড়ীয়-
শুদ্ধভক্তগুরুবর্গের গলায় পরাইয়া দিয়া আমি যে হরিতজনসেবার অধিকার পাইব,
তাহা আপনি স্থূর্ভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। অনেকে গোঁণী-বিন্ধা-ভক্তিকে
আশ্রয় করিয়া হরিসেবার পরিবর্তে ভগবানকে ‘ভোগের বস্তু’ মনে করেন,
তাঁহারাও এই ‘হার’ কণ্ঠে ধারণ করিলে তাঁহাদের স্বরূপের অভিজ্ঞান হইবে এবং
আমাদের দ্বায় কান্ধালের সহ বিদ্বেষ করিতে বিরত হইতে পারেন, মনে হয়।

শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার-পরিচয়ে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে আপ্রাকৃত
লীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ মার্জ্জনসেবার উপকরণরূপ-
শতমুখীমূর্ত্তে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমন এবং দুঃসঙ্কানুকরণ-বর্জ্জন-

কাখা জগতের অগ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে।

শ্রীরাধাবির্ভাব-বাসর
শ্রীচৈতন্যদ, ৪৪০

}

পতিতপাবন-নিত্যদাস নিরাসীর্নির্গমজ্জিয়
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

একখানি পত্র

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত হরিপদ বিষ্ণুরত্ন মহাশয়ের পত্র

দণ্ডব্রততয়: সন্ত.....

পূজ্যপাদ মহারাজ, বিগত ১৫।৫ তারিখে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠাইয়াছি, এষাবৎ তাহার প্রাপ্তি-সংবাদ না পাইয়া কথঞ্চিৎ উদ্বেগযুক্ত আছি। তাহার পর-দিবস আপনার শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা পাইয়া ও পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আপনার “উত্তমা ভক্তি” প্রবন্ধ অতি উপাদেয় হইয়াছে। ইহার ভাব, গান্তীর্ঘ্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার পরিচয় স্বরূপ পাঠকবর্গেরও চিত্ত আকর্ষণ করিবেই, মাদৃশ অর্কাচীন তো মুগ্ধ হইয়া ইহা পুনঃ পুনঃ পাঠ না করিয়া থাকিতে পারে নাই। ঐরূপ ভক্তিশাস্ত্র, বেদান্ত, শ্রায়, ব্যাকরণ প্রভৃতির একত্র সমাবেশ প্রবন্ধাকারে অল্পই দৃষ্ট হয়। আশাকরি ঐরূপ প্রবন্ধ পরিবেশন করিয়া আপনি বৈষ্ণব-জগতে চিরস্মরণীয় হইবেন।

‘গুরু সাজিবার ধুটতা’ সম্বন্ধে আপনি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সমীচীন ও সময়োপযোগী হইয়াছে। আমি বলিতে চাহিনা ও বোধ হয় ঐরূপ বিধানও নাই যে, হরিভজ্ঞনপরায়ণজনগণ কেহ শিষ্য স্বীকার করিবেন না, কেন না সাধক ভক্তকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু আদেশ দিয়াছেন, “আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ”। তবে নিজেকে গুরু-বুদ্ধি করা অবৈষম্যবত। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় শিষ্যবর্গকে বলিতেন ‘আমার গুরুবর্গ’। অবশ্য উহার অনুকরণে ঐরূপ বলিলেই হইবে না। তাঁহার অনুসরণে ঐরূপ চিন্তা করিতে হইবে। শ্রীমহাপ্রভুর ঐরূপ বলিবার উদ্দেশ্য—সকলকে হরিকীর্তনে প্রবর্তিত করা। কীর্তন ছাড়িলে চলিবে না। কেন না কীর্তনই ভজনের মূল-সূত্র, অথচ কীর্তনকারীই গুরু। মদীয় সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, ব্রজবাসী সতীর্থ গুরুভ্রাতৃগণ সকলেই গুরু হউন, ইহা আপত্তির নয়; কিন্তু গুরুগিরি করিয়া শিষ্যকে ভোগ্যবুদ্ধি করা অত্যাচার। যিনি যে পরিমাণে প্রকৃত গুরু হইবার যোগ্যতা অর্জন করিবেন তদনুরূপ পরমারাধ্য

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণে স্তুতি লাভ করিবেন। * * * * আমরা এত অল্প সময়ে শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের অমূল্য উপদেশ ভুলিতে বসিয়াছি, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়। মঠমন্দির তিনি হরিভক্তিকেন্দ্ররূপে স্থাপন ও পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। কাহারও মহাস্তগিরির জ্ঞান নহে। মহাস্তগিরির বিরুদ্ধে তাঁহার যে প্রবল নিষেধ ছিল, তাহার কোনও মূল্য আমরা দিতে পারিতেছি না, ইহা বিশেষ দুঃখের কথা। * * * * আপনি ঠিক বলিয়াছেন “উদ্দেশ্য সাধু হইলে ভক্তির আবির্ভাবের ফলে চিন্তে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসমূহ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে, ভক্তিবিরোধী কামনা-বাসনা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।” ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস ভক্তিপ্রার্থী অকিঞ্চন

—কান্দাল হরিপদ (বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল; গৌড়ীয় ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার ভূতপূর্ব সম্পাদক), পো: দাসনগর, হাওড়া, ২৪।৫।৪২

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে স্নানযাত্রা-মহোৎসব

আমাদের পাঠকবর্গ অবগত আছেন গত ৪র্থ সংখ্যায় ১৫৯ ও ১৬০ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে “শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসবে আহ্বান” ও “দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা” মুদ্রিত হইয়াছে। এ বৎসর এই উৎসব অতি বিরাট ও বিপুলভাবে সম্পন্ন করিবার আয়োজন চলিতেছে। আমরা সকলকেই এই উৎসবে যোগদান করিবার জ্ঞান হৃদয়ের সহিত আহ্বান করিতেছি। এই উৎসবেরই অঙ্গস্বরূপ বিগত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১০ই জুন শুক্রবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা মহোৎসব পূর্বপূর্ব বৎসরের তায় অতি সুন্দর সূচাক্রমে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব স্বয়ং অর্চা-মূর্তিতে তদভিন্ন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। ষাংহারা শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্র পুরীধামে গিয়া স্নান-যাত্রা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না, তাঁহারা শ্রীমঠের স্নান-যাত্রা উৎসবে যোগদান করিয়া পরম প্রীতिलाভ করিয়াছেন। পঞ্চামৃতে ও অষ্টোত্তর-শত রোপ্য-কলসীপূর্ণ গঙ্গাজলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা সম্পন্ন করা হয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যাবতীয় দর্শকমণ্ডলীকে স্নানান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সকলেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানজল স্ব স্ব পাত্রের স্ব স্ব গৃহে অতি আগ্রহের সহিত লইয়া যান। অপরাহ্নে শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে শ্রীস্নানযাত্রা-প্রসঙ্গ সহজ সরল ভাষায় পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করেন। শ্রীমঠের স্নানযাত্রা-উৎসব একটা অপূর্ব-দর্শন।

—প্রকাশক

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ক্ষেজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ক্ষেজে অহৈতুকী ভক্তি বিদগ্ধা ॥
অত্র ধর্ম সূত্ৰরূপে পালে যেই জন । হরি-কথার রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১ম বর্ষ } অনিরুদ্ধ, ৯ ছবীকেশ, ৪৬৩ গোরাঙ্গ বৃধবার, ৩২ শ্রাবণ ১৩৫৬, ইং ১৭৮৮৪৯ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীদয়িত-দাস-প্রণতি-পঞ্চকম্

(ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমন্ত্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-মহারাজ-কৃতম্)

ভয়ভঞ্জন-জয়শংসন-করণায়তনয়নম্ ।

কনকোৎপল-জনকোজ্জ্বল-রসসাগর-চয়নম্ ॥

মুখরীকৃত-ধরণীতল-হরিকীর্তন-রসনম্ ।

ক্ষিতিপাবন-ভবতারণ-পিহিতারুণ-বসনম্ ॥

শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।

প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥১॥

শরণাগত-ভজনব্রত-চিরপালন-চরণম্ ।
 সুকৃতালয়-সরলাশয়-সুজনাখিল-বরণম্ ॥
 হরিসাধন-কৃতবাধন-জনশাসন-কলনম্ ।
 সচরাচর-করুণাকর-নিখিলাশিব-দলনম্ ॥
 শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।
 প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥২॥
 অতিলৌকিক-গতিতৌলিক-রতিকৌতুক-বপুষ্ম ।
 অতিদৈবত-মতিবৈষ্ণব-যতি-বৈভব-পুরুষম্ ॥
 সসনাতন-রঘুরূপক-পরমাণুগচরিতম্ ।
 সুবিচারক ইব জীবক ইতি সাধুভিরুদিতম্ ॥
 শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।
 প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥৩॥
 সরসীতট-সুখদোটজ-নিকটপ্রিয়ভজনম্ ।
 ললিতামুখ-ললনাকুল-পরমাদরযজনম্ ॥
 ব্রজকানন-বহুমানন-কমলপ্রিয়নয়নম্ ।
 গুণমঞ্জরি-গরিমাগুণহরিবাসনবয়নম্ ॥
 শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।
 প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥৪॥
 বিমলোৎসবমমলোৎকল-পুরুষোত্তম-জননম্ ।
 পতিতোদ্ধৃতি-করণাস্তৃতি-কৃতনৃতন-পুলিনম্ ॥
 মথুরাপুর-পুরুষোত্তম-সমগৌরপূরটনম্ ।
 হরিকামক-হরিধামক-হরিণামক-রটনম্ ॥
 শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।
 প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥৫॥

শ্রীদয়িত-দাস-প্রণতি-পঞ্চকের অনুবাদ

যিনি স্বর্ণ কমল-উৎপাদনকারী (অপ্রাকৃত, উন্নত) উজ্জল-রসমাগর হইতে উত্থিত (মূর্তি), ষাঁহার বিশাল ও কারুণ্যপূর্ণ লোচনযুগল (আর্তগণের) ভয় নিবারণ ও (আশ্রিতগণের) বিজয় ঘোষণা করিতেছে, ষাঁহার রসনা সমগ্র পৃথিবীকে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্ত্তনে (সৰ্বদা) মুখরিত করিতেছে এবং যিনি জগৎপবিত্র-কারী ও ভবতাপবিদূরনকারী অরুণ (কাষায়) বসন পরিধান করিয়া শোভা পাইতেছেন, শ্রীচরণান্তচরণের সহিত শ্রীবৃষভানুন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তদীয় শুভ প্রকট-বাসরে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি ॥১॥

শরণাগত ভজনশীল ভক্তগণ নিত্যকাল ষাঁহার শ্রীচরণতলে প্রতিপালিত হইতেছেন, যিনি সরলহৃদয়, স্কন্ধতিসম্পন্ন সুদয় সজ্জনগণের বরণ্য, শ্রীহরিসেবায় বিশ্বকারিগণকে (ও) যিনি শোধানাদীকার করিতেছেন এবং যিনি সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের প্রতি করুণার উৎসস্বরূপে নিখিল বিশ্বের অমঙ্গলরাশি খণ্ডন করিতেছেন, শ্রীচরণান্তচরণের সহিত শ্রীবৃষভানুন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥২॥

যিনি লোকাভীত বিলাসসম্পন্ন, চিত্রকরের(ও) বাঞ্ছা এবং কৌতূহল-প্ৰতীকারী (সুন্দর) (অথবা চিত্রকর ও রতির কৌতুকপ্রদ) শ্রীমূর্তিবিশিষ্ট, দেবতা অপেক্ষা(ও) উন্নতমতি এবং বৈষ্ণব-সম্মাসীর (ত্রিদণ্ডি যতির) ঐশ্বর্য-স্বরূপ পুরুষপ্রবর, যিনি সসনাতন-রূপ-রঘুনাথের পরমাণুগত্যময় চরিত এবং শ্রীজীবপাদতুলা (সুসিদ্ধান্তসম্পন্ন) রূপে স্বেচচারক সাধুগণ কর্তৃক কথিত হইয়া থাকেন, শ্রীচরণান্তচরণের সহিত শ্রীবৃষভানুন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥৩॥

শ্রীরাধাকুণ্ডতে স্থানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে যিনি নিজ প্রিয়জনের ভজন-পরায়ণ, ললিতাদি ব্রজললনাগণের(ও) পরমাদর-ভাজন, ব্রজবনে প্রসিদ্ধ কমল-মঞ্জরীর যিনি অত্যন্ত প্রিয় এবং যিনি গুণমঞ্জরীর গরিমা-গুণ দ্বারা শ্রীহরির বাসভবন নিৰ্ম্মাণ করিতেছেন, শ্রীচরণান্তচরণের সহিত শ্রীবৃষভানুন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥৪॥

যিনি বিমলানন্দ-স্বরূপ বা বিমলাদেবীর প্রসন্নতা বা উল্লাসস্বরূপ, পবিত্র উৎকলে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জন্মলীলা প্রকাশ এবং নৃতন পুলিন বা নবদ্বীপে নিজ পতিতোদ্ধার ও (প্রেম-প্রদানরূপ) করুণা-বিস্তার-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, যিনি

ব্রজধাম ও পুরুষোত্তমধামসদৃশ গৌরধাম (শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ) পরিভ্রমণ করিয়া ব্রজকাম, বৈকুণ্ঠধাম ও কৃষ্ণনাম নিরন্তর প্রচার করিতেছেন, শ্রীচরণানুচরণের সহিত শ্রীবৃষভানুন্দিণীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥৫॥

[শ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃতম্ হইতে উদ্ধৃত]

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত

আলোচনা

আমরা বৈষ্ণব-সাহিত্যে ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবের মুখে অপ্রাকৃত শব্দ শুনিতে পাই। ভক্তিগ্রন্থাদিতে প্রাকৃত শব্দেরও অনেকস্থলে উল্লেখ দেখা যায়। এই শব্দ দুইটি ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রকার ও বক্তাগণ কি লক্ষ্য করেন, তাহাই আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয়।

অব্যক্ত-প্রকৃতির স্বরূপ

প্রকৃতি অব্যক্ত অর্থাৎ যাহা প্রকাশমান না হইয়া সর্বকারণকারণরূপে নিজাশ্মিতার অস্তিত্ব সম্পাদন করে। প্রকাশমান কোন কার্যের কারণ প্রকাশিত হইলে তাদৃশ প্রকাশিত কারণের কারণ জানিতে জ্ঞানবৃত্তির স্বাভাবিক কৌতূহল হয়। মানব-জ্ঞান যে-কালে কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া কারণকে প্রকাশমান দেখিতে না পান, তখন তাদৃশ কারণকে অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত-প্রকৃতি সংজ্ঞা দেন।

প্রকৃতিজাত প্রাকৃত-বস্তুর ভোগে সুখ ও দুঃখ

প্রকৃতি হইতে জাত প্রকাশমান দ্রব্য বা দ্রব্যসংস্কীয় ভাব সমস্তই প্রাকৃত। জীব ঐগুলি জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিয়া ভোগ করেন। তাহাতে কোন সময় তাহার নিজেন্দ্রিয়ের প্রীতি হয়, কখনও বা অপ্রীতি বা দুঃখের উদয় হয়।

প্রকৃতির গুণত্রয়, তাহাদের ধর্ম, এবং মূল পুরুষাবতার

প্রকৃতির অধীনে তিনটি গুণ প্রকাশমান আছে। তাহাদিগকে রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ আখ্যা দেওয়া হয়। রজোগুণের ধর্ম অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশ করে। সত্ত্বগুণের ধর্ম প্রকাশসত্তা রক্ষা করে। তমোগুণের ধর্ম প্রকাশিত বস্তু-সত্তার বিলোপ সাধন করে। সত্ত্বের প্রারম্ভে রজোগুণ এবং অপর প্রান্তে তমোগুণ ;

স্বতরাং ঐ অসং গুণদ্বয়ের সত্তা প্রাকৃত-সত্ত্ব আবদ্ধ। এই তিনটি গুণের গুণী তিনটিকে ভগবানের পুরুষ-অবতার বলা হয়।

বিষ্ণু—অপ্রাকৃত ও গুণাভীত, কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র— প্রাকৃত ও সগুণ

সদ্বগুণের ঈশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু। সদ্বগুণের অধীশ্বর হইয়াও তাঁহাকে প্রকৃতি বা জড়-ফলভোগ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। তবে তাঁহার আশ্রিত রজো-গুণাধীশ্বর ব্রহ্মা এবং তমোগুণাধীশ্বর রুদ্র প্রকৃতি-বাধ্য হইয়া পরমেশ্বর বিষ্ণুর সমধর্ম্মে অধিকারী হন না। বিষ্ণু প্রকৃতির অধীশ্বর। ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রাকৃত ও প্রকৃতিপতি হইয়াও প্রকৃতির অধীন। ভগবান্ বিষ্ণু প্রাকৃত বিকার স্বীকার করেন না, কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র বিকার স্বীকার করিয়া বিষ্ণুর সর্বশক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্তই ব্রহ্মা ও রুদ্রকে অঘটনঘটনপটয়সী বিষ্ণুমায়া-শক্তির পুত্র বলিয়া অভিহিত করা হয়। বিচাররহিত অবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে অপর দুইটি গুণাধীশ্বরের সহিত সমজ্ঞানে অপরাধ করিয়া বসেন। শাস্ত্র বলেন—

যন্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।

সমত্বেনৈব বীক্ষ্যত স পাষণ্ডী ভবেদ্বৈবম্॥

(পান্দোন্তর খণ্ডে—২৩।১২)

“বিষ্ণৌ সর্বৈশ্বরেশে তদিতরসমধীর্ষন্ত বা নারকী সঃ।”

(পদ্মপুরাণম)

চতুর্দশ ভুবনসহ আত্রেক্স-সুত্ব সমস্তই প্রাকৃত

প্রাকৃত রাজ্যে ফলভোক্তা বদ্ধজীব। তিনি কখনও বা ব্রহ্মার দেহ লাভ করিয়া দেবতা, কখনও বা রবি-কিরণ-তপ্ত গতেচেন স্থাপু। এই সকল অবস্থায় জীবকে আমরা অনিত্য-বদ্ধ-ভোগ-কামনায় নিযুক্ত দেখিতে পাই। দেবীধামের অন্তর্গত প্রকাশমান চতুর্দশ ভুবন সমস্তই প্রাকৃত।

অপ্রাকৃত জীবের স্বরূপ-ভ্রান্তিবশতঃ প্রাকৃত-জগতে

সুখ-দুঃখভোগ

এই চতুর্দশ ভুবনে ভ্রমণকারী পথিকরূপে অত্যাভিলাষের দাস হইয়া জীব প্রাকৃতভাভিমানে বিচরণ করেন। প্রাকৃত, অনিত্য, অস্থাপাদেয় জড়দ্রব্য-ভোগবুদ্ধি লইয়া অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃত ভোগের কঠোর নিগ্রহ ভোগ করেন। ইহাই তাঁহার স্বরূপ-বিভ্রান্তি বা মতিভ্রংশতা। আপেক্ষিক দুঃখভার লাঘব করিতে সমর্থ হইলে

অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃতাভিमानে আপনাকে স্মৃতি মনে করেন, আবার ভোগ-পিপাসার প্রাবল্যে ভোগ্যদ্রব্যের অপ্রাপ্তিতে স্মৃতিরহিত দরিদ্রতায় অবস্থিত হইয়া আপনাকে দুঃখী জ্ঞান করেন।

প্রকৃতি ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি, জীব তটস্থা-শক্তি

প্রাকৃত বস্তু-সত্তার মূলশক্তি প্রকৃতি। বদ্ধজীবের নির্মল জড়-ভোগ-রহিত নিজ স্বরূপানুভূতি তটস্থ ধর্ম্মে আবদ্ধ। গুণ-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। একটা বিষ্ণুর বহিরঙ্গা-শক্তি ও অপরটা তটস্থা-শক্তি। তটস্থা-শক্তি-পরিণত জীব, বহিরঙ্গা-শক্তির গুণসমূহকে আবাহন করিলেই জীবের বদ্ধাবস্থা বা প্রাকৃতাভিমান।

অপ্রাকৃত-জগৎ এবং তত্রস্থ জীবসমূহ

বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ

বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা-শক্তি-পরিণামই অপ্রাকৃত চিচ্ছগৎ। সেখানে জীবের প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি নাই। ভগবান্ বিষ্ণুই তথাকার একমাত্র ভোক্তা, তদ্রূপ-বৈভবের আনুগত্যে শুদ্ধজীব ভগবানের ভোগ্যরূপে সেবা বিধান করেন। জীব অপ্রাকৃত রাজ্যে নিজের স্বভোগাভিলাষে ব্যস্ত নন, পরন্তু হরিভজনই তথায় তাঁহার নিত্য-কৃত্য। প্রাকৃত জগতে মায়ায় স্মৃতি-দুঃখ ভোগের অন্তরালে জীব যেক্রপ প্রাকৃত অভিमानে বদ্ধ হন, অপ্রাকৃত রাজ্যে ভগবদাশ্রয়ে তদ্রূপ নিত্যকাল ভগবানের সেবাকার্য্যে আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন।

নির্বিশেষমতে “অপ্রাকৃত” অর্থে বিচিত্রতাহীন (?)

নির্বিশেষমতে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে তটস্থ-ভাবময় নিগুণতা অবস্থিত। তথায় অপ্রাকৃত বিচিত্রতা নাই। তাঁহাদের মতে মায়াশক্তিতে বিচিত্রতা আবদ্ধ, স্মৃতিরাং তন্মতে অপ্রাকৃত শব্দের অর্থ—নিত্য বিচিত্রতাহীন অধ্যাত্ম শব্দবাচ্য। কিন্তু অধ্যাত্ম শব্দে নির্বিশেষবাদী শক্তি-রহিত ব্রহ্মকেই বুঝিয়া থাকেন। প্রাকৃত ভোগময় রাজ্যে ত্রিবিধ তাপে প্রতপ্ত হইয়া প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অপ্রাকৃত শক্তি নানা বিচিত্রতা প্রকাশ করিতে পারেন, এক্রপ তথ্যের কোন সংবাদই রাখেন না।

বৈকুণ্ঠ-রাজ্য অপ্রাকৃত বিবিধ বৈচিত্র্যযুক্ত

বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রাকৃত গুণসমূহ নিষ্ক্রিয় হইলে অপ্রাকৃত পৰম চমৎকার চিহ্নৈচিত্র্য-প্রকাশনসমর্থ। অন্তরঙ্গা-শক্তি, জড়ের হেয়তা, সসীমতা, কালনাশিতা প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ রহিত করিতে পারেন। বিশুদ্ধ ভগবৎ-সেবা-

পরতাই অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব। সেখানে ব্রহ্মাণ্ডের মত জীবের প্রাকৃত ভোগ নাই। ভগবৎ-সেবাজনিত আনন্দও জীবকে ভোগে নিমগ্ন করাইতে পারে না। জীব বন্ধরাজ্যে অল্পভববিশিষ্ট হইয়াও তাহা পরিহারপূর্বক অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব বুঝিতে পারেন।

নির্বিশেষ তর্কজ্ঞানাদির উদ্দিষ্ট-বস্তু অপ্রাকৃত নহে

কেবল জড়নিষ্ক্রিয়তায় ও নিজের বন্ধ ভোগাভিমান পোষণ করিয়া হরিসেবা-বিমুখ তর্কজ্ঞানাদির বাধ্য হইলে, জীবকে কখনই প্রাকৃত অভিমান ছাড়িয়া দিবে না। বৈকুণ্ঠ-বস্তুর অল্পলীলনে জীবের ভোগ-বাসনা বিদূরিত হয়। পাণ্ডিবা মাটীয়া-অল্পভূতি বন্ধজীবের ভোগপর কর্মফল। অপ্রাকৃত শরীরদ্বারা অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবাপর হইলে প্রাকৃত জড়বলের ফল্যতা উপলব্ধি হয় এবং নির্বিশেষ জ্ঞানের ফল্য গরিমার লঘুত্ব দৃষ্ট হয়। জ্ঞানীর অধ্যাত্ম শব্দে অপ্রাকৃতত্বের খণ্ডচিত্র থাকিলেও উহা কখনই অপ্রাকৃত-শব্দোদ্দিষ্ট নির্মল রাজ্য নহে।

অপ্রাকৃত বৃন্দাবন—ভোগী, কল্মী, মুমুক্শু জ্ঞানিগণের বিচারবহিষ্ঠ

অপ্রাকৃত বৃন্দাবন বলিলে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ভোগপর নরগণ নিজ বন্ধ ভোগপর প্রদেশবিশেষ বুঝেন। আবার নির্বিশেষ মতাবলম্বী মুমুক্শুগণ মায়াশক্তি-রহিত চিহ্নচিত্রতাহীন আধারকে বুঝিয়া থাকেন। তাহা তাঁহাদের উভয়ের মাটীয়া-জ্ঞানের পরিচয় মাত্র। তাদৃশ জ্ঞানগম্য প্রদেশ অপ্রাকৃত নহে।

অপ্রাকৃত-ভূমির পরিচয়

মায়াশক্তির ক্রিয়ারহিত চিহ্নচিত্রা কৃষ্ণসেবাময় ত্রিপাদ-বিভূতিবিশিষ্ট ভূমি 'অপ্রাকৃত'। অপ্রাকৃত বিচিত্রতার সহিত প্রাকৃত বিশেষের কোন কোন বিষয়ের অম্বয়তা আছে, আবার কোন কোন বিষয়ের ব্যতিরেকত্বও দৃষ্ট হয়। জ্ঞানী-সম্প্রদায় মনে করেন যে, অপ্রাকৃত-লীলা ও তদ্রূপ-বৈভব তাঁহাদের জড়ভোগ-চিন্তার অন্ততম, অথবা মনোময় ক্ষণভঙ্গুর রাজ্যের আখ্যায়িকাবিশেষ। কিন্তু তাঁহাদের তাদৃশ ভাব প্রাকৃত; অপ্রাকৃতের সহিত বিরুদ্ধ ভাব-বিশিষ্ট। ভগবত্তাকে মায়াশক্তির অন্তর্গত মনে করায় তাঁহাদের অপরাধফলে একরূপ ধারণা। ভোগময় ব্যাধি বা ত্যাগময় শান্তি উভয়ই প্রাকৃত ভোগের প্রকার-ভেদ, অপ্রাকৃত তাহা হইতে স্বতন্ত্র। উহা নিত্য হরিসেবাপর, অবিনাশী, সম্বন্ধবিশিষ্ট ও নিত্য অধিষ্ঠিত।

প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জন

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি যাবতীয় ধর্মের অন্তরালে প্রতিষ্ঠাশা

আমরা যতই আত্মোন্নতির চেষ্টা করি, যতই ধার্মিক হইতে যত্ন করি, যতই বৈরাগ্য-ধর্ম পালন করি, বা যতই জ্ঞান চর্চা করি, ততই স্বীয় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদের চিত্তকে মলিন করে এবং চরিত্রকে দূষিত করে। অনেক যত্ন করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদকে খর্ব করি। কঠোর তপস্যা করিয়া ইন্দ্রিয় দমন করি, তথাপি হৃদয়ে অতি গুপ্তরূপে প্রতিষ্ঠাশারূপ ব্যালশাবক সম্বদ্ধিত হইতে থাকে। অষ্টাঙ্গযোগ শিক্ষা করিয়া যোগিরূপে খ্যাত হইতে বাসনা করি। যদি কেহ বলে যে, আমার যোগশিক্ষা কেবল ধূর্ততামাত্র, তখনই আমি ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হই। আমি অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আপনাকে ব্রহ্ম-তত্ত্বে লীন করিবার চেষ্টা করি। যদি কেহ বলে, ঐ প্রক্রিয়াটি নিষ্ফল, তখনই আমার মনে উদ্বেগ হয়। আমার নিন্দুককে নিন্দা করিতে থাকি। শম, দম, তপ, অস্তেয় প্রভৃতি দশবিধ ধর্ম শিক্ষা করি এবং নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম করিতে করিতে সংসার নির্বাহ করি। যদি কেহ বলে যে, কর্ম-কাণ্ড কেবল নিরর্থক শ্রমমাত্র, তখনই আমার মনে দুঃখ হইয়া থাকে; কেননা আমার প্রতিষ্ঠার খর্ব হইলে আমার কিছুই ভাল লাগে না।

ভুক্তি ও মুক্তিকামী—অশান্ত ও প্রতিষ্ঠার দাস

কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি যখন ভুক্তি ও মুক্তিফল আশায় ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের শান্তি কোথায়? সুতরাং তাঁহারা প্রতিষ্ঠার আশাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসাশূন্য বৈষ্ণবগণের পক্ষে প্রতিষ্ঠার আশা নিতান্ত হয়।

বর্তমান বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ প্রতিষ্ঠাকামী ও অসহিষ্ণু

আজকাল যাহারা বৈষ্ণবধর্মের আচার্য্য, তাহারা কোন প্রকার অসম্মান সহিতে পারেন না। প্রথমেই সকলের মস্তকে পদ উত্তোলন করিয়া স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। আচার্য্য বলিয়া অপরে সম্মান করে, তাহা অন্ময় নয়; কিন্তু নিজে সেই সম্মান হস্তগত করিবার যিনি যত্ন করেন, তাহার শ্রেয় কোথায়? আবার কোন ব্যক্তি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করে নাই, তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ করা নিতান্ত গর্হিত ব্যাপার। আচার্য্যদিগকে সম্মান করিবার

জন্ম শিষ্ট লোক তাঁহাদের জন্ম পৃথক্ আসন দিয়া থাকেন। ষাঁহারা আসন দেন, তাঁহারা যথাশাস্ত্র আচার্য্য-সম্মান করেন। কিন্তু ঐ আচার্য্যদিগের আসনে অস্ত্র কেহ বসিলে তাঁহাদের যে ক্রোধোৎপত্তি হয়, তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এই সকল কার্য্য কেবল প্রতিষ্ঠা-আশা হইতে উদ্ভূত হয়।

প্রতিষ্ঠা-ত্যাগ স্তুত্বকর

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক গৃহত্যাগ করিয়া ভেক গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠার আশা গৃহস্থ লোকের অধিক হইবে বলিয়া শাস্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সংসার ছাড়িয়া ভেক গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠা আশা অধিক বলবতী হইয়া উঠে! কোন ভেকধারীকে যদি সম্মান না করা যায়, তাহা হইলে তিনি বিশেষ রাগান্বিত হন। গৃহস্থ বৈষ্ণবাচার্য্য এবং ভেকধারী বৈষ্ণবের মধ্যে যদি প্রতিষ্ঠা-আশা রহিল, তবে আর কাহার চিত্ত সেই আশা-শূন্য হইতে পারিবে?

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ হয় না

আমরা অনেক সময় চিন্তা করিয়া এবং মহৎ লোকের উপদেশ সংগ্রহ করিয়া জানিয়াছি যে, যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, ততদিন বৈষ্ণব হইয়াছি একরূপ মনে করিতে পারি না। কেবল কথায় দৈন্ত্য করিলে হয় না। আমি বলিয়া থাকি, আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই, কিন্তু মনে মনে করি যে, শ্রোতাগণ এই কথা শুনিয়া আমাকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবেন! হায়, প্রতিষ্ঠার আশা আমাদের দিকে ছাড়িতে চাহে না। অতএব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলিয়াছেন—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা স্বপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ

কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নহু মনঃ।

সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু-দয়িতসামন্তমতুলং

যথা তাং নিকাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥ (মনঃশিক্ষা-৭)

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যতদিন আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশারূপ নিলজ্জ-চণ্ডালিনী নৃত্য করিতেছে, ততদিন নির্মল-সাধু-প্রেম এই মনকে কিরূপে স্পর্শ করিবে? অতএব, হে মন! তুমি তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অতুল সামন্তরূপ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবা কর। তাহা হইলে তিনি সেই চণ্ডালিনীকে তোমার হৃদয়-মন্দির হইতে শীঘ্র দূর করিয়া প্রেম বস্তুকে প্রবেশ করাইবেন।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গে প্ৰতিষ্ঠাশাৰ বিলোপ

এই মহাজন-বাক্য হইতে আমরা কি সংগ্ৰহ কৰি? আমরা জানিতে পাবিহঁতেছি যে কেবল গ্ৰন্থচৰ্চা, অপ্ৰাপ্ত-প্ৰেম-ব্যক্তিৰ উপদেশ এবং শাৰীৰ-যোগাদিদ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাশা কখনই দূৰ হইতে পাৰে না। কেবল বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেৱাৰ দ্বাৰাই তাহা নিশ্চিতৰূপে দূৰ হয়। আমরা বিশেষ যত্ন সহকাৰে বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব অন্বেষণ কৰিয়া তাঁহাৰ সঙ্গ ও সেৱা কৰিব—ইহাই আমাদেৱ চৰম কৰ্ত্তব্য।

সংসঙ্গ-গ্ৰহণ ও অসংসঙ্গ-ত্যাগ একই কথা

বৈষ্ণবসঙ্গে আমাদেৱ হৃদয়ে সাধুতাৰ উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূৰ্ণৰূপে দূৰ হইবে। হৃদয় পৱিত্ৰ হইলে সেই সাধু-বৈষ্ণৱৰ হৃদয়স্থ প্ৰেম-সূৰ্য্যোৰ কিৰণ আমাদেৱ হৃদয়ে প্ৰবেশ কৰতপ্ৰেমৰূপে সমৃদ্ধ হইবে। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ইহাই সাধু হইবাৰ স্বাভাৱিক উপায়। অন্য প্ৰকাৰ সকল যত্নই বিফল হয়। তাৎপৰ্য্য এই যে, সংস্ৰভাব গ্ৰহণ ও অসংস্ৰভাব দূৰীকৰণ একই কথা।

সাধুসঙ্গ প্ৰভাবে প্ৰতিষ্ঠাশা দূৰীভূত ও কৃষ্ণপ্ৰেম লাভ

প্ৰেম যে ধৰ্ম্ম তাহা কেবল বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-পৰায়ণ আত্মায় নিহিত থাকে। প্ৰেমৰ অন্য আবাস নাই। এক আত্মা হইতে প্ৰেম অন্য আত্মায় সঞ্চারিত হয়। এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে যেনেৰূপ বিদ্যাক্ষৰ্ম সঞ্চারিত হয়, তদ্বৎ। সঙ্ক্ৰমে যখন প্ৰেম-ফলক বৈষ্ণব আত্মা হইতে অন্য জীৱৰ আত্মায় স্বভাবক্ৰমে চালিত হয়, তখনই অন্য জীৱৰ হৃদয়ৰ মন্দস্বভাব দূৰীভূত হইয়া সাধু-স্বভাব অগ্ৰে সঞ্চারিত হয়। সকল মহদগুণই প্ৰেমৰ সঙ্গী। সুতৰাং প্ৰেমৰ প্ৰবেশকালে মহদগুণ-গুলি অগ্ৰসৰ হইয়া হৃদয় শোধন কৰে। অতএব সাধুসঙ্গ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাশা দূৰ কৰা কৰ্ত্তব্য।

—শ্ৰীল ঠাকুৰ ভক্তিৱিনোদ

(সঙ্জনতোষণী—৮ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

সাধু ও অসাধু

আধুনিক জড়শিক্ষায় শিক্ষিত ত্রিতাপগ্রস্ত মানবগণ অপটু ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া এই জড়-জগতে বিচরণকালে নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করিয়া প্রত্যেক বস্তুই বুঝিয়া লইবার জ্ঞান সচেষ্টি। এই প্রাকৃত রাজ্যে প্রাকৃতেন্দ্রিয় দ্বারা যে সমস্ত বস্তু গ্রাহ্য হইয়া থাকে তাহা হইতে অপ্রাকৃত রাজ্যের বিষয় অতি বিলক্ষণ। জাগতিক চিন্তাস্রোতের মধ্যে সর্বক্ষণ নিমজ্জমান থাকায় পারলৌকিক ধারণা তাহারা করিয়া উঠিতে পারেন না, বা তাহা করিতে যাওয়াও তাহাদের পক্ষে ধুষ্টতা। যেহেতু অধোক্ষজ বস্তু ইন্দ্রিয়াতীত। আরোহপন্থায় সেই অতীন্দ্রিয় বস্তু গ্রাহ্য নহেন, অবরোহ পন্থাই একমাত্র কার্যকরী। অবরোহ পন্থায় অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমেই শরণাগতির আবশ্যক। শরণাগতির লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যথা—

আনুকূল্যশ্চ সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জনম্।

রক্ষিস্ততীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।

আত্মনিঃক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥ (বৈষ্ণবতন্ত্রে)

অর্থাৎ সেই অধোক্ষজ বস্তুর অবগতির জ্ঞান অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ, প্রতি-কূলের বর্জন, তিনি আমার একমাত্র রক্ষক এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহাকে রক্ষকপদে বরণ, দৈন্ত্য এবং আত্মনিবেদন—এই ষড়্‌বিধা শরণাগতির দ্বারা আন্তরিক চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত ধারণায় আবদ্ধ থাকা কালে অধোক্ষজের সেবকস্বরূপ সাধুগণের সম্বন্ধেও তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল থাকে। সাধুগণ অধোক্ষজের সেবক হিসাবে অধোক্ষজ ভূমিকায় অবস্থিত। সুতরাং সাধুকে প্রাকৃত ধারণায় বুঝা সূকঠিন। এই জগতেই দেখা যায়, একজন যাদুকর চক্ষুর সামনে যে বস্তু যাহা নয় সেই বস্তুকে তদ্বস্তুরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকে। দর্শকগণ কিছুতেই সেই বিষয়ের ভ্রম ধরিতে পারেন না। এই জগতেরই বস্তুগুলি সব সময় যখন বোধগম্য হয় না, তখন অপ্রাকৃত জগতের কথা কি প্রকারে এই সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যাইবে? এইরূপ ঐন্দ্রজালিকের প্রদর্শিত বস্তুর ছায় সাধু এবং অসাধুকে বাহ্যতঃ একই প্রকার মনে হয়। উভয়কেই একই প্রকারে আহার-নিদ্রাদি বিবিধ কার্যে লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়। চূর্ণগোলা ও হৃদয় বাহ্যতঃ দেখিতে একই প্রকার কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পূর্ণ পৃথক্। একটীতে শরীর পুষ্ট হয় ও অপরটী অনিষ্টকারক। সুতরাং বাহ্য ধারণায় সাধু নির্দ্ধারণ করিতে গেলে

বঞ্চিত হইতে হইবে। গৈরিক বসন ও তিলক ইত্যাদি ধারণ করিলেই যে সাধু হইবে, তাহা নহে। অবশ্য যদিও ইহা সাধুর বাহ্যিক পরিচয়, তথাপি এই জিনিষকেই সাধু বলা যাইবে না। তবে কি এই শরীরটা সাধু? না, তাহাও নহে। এই নম্বর স্ব-শৃগালভক্ষ্য শরীর কখনও সাধু হইতে পারে না। আধ্যাত্মিকগণ নিজ নিজ অসম্পূর্ণ বিজ্ঞাবুদ্ধির পুঞ্জীপাটা লইয়া যখন সাধু নির্ধারণ করিতে অগ্রসর হয়েন, তখন তাহারা সাধুর বাহ্যিক চিহ্ন দেখিয়াই অযথা মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন—সাধুগণ ভাল খাইবেন কেন, ভাল পরিবেন কেন, তাহাদের নামের আগে ১০৮শ্রী থাকিবে কেন, তাহারা গৃহে বাস করিবেন কেন, তাহারা যখন ত্যাগ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন তখন বনে গিয়া অবস্থান করাই তাহাদের উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি নানাপ্রকার কটাক্ষপাত করিতে থাকেন।

ভোগী সম্প্রদায়ের চিন্তাস্রোত উহার অতিরিক্ত অগ্রসর হইতে পারে না। তাহাদের ঐরূপ চিন্তা করিবারও বিশেষ কারণ আছে। বর্তমান অবস্থায় তাহারা যে পরিমাণ ভোগে নিমগ্ন, তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া আরও অধিক ভোগাশায় সাধুগণের প্রতিও কটাক্ষপাত আরম্ভ করেন। তাহাদের ধারণা, সাধুগণ যদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাদের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি তাহারা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে পারিবেন। ভোগাঙ্ক জীব নিলজ্জভাবে “বামনের চাঁদ ধরার ছায়” সাধুগণকেও নিজ নিজ আয়ত্নে রাখিয়া তাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহে। এইরূপ চিন্তাধারা তাহাদেরই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক ছাড়া আর কি?

যঐশ্বর্য্যপূর্ণ সর্বশক্তিমান ভগবানের সেবায় যে সমস্ত সাধুগণ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে এই জগতের যাহা কিছু সমস্তই ভগবানের সেবার উপকরণ এবং প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে ভগবানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্তমান। স্তবরাং ইহা জীবভোগ্য হইতে পারে না। গঙ্গাজলে যেরূপ গঙ্গাপূজার বিধান আছে, তদ্রূপ ভগবৎসৃষ্ট সমস্ত দ্রব্যাদির দ্বারা তাঁহারই সেবা করিয়া থাকেন। ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের আগ্রাণ সর্বতোমুখী চেষ্টা। জড়বদ্ধ জীবগণ যেরূপ কামনামূলে ভগবানের পূজার ভাণ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদের ভগবানের নিকট কেবল ‘দেহি’ ‘দেহি’ ছাড়া অল্প কোন ভাব থাকে না, কিন্তু প্রকৃত শুদ্ধ-ভক্তগণ বদ্ধজীবের ছায় ভগবানের সহিত বণিগবৃত্তির সম্বন্ধ রাখেন না। তাঁহাদের কায়, মন ও বাক্য সমস্তই ভগবানের স্থখ বিধানের জন্ত। তাঁহারা

জানেন—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম ।

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ (চৈঃ, চঃ আদি-৪।১৬৫)

সুতরাং আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া সর্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা-মূলে সাধুগণের যাবতীয় চেষ্টা । ভগবানের সেবার জন্তই তাঁহাদের শরীর ধারণ । সুতরাং এই শরীর রক্ষা করিতে যেটুকু প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিতে হইবে । তাঁহারাই ভগবদ্-প্রদত্ত সমস্ত বস্তুর প্রকৃত সদ্যবহার করিয়া থাকেন । তাঁহারা—

“কাম কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্ত-দেবী জনে,

লোভ সাধুসঙ্গে হরি-কথা ।

মোহ ইষ্ট-লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ-গুণ গানে,

নিযুক্ত করেন যথা তথা ॥”

পরম কারুণিক ভগবান ত্রিতাপ জালায় দক্ষিভূত জীবগণের মঙ্গলবিধানের জন্ত গুরু, ভক্ত, ঈশ্বর, ঈশাবতার, প্রকাশ ও শক্তি—এই ছয় প্রকারে বিলাস করিয়া থাকেন । যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—

বনে গুরুনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।

তৎপ্রকাশাংশ তচ্ছক্তিঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকান্ ॥

ভগবানের এইরূপ বিলাসের দ্বারা ভোগিগণের ভোগে বিঘ্ন হওয়ায় ভগবান ও ভক্তকে বনে নির্বাসিত করিতে পারিলে নিষ্কণ্টক ভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ করা যাইবে—এইরূপ চিন্তা দ্বারা চালিত হইয়া তাহারা উন্নতের ন্যায় সাধুগণের প্রতি নানাপ্রকার প্রলাপোক্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবান ও ভক্ত উভয়েই অত্যন্ত ক্রপাময় । তাঁহারা ঐ সমস্ত জীবের ভাবী অমঙ্গল লক্ষ্য করিয়া সর্বক্ষণই তাহাদের মঙ্গলের জন্ত নিকটে নিকটে অবস্থান করেন এবং তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া নানাপ্রকার কৌশল বিস্তার দ্বারা তাহাদিগকে নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ করিবার জন্ত চেষ্টা করেন । পিতামাতা যে প্রকার তাড়ন-ভংসন-দ্বারা পুত্রের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভগবানও মায়া কর্তৃক ক্রেশ প্রদানাদির ব্যবস্থা রাখিয়াছেন । ভোগোন্মত্ত জীব সে সমস্ত বুঝিতে না পারিয়া ভগবানকে নিদ্দয়, নিষ্ঠুর প্রভৃতি বলিয়া থাকেন এবং সাধুগণের ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া থাকেন । তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাদির প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না । সমস্ত ঈশ্বর্যের মালিক যে ভগবান তাঁহার সেবকের

কখনও কি অভাব থাকিতে পারে, না, প্রতিষ্ঠার অভাব হয়? কুপুত্রকে ত্যাগ্য করিয়া পিতা যেমন সুপুত্রকে সমস্ত ঐশ্বর্যের মালিক করিয়া দেন, তদ্রূপ ভগবানও অভক্তকে শাসন করিয়া একান্ত ভক্তকে সমস্ত ঐশ্বর্য ইত্যাদি দিয়া থাকেন। মৎসর জীব এই সমস্ত বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, সেই জন্ত অযথা মঙ্গলময় সাধুগণের প্রতি নানাপ্রকার কটাক্ষ করিয়া থাকেন। সাধুগণ যদি সকলেই বনে গিয়া অবস্থান করেন, তাহা হইলে সাধারণ জীবের মঙ্গলের সম্বন্ধ কে দিবে? শাস্ত্র বলেন—

মহদ্বিচলনঃ নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্ ।

নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নাস্তথা কল্পতে কচিৎ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত—১০।৮।২)

সাধুগণের নিজের কোন আবশ্যক না থাকিলেও গৃহস্থের মঙ্গলের জন্ত তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হন, নিজ উদর ভরণের জন্ত যান না। তাঁহারা যে সমস্ত বিরাট বিরাট উৎসবাদি দ্বারা ভগবদ্-প্রসাদাদি দানে জীবের সুকৃতি অর্জনের সহায়তা করিয়া পরম মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন, তাহা ভোগিগণের বিচারে অযথা ব্যয় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ভোগোন্মত্ত থাকাকাল পর্য্যন্ত এ সমস্ত কথা তাহারা কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না। মৃত্যু সময়ে যমদূতগণ কর্তৃক যখন বিবিধ দুঃখময় নরকে শাস্তি ভোগের নিমিত্ত নীত হইবেন, সেই সময় তাহাদের স্বীয় নির্কুণ্ঠিতার কথা কিছু মনে হইতে পারে, তৎপূর্বে নহে।

ভোগিগণের চিন্তায় যে সমস্ত দ্রব্য সাধুর ত্যাগ করা উচিত, তাহা তাঁহারা ত্যাগ না করিলেও যে সমস্ত বস্তু তাঁহারা মলমূত্রবৎ ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা ভোগিগণ কর্তৃক পরম আদরের বস্তু স্বরূপ গৃহীত হয়। যথা—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার ।

স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণভক্ত আর ॥

(চৈঃ, চঃ, মধ্য ২২।৮৪)

সাধুগণের ত্যাগের একমাত্র বস্তু অসৎসঙ্গ। অসৎসঙ্গ বলিতে অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ, বা তৎসঙ্গী-সঙ্গ এবং কৃষ্ণের অভক্ত—এই দুই প্রকার। স্ত্রী-সঙ্গ বলিতে কেবল মাত্র স্ত্রীতে আসক্তি নির্দেশ করেন নাই, অপিচ ভোগমূলে যে কোন বস্তু গ্রহণ করিবার নামই স্ত্রীসঙ্গ। এই দুই বস্তুতেই ভোগাসক্ত জীব মাত্রই অত্যন্ত আসক্তি করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রে নির্বিশেষবাদী মুমুক্শুগণের ফল বৈরাগ্যের কথা দেখা যায়। তাহারা 'নেতি' 'নেতি' বিচারে ভগবানের সম্বন্ধে সম্বন্ধিত বস্তুকেও প্রাপঞ্চিক জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, যথা—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তনঃ ।

মুমুক্শুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফলম্ কথ্যতে ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

এই ব্যাপারে তাহারা বাহ্যতঃ অনেক ক্রেশ স্বীকার করেন বটে, কিন্তু অন্তরে সুস্থান্নরূপে ভোগের বাসনা প্রবলভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তগণ মুমুক্শুগণের বিচারে প্রতিষ্ঠিত নহেন। তাহারা লীলাময় পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ দর্শন করেন এবং সমস্ত বস্তু দ্বারা সর্বক্ষণই তাঁহার সেবাস্থখে নিমগ্ন থাকেন। যথা—

অনাসক্তশ্চ বিষয়ান্ যথার্থমুপযুক্ততঃ ।

নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

ভগবানের যাবতীয় বস্তুর প্রতি ভোগাসক্তি রহিত হইয়া ঐ সমস্ত বস্তু দ্বারা তাঁহার প্রীতি বিধান করিয়া তাঁহারা প্রীত হইয়া থাকেন। ইহাদের বৈরাগ্য যুক্তবৈরাগ্য নামে অভিহিত। ভগবানে বিমলপ্রেম থাকায় তাঁহাদের অন্তরে ভোগবাসনা তিলমাত্রও স্থান পায় না। সুতরাং ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল বিষয়গুলি গ্রহণ এবং প্রতিকূল ত্যাগই—সাধুর সাধুত্ব।

—শ্রীকৃষ্ণকারণ্য ব্রহ্মচারী

কার্য্যাধ্যক্ষ ও সহঃ সম্পাদক

প্রকৃত স্বজন

গুরুন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ

পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ ।

দৈবং ন তৎ স্যাদ্ পতিশ্চ স স্যাৎ

ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥

গুরু, পিতা, মাতা, পতি, দেবতা, বান্ধব ।
 নহেক—আপন কেহ—জান এই সব ॥
 ভক্তি পদে উপদেশি' মৃত্যু হ'তে মোরে ।
 উদ্ধারিতে—যেই জন শক্তি নাহি ধরে ॥
 তাঁ'দের এসব আখ্যা না জেনে! কখন ।

সঙ্গ ফলে লভে জীব গমনাগমন ॥
 ভক্তি পথে যেই জন করয়ে সহায় ।
 আপন বলিয়া তারে জান সর্ব্বথায় ॥
 কৃষ্ণ বিমুখের সঙ্গ, কৃষ্ণ সেবা তরে ।
 পরিত্যাগ কর মন তুমি চিরতরে ॥
 যদি বল পিতা মাতা ত্যাগ কেবা করে ।
 শাস্ত্রের বচন শুন বলি যে তোমাতে ॥

হিরণ্যকশিপু ছিল প্রহ্লাদের পিতা ।
 বিষ্ণুর বিরোধী বলি' তাহারে সর্ব্বথা ॥
 করেছিলেন ত্যাগ প্রহ্লাদ মহাজন ।
 রাখিয়া সতত হরি-পাদ-পদ্মে মন ॥

তেয়াগি' ভ্রাতার সঙ্গ রাজা বিভীষণ ।
 সীতাপতি রাম পদে লইল শরণ ॥

কৈকেয়ী মাতারে ছাড়ি' শ্রীরামচরণ ।
 সেবেন ভারত সদা হইয়া মগন ॥

বলিরাজে কৃপা করি' বামন শ্রীহরি ।
 তিন পাদ ভূমি মাগে নানা ছল করি' ॥
 গুক্রাচার্য্য বাধা দিল বামন সেবায় ।
 গুরু-ক্রবে ত্যাগ করে বলি মহাশয় ॥

ছাড়িয়া বান্ধব-সঙ্গ বিদুর সজ্জন ।
 কৃষ্ণগুণ গাহি' করে তীর্থ পর্য্যটন ॥

দেবতার সঙ্গ ছাড়ি' খট্টাঙ্গ নৃপতি ।
 কৃষ্ণ-চরণ সেবেন হ'য়ে দৃঢ়মতি ॥
 করি' পরিত্যাগ পতি যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণী ।
 কৃষ্ণসেবা তরে ছুটে বাধা নাহি মানি ॥
 “সকল জন্মেতে পিতা-মাতা সবে পায় ।
 গুরু, কৃষ্ণ, নাহি মিলে, ভজহ হিয়ায়” ॥
 ছাড়িয়া অসং সঙ্গ, ওরে ছুষ্ঠ মন ।
 শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গদ করহ ভজন ॥

—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীভক্তিকুমুদ মহারাজ

আচার্য্যদেব ও কৃষ্ণদাস

একদিন আচার্য্যদেব প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া শ্রীমন্দির প্রাঙ্গনে শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন জীউর সম্মুখে আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীনাম-ভজনে আছেন, এমতাবস্থায় নিকপট ভজনপিপাসু কৃষ্ণদাস নামক এক ব্যক্তি বিনয়ান্বিতশিরে আচার্য্যদেবের পাদপদ্মে প্রণামপূর্ব্বক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া কিছু প্রশ্ন করিবার জন্ত উৎসুক হইল। তদর্শনে আচার্য্যদেব তৎপ্রতি কৃপাপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? তুমি কি চাও?

কৃষ্ণদাস—আমার নাম কৃষ্ণদাস, আমি সংসার-দুঃখ জলধিমধ্যে কাম-ক্রোধাদি নক্র-মকরের কবলে পতিত হইয়া দুর্কাসনারূপ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত রহিয়াছি। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী যেরূপ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে, তদ্রূপ জাগতিক মোহের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও সন্তরণে অপটু আমিও সংসার-জলধিমধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি এবং সংসারের যাবতীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী সহস্রচেষ্টা করিলেও সে যেমন ঐ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না, অথবা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করাইতে পারেন এতাদৃশ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত দয়া ছাড়া সে যেমন বন্ধনদশা হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ আমিও সংসার জালায় জর্জরিত হইয়া মায়াদাস্ত

হইতে ছুটিলাভ করিতে অসমর্থ। এমতাবস্থায় এই সংসার যন্ত্রণার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে, এই সংসার কি বস্তু, ইহাতে কি সার বা অসার আছে, কেনই বা এখানে আসিতে হয়, আমি কে, আমার কর্তব্য কি এবং কি করিয়া এই যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন অর্থাৎ বন্ধমোক্ষবিৎ ব্যক্তির চরণাশ্রয় ব্যতীত এই সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় না—ইহা স্থির করিয়া “শিষ্টশ্রেষ্ঠং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্”। আমি মূঢ়, আপনার শরণ লইলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমার সংশয় দূর করত আমাকে আত্মসাৎ করুন। প্রথমতঃ আমার জ্ঞাতব্য বিষয়—সংসার কি ?

আচার্য্যদেব—সংসার শব্দে সাধারণতঃ জগৎ, দেহ, মায়াবন্ধন বা মায়া-জ্ঞ জীবন প্রভৃতিকে বুঝাইয়া থাকে। আরও গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অনন্ত কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র কর্তা, ভোক্তা, পাতা এবং নিয়ন্তা পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণই জীবের অবলম্বনীয়। এই কথা যখন ভুলিয়া গিয়া স্বতন্ত্রতাবশে জীব নিজেকেই ভোক্তা, কর্তা, পালয়িতা এবং রক্ষাকর্তা জ্ঞান করে অর্থাৎ ‘অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্বতে’ বিচার অবলম্বন করে, তখন তাহাদিগকে কৃষ্ণোন্মূখী করিবার জন্ত অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া সংসার-মাগরে নিষ্ক্ষেপ করিয়া সংসারের নানারূপ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করায়।

“কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ” ॥ (টীঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)

সংসারের সাময়িক সুখ যে কেবল দুঃখদায়ক, অসার ও অনিত্য, জীবন বিগত হইলে ধন-স্বজনাদি সঙ্গে যাইবে না, তাহা উপলব্ধি করিয়া পরা শাস্তি-রূপ কৃষ্ণসেবা-সুখ লাভ করিবার অনুকূল স্থান এই সংসার।

মনুষ্য দেহই ভগবদ্ভজনের আদি তরণীস্বরূপ। দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি জন্মে ভোগময় দেহ প্রাপ্ত হইয়া ভোগোন্মত্ত অবস্থায় ভগবান্কে ভুলিয়া থাকা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু ইহলোকে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া জীবগণ নানা দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের মধ্য দিয়া শ্রীভগবানের সেবাসুখ প্রাপ্ত হইবার সুযোগ সহসা লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই জন্ত মনুষ্য জন্ম হরি-ভজনের মূল বলিয়া শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে—

নৃদেহমাণ্ডং স্থলভং স্থূলভং

প্লবং স্ককল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।

ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং

পুমান্ ভবাক্টিং ন তরেং স আত্মহা ॥ (ভাঃ ১১।২০।১৭)

এই নৃদেহটী সকল দেহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেহ, অতএব আত্ম, স্থলভ ও স্থূলভ । ইহাই সংসার-সমুদ্র-তরণে পটুতর নৌকা । গুরুই ইহার কর্ণধার । কৃষ্ণ-কৃপারূপ অহুকূল বায়ুদ্বারা প্রচালিত হইয়া এই সংসার সমুদ্র পার হওয়া যায়, যিনি তাহা না করেন, তিনি আত্মঘাতী ।

অতএব কৃষ্ণ-বিশ্বত জীবের ভগবৎ-সেবা প্রাপ্তির প্রধান উপায়স্বরূপ এই মনুষ্য জন্মেই ভগবান্ সৃষ্টরূপে লভ্য । মর্ত্যলোক বা ভুলোক ছাড়া দেব-লোক, গন্ধর্ব্ব-লোক প্রভৃতি উর্দ্ধতন সপ্তলোকে মনুষ্য দেহ লাভ করা যায় না । এই ভুলোকের অপর নাম নরলোক ।

লব্ধ্বা স্থূলভমিদং বহুসম্ভবাস্তে

মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ।

তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ

নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সৰ্ব্বতঃ স্তাৎ ॥ (ভাঃ ১১।২১।২২)

অনেক জন্মের পর এই মনুষ্য জন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ । এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ । যে অর্থ লাভ করিলে জগতের কোনও অর্থের প্রতি মানুষের স্পৃহা হৃদয়ে জাগরিত হয় না, সেই অর্থ পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই অর্থের প্রাপ্তিতে তিনি স্পর্শ-মণিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অনাদৃতভাবে রাখিয়া দিয়াছিলেন । এমন কি, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণও যে স্পর্শ-মণির তুচ্ছত্ব উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণপ্রেমরূপ অফুরন্ত ভাণ্ডারের পরমার্থ বস্তু পূজ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন এবং স্পর্শ-মণিকে নদী-গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া সংসারের সমস্ত আশার মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন । সেই পরমার্থ বস্তু ইহ জগতে দুর্লভ ।

অতএব, এই সংসার ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডারদ্বারা জগন্মোহিনী মায়ায় তাণ্ডবলীলাস্থলী হইলেও মনুষ্যগণের পক্ষে নিত্য গোলোক-বৃন্দাবন-বিহারী দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীমন্মন্দর মদনমোহন জীউর নিত্য সেবা লাভের অহুকূল স্থান ।

কৃষ্ণদাস—ইহাতে কি সার বা অসার আছে ?

আচার্য্যদেব—উপরি লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ দ্বারা আমরা জানিতে পারিতেছি যে এ সংসার অসার। কারণ, পরিদৃশ্যমান জগতের বাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি, সেই সকলেই উৎপত্তি ও লয় বিद्यমান। কাজেই বাহা হইতে অনিত্য বিনশ্বর বস্তুর উৎপত্তি হয়, তাহাতে কখনও নিত্যত্ব বা সারত্ব বিद्यমান থাকিতে পারে না। কিন্তু সংসারটী অসার বা অনিত্য হইলেও ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, বুদ্ধিমান জনগণ এখানে থাকিয়া সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করত সার বস্তুর অহুসন্ধানে তৎপর হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন।

কৃষ্ণদাস—কেনই বা এখানে আসিতে হয় ?

আচার্য্যদেব—জীবের ‘স্বরূপ’ হয় কৃষ্ণের ‘নিত্যদাস’।

কৃষ্ণের ‘তটস্থা-শক্তি’, ‘ভেদাভেদ-প্রকাশ’ ॥

কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব অনাদি-বহিস্মুখ ॥

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ-১০৮, ১১৭)

কৃষ্ণ-বহিস্মুখ হঞা ভোগ বাঞ্ছা করে।

নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।

মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥ (প্রেমবিবর্ত)

স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। জীবের যখন স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটে, তখন তাহার দুস্পারা মায়ার কবলে পতিত হইয়া এই জগতে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে। জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। জীব তটস্থা শক্তিজাত ও স্বভাবতঃই মায়া-বশ যোগ্য। ‘স্বকর্ম ফলভুক্ পুমান্’। জীবগণ স্বতন্ত্রতাবশে যে সকল সং ও অসং কর্ম করিয়া থাকে, তাহার ফলভোগস্বরূপ পুনঃ পুনঃ এই সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে। জীবগণ অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া যে যে ভাব স্মরণপূর্বক দেহ ত্যাগ করে, দেহান্তে তদ্ভাবানুযায়ী দেহ প্রাপ্ত হয়।

দেহে পঞ্চত্বমাপনৈ দেহী কর্ম্মানুগোহবশঃ।

দেহান্তরমহুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥ (ভাঃ ১০।১।৩২....)

এবম্প্রকারে দেহীসকল স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী দেহ প্রাপ্ত হইয়া ভোগান্তে জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া থাকে।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি ।

এবং ত্রয়ীধর্মমতুপ্রপন্ন।

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ (গী-৯-২১০)

জীবগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্মফলে স্বর্গ লাভ করে, তথায় প্রভূত সুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যালোকে আগমন করে। এইরূপ কামকামী ব্যক্তিগণ বেদ-ত্রয়ীর অন্তর্গত হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে।

কৃষ্ণদাস—আমি কে ?

আচার্য্যদেব—আমি জীব অথবা আত্মা, আমি নিত্য কৃষ্ণ দাস। “আমি নিত্য কৃষ্ণদাস” এই কথা ভুলে। মায়াব নফর হইয়া চিরদিন বুলে ॥” এই কথার দ্বারা জানা যায় যে জীব বা আমি স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণ-দাস। কৃষ্ণ সেব্য, আমি সেবক; কৃষ্ণ প্রভু, আমি দাস; কৃষ্ণ যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; কৃষ্ণ পূর্ণ চিদ্রস্তু, আমি অণু চিদ্রস্তু; স্ততরাং ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমি বিরূপে মায়াব দাস হইলেও স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণদাস—আমার কর্তব্য কি ?

আচার্য্যদেব—সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুকূল কৃষ্ণানু-শীলনই জীবগণের কর্তব্য। “হৃষীকেশ হৃষীকেশ-সেবনম্”। হৃষীক শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের সেবা করাই প্রয়োজন।

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।

করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসংকথোদয়ে ॥

মুকুন্দলিঙ্গালয়-দর্শনে দৃশৌ তদভূত্যাগাত্ৰস্পর্শেহঙ্গসঙ্গমম্।

ব্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজমোরভে শ্রীমন্ত, লম্বা রসনাং তদপিতে ॥

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরৌ হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।

কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যা যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥

(ভাঃ-২।৪।১৬-১৮)

অন্তাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকণ্ঠাচ্ছনাবৃতম্।

অনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।২)

কৃষ্ণের বিষয়ে আসক্তিরহিত হইয়া এবং জ্ঞান ও কর্মে লিপ্ত না হইয়া অনুকূল ভাবে কৃষ্ণানুশীলনতৎপর হওয়াই জীবের কর্তব্য।

কৃষ্ণদাস—কি করিয়া এই যন্ত্রণার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করা যায় ?

আচার্য্যদেব—শ্রদ্ধা সহকারে কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সঙ্গপুরুষ চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার

উপদিষ্ট কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণমন্ত্র ও গায়ত্রী সম্যকরূপে যথাক্রমে কীর্তন ও জপ করিতে করিতে অহৈতুকী ভক্তিপ্রভাবে জীবের অনর্থ উপশান্ত হইয়া যাইবে। অনর্থো-পশমে সংসারের যাবতীয় জালা-যন্ত্রণাময় আধ্যাত্মিকাদি তাপের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জীবাত্মা সম্যকরূপে প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি ॥ (ভাঃ ১।২।৬)

—শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী (ভক্তিশাস্ত্রী, ভিষগব্রহ্ম)

বোস সাহেবের প্রশ্নের উত্তর

(দ্বিতীয় প্রকার)

শ্রী পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় শ্রীযুত জিতেন্দ্রনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনার ভাষা ও ভঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া অযাচিতভাবে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা না লিখিয়া পারিলাম না।

শ্রীযুত বসু মহাশয় যে কয়টি প্রশ্ন করিয়াছেন তাহা অতি গভীর ও জটিল। তাঁহার ভাষায় তিনি নিজেকে “অবৈষ্ণব” বলিয়া বর্ণন করিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহার স্বাভাবিক উদারতা ও বৈষ্ণবতাই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রশ্নগুলির উত্তর ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর বহু ব্যক্তির মঙ্গল বিধান করিবে। এজন্যই তিনি উদার ও জীবন্তে ছুঃখী। বৈষ্ণবগণের নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও অপরের মঙ্গলার্থ অনেক কার্যের অমুষ্ঠান করেন।

১। “বৈষ্ণব” শব্দে বিষ্ণুভক্তকেই বুঝা যায়, তাহার সঙ্গে বৈশিষ্ট্য প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বৈষ্ণবের বাহ্য বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়া অনেকে সরল প্রকৃতির ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করেন।

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো নরঃ ।

বৈষ্ণবোহভিহিতোহভিষ্টৈরিতরোহস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কেবলমাত্র বিষ্ণুপূজানিরত ব্যক্তিকেই বৈষ্ণব বলা যায়, তন্নিম্ন অল্প কার্যে ব্রতী ব্যক্তিগণও আপনাদিগকে “বৈষ্ণব” আখ্যায় পরিচিত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না। আজকাল শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত না হইলেও শব্দগুলির অপব্যবহার করাটাই বর্তমান সমাজের একটা

মজ্জাগত স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকটা উদাহরণ না দিয়া পারিলাম না। যথা—জয়ন্তী, প্রেম, হরিজন প্রভৃতি। জয়ন্তী শব্দটা কেবল শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবার কথা—তাহাই শাস্ত্রের নির্দেশ *, কিন্তু শব্দটা শুনিতে ভাল এবং মূল্যবান বলিয়া সাধারণ ত্রিগুণতাড়িত মায়াবদ্ধ জীবের জন্মতিথিতেও উহা ব্যবহৃত হইতেছে। “প্রেম” শব্দটার অর্থ শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

আয়েন্দ্রিয়প্ৰীতি-বাঞ্ছা তারে বলি ‘কাম’।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্ৰীতি-ইচ্ছা ধরে ‘প্রেম’ নাম ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৫)

কিন্তু এই শব্দটার বিরূপ অসম্ভাবহার ও অপব্যবহার হইতেছে তাহা বহু মহাশয়ের অজ্ঞাত নাই। “হরিজন” শব্দটাও তদ্রূপ। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করিয়া উহার প্রকৃত অর্থ একমাত্র বৈষ্ণবকেই বুঝায়, কিন্তু তাহারও অপব্যবহার দেখা যায়। এইরূপ জাগতিক কোন কার্য করিয়া পাঁচজনের নিকট বাহবা কুড়াইয়া “বৈষ্ণব” আখ্যায় খ্যাত হইতে অনেকেই ব্যস্ত বলিয়া “শুদ্ধ বৈষ্ণব” শব্দের প্রয়োগ। শাস্ত্র ও বৈষ্ণবগণের ভাব বড়ই গভীর। বহু মহাশয়ের ভাষায় প্রকৃত বৈষ্ণবকে শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পৃথক করিয়া বলিবার জগুই “শুদ্ধ বৈষ্ণব” আখ্যা দেওয়া হয়। নচেৎ কোমলশ্রদ্ধ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ভ্রান্তি-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে পারেন। এ সম্বন্ধে ২য় প্রশ্নের উত্তরে আরও কিছু অর্থ স্বতঃই ব্যক্ত হইবে।

নিখিল শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত, উপনিষৎ প্রভৃতিতে ‘পর’ ‘অপর’ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। পর ও অপর দুই শব্দের অর্থই এক—‘অগ্র’, এই অর্থ সাধারণ। কিন্তু বৈদান্তিক পরিভাষা অনেক সময় ব্যাকরণের ব্যক্ত অর্থকে অতিক্রম করিয়া একটা সুন্দর অর্থ করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতসীতার ১ম অধ্যায়ে দুর্ধ্যোধনের কথিত অপৰ্য্যাপ্ত ও পর্য্যাপ্ত শব্দেরও এইরূপ বিপরীত অর্থ

*“জয়ং পুণ্যঞ্চ কুরুতে জয়ন্তীং তেন তাং বিদুঃ।”

(বিষ্ণুপুরাণ)

কৃষ্ণাষ্টম্যাং ভবেদ্ যত্র কলৈক। রোহিণী নৃপ।

জয়ন্তী নাম সা জ্যেষ্ঠা উপোষ্ট্যা সা প্রযত্নতঃ ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস-১৫শ বিলাস)

জয় ও পুণ্য প্রদান করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ ঐ তিথিকে জয়ন্তী নামে কীৰ্ত্তন করেন। হে ভূপাল, কৃষ্ণাষ্টমীতে কলামাত্র রোহিণী নক্ষত্র থাকিলে তাহাকেই জয়ন্তী বলে। যত্নপূর্বক তাহাতে উপবাস করিবে।

জানা যায়। এইরূপ অর্থের তারতম্যহেতু—বিদ্বৎপ্রতীতি ও অবিদ্বৎপ্রতীতি। অর্থাৎ প্রকৃত বিদ্বান্ ব্যক্তির ধারণার্থকে বিদ্বৎপ্রতীতি ও সাধারণ অর্থবোধক ধারণাকে অবিদ্বৎপ্রতীতি বলে। ভগবান্ শ্রীকপিলদেব ভক্তিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—সাত্বিকী, রাজসী, তামসী ও নিগুণা ভক্তি। যথা—

ভক্তিযোগে বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।

স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিষ্যতে॥

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দন্তং মাৎসর্যমেব বা।

সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্যমেব বা।

অর্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্ ভাবঃ স রাজসঃ॥

কর্মনির্হারমুদ্दिष्ट পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।

যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ ভাবঃ সঃ সাত্বিকঃ॥

মদগুণশ্রতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুণাশয়ে।

মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গান্তসোহম্বুধৌ॥

লক্ষণং ভক্তিযোগস্ত নিগুণস্ত হ্যদাহতম্।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ (ভাঃ ৩২৯৭—১২)

অর্থাৎ—অভিপ্রায়যুক্ত পুরুষে প্রকার-ভেদে ভক্তিযোগ বহুভাবে প্রকাশিত; পুরুষের স্বভাবভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোবৃত্তি-ভেদে অভিপ্রায়-ভেদ অর্থাৎ ফলসম্বল্ল-ভেদ বশতঃ ভক্তিভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ক্রোধী, ভেদদর্শী পুরুষ হিংসা, দন্ত, মাৎসর্যের উদ্দেশে আমার প্রতি যে ভক্তি করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি ‘তামস ভক্ত’ বলিয়া কথিত হয়। যে ব্যক্তি বিষয়, যশঃ, ঐশ্বর্যের উদ্দেশে ভেদদর্শী হইয়া আমার পূজা করে, সে ব্যক্তি ‘রাজস ভক্ত’। আবার যিনি পাপক্ষয়, পরমেশ্বরে কর্মার্পণ অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশে অথবা ‘ভগবদর্চন কর্তব্য’ এইরূপ বুদ্ধিতে ভেদদর্শী হইয়া আমার পূজা করেন, তিনি ‘সাত্বিক ভক্ত’। আমার গুণ-শ্রবণমাত্র সর্বচিত্তনিবাসী আমাতে সাগরের প্রতি গঙ্গাজল-প্রবাহের ছায় যে আত্মার অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী গতি উদিত হয়, তাহাই নিগুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ; পুরুষোত্তমস্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি ফলাহুসন্ধান্নরহিতা ও দ্বিতীয়াভি-নিবেশজ প্রাকৃত ভেদলক্ষণ-রহিতা।

উপরোক্ত শ্লোকসমূহের অর্থদ্বারা ভক্তির তারতম্য স্পষ্টই বিবৃত হইয়াছে। ‘ভক্তি’ শব্দটি মনের আঁকু পাকু ভাব অথবা হৃৎকলচিত্তের সাধারণ রোদন, আশান-

বৈরাগ্য প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হওয়া অকর্তব্য বিধায় ‘পর-অপর’, ‘হৈতুকী অহৈতুকী’ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োজন। শাস্ত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুইটা মার্গের কথা শুনা যায়। প্রবৃত্তি মার্গের ব্যক্তিগণ ধন, জন, প্রতিষ্ঠা, পশু, অন্ন, স্বর্গ প্রভৃতিকে পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া শাস্ত্রবিধিমেতে কতকগুলি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করেন এবং কামনাদ্বারা অপহৃতজ্ঞান হইয়া ঐসকল কামনামূলে যে ভক্তির অনুষ্ঠান করেন তাহা হৈতুকী অর্থাৎ কোন একটা হেতু লইয়া ভক্তি। কিন্তু কেবলমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণমূলে সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ করিয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবাই অহৈতুকী ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবতে ১।২।৬ শ্লোকে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

এই শ্লোকে পর-ধর্ম ও অহৈতুকী শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে পর অর্থ শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠ ধর্মের যাজন জীবমাত্রেরই ধর্ম। তাহা কোন প্রয়োজন হেতু না হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিমূলক হইলেই তাহা শ্রেষ্ঠ ও অহৈতুক। তদ্বারা আত্মার প্রসন্নতা সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহারা আত্মার প্রসন্নতা সাধনের হেতু ভক্তি যাজন না করিয়া দেহ-মনের সুখ-সুবিধা লইয়া তদনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অপরাভক্তি বা হৈতুকীভক্তির সাধক।

এখানে বসু মহাশয়ের কথিত “দলছাড়া” করার কথা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, রোগী ও সুস্থ উভয়ের একরূপ পথ্যের ব্যবস্থা না করিয়া ভেদ করার ত্রায় সাধারণ কনিষ্ঠাধিকারীর জ্ঞাত অর্থাৎ প্রাথমিক বৈষয়বগণের পস্থা সুগম ও সহজ করিবার জ্ঞানই শাস্ত্রের ঐদৃশ নিদেশ। সুস্থ ব্যক্তির খাওয়াখাওয়া বিচারের বেশী প্রয়োজন নাই, সহজেই সকল খাদ্য যাহারা অনায়াসে পরিপাক করিতে পারেন, তাঁহারা নিশ্চিন্ত। কিন্তু অজ্ঞান রোগীর পথ্যাপথ্য নির্বাচন করিয়া না চলিলে যে রূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হয়, তদ্রূপ ভক্তির প্রাথমিক সাধনকালে বৈষয়-অবৈষয়, ভক্তি-অভক্তি প্রভৃতির জ্ঞান তথাকথিত সাধকের তর্কোপা বলিয়া ঐ সকল শব্দ ব্যবহৃত। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ‘ভক্তি’ যাজনের নিমিত্ত শ্রীভক্তিরসামুতসিন্দু গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার ব্যক্ত করিয়াছেন।

২। শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন স্থানে পরা-অপর, হৈতুকী-অহৈতুকী ভক্তির উল্লেখ আছে। শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তি—

নমস্কা ময়ি কুর্কন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনঃ।

অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাশ্রিয়ে যথা ॥ (ভাঃ ১০।২৩।২৬)

স্বার্থদর্শী বিবেকী ব্যক্তিগণ আত্মা এবং প্রিয়রূপী আমাতে অহৈতুকী অব্যবহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন। কোন ফলাকাজ্ঞা না থাকিলেই তাহা অহৈতুকী। সুতরাং তাহা অব্যবহিত অর্থাৎ কোনকালে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর দ্বারা তাহা ব্যবহিত হয় না; সুতরাং নিরন্তর চলিতে থাকে।

মুণ্ডক উপনিষদেও ‘পর’ ‘অপর’ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়—“ঐ বিত্তে বেদিতব্যে ইতি, হ স্ম যদ্বন্ধবিদো বদন্তি—পর্য চৈবাপরাচ ॥ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্কবেদঃ শিক্ষা কল্পে ব্যাকরণং নিকৃন্তং ছন্দো জ্যোতিষ-মিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥” (১ম মুঃ উঃ ১।৪-৫)

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদগণ বলেন যে বিদ্যা দুই প্রকার—পর্য ও অপরা। ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ক—চারিবেদ এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃন্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ এবং ছয়টি বেদাঙ্গ সবই অপরা বিদ্যা; আর যাহা হইতে সেই অক্ষর ব্রহ্মের সম্যক জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই পরা। ভোগ করিবার বিধি, ভোগসামগ্রী, ঐ সকল দ্রব্য রচনা করিবার বিধি, নানাপ্রকার যজ্ঞ-বিধি এবং তাহার ফল বিস্তৃতভাবে বেদে বর্ণিত আছে। সেই সকল বিষয়ে আকৃষ্ট হইলে অপরা বিদ্যার বাধ্য হয়। ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে ‘শিক্ষা’ গ্রন্থে বেদের যথার্থ উচ্চারণের বিধি, কল্পে যজ্ঞাদির বিধি, ব্যাকরণে প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগপূর্বক শব্দ-সাধনের প্রক্রিয়া শব্দার্থবোধক বিধি এবং শব্দ প্রয়োগাদির নিয়ম, নিকৃন্তে বৈদিক শব্দ সমূহের অর্থ, ছন্দে বৈদিক-ছন্দ সকলের ভেদ ও জাতির বর্ণন এবং জ্যোতিষ-গ্রন্থে গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি, স্থিতি আর তত্ত্বগ্রহাদির সহিত জাগতিক বস্তু বা ব্যক্তিগণের সম্বন্ধ নিকৃপিত হইয়াছে। এই বেদ ও বেদাঙ্গে যে সকল অংশে ভোগের কথা আছে, তাহাকেই অপরা বিদ্যা বলা হইয়াছে আর তাহারই মধ্যে যে সকল বিষ্ণুভক্তির কথা— তাহাই পরা। সুতরাং সাক্ষাৎ ভগবানের নিঃস্বাস স্বরূপ অপৌরুষেয় (যাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের রচিত নহে) গ্রন্থ বেদশাস্ত্রেও পরা-অপরা, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট ভেদ-দর্শন করা যাইতেছে। ঐ মুণ্ডকেই অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যার অধীন জীবকে নিন্দা করিয়াছেন—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরা পণ্ডিতমগ্নমানাঃ।

জজ্ঞম্ভমানাঃ পরিবন্তি মুঢ়া অন্ধৈর্নৈব নীয়মানা যথাক্ষাঃ ॥

অবিজ্ঞায়াং বহুধা বর্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমগ্নস্তি বালাঃ।

যং কশ্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥

(১ম মুঃ উঃ ২।৮-৯)

অন্ধব্যক্তির মার্গপ্রদর্শক যদি অন্ধ হয় তবে যেমন উভয়েই গর্তাদিতে পতিত হইয়া বিপদকে বরণ করে, তদ্রূপ অবিচার অধীন মূর্খ জীব নিজকে পণ্ডিত অভিমান করিয়া ভগবদ্ভক্তি ত্যাগ করতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগ-বাসনা দ্বারা ক্রমশঃ পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি যোনিতে গমন করিয়া নানাপ্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হইতে থাকে ।

অবিচার অন্তর্গত জীব ইহলোক ও পরলোকে উত্তম উত্তম ভোগপ্রাপ্তির সাধন জ্ঞাত নানাপ্রকার কৰ্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া কৰ্ম্মের উত্তম ফল যে মহাদুঃখ তাহা জানিতে না পারিয়া উচ্চ যোনি হইতে চ্যুত হইয়া নীচ যোনিতে গমন করিয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয় ।

এ মন্তব্যের পরই পরা-বিচার অধীন জীবের প্রশংসা করা হইয়াছে—

তপঃশ্রদ্ধে যে ছ্যপবসন্ত্যরণ্যে শাস্তা বিদ্যাংসো ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ ।

সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়াস্তি যজ্ঞামৃতঃ স পুরুষো হব্যয়াত্মা ॥

(১ম মুঃ উঃ ২।১১)

জাগতিক ভোগসকল দুঃখজনক জানিয়া ঐহারা উহা ত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মার তত্ত্ব জ্ঞানের ইচ্ছায় শাস্ত-স্বভাব বিদ্যান তপঃ ও শ্রদ্ধার সেবনার্থ অরণ্যে বাস করেন তাঁহারা সূর্য্যদ্বারে বিরজায় গমন করেন যেখানে সেই অব্যয়াত্মা পুরুষ বিরাজিত আছেন অর্থাৎ ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করতঃ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবনার্থ তপস্যা ও ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইয়া তত্ত্ব সাধন-চেষ্টায় কাল অতিবাহিত করিলে পরিণামে নির্মল বিশুদ্ধ নিত্যসুখময় স্থানে গমন করেন ।

(সূর্য্যদ্বারকে উত্তম গতি বলা হইয়াছে । উপনিষদে ও গীতায় দুইটি পথ বর্ণিত আছে—দেবযান ও ধূম্রযান । শরীর ত্যাগের পর সূর্য্যদ্বারে অর্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মাণ্ডের অতীত স্থানে লইয়া যায়—ইহাই দেবযান । আর চন্দ্রমণ্ডলে গিয়া পুনশ্চ পৃথিবীতে পুনরাবর্তন হইলে তাহাকে ধূম্রযান বলে ।)

উপরোক্ত কয়েকটি স্থানে পরা-অপরা প্রভৃতির বর্ণন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । এখানে সদাচারী ব্যক্তির প্রশংসা আর অসদাচারীর নিন্দার কথা দেখিয়া কি শাস্ত্রসকলকেও পক্ষপাতযুক্ত বিচার করা হইবে? তাহা নহে । শ্রীযুত বন্থ মহাশয় যে “অবৈষম্যবাদের দলছাড়া করার কথা” উল্লেখ করিয়াছেন বা “ধর্ম্মমার্গে সাম্প্রদায়িক দল গঠনের” কথা জানাইয়াছেন, ইহার একটি নিগূঢ় বিচার আছে । শাস্ত্র বা সাধুগণের বিচার খুবই গভীর । তাহা সাধারণ ধারণা লইয়া বুঝিতে গেলে ভ্রান্ত হইতে হয় । এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব মহাজনের উক্তি কয়েকটি

পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম; আশা করি ইহা স্বারাই উপযুক্ত ধারণার স্থমীমাংসা হইবে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—“গুরু যখন শিশুকে বিষয়-প্রবোধনের জন্ত উপদেশ করেন, তখন কাজে কাজেই একটু একটু পরচর্চা না করিলে উপদেশ ফুট হয় না। পূর্ব মহাজনগণ যখন সেরূপ পরচর্চা করিয়াছেন, তাহাতে গুণ বই দোষ হয় না। শ্রীভাগবতে শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন—

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নন্তং ব্যাযেন চ বা বয়ঃ ।

দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥

দেহাপত্য-কলত্রাদিষা অসৈন্তেষসংস্বপি ।

তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশুন্নপি ন পশুতি ॥ (ভাঃ ২।১।৩-৪)

হে রাজন্! বিষয়িলোক নিদ্রাসক্ত হইয়া রাত্রিশ্রমেপ করে অথবা স্ত্রীসঙ্গে রাত্রিষাপন করে। দিবসে তাহার অর্থ-চেষ্টায় বা কুটুম্বভরণে কাল নষ্ট করে। দেহ, অপত্য, কলত্র ইহাদের সকলকেই নিজজন বলিয়া প্রমত্ত থাকে বলিয়া তাহাদের নাশ দৃষ্টি করিয়াও তাহাদিগকে অনিত্য জ্ঞান করে না।

শ্রীমন্ন্যাপ্রভুও অসদ্বৈরাগীর নিন্দা করিয়াছেন—

প্রভু কহে,—“বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।

দেখিতে না পারেন। আমি তাহার বদন ॥

ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।

ইন্দ্রিয় চরাঞ্চা বলে ‘প্রকৃতি’ সম্ভাষিয়া ॥”

(টীঃ চঃ অঃ ২।১১৭, ১২০)

উপদেশস্থলে এবং বিষয়-সিদ্ধান্ত-সময়ে এইরূপ বাক্য না বলিলে জগতের ও নিজের মঙ্গল হয় না।”

শ্রীযুত বসু মহাশয়ের সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও তাঁহার পর-দুঃখ-দুঃখী ভাব আমাকে উল্লসিত করিয়া এই কয় পংক্তি লিখিতে বাধ্য করিয়াছে। আশা করি মদীয় ব্যক্তিগত ক্রটি-বিচ্যুতি তিনি গ্রহণ না করিয়া কথার সার গ্রহণ করিবেন।

—ত্রিদিগ্‌শ্রীমদ ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ মহারাজ

ভগবানের কথা

(পূর্বপ্রকাশিত ১০৭ পৃষ্ঠার পর)

গীতায় উক্ত শ্লোকসমূহে (গী ১৬।৭—২০) আত্মরীক বৃত্তির প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত। দুই প্রকারের লোক চিরকালই জগতে আছে। এক প্রকারের লোক দেবতা আর এক প্রকারের লোক তদ্বিপরীত অর্থাৎ অত্মর। পূর্বে রাবণের মত ২।১টি অত্মর ছিল যাহারা সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া ভগবান্‌ রামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতাকে হরণ করিয়া ধ্বংস হইত। এখন সেই রাবণের গোষ্ঠী লক্ষ-কোটি গুণ বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইয়া সকলেই সীতাপহরণ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা লাগাইয়া দিয়াছে। ফলে অত্মরগণের মধ্যে বহুমুখী আদর্শ আসিয়া তাহাদিগকে পরস্পরের শত্রু করিয়া তুলিয়াছে। সকলেই ভাবিতেছে আমি চালাকি করিয়া সীতাকে ভোগ করিয়া লইব। কিন্তু ফলে সকলেই রাবণের স্থায় সর্বংশে ধ্বংস হইয়া বাইতেছে। জগতে কত বড় বড় হিটলারাদি মহা-মহাবলীযানেরই জন্ম হইল কিন্তু ভগবানের লক্ষ্মী সীতাকে ভোগ করিবার আশায় প্রলুপ্ত হইয়া সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। এই প্রকার অত্মায় ভোগ প্রবৃত্তিই 'In the dispensation of providence mankind cannot have any rest' এর মূলীভূত কারণ।

অত্মরগণ কোন্‌ বিষয়ে প্রবৃত্তি করিতে হয় তাহা বুঝিতে পারে না এবং কোন্‌ বিষয়ে নিবৃত্তি করিতে হয় তাহাও জানে না। রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বিচার করিতে হয়। সুতরাং আত্মরীক ভাবাপন্ন 'mankind' এর রাবণ-প্রণোদিত সন্ন্যাস-রোগ নিবৃত্তি করিতে হইলে তাহার প্রবৃত্তিটি ফিরাইবার চেষ্টা করা আবশ্যক। রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে যেমন তার পারিপাশ্বিক শুচি ও আচার প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিতে হয়, সেই-প্রকার আত্মরীক স্বভাব পরিবর্তন করিতে হইলে-মমুষ্ট জাতিকে শুচি, আচার এবং সত্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। “যত মত তত পথ” বলিয়া লোক-বঞ্চনা করিয়া শুচি, অশুচি, আচারবান্‌ ও দুরাচার অথবা সত্যাত্মীয়, মিথ্যাাত্মীয় প্রভৃতি সকলকেই এক করিয়া ফেলিলে কোনদিনই রোগের চিকিৎসা সম্ভব হইবে না।

অসত্যাত্মীয় অত্মরগণ এতই হতজ্ঞান যে তাহারা প্রতিমুহূর্ত্তেই শরীরের অসত্যত্ব উপলব্ধি করিয়াও সেই শরীরকেই সকল কার্যের কেন্দ্র করিয়াছে। তাহারা বুঝে না যে “শরীরী”ই সত্য বস্তু আর “শরীর”ই অসত্য বস্তু। তাহারা

বিবর্তবাদে মোহিত হইয়া স্থির করিয়াছে যে, এই জগতের বৃহত্তম শরীরেরও কোন শরীরী নাই। তাহারা নিজ শরীরে বিবর্ত করিয়া যেমন শরীরী-রূপ আত্মার বা চেতনের কোন সন্ধান রাখে না সেই প্রকার মহৎ শরীর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেরও যে কোন শরীরী আছে তাহা বুঝিতে পারে না। তাহারা নিজেকেও যেমন শরীর-সর্বস্ব মনে করে সেই প্রকার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মহৎ শরীর দেখিয়াই প্রকৃতি-সর্বস্ব মনে করে। কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে তাহারা nature nature বলিয়া সহজেই সমাধান করিতে চাহে। তাহাদের মধ্যে আর একটু উচ্চ স্তরের বুদ্ধিমান ব্যক্তি শেষ পর্য্যন্ত অব্যক্ত বলিয়াই মামলা ডিসমিস্ করিয়া দেন। কিন্তু এই সকল অব্যক্ত-ব্যক্ত প্রভৃতির সৃষ্টি হইতে বহুদূর যে সনাতন ভাব বর্তমান আছে তাহার সন্ধান রাখিতে অস্বরগণ স্বাভাবিক ভাবেই অপারগ।

অস্বরগণ এইভাবে নষ্টবুদ্ধি হইয়া দূরদৃষ্টির অভাবে বহু প্রকার জগতের অহিতকর উগ্রকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে। সেই সকল উগ্রকর্ম্মের ফলস্বরূপই আণবিক বিস্ফোরকের আবির্ভাব হইয়াছে। অস্বরগণের বহুপ্রকার উগ্রকর্ম্মের অনুষ্ঠান বা plan কোনদিনই জগতের হিত করিতে পারিবে না। পূর্বকালে রাবণ মহাশয় যেমন শ্রীরামচন্দ্রকে বধনা করিয়া জনসাধারণের উপকারের জন্ত স্বর্গের পাকা সিঁড়ি বাধিবার পরিকল্পনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন, সেই প্রকার রাবণ-বংশধরগণও জনসাধারণের উপকার করিবার জন্ত বহুপ্রকার plan করিয়াছেন। একটি অস্বরের plan কিন্তু অপর অস্বরের plan এর সহিত খাপ খায় না। কেহ বলেন আমাদের planটি বড় চমৎকার সুতরাং আমাদেরই তোমরা ভোট দাও। আবার বিপক্ষ কেহ বলেন যে তাঁহার planই সর্বাপেক্ষা ভাল অতএব তাঁহাকেই ভোট দেওয়া উচিত। এই ভোটের যুগে কে কাহাকে ভোট দিবে এই বিষয়ে পরস্পর বিরোধ করায় সকল স্বর্গের সিঁড়িই অকালে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে দূরদৃষ্টিহীন নষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণের এই-প্রকার বহু plan উদ্ভাবিত হইলেও কোনদিনই জগতের শান্তি আনিতে পারে না। সকল অস্বরগণ কিন্তু ভগবান্কে ফাঁকি দিয়া তাঁর লক্ষ্মীকে ভোগ করিবার জন্ত সর্ব্বতঃ একমত।

প্রত্যেক অস্বরেরই দম্ভ আছে যে তাঁর চেয়ে বুদ্ধিমান ও মানী ব্যক্তি আর কেহই নাই। সুতরাং তিনি যে সকল কামনা দি দ্বারা চালিত হইতেছেন

তাহা সমস্তই লোকহিতকর। কিন্তু ফলে দেখা যায় যে, তাহার সমস্ত কামনাই মোহগ্রস্ত এবং অসং। কিন্তু সেই-প্রকার অসদাগ্রহ করিয়াও অস্বরগণ বহু প্রকার ছলনা-চাতুর্য্য বিস্তার করিয়া প্রভাব বিস্তার করে।

অশুচিব্রত অসত্যাশ্রয়ী অস্বরগণের চিন্তার ধারা অপরিমেয়। তাহারা স্বকপোলকল্পিত নেতা সাজিয়া দেশের ও দেশের কি ভাবে উপকার হইবে তাহা চিন্তা করিতে করিতে বিব্রত হইয়া পড়েন। ‘হাটের এত লোক কোথায় শয়ন করিবে’ এই প্রকার চিন্তাধারা কালান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া যায়। আমার ভোগ, আমার পুত্রের ভোগ, আমার পৌত্রের ভোগ, তন্তু সন্তানের ভোগ, তন্তু সন্তানশ্রু সন্তানের ভোগ ইত্যাকার ভোগের চিন্তা করিতে করিতে পৃথিবীর প্রলয়কাল পর্য্যন্ত কিভাবে ভোগের ব্যাপারটা সুদৃঢ় হইতে পারে তাহারই পর্য্যায়ক্রমে বহুমুখী ‘ভোগ’ বা ‘বাদ’ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ভোগের পরিবর্তে যখন দুঃখের অবতারণা হয় তখন সেই সকল অস্বরগণ কাম-ভোগের ওহু জীবহিংসা প্রভৃতি সাধন করিয়া অজ্ঞায়ভাবে অর্থ সঞ্চয় করে। অসীম কাম-ভোগের জন্ত কোটি কোটি টাকাও সঞ্চয় করিয়া তাহাদের আশা পরিতৃপ্ত হয় না। অজ্ঞায়ভাবে যে যত অর্থ-সঞ্চয় করিতে পারিলে সে তত বড় প্রধান হইয়া উঠে। শত শত আশা-পাশের দ্বারা বদ্ধ কাম-ক্লোদপরায়ণ অস্বরগণ সামান্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক শরীর-সর্বস্ব কামোপভোগাদির জন্ত অজ্ঞায়ভাবে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া যেমন ক্ষান্ত নহে, অপর পক্ষে বিপক্ষ অস্বরগণও সেইপ্রকার আশা-পাশের দ্বারা চালিত হইয়া ঐসকল অজ্ঞায়ভাবে সঞ্চিত অর্থগুলি পুনঃ অজ্ঞায়ভাবে অপহরণ করিবার চেষ্টায়ও বড় কম দক্ষ নহে। সুতরাং এইপ্রকার অজ্ঞায়ভাবে অর্থ সঞ্চয়ের ব্যাপারে আত্মরীক প্রতিযোগিতা কিভাবে মনুষ্য জাতির মঙ্গল আনয়ন করিতে পারিবে? অতএব ‘In the dispensation of providence mankind cannot have any rest’ এই কথার সমাধান অস্বরগণ কর্তৃক কখনই হইতে পারিবে না।

অস্বরগণের সর্বদাই চিন্তা অথ ব্যাঙ্কে কত টাকা জমা বাড়াইতে পারিলাম। “অথ বাজারে ফটকাবাজী করিয়া এত লাভ করিলাম, আগামী কল্য এই এই জিনিষগুলির দর বাড়িলেই আবার এত লাভ হইবে। সুতরাং আমার Bank Balance এত ছিল এইবার এত হইল। এইভাবে অদূর ভবিষ্যতে আরও জমা বাড়িবে।”

আমার অমুক শত্রুটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপর শত্রুটি শীঘ্রই হত হইবে।

স্বতরাং শীঘ্রই আমি নিশ্চিত হইব। এইভাবে শত্রু-হনন-কার্যে আমি বিশেষ পারদর্শী বলিয়া আমিই ভগবান্। ভগবান্কে আবার কোথায় খুঁজিতে হইবে? 'শত শত ভগবান্ ঘুরিছে সম্মুখে তোমার'। এইপ্রকার অস্বরীক বিচার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাহারা ভগবানের অমৃত কথা শুনিতে মোটেই রাজী নহে। তাহারা বলে ভগবান্ আবার কে? আমিই ত' ভগবান্। আমি যখন অন্ধ্যা ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়া জগতকে ভোগ করিতে পারি তখন আমিই ত' ভগবান্ এবং আমিই ত' ভোগী, সুখী, বলবান্ এবং সিদ্ধ। যাহাদের বল, নাই, অর্থ নাই, তাহারাও ভগবান্ ভগবান্ বলিয়া আমাদের সম্মান করিবে। অত্ৰ ভগবান্কে ডাকিবার কি প্রয়োজন আছে?

অস্বরগণের ধারণা যে তাহাদের অপেক্ষা ধনজনবান আর অত্ৰ কেহ নাই। যক্ষাদির কাছে তাহার ধন সঞ্চিত থাকিবে এইপ্রকার অজ্ঞান-বিমোহিত অস্বর-গণ অনেকপ্রকারের চিত্ত-বিভ্রান্ত হইয়া মোহজালের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া যায়। সেইপ্রকার মোহজাল দ্বারা বদ্ধ হইয়া কাম-ভোগরূপ অশুচি নরকে পতিত হইয়া যায়।

অস্বরগণের যে যাগ-যজ্ঞাদির অমুষ্ঠান তাহাও ধন-মান-মদান্বিত, আত্মতৃপ্তিকর ও হিংসাপরায়ণ। তাহারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নামমাত্র যজ্ঞ দম্ভের সহিত অমুষ্ঠান করে। অহঙ্কার-বলদর্প-ক্রোধ-কামাদির দ্বারা মিশ্রিত বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া এ'টি আমার দেহ এবং ঐটি অপরের দেহ, আমি হিন্দু, ঐ ব্যক্তি মুসলমান, আমি বাঙ্গালী, অমুক অবাঙ্গালী, আমি জার্মান, তিনি ইংরাজ ইত্যাদি বিচার করিয়া জীবহিংসা কার্যে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। সেইপ্রকার হিংসাপরায়ণ ক্রুর-নরাধমগণকে ভগবান্ তাঁর দৈবী মায়ায় ত্রিশূল বিদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ নানাপ্রকার অশুভ, অশুচি, অস্বরযোনিতে নিক্ষেপ করেন। এবং পুনঃ পুনঃ অস্বর-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া সেই নরাধম মূঢ় অস্বর জন্মজন্মান্তরেও শ্রীভগবান্ এবং তাঁর নামরূপলীলা-পরিকর বৈশিষ্ট্যের কথা বুঝিতে না পারিয়া নির্বিশেষ-জ্ঞানরূপ অধমগতি লাভ করে।

(ক্রমশঃ)

— শ্রীঅভয় চরণ দে.

এডিটর ব্যাক-টু-গড্, হেড

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বক্তব্য

আমরা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠক-পঠিকাবর্গের নিকট পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি যে, এ বৎসর ২৬শে আষাঢ় হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাগণ চাতুর্মাস্ত্র-ব্রত পালন আরম্ভ করিবেন। তদনুসারে পত্রিকার পাঠকগণকেও এই ব্রত উদ্ঘাপনের জন্ত নিবেদন করিয়াছি। উক্ত তারিখ হইতে সমিতির প্রতিষ্ঠিত মঠ ও প্রতিষ্ঠানসমূহে যথানিয়ম চাতুর্মাস্ত্র-ব্রত উদ্ঘাপন আরম্ভ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ নবদ্বীপ তেঘরিপাড়াস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, সিধাবাড়ী গ্রামস্থ সিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ ও বাগবাজার বোসপাড়া লেনস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে বিশেষ আগ্রহ, যত্ন ও কঠোরতার সহিত উক্ত ব্রত পালিত হইতেছে। বর্তমান চান্দ্র-শ্রাবণ মাস হইতেই সমিতির সভ্য ও সেবকগণ পটোল, লাউ, কলাই ডাল, সিম, বরবটী, বেগুন, কলসী শাক, পুতিকা প্রভৃতি চারি মাসের জন্ত অতি যত্নের সহিত বর্জন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, “শ্রাবণে বর্জয়েৎ শাকং” শাস্ত্রের এই বাক্যানুসারে শুদ্ধ-ভক্তগণ সযত্নে সকল প্রকার শাক পরিত্যাগ করিয়াছেন। উক্ত ২৬শে আষাঢ় যথাশাস্ত্র নখ-রোমাদি চারি মাসের জন্ত ধারণোদ্দেশ্যে ক্ষৌরাদি কৰ্ম্মও সমাপ্ত হইয়াছে। চাতুর্মাস্ত্রে সর্বপ্রকার বিলাস-ব্যসনাদি ও বিবিধ ভোগ-প্রবৃত্তি হইতে দূরে থাকিয়া সর্বতোভাবে সাধুসঙ্গে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকাই চাতুর্মাস্ত্র পালনের প্রধান উদ্দেশ্য। সমিতি ইহা সাগ্রহে পালন করিতেছে ও করিবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইতেছি যে, কতিপয় ‘কিশোরী ভজা’ ও ‘ভজন খাজা’ সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মধ্বজী গৌড়ীয়-নামধারী গুরুদ্রোহী পাষণ্ড চাতুর্মাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতাকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা দেখাইতেছে। আমরা সর্বসাধারণকে এই ‘ভজন-খাজা’ সম্প্রদায় হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্ত বিশেষভাবে সাবধান করিতেছি। এই গুরুত্যাগী ভজন-বিরোধী-সম্প্রদায় সহজিয়াগণের উচ্ছিষ্টভোজন করিয়া পাতিত্য বরণ করিয়াছে। আমরা ইহাদের স্বরূপ ও প্রকৃতি ক্রমশঃ সর্বসাধারণের নিকট জ্ঞাপন করিব। ইহারা এইরূপ বলিবারও ধৃষ্টতা পোষণ করে যে, শাস্ত্রও নাকি তাহাদের মতের পোষকতা করিতে পারে। আমরা জানি, শয়তানও তাহার মতবাদ পোষণের

জন্ত শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধার করিয়া থাকে—Devils can quote scriptures. সে যাহা হউক, আমরা উক্ত ‘ভজন-খাজা’ সম্প্রদায়ের যুক্তি নিরসনকল্পে চাতুর্মান্ত্র-ব্রত পালন সম্বন্ধে শাস্ত্রের যাবতীয় প্রমাণ ও যুক্তি প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া পাঠকবর্গকে একটি প্রবন্ধ পরে পরিবেশন করিব।

শ্রীশ্রীঅযোধ্যা-ধাম পরিক্রমার বিরাট আয়োজন

শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইবেন, প্রতি বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি অতি আদরের সহিত যথাসাশ্ত্র উর্জ্জব্রত পালন উপলক্ষে ভগবৎ ও ভাগবত-ধাম পরিক্রমা করিয়া থাকেন। এই বৎসর কান্তিক-ব্রতকালে শ্রীশ্রীঅযোধ্যা-ধাম পরিক্রমার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আগামী ১৭ই আশ্বিন, ৪ঠা অক্টোবর মঙ্গলবার, ত্রয়োদশীর দিন হাওড়া ষ্টেশন হইতে রিজার্ভ (সংরক্ষিত) গাড়ীতে বেলা ১০টার সময় সমিতির সভ্যগণ যাত্রা করিবেন। সুতরাং অযোধ্যা পরিক্রমার যাত্রিগণ তদনুসারে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইবেন। আমরা প্রত্যেক যাত্রীর নিকট এই পরিক্রমা উপলক্ষে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করি। যাহারা শ্রীশ্রীপরিক্রমায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাহারা এতৎসম্বন্ধে নিয়মাবলীর জন্য শ্রীপরিক্রমার নিয়ামক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্‌পামী শ্রীশ্রীমদভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ঋষ্য এবংসরও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-উৎসব শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। অগ্ৰাণ্ত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন দেশীয় বহু শুদ্ধভক্তের সমাবেশ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইউ-পি, পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ, আসাম প্রভৃতি প্রদেশ হইতে সমাগত ভক্তগণের সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা এই বৎসরের যাত্রী-সংখ্যা দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শুদ্ধভক্তি প্রচার ও আচার-ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া সকলেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইতেছেন—ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ধর্মের নামে কৃত্রিমতা অধিক দিন চলিতে পারে না; নিরপেক্ষ সত্যসুসন্ধিৎসুমান্ত্রেই তাহা ধরিয়া ফেলেন। শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রচার-বৈশিষ্ট্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া ‘কর্ত্তাভজা’, ‘ভজন-ধাজা’ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা তাহাদিগকে পরশ্রী-কাতরতার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সমিতির আনুগত্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।

বিগত ১২ই আষাঢ় শ্রীল ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে প্রত্যাষে মঙ্গলারাত্রিক-অন্তে উষঃকীর্ত্তনমুখে “শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি”—গুরুপরম্পরা, পঞ্চতন্ত্র ও শ্রীল ঠাকুরের রচিত “জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে” প্রভৃতি কীর্ত্তন হয়; পরে “নমো নমঃ তুলসী মহারানী”—এই গীতিটী কীর্ত্তনমুখে তুলসী-আরতি কীর্ত্তন ও পরিক্রমা হয়। যদিও ইহা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রাত্যহিক কৃত্য, তথাপি ঠাকুরের বিরহ উপলক্ষে ইহা বিশেষ উৎসাহ ও উজ্জলতার সহিত অহুষ্ঠিত হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ভোগারতি কীর্ত্তন হইবার পর দূরদেশ হইতে সমাগত ভক্তমণ্ডলীর প্রসাদ সেবাস্তে মঠের সেবকগণ তাঁহাদিগকে লইয়া ঠাকুরের অতিমর্ত্য আচার-বিচার সম্বন্ধে ইষ্টগোষ্ঠী করেন। কেহ ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনী আলোচনা করেন, কেহবা তাঁহার সম্পাদিত সজ্জনতোষণী হইতে তাঁহার প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করেন, কেহবা তাঁহার রচিত শরণাগতি, গীতাবলী, কল্যাণকল্পতরু প্রভৃতির গীতিগুলি মৃদুস্বরে কীর্ত্তনমুখে আলোচনা করেন, কেহবা শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত ‘ঈজবধর্মের ভূমিকা’ পাঠ করেন, কেহবা মৌখিকভাবে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কেহবা অপরাহ্নে বিরাট অধিবেশনের

আয়োজন ব্যাপারে তৎপর হন, কেহবা সন্ধ্যারাত্রিকের পর সমাগত বিরহ উৎসবের বিচিত্র প্রসাদ বিতরণের আয়োজনে লিপ্ত হন এবং কেহবা শ্রীল ঠাকুরের অভিকৃষ্টি অনুসারে পৃথগ্‌রূপে বিশেষভাবে রন্ধনাদির আয়োজনে তৎপর ছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতঃপর পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় একটা বিরাট বিরহ-সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় চুঁচুড়া সহরস্থ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিসকল যোগদান করিয়া সমিতির সভ্যগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। সভায় প্রারম্ভিক কীর্তনের পর “যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর” গীতিটি অতি স্থূললিত কণ্ঠে কীর্তিত হয়। তৎপরে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-সম্পাদিত মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীল ঠাকুরের স্বরচিত “শ্রীগৌড়মচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ” সংস্কৃত গীতিটি তাঁহার স্বভাব-স্থূলভ স্থূললিত-কণ্ঠে কীর্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রীতি সম্পাদন করেন। (শ্রীল ঠাকুরের এই সংস্কৃত পঞ্চটি পূর্বে বহুল প্রচারিত না হওয়ায় আমরা ইহা বঙ্গানুবাদ সহিত আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিব।) অতঃপর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্রিদিগেশ্বামী শ্রীশ্রীমদভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ মহোদয় সমাগত ভক্তমণ্ডলীর প্রার্থনানুসারে তাঁহাদিগকে বিরহ-মহোৎসব সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে উপদেশ প্রদান করেন। নিম্নে বথাসম্ভব তাঁহার ভাষায় সংক্ষেপে তাঁহার বক্তৃতা উদ্ধৃত হইল।

মহারাজের বক্তৃতার সংক্ষেপ মর্ম্ম

“আমরা প্রতি বৎসর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জীবন-চরিত এবং তাঁহার বিরহ-তিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে কীর্তন করিয়া থাকি। আপনারা সকলেই এই মহাপুরুষের অতিমর্ত্য জীবনীর কথা বহুবার বহুক্ষেত্রে শ্রবণ করিয়াছেন। আমি তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া আপনাদের সময়ক্ষেপণ করিব না। তবে একটীমাত্র বিষয় আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন। প্রতি বৎসরই এই বিরহতিথির সমাগম হইয়া থাকে। বিরহ জীবমাত্রকেই ব্যথিত করে। সুতরাং প্রতি বৎসরই ব্যথিত হইবার জন্ত এত আয়োজন ও ঘটী কেন? হৃদয়-বিদারক ঘটনাবলীতে কাহারও উৎসাহ থাকিতে পারে না, অথচ বৈষ্ণবগণের পরিভাষা লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই, বিরহও একটা উৎসববিশেষ। উৎসব শব্দের অর্থ—আনন্দ। লোকের হৃদয়ে ব্যথার উদ্বেক করাইয়া আনন্দ-লাভ করাই বিরহ উৎসবের উদ্দেশ্য নহে, অথচ বিরহ-ব্যাপার আনন্দদায়ক বলিয়াই বৈষ্ণবগণ

বিরহোৎসব পালন করিয়া থাকেন। আমরা সকলেই “অমৃতশ্রু পুত্রাঃ”—
 আনন্দের সন্তান, নিরানন্দ আমাদের স্বরূপ নহে। আমাদের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-
 কণা, তাহাতে উদ্বিগ্ন, নিরানন্দ, দুঃখ, শোক প্রভৃতির ছায়ামাত্রও নাই।
 তথাপি বৈষ্ণব-সাহিত্যে ‘বিরহ’ একটা রস বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। এই বিরহ-
 রসের অন্তরালে যে পূর্ণানন্দস্বরূপ ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ দেখা যায়, তাহাই উৎসব।
 পার্থিব-শোক মানুষকে সংসারাক্ষয় করিয়া ফেলে, কিন্তু বিরহ জীবকে সংসার
 হইতে মুক্ত করিয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে নিহিত করে। শোকাভিভূত ব্যক্তি শূদ্র,
 কিন্তু বিরহ-কাতর ব্রাহ্মণোত্তম নিগুণ ভক্ত। সূতরাং শোক ও বিরহে
 আকাশ-পাতাল, স্বর্গ-নরক পার্থক্য রহিয়াছে। শোকে মানুষকে নিকৃৎসাহিত
 করিয়া হীনবীৰ্য্য করিয়া ফেলে, কিন্তু বিরহ ভগবদ্ভক্তকে প্রচুর পরিমাণে
 সেবোৎসাহে সজীবিত করিয়া থাকে। সূতরাং আপনারা শোক ও বিরহ-তত্ত্বকে
 এক মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইবেন না। যদিও শাস্ত্রকারগণ ‘বিরহ’-শব্দের
 পরিবর্তে কোন কোন স্থলে ‘শোক’-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি এই শোক
 শব্দের দ্বারা অপ্ৰাকৃত বিরহ-তত্ত্বই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাকৃত মায়া-মোহগ্রস্ত
 শোকের কথা উদ্দিষ্ট হয় নাই।

বিরহের অন্তরের অন্তঃস্থলে যে অব্যক্ত নিত্যানন্দের উচ্ছ্বাস বর্তমান, তাহা
 আমরা প্রাকৃত জগতেও বহুক্ষেত্রে কাব্যরসের রসিকগণের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া
 থাকি। উদাহরণ-স্বরূপ আপনাদের নিকট আমি নিবেদন করিতে চাহি—
 আপনারা ব্যবসায়ী কীর্তনীয়ার স্থললিত করুণকণ্ঠে রামলীলার করুণ কাহিনী
 শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন।
 সেই কীর্তনীয়ার কীর্তন-চাতুর্য্যে আপনাদের হৃদয় বিগলিত হয় এবং তাহাতে
 আপনাদের প্রচুর পরিমাণে করুণ-রসের উদ্বেগ হইয়া দরদর ধারায় অশ্রু বিগলিত
 হইতে থাকে। আপনারা এইরূপ কীর্তন শ্রবণ করিবার জন্ত সকলকে সাদরে
 আহ্বান করিয়া থাকেন। এইরূপ করিবার কারণ অহুসঙ্কান করিলে আপনারা
 বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, করুণ-রস দুঃখদায়ক হইলেও তাহার অন্তরালে
 এমন অব্যক্ত আনন্দ আছে, যাহার জন্ত আপনারা সর্বদাই লালায়িত।
 আপনাদের এরূপ উদ্দেশ্য নয় যে, আপনাদের বন্ধুবান্ধবগণকে আহ্বান করিয়া
 তাঁহাদের হৃদয় ব্যথিত করিয়া উদ্বেগের সৃষ্টি করেন। সূতরাং বৈষ্ণবগণের
 বিরহ-উৎসব কথার প্রাকৃত তাৎপর্য্য এই উপমার সহিত তুলনা করিলে কথঞ্চিৎ
 অল্পধাবন করিতে পারিবেন। বিরহ—উদ্বেগদায়ক হইলেও আমরা প্রতি বৎসর

ইহার আলোচনা করিয়া আনন্দ অনুভব করি এবং আপনাদিগকেও সেই আনন্দের অংশভাগী হইতে আহ্বান করিয়া থাকি।

বিরহের অপর নাম বিপ্রলম্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্রলম্ব রসকেই সর্বোত্তম বলিয়া নিজ আদর্শের দ্বারা প্রচার করিয়াছেন। ইহার এই উদ্দেশ্য নহে—যাবতীয় জীবকে অনর্থমুক্তদশায় দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করা। একদিকে পরম মুক্ত-পুঙ্খগণের হৃদগত বৃত্তি যেমন বিপ্রলম্ব রস, তেমনি অত্নদিকে বদ্ধ-জীবগণের বিরহ-রসোৎসবের অনুষ্ঠানও তাহাদিগকে অনর্থ হইতে মুক্ত করায়। স্তত্রাং সিদ্ধ-সাধন অবস্থায়ও বিরহগত বৃত্তির তারতম্য লক্ষিত হয় না। উপায়-উপেয়—একই তাৎপর্য্যপূর্ণ ও পর্য্যায়ভুক্ত হওয়া আবশ্যক।

বিরহ বা বিপ্রলম্ব ভাবেই শ্রীমন্মহাপ্রভু এত বহুমানন করিলেন কেন, তাহা আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়। মুক্তাবস্থার বিপ্রলম্বের কথা আমাদের বর্তমানে আলোচ্য বিষয় নহে। সাধক-জীবনে এই বিরহ-বিপ্রলম্ব আমাদের সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরলভাবে অনর্থের হাত হইতে নিষ্কৃতি দেয়। বৈষ্ণবগণের যে বৈরাগ্য, তাহা এই বিরহ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। যে বৈরাগ্য আমাদের ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দেয়, তাহা কখনও বিরহ বা বিপ্রলম্ব নহে। আমরা উদরবেগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের চরিত্রে দেখিতে পাই, অধিক ভোজনের জন্ত তাহারা উপবাসাদি সংযম করিয়া থাকে। এই সংযম বা বৈরাগ্য বিরহ বা বিপ্রলম্ব নহে। হৃদয়ে ভক্ত ও ভগবদ্বিরহ যত অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইবে, ততই বাহ-জগতের প্রতি স্পৃহাহীন হইয়া প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইবে। তজ্জন্ত বৈরাগ্যই প্রকৃত বিপ্রলম্ব। আমরা পার্থিব-জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই যে, পুত্রের সত্ত্ব বিয়োগে জননী যেরূপ শোকাক্তা হইয়া সংসারের প্রতি নিস্পৃহা হইয়া থাকেন, সেরূপ আর অত্ন কোন প্রকারে নিস্পৃহ হইবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায় না। সন্তোমুত পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া জননী আর্তনাদ করিতেছে, এমন-সময়ে কেহ লক্ষ মুদ্রা সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেও তাহা মাতার নিকট বিষবৎ অগ্রাহ্য বলিয়া মনে হইবে। তাঁহার নিকট আহা-বিহার, বেশ-ভূষা সমস্তই তিক্ত বলিয়া বোধ হইবে। তজ্জন্ত সন্তোগ-রস অপেক্ষা বিপ্রলম্ব-রসই পরম মঙ্গলদায়ক—ইহাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষার সার। সন্তোগে সাধকের চিত্তকে কলুষিত করে, বিরহে সাধককে পবিত্র করিয়া শুদ্ধ-বৈরাগ্যে স্থাপন করে, ইহা হইতেই সাধকের সংসার-স্পৃহা নষ্ট হইয়া যায়। বিরহের ক্লেশবোধই ভোগ-

বাসনা, কামনা প্রভৃতি সংসার-মোচনের একমাত্র কারণ। আমরা তজ্জন্মই প্রতিবৎসর শ্রীল ঠাকুরের বিরহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।

বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব একই উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। বৈষ্ণব জগতের কল্যাণের জন্ত আবির্ভূত হন এবং জগতের কল্যাণের জন্তই তিরোহিত হইয়া থাকেন। জগতের অকল্যাণ সাধনের জন্ত বৈষ্ণবের তিরোভাব নহে। ‘বৈষ্ণব চরিত্র সর্বদা পবিত্র’—তাহাতে কোন অমঙ্গলের ছায়া নাই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে আবির্ভূত হইয়া যেরূপ মঙ্গলবিধান করিয়াছেন, তিরোহিত হইয়া তিনি তদপেক্ষা অধিক মঙ্গলবিধান করিতেছেন। ইহা একটা গুঢ় রহস্যময় তত্ত্ব। আমরা সাধারণ-দৃষ্টিতে ইহার তাৎপর্য সহজে অনুধাবন করিতে পারিব না ইত্যাদি ইত্যাদি।”

স্বামিজী মহারাজ এই সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা করিলেও স্থানাভাবে এখানে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীল ঠাকুরের স্বলিখিত ৫টি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ কয়টি জগজ্জীবের অতীব মঙ্গলকর। এই প্রবন্ধগুলি এতদিন শুদ্ধভক্তগণের চক্ষুর অন্তরালে ছিল। সুতরাং আমরা ঐ প্রবন্ধগুলি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিব।

তৎপরে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্য চরিত্রাবলী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীর প্রভূত আনন্দ বর্দ্ধন করেন। তিনি দৈন্তমুখে ভক্তনোম্মতির জন্ত শ্রীল ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা করেন, ইহা সকলের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অতঃপর শ্রীমহামন্ত্র কীর্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয় এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, এই দিবস সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীল ঠাকুরের স্বরচিত অপ্রকাশিতপূর্ব “সংক্ষেপ অর্চন পদ্ধতি” অবলম্বন করিয়া তাঁহার উদ্দিষ্ট মন্ত্রে একটা পৃথক্ ভোগ নিবেদন করা হয়। আমরা সময়ান্তরে ঠাকুরের রচিত “সংক্ষেপ অর্চন পদ্ধতি” প্রকাশ করিব।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসবের বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

মাননীয় নারায়ণ বাবুর প্রশ্নাবলী

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা,

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, হুগলী।

আপনার বহুল-প্রচারিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়টির শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়া আমার সংশয় ভঞ্জন করিবেন।

১। জীবের শূদ্রাবস্থা কতদিন থাকে এবং কি প্রকারে তাহা হইতে মুক্তি পাইতে পারে?

২। দ্বিজাবস্থার লক্ষণ ও কার্যক্রম কি কি ও পতনের সম্ভাবনা আছে কি না?

৩। বিপ্রতা কখন আসে এবং তাহার বিশেষ বিশেষ কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তদবস্থায় বিপ্রেয় কি কার্যক্রম তাহাও বর্ণনা করিবেন।

৪। ব্রাহ্মণের প্রধান কার্য কি কি? কোন্ অবস্থায় ব্রাহ্মণ থাকেন ও তাহার পতনের সূচক আছে কি না?

৫। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবভাব কখন কোন্ অবস্থায় প্রকাশ পায়?

৬। অব্রাহ্মণ শ্রীবিগ্রহ-সেবা বা অর্চন করিবার অধিকারী কি না?

৭। সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণতা আসে কি না? আর কোন্ অবস্থায় সন্ন্যাস-গ্রহণ বিধেয়?

৮। ব্রাহ্মণতা না আসা পর্যন্ত শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার আসে কি না?

৯। অব্রাহ্মণ—শ্রীভগবানের ভোগ রান্না করিতে পারে কি না?

১০। সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠিত কোনও মঠে কোন দীক্ষিতা মহিলা ভোগ রান্না করিবার অধিকার পাইতে পারে কি না?

১১। শ্রীবিগ্রহ বহন করিবার অধিকার কাহাদের? শূদ্র বহন করিতে পারে কি না?

১২। ব্রাহ্মণতা না আসা পর্যন্ত কেহ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিলে তাহা সম্মান করা বিধিসম্মত কি না? কোন্ কোন্ শাস্ত্রে প্রমাণ আছে উল্লেখ করিবেন।

অপরূপ বিষয় পরে সমালোচনা করিব। আশা করি, দয়া করিয়া আমার সংশয় ছেদন করিবেন। ইতি—

বৈষ্ণবদাসহুদাস—শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী (মুখোপাধ্যায়)

১৪, ফোরডাইস লেন (কলিকাতা) ৬৬৪০

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥
অত্র ধর্ম সুষ্ট্ররূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১ম বর্ষ { ক্ষীরোদশায়ী, ১০ পদ্মনাভ, ৪৬৩ গৌরান্দ { ৭ম সংখ্যা
শনিবার, ৩১ ভাদ্র ১৩৫৬, ইং ১৭।৯।৪৯

শ্রীগুরুবষ্টকম্

(শ্রীগৌরদাস-ব্রহ্মচারি-কাব্য-ব্যাকরণতীর্থেন বিরচিতম্)

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীন্দু- শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদাজ্জড়ঙ্গ-
রিত্যাখ্যা বিশ্বপ্রসাদসিদ্ধুঃ । স্তব্ধপ্রেমপীযুষতরঙ্গরঙ্গঃ ।
গৌড়োদিতো বিশ্বতমোনিহন্তা তন্মাম-তন্মাম-প্রচার বিজ্ঞো
বন্দে গুরোস্তুচ্চরণাবিন্দম্ ॥ ১ ॥ বন্দে গুরোস্তুচ্চরণাবিন্দম্ ॥ ২ ॥

সমুত্তিসিদ্ধান্তমহাবদান্তঃ বিশুদ্ধ-সচ্ছাস্ত্র-বিচার-ধীরো
 সৌজন্য-দাক্ষিণ্য-গুণাতিথ্যঃ । বিরুদ্ধসিদ্ধান্তমতাক্ষ-সূরঃ ।
 শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যগণাগ্রগণ্যো সদা সদাচার-বিধানসারো
 বন্দে গুরোস্তুচ্চরণারবিন্দম্ ॥ ৩ ॥ বন্দে গুরোস্তুচ্চরণারবিন্দম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীমজ্জগন্নাথপুরাবতীর্ণো রাধাসখীসঙ্ঘশিরোললামো
 বাল্যাবধি-প্রেম-সুভক্তিপূর্ণঃ । নিগূঢ়-সেবা-সততাভিরামঃ ।
 জিতেন্দ্রিয়-ন্যাসিশিরোহবতংসঃ আনন্দপ্রেমাক্কি-নিমগ্নদেহো
 বন্দে গুরোস্তুচ্চরণারবিন্দম্ ॥ ৪ ॥ বন্দে গুরোস্তুচ্চরণারবিন্দম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-সংলাপ-সহস্রবক্তৃঃ সমস্তজীবোদ্ধারণপ্রযত্নো
 প্রস্বেদ-কম্পাশ্রু-বিকারগাত্রঃ । শ্রীনামসঙ্কীৰ্ত্তনদানলগ্নঃ ।
 সদা মহাভাবনিমগ্নচিন্তো অশেষকল্যাণগুণপ্রদীপ্তো
 বন্দে গুরোস্তুচ্চরণারবিন্দম্ ॥ ৫ ॥ বন্দে গুরোস্তুচ্চরণারবিন্দম্ ॥ ৮ ॥

ভক্ত্যা য এতদগুরুবন্দনং কো
 নিত্যং শৃণোত্যাচ্চরবৈরধীতে ।
 শ্রীরাধিকাকৃষ্ণনিগূঢ়সেবাং
 লব্ধ্বা মহাপ্রেমসুধাপ্লুতঃ স্মৃতাং ॥ ৯ ॥

শ্রীগুরু-স্বরূপ

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিচরণ বাবুর পত্র

নোয়াখালি বিজয়নগর হইতে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত হরিচরণ পাল
 লিখিয়াছেন—“শ্রীশ্রীগুরুদেব সম্বন্ধীয় তর্কের মীমাংসার জন্য আপনার নিকট
 নিবেদন করায় আপনি শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলা অনুসন্ধান করিতে
 আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তদ্বারা আমার আশা ও
 পিপাসা নিবারণ না হওয়ায় অতঃ এই দীনহীন ভজন-বিহীন অজ্ঞান নিতান্ত

বিপদে ও ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া মহাশয়ের শ্রীচরণে শরণাগত হইল। আপনি যে একজন দয়াল, পরহুঃখ-কাতর, পাপীর সহায় ও দরিদ্রের বন্ধু, তাহা আপনার ভূত ও বর্তমান কার্য্যদ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। যদি দয়া করিয়া এই নরাধম ও ঘোর পাপীর উদ্ধার-সাধনে বাঞ্ছা হয়, তবে নিজ-কার্য্যের একটু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নিম্নলিখিত প্রশ্নটীর বিস্তৃত মীমাংসা জানাইয়া প্রতিপালিত, উপকৃত ও অনুগৃহীত করিবেন। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অগ্রকটে আমরা আপনার আদেশ, উপদেশ ও মীমাংসা শিরোধার্য্য করিয়া লইব বলিয়া স্থির সঙ্কল্প হইয়া রহিয়াছি; তাহাতেই এই প্রশ্নের বিস্তৃত মীমাংসা (বিরুদ্ধ-বাদ খণ্ডনপূর্ব্বক) জানিবার জন্ম মহাশয়ের শরণাগত হইলাম। এইক্ষণ আপনার স্নেহ ও দয়ার উপর নির্ভর।”

শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে সংশয়

“শ্রীশ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে আমাদের দেশে দুই পক্ষের সম্পূর্ণ বিপরীত দুইটি মত ও বাগ্-বিতণ্ডা চলিতেছে। তাহাতে আমার স্থায় অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বড়ই বিপদ ঘটিয়াছে। কোন্ পথ সত্য, সূতরাং কোন্ পথ অবলম্বন করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ধর্ম্ম-গ্রন্থ ব্যাখ্যাকারগণের ভাবও কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এক এক জন এক এক প্রকার ব্যাখ্যা করিতেছেন। সূতরাং যাই কোথা? কাঁহার কথা বিশ্বাস করি?”

শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষ

কেহ বলেন—শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্। সূতরাং তাঁহাকে ভজন করিলেই বাঞ্ছিত কার্য্য সিদ্ধ হইবে। আবার কেহ বলিতেছেন—তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ ভাবিলে অপরাধ হইবে। শ্রীশ্রীভগবানের পার্শদ বা প্রিয়তম ভক্ত জ্ঞান করিয়া ভজন করিতে হইবে।

উভয় পক্ষই নিজ নিজ মত বজায় রাখিবার জন্ম শাস্ত্রোক্ত বহুতর শ্লোক প্রমাণ-স্বরূপ ব্যবহার করিতেছেন। আমি এপর্য্যন্ত শেষোক্ত মতই অবলম্বন করিয়া আছি। কিন্তু বিপক্ষের প্রতিবাদ খণ্ডাইতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইতেছি না।

উক্তবিষয় সম্বন্ধে মীমাংসার প্রার্থনা

এইক্ষণ মহোদয়ের নিকট নিতান্ত বিনয় ও কাকূতিভরে প্রার্থনা এই যে, এ-সম্বন্ধে আপনার বিশুদ্ধ মতটি (যাহা আমরা নিঃসন্দেহে শিরোধার্য্য করিয়া লইব) বিস্তৃত মীমাংসা-সহ শাস্ত্রীয় প্রমাণ-বাক্যের সাহায্যে জানাইলে পরমোপকৃত হইব। তর্ক করিয়া বিরুদ্ধবাদীকে বুঝাইবার জন্মই শাস্ত্রীয় প্রমাণের প্রার্থী

হইলাম। শ্রীগ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তদ্বারা বিরুদ্ধবাদ খণ্ডাইয়া কাহাকেও কিছু প্রবোধ দিতে পারি না।

সুতরাং, এইবার আর ঐরূপ গ্রন্থ দেখিবার আদেশ না দিয়া একটু বিস্তৃত করিয়া বুঝাইয়া দিলে অনেকগুলি মূর্খ ও সন্দিক্ত ব্যক্তির অপার উপকার করা হইবে।

এপত্রের উত্তর প্রাপ্তির প্রত্যাশায় এস্থানের অনেক লোকই বিশেষরূপে উৎকণ্ঠিত হইয়া পথ-পানে চাহিয়া রহিল। অতএব কৃপা পাইতে যেন বিলম্ব না হয়, ইহা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা।”

(শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত) সন্দুভন ৪—

অদ্বৈতবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানীর মত অশুদ্ধ

শাস্ত্রসকল তিন ভাগে বিভক্ত। কৰ্মবিচার, জ্ঞানবিচার ও ভক্তিবিশ্বাসে শাস্ত্রার্থ বিভিন্নভাবে গৃহীত হয়। যাহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত অণু জীবাদির স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান বা অনুভূতি স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর অবস্থিতি নাই। এই নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বস্তু-মাত্রকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম হইতে গুরু পৃথক নন। ইহারা উপাসনা বা ভক্তিমার্গ স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু, ভক্তিমার্গ, শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুরুত্বসহ ষট্‌তত্ত্বাত্মক

শ্রীমহাপ্রভুর মতে, তত্ত্ব, অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত অর্থাৎ ষাটতীয় বস্তু যুগপৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মই অবস্থিত। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, কিন্তু শক্তিগত পার্থক্যে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয়ে পরস্পর পৃথগ্ ধর্মবিশিষ্ট। মায়াবাদী জ্ঞানিগণ তত্ত্ববিষয়ে যে ধারণা করেন, তাহাকে নির্বিশেষ জ্ঞান বলে। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশিত তত্ত্বজ্ঞান সর্বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক বস্তু হইয়া ছয়টী ভিন্ন তত্ত্বে প্রকাশমান। ১। গুরু-তত্ত্ব ২। শ্রীবাসাদি ভক্ত-তত্ত্ব ৩। অংশাবতার অদ্বৈত-তত্ত্ব ৪। স্বরূপ-প্রকাশ নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ৫। গদাধরাদি নিজ শক্তি-তত্ত্ব ৬। স্বয়ং ভগবৎ-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই ছয় তত্ত্বই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাহা হইলে গুরুতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে ছয় তত্ত্বই ভগবান, কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, অদ্বৈত অংশাবতার, নিত্যানন্দ প্রকাশ-স্বরূপ এবং গুরুদেব—এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত অভেদ হইলেও এই পাঁচ তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথগ্ দাস।

শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রকাশ, প্রিয়তম ভক্ত, স্মৃতরাং তদপেক্ষা বড়
 শ্রীগুরুদেব চৈতন্যদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ, ভগবানই
 গুরুদেব। গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রকাশ হইলেও তিনি কৃষ্ণচৈতন্যের
 প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুদেব মর্ত্য নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে
 দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয় বস্তু। তিনি ভক্ত, স্মৃতরাং কৃষ্ণ
 হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্বতা করা হয়।

“কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য-আশ্বাদন।”

“কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্ত পদ।”

“ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে।

সেই ভাবে অমুগত তাঁর অংশগণে॥”

“নানা-ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য পান।”

“আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান॥”

“সেই অভিমান-স্থখে আপনা পাশরে।”

“কৃষ্ণদাস-অভিমাণে যে আনন্দসিন্ধু।

কোটা ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু॥”

“মুই যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।

দাস ভাব সম নহে অগ্রত আনন্দ॥”

“সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য-ঈশ্বর।

অতএব আর সব,—তাঁহার কিঙ্কর॥” (শ্রীচরিতামৃত)

এই সকল পণ্ড, কৃষ্ণ এবং গুরুদেব সম্বন্ধেও আলোচনা করিবেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরুত্ব বিচার

ভক্ত, কৃষ্ণ ও গুরুদেব কেবল অভিন্ন হইলে ভক্তিমার্গের অস্তিত্ব থাকে না
 উহা নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান-মার্গ হইয়া যায়। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ও শ্রীমন্ন্যাস-
 প্রভু গুরুদেবকে মর্ত্য বুদ্ধি করেন নাই কিন্তু ভগবদ্বুদ্ধি করিলেও তাঁহাকে
 ভগবানের সেবক ভক্ত জানিয়াছেন। কস্মী, জ্ঞানী ও ভক্তগণ সকলেই
 গুরুদেবকে ভগবদৃষ্টি করিয়া থাকেন। কেহই প্রাকৃত দৃষ্টি করেন না। কিন্তু
 শুদ্ধ ভক্তগণ গুরু ও ভগবানে অভেদ দৃষ্টি করিলেও গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম
 জানেন। শ্রীকৃষ্ণাচাৰ্য্য প্রবর শ্রীজীব গোস্বামী অজ্ঞাতরুচি বৈধমাগীয়
 ভক্তগণের মঙ্গলের জন্ত উক্তিসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ
 শ্রীশিবস্ত চ ভগবত। সহ অভেদ দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মনুষ্যন্তে।” অর্থাৎ শুদ্ধ

ভক্তগণ শ্রীগুরুর এবং শ্রীশিবের সহিত ভগবানের অভেদ-দৃষ্টব্যাপারকে ভগবানের প্রিয়তমত্ব বলিয়া মনে করেন। প্রমাণ-স্বরূপ আমাদিগের আচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে, শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের প্রিয়তম জানিবার, পরিস্কার প্রমাণ দিয়াছেন। তাহা এই—

বয়স্ত সাক্ষাদভগবন্ ভবস্ত, প্রিয়স্ত সখ্যঃ ক্ষণসঙ্গমেন।

মুহুর্চিকিংশস্ত ভবস্ত মৃত্যোভিষকৃতমং আত্মগতিং গতাঃ স্ব ॥

(ভাঃ ৪।৩০।৩৮)

তব যঃ প্রিয়ঃ সখা তস্ত ভবস্ত। অত্যন্তমচিকিংশস্ত ভবস্ত জন্মনো মৃত্যোশ্চ ভিষকৃতমং সর্বেদ্যং স্বাং গতিং প্রাপ্তা ইত্যোষা। শ্রীশিবো হ্যেবাং বক্তৃণাং গুরুঃ। শ্রীপ্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজং পুরুষম্ ॥ (ভক্তিসন্দর্ভ—২।১৩)

প্রাচীনবহিতনয় প্রচেতাগণ শ্রীশিবের শিষ্য। প্রচেতাগণ রুদ্রগীত দ্বারা ভগবান্ অষ্টভুজকে আবির্ভাব করাইয়া যে স্তব করেন তাহার মধ্যে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়। প্রচেতাগণ বলিলেন “হে ভগবন্ আমরা আপনার প্রিয় সখা, শিবের অল্পকাল সঙ্গপ্রভাবে অত্যন্ত চুশ্চিকিংশ জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারের ভিষক্শ্রেষ্ঠ আত্মগতি তোমাকে লাভ করিয়াছি। এই শ্লোকে প্রচেতাগণ তাহাদের গুরুদেব শিবকে কৃষ্ণের প্রিয় সখা বলিয়া নির্দারণ করিয়াছেন।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর বিচার

আচার্য্যের শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীকৃপানুগ জনের রাগানুগ মাগীয় প্রধান আচার্য্য। তিনি বলেন—

ন ধর্ম্যং নাধর্ম্যং প্রতিগগনিকৃতং কিল কুরু

ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।

শচীসুহৃৎ নদীশ্বর-পতিস্তুতত্তে গুরুবরং

মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্তে স্বর পরমজশ্রং ননু মনঃ ॥

(মনঃশিক্ষা ২য় শ্লোক)

অর্থাৎ হে মন, তুমি বেদাদিষ্ট ধর্মসমূহ বা বেদনিষিদ্ধ অধর্মাদি কিছুই করিও না, ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যার এখানেই সাধন কর। শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দন জানিবে; গুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রিয়তম সর্বদা জানিয়া স্মরণ করিবে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

যद्यপি আমার গুরু চৈতন্তের দাস।

তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ ॥ (চৈঃ চঃ ১।১।৪৪)

এস্থানে শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্য না হইলেও চৈতন্যদেবের প্রকাশ। শুদ্ধভক্ত জগতের গুরু চৈতন্যদেবের প্রকাশ, নিত্যানন্দ প্রভু বিষ্ণুতত্ত্বের মূলবস্তু হইলেও দশ দেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ সেবা করেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনার মধ্যে লিখিয়াছেন—

“স্ববর্ণের ঝারি করি, রাধা কুণ্ডে জল পুরি,

দৌহাকার অগ্রেতে রাখিব।

গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,

চামরের বাতাস করিব ॥”

হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,

দৃঢ় করি ধর নিতাই পায়।

সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা গেল জন্ম তার,

সেই পশু বড় ছুরাচার ॥

(প্রার্থনা—১১৩)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের শিক্ষা

শ্রীপাদ চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—

“সাক্ষাৎকরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রে—

রক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।

কিস্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্ম

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥ (গুরুষ্টক—৭)

অর্থাৎ যদিও সকল শাস্ত্রে গুরুদেব ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং তাহাই বৈষ্ণবগণ কর্তৃক বিবেচিত হইবে, তথাপি শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও ভগবানের প্রিয়, কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর শিক্ষা

শ্রীগৌর পার্শদ বক্রেস্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপাল গুরু, তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী শুদ্ধ ভক্তের পরমাদৃত স্বীয় পদ্ধতি গ্রন্থে লিখিয়াছেন—“শ্রীমহাপ্রভু-শেষ-নির্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্শদান্ পূজয়েৎ তথৈব তদ্ভক্তান্ শ্রীগুরুদীন্ ভক্তিতঃ।” অর্থাৎ শ্রীগৌরনির্মাল্য দ্বারা শ্রীবাসাদি পার্শদ ভক্তগণের পূজা করিবে। সেই প্রকার গৌর প্রসাদ দ্বারা শ্রীগুরুদেবপ্রমুখ ভক্তগণের ভক্তিসহ-কারে পূজা করিবে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশ

শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু ।

গুরু, কৃষ্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ-প্রেম, নিত্য-প্রভু ॥

গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত ; শুদ্ধ বৈষ্ণবের মত নহে । সাধক-ভক্তগণ এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন । মায়াবাদ সূচাক্ষরে সাধনমধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত সাধন দূষিত করিবে ।”

(শ্রীল প্রভুপাদের) নিজ উপদেশ

এসম্বন্ধে পত্রান্তরে ১৩১০ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ এখানে উদ্ধৃত হইল ।

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত শ্রীবৈষ্ণবসন্দর্ভ নামধেয় মাসিক পত্রের দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা পাইয়াছি । এই পত্র সম্বন্ধে কোন স্থলে বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছে—“ইহা পূর্বাচার্য্য গোস্বামিগণের অপ্রকাশিত অভিনব মাসিক সন্দর্ভ ।” অত্রস্থ অদৃষ্টচর নবীন মত একটি আমাদের অজ্ঞকার আলোচ্য বিষয় । কতিপয় শুদ্ধ বৈষ্ণব ব্যাখিত হইয়া আমাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রীগুরুনিষ্ঠা (১) প্রবন্ধের চরম মীমাংসা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন । তাহা বাস্তবিকই পূর্বাচার্য্য গোস্বামিগণ জানিতেন না । তাহা এই—“সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ শচীনন্দন কি শিখাইলেন ? শিখাইলেন শ্রীগুরুই ঈশ্বর পরম স্বতন্ত্র বস্তু ।” কিন্তু কার্য্যার্থ্য্য মহাশয়ের আশ্বাসবাণী নিফল হইল দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম । ভক্তি-বিরোধী মন্ত্রজীবীগণের বাগাড়ম্বরে পরমার্থ ভ্রষ্ট হইয়া অনেকে বঞ্চিত হন, ইহা চিন্তা করিলেও আমাদের দুঃখ হয় ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শিখাইয়াছেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ভ্রাসী, শূদ্র কেনে নয় ।

যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥ (চৈঃ চঃ ২।৮।১২৭)

সুতরাং বস্তুতঃ ঈশ্বর না হইয়াও ঈশ্বরাদ্যগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ হইলে গুরু হন, জানা গেল ।

পারমার্থিক গুরু তিন প্রকার

পারমার্থিক শাস্ত্রে লিখিত আছে শ্রীগুরু তিন প্রকার । শ্রবণগুরু, ভজন-শিক্ষাগুরু এবং মন্ত্রগুরু । বস্তুপ্রদর্শক গুরু বা শ্রবণগুরু অনেক স্থলে ভজনশিক্ষা-গুরু একই ব্যক্তি হন । শিক্ষাগুরু অনেক হইলেও আগম মন্ত্রশাস্ত্রকুশল গুরুর

নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। মন্ত্রগুরু যদি অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগপূর্বক ভগবন্তগুরুর চরণাশ্রয় কর্তব্য। শ্রীগুরুদেবকে অতীষ্ট দেবতার হ্রায় ভক্তি করিবেন। তত্ত্ববাগিনী মায়াবাগিনীর হ্রায় চিত্তস্থিতে বিশেষ নাই, স্বীকার করেন না। শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু ভক্তি-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—

“তস্মিংশ্চিন্মাত্রাহপি বস্তুনি যা বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তিসিদ্ধা ভগবত্তাদিরূপা বর্তন্তে তাংস্তে বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে যথা রজনী খণ্ডিনি জ্যোতিষি জ্যোতির্মাত্র-হেপি যে মণ্ডলাস্তর্কহিষ্ট দিব্যবিমানাদি-পরম্পরপৃথগ্ ভূতরশ্মিপরাগুরুপা বিশেষাত্মাংশ্চক্ষুযী ন ক্ষমন্তে ইত্যম্বয়স্তদং। পূর্ববচন যদি মহৎকৃপা-বিশেষণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি তদা বিশেষোপলব্ধিঃ ভবেৎ।” শ্রীগুরুদেবকে মায়াবাদ-বুদ্ধিতে দর্শন করিলে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু বাস্তবিক (গুরুকৃপা) মহৎকৃপা বিশেষদ্বারা দিব্যদৃষ্টিলাভ হইলে ঈশ্বর বস্তুতে বিশেষ ধর্ম উপলব্ধি হয়। তখন ‘বন্দে গুরুন’ প্রভৃতি শ্লোকদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আনুগত্যভিলাষে রুচি হয়।

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয় ভক্তাবতার প্রকাশ।

শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৩২)

এই মহাবাক্য হইতে জানা যায় যে শক্তিগত ভেদ নিত্য। তাহা ভাষা বিকাশকৌশলে চাপিয়া রাখিলে চলিবে না। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভু গুরুতত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার মানসে লিখিয়াছেন—

যতপি আমার গুরু—চৈত্যান্তর দাস।

তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪)

সুতরাং মূঢ় এবং নিপুণ উভয় পাঠকই সহজে বুঝিতে পারেন যে, বস্তুতঃ শ্রীগুরু ঈশ্বর নহেন কিন্তু শ্রীভগবদ্দাস। তাঁহার সহিত প্রাকৃত ব্যবহার করিলে কৃষ্ণপ্রসাদ কোন কালেই লাভ হইবে না। অপ্রাকৃত নিত্যরূপে গুরুদেবকে সর্বদা চিন্ময় বুদ্ধি করিবে।

ত্যাগ্য গুরুর পরিচয়

গুরুকে চৈতন্য, অর্থলোভী, ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছাবান্, ঘোষিতসঙ্গী, কৃষ্ণভক্ত, কপটী, জীব-হিংসাপর লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাসেবী, মন্ত্রজীবী, অবৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারিলে তাহার আশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে না। সেই অযোগ্য কপটীকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতঃ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্য অমর্ত্য অপ্রাকৃত গুরুাশ্রয়

অবশ্য কর্তব্য। চতুর্দশভুবনবন্দ্য শ্রীভগবৎপার্ষদবর আচার্য্য শ্রীমৎ প্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুগ বর্তমান এবং ভাবী মহামহোদয় বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য। তিনি, স্বরূপদামোদর এবং শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুদ্বয়ের অনুগমনে যে গুরুদেবের তত্ত্ব মনঃশিক্ষা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কাল্পনিক গগনভেদী চীৎকার কখনই সফল উৎপন্ন করিবে না। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দের প্রেষ্ঠ, পরম প্রিয়; স্নতরাং মুকুন্দ নহেন।

আচার্য্যবর্গের মতের পুনরালোচনা

শ্রীল প্রভু নরোত্তম দাস তদীয় প্রার্থনায় ‘নিতাই-পদকমল’ প্রভৃতি গীতে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া শিখাইয়াছেন, তাহাতে তাত্ত্বিক বৈষ্ণবমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে গুরুদেব সন্ধিনী, হলাদিনী বা সঙ্ঘি শক্তিমূলে নিত্য বিরাজমান, কেবল সঙ্ঘি-শক্তি পরিচয় তাঁহার স্বন্ধে চাপাইতে গেলে মায়াবাদী বা বাউল সহজিয়া মত হইয়া যাইবে। যতীন্দ্র শ্রীমদ্যানচন্দ্র গোস্বামিপাদ বিশুদ্ধ মহানুভব বৈষ্ণবগণের ব্যবহার হইতে তদীয় পদ্ধতিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজে এই গ্রন্থের বিশেষ আদর আছে। যথা—

“শ্রীমহাপ্রভু-শেষ-নির্ম্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্ষদান্ পূজয়েৎ। তথৈব তদ্বক্তান্ শ্রীগুর্বাদীন্ ভক্তিতঃ।” এই সকল আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে স্বার্থান্ধ হইয়া শ্রীগুরু সম্বন্ধে নবীন মত প্রচার করিলে একটি উপসম্প্রদায়ের নিজীব ভিত্তি স্থাপন হইবে মাত্র। এই প্রকার উপসম্প্রদায়ের অভাব নাই। অবশেষে শ্রীগুরুদেব এই স্বার্থান্ধগণকে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগোদ্রমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ

(শ্রীশ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-কৃতঃ)

তোটকছন্দঃ

যদি তে হরিপাদসরোজসুখা

ধন-যৌবন-জীবন-রাজ্যসুখং

রসপানপরং হৃদয়ং সততম্।

নহি নিত্যমনুক্ষণ-নাশপরম্।

পরিহৃত্য গৃহং কলিভাবময়ং

তাজ গ্রাম্যকথা সকলং বিফলং

ভজ গোদ্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ১ ॥

ভজ গোদ্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ২ ॥

রমণীজনসঙ্গসুখঞ্চ সখে
চরমে ভয়দং পুরুষার্থহরম্ ।
হরিনামসুধারস-মত্তমতি-
ভজ গোদ্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ৩ ॥

জড়কাব্যরসো নহি কাব্যরসঃ
কলিপাবন-গৌররসো হি রসঃ ।
অলম্ভকথাগুণশীলনয়া
ভজ গোদ্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ৪ ॥

বৃষভানুসুতাস্থিতবামতনুঃ
যমুনাতট-নাগর-নন্দসুতম্ ।
মুরলীকলগীতবিনোদপরং
ভজ গোদ্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ৫ ॥

হরিকীৰ্ত্তনমধ্যগতং স্বজনৈঃ
পরিবেষ্টিত-জাম্বুনদাভহরম্ ।
নিজ গৌড়জনৈককুপাজলধিঃ
ভজ গোদ্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ৬ ॥

গিরিরাজসুতাপরিবীত-গৃহং
নবখণ্ডপতিং যতিচিন্তহরম্ ।
সুরসজ্জ্বলুতং প্রিয়য়া সহিতং
ভজ গোদ্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ৭ ॥

কলিকুঙ্করমুদগর ভাবধরং
হরিনামমহৌষধ-দানপরম্ ।
পতিতার্ভ-দয়াদ্র-সুমুত্তিধরং
ভজ গোদ্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ৮ ॥

রিপুবান্ধবভেদবিহীনদয়া
যদভীক্ষমুদেতি মুখাজততো ।
তমকৃষ্ণমিহ ব্রজরাজসুতং
ভজ গোদ্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ৯ ॥

ইহ চোপনিষৎ-পরিগীতবিভূ-
দ্বিজরাজসুতঃ পুরটান্ড-হরিঃ ।
নিজধামনি খেলতি বন্ধুযুতো
ভজ গোদ্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ১০ ॥

অবতারবরং পরিপূর্ণকলং
পরতত্ত্বমিহাশ্রবীলাসময়ম্ ।
ব্রজধামরসাসুধি-গুপ্তরসং
ভজ গোদ্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ১১ ॥

শ্রুতিবর্ণধনাদি ন যস্য কৃপা-
জননে বলবৎ ভজনেন বিনা ।
তমহৈতুকভাবপথা হি সখে
ভজ গোদ্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ১২ ॥

অপি নক্রগতো হৃদমধ্যগতং
কমমোচয়দার্তজনং তমজম্ ।
অবিচিন্ত্যবলং শিবকল্পতরুং
ভজ গোদ্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৩ ॥

সুরভীন্দ্রতপঃপরিভুষ্টমনো
বরবর্ণধরো হরিরাবিরভূৎ ।
তমজস্রসুখং মুনিধৈর্যাহরং
ভজ গোদ্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৪ ॥

অভিলাষচয়ং তদভেদধিয়-	বদ যামুনতীরবনাদ্রিপতে
মণ্ডভঞ্চ শুভং ত্যজ সর্বমিদম্ ।	বদ গোকুলকানন-পুঞ্জরবে ।
অনুকূলতয়া প্রিয়সেবনয়া	বদ রাসরসায়ন গৌরহরে
ভজ গোক্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৫ ॥	ভজ গোক্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৮ ॥
হরিসেবকসেবন-ধর্মপরো	চল গৌরবনং নবখণ্ডময়ং
হরিনামরসামৃত-পানরতঃ ।	পঠ গৌরহরেশ্চরিতানি মুদা ।
নতি-দৈন্ত-দয়া-পরমানযুতো	লুঠ গৌরপদাক্ষিতগাঙ্গতটং
ভজ গোক্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৬ ॥	ভজ গোক্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৯ ॥
বদ যাদব মাধব কৃষ্ণ হরে	স্মর গৌর-গদাধর-কেলিকলাং
বদ রাম জনার্দন কেশব হে ।	ভব গৌর-গদাধর-পক্ষচরঃ ।
বৃষভানুসুতাপ্রিয়নাথ সদা	শৃণু গৌর-গদাধর-চারুকথাং
ভজ গোক্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৭ ॥	ভজ গোক্রমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥ ২০ ॥*

শ্রীশ্রীগোক্রমচন্দ্রভজনোপদেশের অনুবাদ

১। যদি তোমার চিত্ত নিরন্তর হরিপাদপদ্মবিনিঃসৃত সুধারস-পানে তৎপর হইয়া থাকে, তবে কলিভাবময় গৃহ (সংসারাসক্তি) পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোক্রম-কাননকুঞ্জবিধুর (গোক্রমস্থ স্বানন্দসুখদকুঞ্জের চন্দ্রস্বরূপ অর্থাৎ কুঞ্জবিহারীর) ভজন কর।

২। ধন, যৌবন, জীবন, রাজ্যসুখ—এই সব নিত্য নয়; প্রতি মুহূর্তে বিনাশশীল। বৃথা গ্রাম্যকথা সকল ত্যাগ কর, শ্রীগোক্রমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

৩। হে সখে! রমণীজন-সঙ্গসুখ পুরুষার্থবিনাশকর ও চরমে ভয়দ। স্তবরাং তাহা পরিত্যাগ করত হরিনামামৃতরসপানে মত্ত হইয়া শ্রীগোক্রমকানন-কুঞ্জবিধুর ভজন কর।

*আমরা পূর্ববর্তী ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ২৩৬ পৃষ্ঠায় আপনাদিগকে জানাইয়াছি যে, সহকারী সম্পাদক সঙ্ঘপতি এই সংস্কৃত গীতিটী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ দিবসে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং ইহা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছিল, তদনুসারে এই সংখ্যায় ইহা মুদ্রিত হইল। —[প্রকাশক]

৪। জড় কাব্যরস প্রকৃত কাব্যরস নহে। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌর-সুন্দরের লীলারসই প্রকৃত রস। সুতরাং কৃষ্ণেতর কথার অনুশীলন ছাড়িয়া শ্রীগোক্রমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

৫। বামে শ্রীবৃষভানুসুতায়ুত, যমুনাতটনাগর, মুরলী-কল-গীতবিনোদপর, নন্দসুত শ্রীগোক্রমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

৬। হরিকীর্তন মধ্যগত, স্বপাৰ্শদগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত, নিজানুগত গোড়-জনমাত্রপ্রতি রূপার সমুদ্র কনকসদৃশ, কান্তিবিশিষ্ট যে হরি, সেই শ্রীগোক্রম-কাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

৭। ষাঁহার ভবন গিরিরাজসুতা গঙ্গাকর্তৃক পরিব্যাপ্ত, যিনি নবসংখ্যক দ্বীপের অধিপতি, যতিগণের চিত্তহারী, দেবগণের দ্বারা পূজিত, প্রিয়ার সহিত সেই শ্রীগোক্রমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

৮। কলিকুব্জের বিনাশের জন্ত মুদারসদৃশ হরিনামৌষধি-দানতংপর, পতিত ও আতঁের প্রতি দয়ার্দ্ৰ শোভনীয়-বিগ্রহ শ্রীগোক্রমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

৯। ষাঁহার শ্রীমুখাজ শক্রমিত্র সকলের প্রতি নিরন্তর সমানভাবে দয়া প্রকাশ করিতেছে, যিনি (ইহ) কলিযুগে অক্লম্ব অর্থাৎ গৌরাঙ্গ সেই ব্রজরাজসুত শ্রীগোক্রমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

১০। দ্বিজরাজসুত, শতপুটিত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জলবর্ণ যে হরি উপনিষৎ কর্তৃক (ইহ) কলিযুগে অবতার বলিয়া পরিগীত, যিনি স্বপাৰ্শদগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নিজধামে (নবখণ্ডাত্মক দ্বীপে) নিত্য ক্রীড়া করেন, সেই শ্রীগোক্রমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

১১। যিনি অবতারী, ষোলকলায় পরিপূর্ণ অথবা যাবতীয় অংশাবতারগণকে ক্রোড়ীভূত করিয়া অবতীর্ণ পরতন্ত্র, আত্মারাম ও ব্রজধাম রসসমুদ্রের গুপ্তরস, সেই শ্রীগোক্রমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১২। ভজন ব্যতীত জন্মৈশ্বর্য-শ্রুত-শ্রী প্রভৃতির দ্বারা ষাঁহার রূপা পাওয়া যায় না, হে সখে! অহৈতুকভাবে সেই শ্রীগোক্রমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১৩। *যিনি নক্ৰশরীরপ্রাপ্ত হৃদমধ্যগত আতঁজনকে অনায়াসে মোচন করিয়াছিলেন, সেই অবিচিন্ত্য-শক্তিমান, প্রেমকল্পতরু, অজ শ্রীগোক্রমকাননকুঞ্জ-বিধুকে ভজন কর।

*শ্রীমন্নহাপ্রভু একদা গোক্রমদ্বীপে গৌরাদেহে উপনীত হন। কোন ঋষির অভিষাপবশতঃ নক্ৰশরীরপ্রাপ্ত এক দেবশিশু শ্রীগৌরহরির পাদম্পর্শে শাপমুক্ত হন। —(প্রেমবিবর্ত)

১৪। স্বরভী ও ইন্দ্রের তপস্বাদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া যে উজ্জ্বলাঙ্গ হরি প্রকট হইয়াছিলেন, সেই অজস্রসুখসাগর, মুনিধৈর্য্যহারী শ্রীগোক্রমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১৫। ('আমি ব্রহ্ম' এই) অভেদবুদ্ধি, অত্যাভিলাষচয় ও শুভাশুভ (কর্ম) সকল ত্যাগ করিয়া অতুলভাবে প্রীতির সহিত শ্রীগোক্রমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১৬। হরিসেবক-সেবাপরায়ণ, হরিনামামৃতপানরত, এবং নতি-দৈন্ত-দয়া-যুক্ত ও মানদ হইয়া শ্রীগোক্রমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১৭। হে যাদব! হে মাধব! হে কৃষ্ণ! হে হরে! হে রাম! হে জনার্দন! হে কেশব! হে বৃষভাসুপ্রিয়নাথ! —এইরূপ সর্বক্ষণ বলিয়া শ্রীগোক্রমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১৮। হে যমুনাতীরবনাদ্রিপতি! হে গোকুলকানন কুঞ্জরবি! হে রাস-রসায়ন গৌরহরি! —এইরূপ সর্বক্ষণ বলিয়া শ্রীগোক্রমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১৯। নবখণ্ডময় গৌরবনে বিচরণ, গৌরহরির লীলাকথা আনন্দের সহিত পাঠ, গৌরপদাঙ্কিত গঙ্গাতীরে শরীরকে লুপ্তিত করিয়া শ্রীগোক্রমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

২০। গৌরগদাধরকেলিকলা স্মরণ, গৌরগদাধরের পক্ষপাতিত্ব গ্রহণ, ও গৌরগদাধরের চারু-কথা শ্রবণ-মুখে শ্রীগোক্রমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

শ্রীশ্রীগোক্রম-কল্পাটবী*

প্রথম ক্রম

শ্রীশ্রীগোক্রমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনামহট্ট অর্থাৎ নামের হাট

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামে—(ধামের যে অংশে যখন বসে)

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণৈশ্চতুঃসবিগ্রহঃ ।

ভাণ্ডার :—বেদান্ত-পরিচিত ঔপনিষদ-রসস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত মহাশাস্ত্র ।

মূল মহাজন :—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ।

অংশী মহাজন :—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু (গৌড়ে) ; শ্রীরূপ, সনাতন (ব্রজে) ; শ্রীস্বরূপ, রামানন্দ (ক্ষেত্রে) ।

ভাণ্ডারী :—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী, শ্রীমতী জাহ্নবা ঠাকুরাণী (গৌড়ে) ; শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী (ব্রজে); শ্রীপরমানন্দ পুরী (ক্ষেত্রে) ।

প্রতিহারী:—শ্রীবংশীবদনানন্দ, শ্রীবিশ্ব রামানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীদামোদর পণ্ডিত, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীজগদীশ, শ্রীহিরণ্য পণ্ডিত (গৌড়ে) ; শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীরাঘব পণ্ডিত (ব্রজে); শ্রীহরিদাস ঠাকুর (ক্ষেত্রে) ।

কোষাধ্যক্ষ :—শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত ও তদভ্রাতাগণ, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন (গৌড়ে); শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী (ব্রজে); শ্রীরাভা প্রতাপরুদ্রদেব (ক্ষেত্রে) ।

লেখক ও গণক :—শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর (গৌড়ে); শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী (ব্রজে); শ্রীবাণীনাথ পট্টনায়ক (ক্ষেত্রে) ।

পোষ্টবর্গ :—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি, শ্রীমতী শচীমাতা ঠাকুরাণী, শ্রীমতী নীতাদেবী, শ্রীমতী মালিনী দেবী, (গৌড়ে); শ্রীমতী সার্কভৌম-পত্নী (ক্ষেত্রে); সানোড়িয়া বিপ্র (ব্রজে) ।

*শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত এই প্রবন্ধ-পঞ্চক, এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক মহারাজ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-বাসরে তাঁহার বক্তৃতার অন্তে পাঠ করিয়াছিলেন । আমরা ইহা শ্রীল প্রভুপাদের মূল ইঙ্গিত জানিয়া সর্বসাধারণে প্রচারার্থ মুদ্রিত করিলাম । —[প্রকাশক]

মুদ্রা-পরীক্ষক বা পোদ্ধার :— শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীঅভিরাম গোস্বামী, শ্রীকবিকর্ণপুর (গৌড়ে) ; শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীবলদেব বিদ্যভূষণ (ব্রজে) ; শ্রীপ্রহ্ম্য মিশ্র (ক্ষেত্রে) ।

দালাল বা যোজক :—শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীকেশব ভারতী, শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি (গৌড়ে) ; শ্রীভূগভ গোস্বামী (ব্রজে) ; শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী (ক্ষেত্রে) ।

পরিমাতা বা কয়াল :—শ্রীমুরারী গুপ্ত, শ্রীবসু রামানন্দ (গৌড়ে) ; শ্রীকবিরাজ গোস্বামী (ব্রজে) ; শ্রীকাশী মিশ্র (ক্ষেত্রে) ।

পরিচারক :—শ্রীবুদ্ধিমন্ত খাঁ, শ্রীবিজয়দাস রত্নবাহু, শ্রীবনমালী পণ্ডিত, শ্রীগুরু পণ্ডিত, শ্রীসিংহানন্দ, শ্রীরামাই পণ্ডিত ইত্যাদি (গৌড়ে) ; শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য (ব্রজে) ; শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত (ক্ষেত্রে) ।

বাহক :—শ্রীসঞ্জয়, শ্রীশুক্রাশ্বর, খোলাবেচা শ্রীধর, শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রহ্ম্য ব্রহ্মচারী (গৌড়ে) ।

শাকটিক বাহক :—শ্রীবাসুদেব দত্ত, শ্রীবাসু ঘোষ, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীগোপীনাথ সিংহ (গৌড়ে) ।

ক্রেতা বা খরিদ্দার :— শ্রীসার্কভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগাই-মাধাই, শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ ।

পণ্যদ্রব্য :—১। নাম, ২। রূপযুক্ত নাম, ৩। গুণযুক্ত নাম, ৪। লীলাযুক্ত নাম, ৫। রসিত নাম, ৬। সর্করসসিক্ত নাম। নাম—ইক্ষুরস, রূপযুক্ত নাম—গুড়, গুণযুক্ত নাম—খণ্ডসার, লীলাযুক্ত নাম—শর্কর, রসিত নাম—অসিত মিশ্রি, সর্করসসিক্ত নাম—উত্তম মিশ্রি ।

অর্থ বা মূল্যের নিয়ম :—এই ব্যাপারে প্রাকৃত পয়সা, সিকি, আধুলি, টাকা, মোহর চলে না। অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা প্রভৃতি মুদ্রা চলে। যিনি প্রাকৃত অর্থ দিয়া বা লইয়া এই দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার বিষম ভ্রম। তাঁহার পক্ষে এ ব্যাপারে প্রবেশ করা উচিত নয়।

অপ্রাকৃত মুদ্রা নিরূপণ ৪—

১। শ্রদ্ধা (পয়সা), তাহাতে নাম পাওয়া যায়।

২। নিষ্ঠা (দুয়ানি অর্থাৎ রজত মুদ্রার অষ্টমাংশ), তাহাতে রূপযুক্ত নাম পাওয়া যায়।

৩। রুচি (সিকি অর্থাৎ রজত মুদ্রার চতুর্থাংশ), তাহাতে রূপ ও গুণযুক্ত নাম পাওয়া যায়।

৪। আসক্তি (আধুলি অর্থাৎ রক্তত মূদ্রার অর্দ্ধাংশ), তাহাতে রূপ, গুণ ও নীলাযুক্ত নাম পাওয়া যায়।

৫। ভাব বা রতি (টাকা অর্থাৎ রক্তত-মূদ্রা), তাহাতে রসিত নাম পাওয়া যায়।

৬। প্রেম (স্বর্ণমূদ্রা বা মোহর), তাহাতে সর্করসসিক্ত নাম পাওয়া যায়। যিনি যেমন মূল্য দিবেন, তিনি সেইরূপ দ্রব্য পাইবেন। ইহাতে রহস্য এই যে, খরিদদার যে মূল্য দিয়া নাম লইবেন, মহাজনের কৃপায় সেই মূল্যও তাঁহার নিকটে নাম-সংখ্যায় গুণিত হইয়া ফেরৎ আসিবে।

এই মহা-হাটের শাখা ত্রিনিশা ৪—

১। পণ্যবীথিকা বা বাজার, ২। বিপণি বা দোকান, ৩। ব্রাজক বিপণী বা পসারী।

পণ্যবীথিকা বা বাজার :—বাজারের আকার হাটের অনুরূপ। শ্রীপাট খড়দহ, শান্তিপুর, বাঘনাপাড়া, মালপাড়া, বিষ্ণুপুর, জাজিগ্রাম, খেতুর, গোপীবল্লভপুর প্রভৃতি স্থানে বাজার আছে। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, ৬৪ মহাস্ত ৬৪ বাজার বসাইয়াছেন।

বিপণি বা দোকান :—এক এক জন করিয়া বা বিপণি-পতি যে-স্থানে বসিয়া দ্রব্য বিক্রয় করেন, সেই স্থান দোকান। দোকান দুই প্রকার যথা :—

১। মহাজনের নিকট ধারে জিনিষ লইয়া বিক্রয় করেন, পরে মূল্য বুঝাইয়া দিয়া নিজের লাভ প্রাপ্ত হন।

২। আপনার অর্থ দিয়া মাল আনেন ও বিক্রয়ান্তে লাভ পান।

ব্রাজক বিপণী বা পসারী :—পসারীরা মহাজনের নিকট ধারে বা মূল্য দিয়া মাল লইয়া মাথায় করিয়া গ্রামে গ্রামে, পথে পথে বিক্রয় করেন। কোন নির্দিষ্ট স্থান রাখেন না। উহারা প্রায় নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

যোজক বা দালাল :—ঋহারা খরিদদারগণকে মহাজনের নিকট লইয়া গিয়া মাল খরিদ করাইয়া দেন, তাঁহারা দালাল।

ক্রেতা বা খরিদদার :—জগজ্ঞন। জগজ্ঞনের মধ্যে ঋহার অর্থ আছে, তিনি মাল খরিদ করিবেন। একটু রহস্য এই যে, মেকী অর্থ দিলে মাল স্বভাবতঃ মেকী হইয়া পড়ে। খরিদদারগণ শ্রীমহাজনের নিরূপিত চিহ্ন বা নিশান দেখিয়া মাল খরিদ করিলে বঞ্চকের হাতে পড়িবেন না। শ্রীগৌরান্দ-নামই শ্রীমহাজনের নিরূপিত চিহ্ন।

কৃত্রিম অর্থ বা মেকী টাকা :—অত্যাভিলাষ-শূন্য ও জ্ঞান-কর্মাদিদ্বারা অনাবৃত শ্রদ্ধাদির সহিত আলোচনার নামই অর্থ । যে-স্থলে আলোচনায় অত্যাভিলাষ বা জ্ঞান-কর্মাতির সম্মান থাকে, সেখানে অর্থ মেকী । মেকীর বিনিময়ে মেকী দ্রব্য অর্থাৎ নামাভাসই লভ্য হয় । মহাজনের মালসব অকৃত্রিম । অবস্থা ও পাত্র-ভেদে সেই অকৃত্রিম মালই নামাভাস-রূপ মেকী হইয়া পড়ে ।

শ্রীনাম হট্টের বিবরণ :—১। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের নাম-স্বরূপ মহা-হট্ট শ্রীনবদীপে উদয় হইয়াছে । এই হট্টের মূল শাখা শ্রীনবদীপে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মহাজনীর অধীন । দ্বিতীয় শাখা শ্রীব্রজধামে, শ্রীরূপ-সনাতনের অধীন । তৃতীয় শাখা শ্রীপুরুষোত্তমে, শ্রীস্বরূপ-রামানন্দের মহাজনীর অধীন ।

২। উক্ত হট্টত্রয়ের অধীন শ্রীবীরভদ্র প্রভু, সভ্যত শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীরাম-চন্দ্র ঠাকুর প্রভু নানাস্থানে বাজার বসাইয়াছেন ।

৩। ঐ সমস্ত হট্ট ও বাজারের অধীন গ্রামে-গ্রামে দেশে-দেশে ফড়িয়া বিক্রেতাদিগের দোকান ।

৪। ঐ সকল হট্ট, বাজার ও দোকান হইতে মাল লইয়া পসারিগণ নামের বাজরা মাথায় করিয়া গ্রামে-গ্রামে ফেরি করেন । এইরূপ হট্ট, বাজার, দোকান ও পসার সর্বত্র সর্বকাল চলিবে । যে-সময়ে যে-সকল শুদ্ধ বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা ঐ সকল ব্যাপার চালাইবেন ।

৫। শ্রীশ্রীমূল মহাজনের ইচ্ছায় সম্প্রতি শ্রীনবদীপের অন্তর্গত গোক্রম-ক্ষেত্রে শ্রীস্বরভিকুঞ্জে শ্রীমূল হাট অবস্থিত আছে, তত্রস্থ শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ঐ হাটের কার্য্য নির্বাহ করিতেছেন ; দেশ-বিদেশস্থ যে-সকল শুদ্ধবৈষ্ণব মহাশয়গণ নিজ নিজ প্রদেশে বিপণি-পতি বা ব্রাজক-বিপণী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রচারক বা সহরংকারী শ্রীযুত রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবৃদ্ধ মহাশয়কে স্বরভিকুঞ্জে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীমূলমহাজনের আজ্ঞা-পত্র-সহ পণ্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইবেন । তাঁহারা নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন ।

৬। বিশেষ দ্রষ্টব্য । —শ্রীমূলমহাজনের আজ্ঞা-পত্র-প্রাপ্ত পণ্য-বীথিকাপতি, বিপণি-পতি ও ব্রাজক-বিপণী মহোদয়গণ সর্বদা শ্রীমহাজনের নিরূপিত চিহ্ন অর্থাৎ শ্রীগৌরচন্দ্র নামের সহিত কৃষ্ণনাম-রূপ পণ্য-দ্রব্য খরিদদারকে দিবেন । ব্রাজক-বিপণী কোন গ্রামে উপস্থিত হইলে নিরূপিত চিহ্ন-সহ পতাকা উড়াইয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবেন । খরিদদারের প্রদত্ত মূল্যানুসারে তারতম্য বিচার-পূর্ব্বক

পণ্য দ্রব্য দিবেন। সতর্ক থাকুন যে, উপযুক্ত মূল্য না পাইয়া উপযুক্ত পণ্য দ্রব্য না দেওয়া হয়। তাহা দিলে পণ্যদ্রব্য স্বভাবতঃ মেকীর প্রায় হইয়া পড়িবে।

৭। যে যে মহাহুভব, বিপণি-পতি প্রভৃতি পদ প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করত তাঁহাদের কার্যের বিবরণ প্রতি-বৎসরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিনের পূর্বে শ্রীস্বরভিকুঞ্জে প্রেরণ করিবেন। তাঁহারা যে-যে স্থান পরিদর্শন করিবেন, বৎসরের মধ্যে যত দিবস মহাজনের কার্য্য করিবেন ও যে-যে শ্রদ্ধাবান্ পুরুষদিগকে নামের গ্রাহক করিবেন, সে-সকল স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

শ্রীশ্রীনাম-হট্টের পরিমার্জক বা ঝাড়ুদার
সুদীন অকিঞ্চন

দাস শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ
স্বরভিকুঞ্জ, গোক্রমদ্বীপ, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম
ডাকের ঠিকানা—শ্রীশ্রীস্বরভিকুঞ্জ
পোষ্টঅফিস—স্বরূপগঞ্জ, জিলা--নদীয়া

শ্রীশ্রীগোক্রম-কল্লাটবী

দ্বিতীয় ক্রম

শ্রীশ্রীগোক্রমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনামহট্ট অর্থাৎ নামের হাট

প্রথম ক্রমে শ্রীনামের হাটে যে-সকল কর্মচারীর নাম লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা সম্প্রতি অপ্রকট-লীলার অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন ভাগ্যবান্ রূপা-বলে ভক্তিভাবিত-চক্ষে সেই লীলা ও তদন্তর্গত হাট এখনও দেখিতে পান, যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে,—

অত্মাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।

কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥

সম্প্রতি সেই হাট নিম্নলিখিত কর্মচারিগণদ্বারা নির্বাহিত হইবে, এইরূপ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের আদশ।

১। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধি-স্বরূপ দশজন পঞ্চায়ৎ এখন প্রধান

কর্মচারী। ইহারা একত্রিত হইয়া যে-সকল আজ্ঞা প্রচার করিবেন, তাহাই প্রভুর আজ্ঞারূপে গৃহীত হইবে।

২। **কাড়দার**। ইনি হাট পরিষ্কার করিবেন। অন্ত্যন্ত কর্মচারীদিগের বৈঠক ও বিচারের ও কার্যের সাহায্য করিবেন।

৩। **সহরৎদার**। ইনি হাটের সমস্ত কথা পরস্পর জানাইবেন।

৪। **দণ্ডিদার**। ইহারা ভাণ্ডার হইতে মাল বাহির করিয়া মাপিয়া দিবেন।

৫। **চাবিদার**। ইহার হাতে ভাণ্ডারের চাবি থাকে। বিক্রয়ের জন্য চাবি খুলিবেন। দিনান্তে উঠাইয়া চাবি বন্ধ করিবেন।

৬। **মুটে**। পরিশ্রমের সহিত মাল বাহির করেন ও উঠাইয়া রাখেন। পাইকেড়ের শকটে বোঝাই করিয়া দেন। ইহারা অনেক।

৭। **চৌকিদার**। নামের হাটে ইহারা পাহারা দেন ও চোর ধরেন।

৮। **মোহরর**। মালের জমা খরচ লিখেন।

৯। **দারগা**। সমস্ত তদারক করেন।

১০। **পেয়াদা**। ধরপাকড়, উসুল-তহসিল করেন। ইহারা অনেক।

১১। **ফরাস**। ইহারা আলৌক দেন।

১২। **ঘাটিয়াল**। ইহারা ঘাটে-ঘাটে নজর রাখেন।

১৩। **দোকানদার**। মাল খুচরারূপে বিক্রয় করেন। প্রথম ক্রমে ইহাদিগকে বিপণিপতি বলা হইয়াছে। ইহাদের দোকান হাটে-বাজারে ও গ্রামে-গ্রামে আছে।

১৪। **পসারী**। ব্রাজক বিপণী। ইহারা অসংখ্য। সর্বত্র ব্যাপিয়া কার্য করেন।

১৫। **পাইকেড়**। শকট করিয়া স্থানে স্থানে মাল বেচিয়া বেড়ান; কিন্তু পসারীদের দ্বারা খুচরা বিক্রয় করেন না।

১৬। **পাটনী**। ইহারা নামের হাটে আসিবার জন্য পার করিয়া দেন।

১৭। **প্রামাণিক**। ইহারা ঘাটের কাছে বসিয়া থাকেন। হাটে আসিবার লোকদিগকে ক্ষোর করিয়া দেন।

১৮। **ধোপা**। ঘাটে হাটুরিয়াদিগের বস্ত্র ধোত করেন।

১৯। **দালাল**। যোজক।

২০। **দরজী**। ইহারা হটুরেদের বস্ত্র সলাই করিয়া দেন।

পূর্বোক্ত বিংশতি প্রকার পদপ্রাপ্তির যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ণয়। যোগ্যতার নাম অধিকার। অযোগ্যতার নাম অনধিকার। অধিকারী লোকই এই সকল পদ পাইবেন।

অধিকার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ হউন, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ হউন, শুদ্ধভক্তি থাকিলে মনুশ্য নামের হাটের কর্মচারীর পদ পাইবার অধিকারী হন।

(অগ্ন্যভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্মের আবরণ হইতে মুক্ত, আনুকূল্য ভাবের সহিত কৃষ্ণাত্মশীলনের নাম শুদ্ধভক্তি। যাহার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির যতদূর অধিকার, তিনি ততদূর অনধিকার-লক্ষণ হইতে স্বভাবত মুক্ত)।

অনধিকার :—১। যিনি জড়বিষয়ে লোলূপ, অলস, স্বার্থপর, অধর্মরত, উৎসাহহীন, নাস্তিক, মুক্তিকামুক, পরলোকের সুখের জন্ত ব্যস্ত, শুক্যুক্তিবাদী, নিতান্ত তর্কপ্রিয়, প্রতিষ্ঠাপরায়ণ, শোক-মোহ-ক্রোধ-লোভ-মাদকাদির বশবর্তী, বঞ্চক, মিথ্যাভাষী, ধর্মধ্বজী, পক্ষপাতাদি কুসংস্কারাপন্ন ও মতবাদী, * তিনি নামের হাটের কর্মচারী পদের অধিকারী নন।

(মনুশ্যের বর্তমান চরিত্রই এস্থলে দ্রষ্টব্য, পূর্ব চরিত্র দ্রষ্টব্য নয়। যিনি যতদূর অনধিকার ক্ষয় করিতে পারিয়াছেন, তিনি শুদ্ধভক্তির আশ্রয়ে ততদূর অধিকার পাইয়াছেন)।

২। গৃহস্থ ও বানপ্রস্থের পক্ষে বৈশ্যগমন, পরদ্বীপগমন বা অনিয়মিতরূপে স্বপ্নীসঙ্গ এবং ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীমাত্র সন্তাষণ নিষেধ। এবিধ দোষযুক্ত পুরুষের নামের হাটের কর্মচারীর পদে অনধিকার। (বিরক্ত বৈষ্ণব-ভেকধারিগণ সন্ন্যাসীর মধ্যে পরিগণিত। সংযোগিগণ যদি শুদ্ধ ভক্ত হন, তবেই বৈষ্ণব বলিয়া গণনীয় ও গৃহস্থ-মধ্যে পরিগণিত)।

৩। আপনাকে নামদাতা অভিমান করিয়া যিনি নামগৃহীতাদিগের নিকট হইতে কোন প্রকার পার্থিব লাভ প্রার্থনা করেন, তিনি অনধিকারী।

(নামদাতাগণ নামদানান্ভিমানশূন্য হইয়া নিজ-নিজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুসারে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ত যাহা উপার্জন বা গ্রহণ করিবেন, তাহাতে অধিকার বাধা হয় না। মন্ত্রদাতা গুরু শিষ্যের উপকারার্থে তাহার স্বেচ্ছাদত্ত দক্ষিণা-মাত্র গ্রহণ করিলে অধিকার বাধা হয় না)।

৪। স্ত্রীলোক শুদ্ধভক্ত হইলে অগ্ন স্ত্রীলোককে নাম-বিক্রয়ের পসারী হইতে পারেন। পুরুষদিগকে নাম দিতে পারেন না। তবে অধিক বয়ঃপ্রাপ্তা, মাগ্না স্ত্রী স্থলবিশেষে সতর্কতার সহিত পুরুষদিগের নিকট নাম বিক্রয় করিতে পারেন। নাম প্রচার-স্থলে বৃদ্ধা ও বালিকা স্ত্রী ব্যতীত সধর্ম্মরহিত অগ্ন স্ত্রীলোককে কোন পুরুষ-প্রচারক অবলোকন বা সন্তাষণ করিবেন না।

আচার-ব্যবহার :- ১। সাধ্যানুসারে লঘু ও সাম্বিক ভোজনদ্বারা জীবন নির্বাহ করা কর্মচারীদিগেব কর্তব্য। নিজ শরীর পোষণে অল্প জীবের ক্লেস না হয়, ইহা দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। শরীর রক্ষার্থে সরলভাবে বৈজ্ঞ-আদিষ্ট ঔষধ ও পথ্য-গ্রহণে অধিকার বিরোধ হয় না।

২। প্রচারকগণ ধর্মপথে জীবনোপায় সংগ্রহ করিবেন। কার্য্য-সমর্থ গৃহস্থের শিক্ষাধিকার নাই। ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী শিক্ষা-দ্বারা জীবন নির্বাহ করিবেন, অল্প উপায় অবলম্বন করিবেন না। কার্য্যান্তরে যেখানে যান, সেখানে নাম প্রচার করিতে অবকাশ অনুসন্ধান করিবেন।

৩। যিনি যে আশ্রমের লোক, তিনি সেই আশ্রমের পরিচ্ছদ স্বীকার করিবেন। দেশ-কাল-পাত্র বিচারে যে পরিচ্ছদে বিনা আড়ম্বরে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তাহাই ভাল। বাহন, দণ্ড, ছত্র ও উপানং সম্বন্ধে যতদূর সহ্য হয়, ততঃ ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন।

৪। যতদূর সহজে ও স্বাস্থ্যরক্ষার সহিত নির্বাহিত হয়, শৌচাচার মনঃপূতরূপে করিলে অধিকার বাধা হইবে না। কিন্তু সতর্কতার বিষয় এই যে, শৌচাচার ক্রমশঃ কুটীনাটী হইয়া না পড়ে। কুটীনাটী শুদ্ধভক্তির বাধক।

৫। বৈষ্ণব-বেশভূষা ধারণে বৈষ্ণবদিগের স্বাভাবিকী প্রীতি। দ্বিকণ্ঠী বা ত্রিকণ্ঠী তুলসীমালা ও সছিদ্র উর্দ্ধপুণ্ড্র অর্থাৎ দ্বাদশ তিলকই বৈষ্ণবদিগের প্রিয় ভূষণ।

৬। কর্মচারিগণ সাধ্যমত সর্বদা অনুরাগের সহিত নামপরায়ণ হইবেন। শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ-নিত্যানন্দাষ্টৈত-গদাধর-শ্রীবাসরূপ পঞ্চতত্ত্বের নিতান্ত অনুগত দাস বলিয়া আপনাদিগকে জানিবেন। দৈন্ত, দয়া, সহিষ্ণুতা, নিরভিমান ও সর্বজীবে সম্মানরূপ ব্যবহারগত ধর্মদ্বারা যতদূর পারেন, ভূষিত হইবেন। স্বংকৃতা, খোল-করতালের সহিত নামগান, ভাবাবেশে নৃত্য ইত্যাদি দ্বারা নাম প্রচার করিবেন। গীত-নৃত্যাদিতে যতদূর ভক্তির আবেশের আবশ্যকতা, ততদূর স্বর-তালের নয়। স্বর-তাল স্ববর্ণে সোহাগার ত্রায় বাঞ্ছনীয়। স্বভাবতঃ যাহার যতদূর ভাব উদয় হয়, ততদূর ভাল। ধর্মধ্বজীদের ত্রায় কৃত্রিমভাব প্রকাশের প্রয়োজন নাই।

৭। কর্মচারিগণ শুদ্ধভক্তির সহিত নাম প্রচার করিবেন। জ্ঞান-কর্মযোগ, শুদ্ধ বৈরাগ্য ইত্যাদি অল্প মত প্রচার করিবেন না। সকলের নিকট রূপা প্রার্থনা-পূর্ব্বক দৈন্ত প্রকাশ করিবেন। এই সকল কর্মচারী ব্যতীত হাট ও বাজারে শুভানুধ্যায়ী ভাট, ফকির, বাউল প্রভৃতি অনেক লোক থাকেন। ইহাদিগের নিজ

নিজ কৰ্মের যোগ্যতাই ইহাদিগের অধিকার। ইহারা গোলযোগের সহিত হাটের পুষ্টি করেন এবং ক্রমশঃ সাধুসঙ্গে উন্নত হন। যতদিন তাঁহারা শুদ্ধভক্ত না হন, তাঁহাদের কার্যের জন্ত মহাজন দায়িক নন।

এখন বিনীতভাবে নিবেদন এই যে, ষাঁহারা পূৰ্ব্বোক্ত বিংশতি প্রকার কৰ্মচারীদিগের পদের প্রার্থনা করেন, তাঁহারা এই ক্রমে লিখিত অধিকার অনধিকার ভাল করিয়া বিচার করত আপনাদিগকে যোগ্য বোধ করিলে সহরংকার অর্থাৎ প্রচারক মহাশয়কে পত্রদ্বারা নিম্নলিখিত ঠিকানা-মত ইচ্ছা জানাইবেন।

শ্রীশ্রীনামহট্টের পরিমার্জক বা ঝাড়ুদার

সুদীন, অকিঞ্চন

দাস শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

স্বরভিকুঞ্জ, গোদ্রমদ্বীপ, শ্রীনবদ্বীপধাম।

ডাকের ঠিকানা—শ্রীশ্রীস্বরভিকুঞ্জ,

পোষ্ট অফিস স্বরূপগঞ্জ, জিলা নদীয়া।

শ্রীশ্রীগোদ্রম-কল্লাটবী

তৃতীয় ক্রম

শ্রীশ্রীগোদ্রমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনামহট্ট

শ্রীশ্রীনামহট্টের সমস্ত কৰ্মচারী মহোদয়গণের প্রতি নিবেদন এই যে, যখন তাঁহাদিগের নিকটস্থ প্রদেশে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে যে-কোন জাতব্য ঘটনা হয়, তাহা সত্বরে গোদ্রম-কল্লাটবীতে প্রকাশের নিমিত্ত লিখিয়া পাঠাইবেন। শুদ্ধ-বৈষ্ণব-মহোৎসব, নামোৎসব, শুদ্ধবৈষ্ণবের তিরোভাব, কোন অসাধারণ (পুরাতন বা নবীন) বৈষ্ণব-ক্রিয়া ইত্যাদিই জাতব্য ঘটনার উদাহরণ।

নামহট্টের ঝাড়ুদার কেন গোদ্রম কল্লাটবীতে সাক্ষর করেন?

ঝাড়ুদার প্রত্যহ প্রত্যুষে নামহট্ট পরিমার্জন করিতে করিতে কোনদিন কোন লিখিত পত্র কুড়াইয়া পান। তাহাতে যাহা লেখা থাকে, তাহাই তিনি

সহরন্দার মহাশয়কে প্রকাশ করিতে দেন। ঝাড়ুদারের নিকট হইতে পান বলিয়া সহরন্দার প্রকাশ করিবার সময় ঝাড়ুদারের নাম লিখাইয়া লইয়া থাকেন। বস্তুত ঐ সকল প্রবন্ধ কোথা হইতে আইসে, তাহা মূল মহাজন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই জানেন।

বিষয় ব্যাখ্যা :—দ্বিতীয় গুটীর ১১শ পৃষ্ঠায় ১৯শ সংখ্যায় যে দালালদিগের উল্লেখ আছে, তাঁহারা আমাদের হাট সম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ বৈষ্ণব। কিন্তু তদ্ব্যতীত হাটের শুভানুধ্যায়ী আর কতকগুলি দালাল আছেন, তাঁহারা এখনও শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া নির্দিষ্ট হন নাই। তথাপি তাঁহাদের সদ্বাসনাক্রমে তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যের দ্বারা হাটের পুষ্টি করিতেছেন। ইহাদের নামও পৃথগ্-রূপে প্রকাশ করা যাইবে। নামের প্রভাবক্রমে তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে দ্বিতীয় ক্রমোক্ত কর্মচারীদিগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবেন।

সতর্কতা :—দ্বিতীয় ক্রমের লিখিত বিংশতি প্রকার কর্মচারিগণ পরস্পর ভ্রাতৃবোধ করিবেন। কেহ কাহাকেও আপনা অপেক্ষা অশ্রেষ্ঠ মনে করিবেন না। যেমত তুলসী পত্রের ছোট বড় আকার দ্বারা উচ্চতা নীচতা নাই, তদ্রূপ শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের ধন, বল, বিদ্যা, জাতি, রূপ ও বয়স দ্বারা উচ্চতা নীচতা হয় না। উচ্চবর্ণ, ধন, কুল, বৈষ্ণব-বংশ ইত্যাদি কারণ বশতঃ যে উচ্চতা নীচতা, তাহা সামাজিক মাত্র, পারমাধিক নয়। শুদ্ধভক্তির উদয়-তারতম্যই ভ্রাতাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা-কনিষ্ঠতা-সূচক লক্ষণ। বৈষ্ণবত্বের প্রাচীনতা, প্রভুবংশীয় বৈষ্ণব মর্যাদা, বৈষ্ণবাচারের অনুষ্ঠান, শুদ্ধবৈষ্ণব-অভ্যাগত সন্মান, অতিথি-সংকার ও অধিকারক্রমে সংসার বর্জনাতির দ্বারা বৈষ্ণব-সমাজে যে একপ্রকার তারতম্য বিচার আছে, সে-সকল শুদ্ধবৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ ভালবাসেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত অগ্নি কোন লক্ষণগত পরস্পরের প্রতি তারতম্য-বিচার শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সতর্কতার সহিত পরিত্যাগ করিবেন।

নিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীনামহট্টের সমস্ত বিধি-বিধান ও ঘটনা এবং এই হাট-সম্বন্ধে যে-সকল বার্তা সাধারণের জানা কর্তব্য, তাহা এই ‘গোক্রম-কল্লাটবী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। গোক্রম-কল্লাটবী পত্রিকা প্রকাশ হইবার সময়ের নিয়ম নাই। কখন এক মাস, কখন দুই মাস অন্তর এবং কখন মাসে দুই খানাও বাহির হইতে পারে এই পত্রিকার কোন মূল্য নাই। ব্রাজক-বিপণী, বিপণিপতি ও হাটের অগ্নি প্রকার কর্মচারীদিগকে ইহার একখানি করিয়া বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাঁহারা এই পত্রিকা পাইতেছেন, তাঁহারা যত্ন করিয়া প্রথম দ্রুম হইতে গাঁথিয়া রাখিলে শেষে অনেক প্রকার উপকার লাভ করিবেন।

এই পত্রিকা হইতে পৃথক্ ‘শ্রীবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা’ বলিয়া আর একখানি পত্রিকা শ্রীনামহট্ট হইতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। শ্রীবৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালার পত্রিকাগুলির নাম—গুটী। ক্রমশঃ একশত আটটি গুটীতে মালা সম্পূর্ণ হইবে। গুটীগুলি সময়ে সময়ে ছাপা হইয়া ব্রাজক-বিপণী ও বিপণিপতিদিগের এবং হাটের অন্যান্য কর্মচারীদিগের হস্তে যাইবে। উঁহারা বিনামূল্যে ঐ সকল গুটী প্রাপ্ত হইবেন। গুটীগুলিতে সমস্ত বৈষ্ণব-তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও শুদ্ধনাম সমস্ত প্রকাশিত হইবে। ব্রাজক-বিপণী ও বিপণিপতি প্রভৃতি কর্মচারিগণ ঐ সকল নাম গান করিবেন ও করাইবেন। গুটীগুলিতে যে সকল নাম-তত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা, শাস্ত্রব্যাখ্যা ও শিক্ষা থাকিবে, তাহা গ্রামে গ্রামে সেই আকারে বা একটু আকার পরিবর্তন করিয়া প্রচার করিবেন। গুটীগুলি প্রথম হইতে কর্মচারিগণ যত্ন করিয়া গাঁথিয়া রাখিবেন। প্রথম গুটী অতি পূর্বে প্রকাশ হইয়াছিল। তাহাও আর একবার পরে মুদ্রিত হইয়া কর্মচারিগণের হস্তে যাইবে। তাঁহারা প্রথম গুটী হইতে বাঁধাই করিয়া রাখিবেন। গুটীগুলি প্রায়ই এক দফা হইবে। যদি অল্প কেহ গুটী লইতে চান, তিনি এক পয়সা মূল্যে প্রত্যেক গুটী পাইতে পারিবেন। কর্মচারিগণ নামের হাটের সহরংকারী মহাশয়কে পত্র লিখিলেই যে কয়খানা গুটী চান, পাইবেন।

যাঁহার যে কিছু গোদ্রুমকল্লাটবীতে প্রকাশ করিবার জন্ম লিখিতে হইবে বা নামের হাটের কর্মচারীদিগকে জানাইতে হইবে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া নিম্নলিখিত নামের ঠিকানায় পাইবেন—

শ্রীযুত রামসেবক চট্টোপাধ্যায়, ভক্তিভৃঙ্গ

শ্রীনামহট্টের সহরংকারী

স্বরভিকুঞ্জ, স্বরূপগঞ্জ পোষ্ট আফিস,

জেলা নদীয়া।

নিবেদন

যে মহাশ্রাগণ আমাদের নামের হাটের ব্রাজক-বিপণী ও বিপণিপতি হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতাজ্ঞালি নিবেদন এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিকটস্থ অথবা জানিত যে-সকল উদ্যোগী শুদ্ধবৈষ্ণব আছেন, তাঁহাদের সম্মতি লইয়া তাঁহাদের নাম, গ্রাম, ডাকের ঠিকানা ও জেলা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া

পাঠান। তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে ব্রাজক-বিপণী বলিয়া গণ্য করতঃ তাঁহাদের নামে শ্রীনামহাটের পুস্তকসমূহ প্রেরণ করিব।

প্রপন্নাশ্রম ও শ্রদ্ধা-কুটীর :-—বিপণিপতি যে গ্রামে থাকেন, সেই গ্রামে বা নগরে তিনি নামের বিপণি-স্বরূপ এক কুটীর বা আলয় স্থির করিবেন। সেই কুটীর বা আলয়কে প্রপন্নাশ্রম বলিয়া নামকরণ করিবেন। প্রপন্নাশ্রমে নিকটস্থ ও দূরস্থ শুদ্ধনামপরায়ণ ভক্তগণ উপস্থিত হইয়া নামানন্দ আশ্বাদন ও প্রচার করিবেন। বিপণিপতি মহোদয় শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে পরমার্থ-ভ্রাতা জানিয়া আদর করিবেন। কিন্তু আশ্রমাগত সাধুজন এরূপ মনে করিবেন না যে, বিপণিপতি তাঁহাদিগকে ভোজনাস্বাদন দিতে বাধ্য আছেন। এক সাধু অল্প সাধুকে নিজের অভাবের জ্ঞা ব্যতিব্যস্ত করেন না, তবে যাহার যে শক্তি, তিনি পরমার্থ-ভ্রাতাকে সেই অনুসারে আতিথ্য করিলেও করিতে পারেন। পক্ষান্তরে কোন সাধু স্বয়ং খাণ্ডদ্রব্যাদি আনিয়া কোন প্রপন্নাশ্রমে রাত্রিবাস করিলে বিপণিপতি-মহোদয় তাহাতে আপনাকে হীন বোধ করিবেন না। যদি ভ্রাতৃসেবায় নিজ দ্রব্যাদি দেন, তাহাতেও দাতা বলিয়া অভিমান করিবেন না। শুদ্ধনামের জয়-পতাকা যাহাতে উড়িতে পারে, এই চেষ্টাই সকলের কার্য। তাহাতে কোন-প্রকার আপন-পর-বোধে মানাপমান রাখার প্রয়োজন নাই। আপনাপন অভাব নিবৃত্তি, আপনাপন কর্তব্য কর্ম, ইহাই সাধারণ বিধি। প্রত্যেক প্রপন্নাশ্রম স্ব-স্ব গ্রাম বা পল্লীর নামের সহিত সংযোজিত থাকিবে; যথা—আমলাঘোড়া প্রপন্নাশ্রম, বাণাজার প্রপন্নাশ্রম, দিনাজপুর প্রপন্নাশ্রম ইত্যাদি।

ব্রাজক-বিপণী মহোদয়গণ যেখানে থাকেন, সেই স্থানের নাম শ্রদ্ধা-কুটীর; যথা—ফুলকুসুম শ্রদ্ধা-কুটীর, নাথুরিয়া শ্রদ্ধা-কুটীর ইত্যাদি। তাঁহার পৃথক কুটীর বা গৃহ-নির্মাণের প্রয়োজন নাই। যখন যে হাট-সম্বন্ধীয় কর্মচারী সেই গ্রামে যাইবেন, প্রথমেই শ্রদ্ধা-কুটীরের দ্বারে গিয়া ব্রাজক-বিপণী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কর্মচারিগণ নিজ-নিজ ব্যয়ে নিজ অভাব নির্বাহ করিবেন। ব্রাজক-বিপণী মহাশয়ের ভ্রাতৃস্নেহই তাঁহার পক্ষে উপাদেয় হইবে। তবে যদি কোন ব্রাজক-বিপণী ভ্রাতা কর্মচারীকে আতিথেয় বরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার চিন্তে যাহাতে স্থখ জন্মায়, তাহা করিলে বড় আনন্দের বিষয় হয়।

বার্তা

আমাদের হাটের কর্মচারিগণ অনেক বিষয়ে পরস্পর পত্রাদি লিখিতে ইচ্ছা করিতে পারেন, এইজন্ত এই পত্রিকায় ক্রমশঃ সমস্ত কর্মচারী মহোদয়গণের নাম

ও ডাকের ঠিকানা প্রকাশিত হইবে। অল্প কতকগুলি কর্মচারী মহাশয়দের নাম প্রকাশিত হইল, যথা—

ব্রাজক-বিপণী মহোদয়গণ :-—১। শ্রীযুত অমরেন্দ্র নাথ সোম, ফুলকুসুম, রাইপুর, বাঁকুড়া। ২। শ্রীযুত কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, রাইপুর বাজার, রাইপুর, বাঁকুড়া। ৩। শ্রীযুত শিবনারায়ণ মহাপাত্র, কাশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। ৪। শ্রীযুত রামানন্দ দাস বাবাজী, দামোদরবাটী, তেলিবেড়িয়া, বাঁকুড়া। ৫। শ্রীযুত সূর্যনারায়ণ বিশ্বাস, রাধামোহনপুর, সোনাখুঁচী, বাঁকুড়া। ৬। শ্রীযুত রসিকলাল দত্ত, রাগভূষণ, নাথুরিয়া, পালীগ্রাম, বর্দ্ধমান। ৭। শ্রীযুত মধুসূদন গোস্বামী, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা। ৮। শ্রীযুত অমৃতলাল বসু, স্ককের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৯। শ্রীযুত হৃদয় নাথ পাণ্ডা, শ্যামপুর, রাইপুর, বাঁকুড়া। ১০। শ্রীযুত বৈষ্ণবনাথ গোস্বামী, হাসিমপুর, কাশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। ১১। শ্রীযুত রমানাথ মুখোপাধ্যায়, আমলাঘোড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ১২। শ্রীযুত গদাধর মজুমদার, আমলাঘোড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ১৩। শ্রীযুত উদয়চন্দ্র দাস, পানাগড়, বর্দ্ধমান। ১৪। শ্রীযুত বেণীমাধব সরকার, পানাগড় বর্দ্ধমান। ১৫। শ্রীযুত যাদবচন্দ্র দাস, বাশকোপা, গোপালপুর, ঐ। ১৬। শ্রীযুত হরিদাস, বাবলাবেড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ১৭। শ্রীযুত রামকল্প সাহা, মানিকান্দা, গোপালপুর, ঐ। ১৮। শ্রীযুত বাউলচন্দ্র ধাড়া, মবারকগঞ্জ, গোপালপুর, ঐ। ১৯। শ্রীযুত বক্রনাথ ঘটক, তাজপুর, পলাশডাঙ্গা, বাঁকুড়া। ২০। শ্রীযুত নীতানাথ দাস মহাপাত্র, সাউরিগ্রাম, সাবড়া, মেদিনীপুর। ২১। শ্রীযুত বরদাপ্রসাদ বাগ্‌চি, রংপুর। ২২। শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র সরকার, নওয়াবাদ, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। ২৩। শ্রীযুত স্বরূপমোহন গোস্বামী, ভবানীপুর, কাশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। ২৪। শ্রীযুত বনমালী দাস বাবাজী, আরঙ্গাবাদ, কাশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। ২৫। শ্রীযুত গোপাল চন্দ্র দাস, মালদহ। ২৬। শ্রীযুত মতিলাল বিশ্বাস, হাঁসখালি, নদীয়া। ২৭। শ্রীযুত গুরুদাস বিশ্বাস, হাঁসখালি, নদীয়া। ২৮। শ্রীযুত বসন্ত কুমার দাস, দিনাজপুর।

বিপণীপতি মহোদয়গণ :-—১। শ্রীযুত বিপিনবিহারী ভক্তিবরু, আমলা-ঘোড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ২। শ্রীযুত রামচন্দ্র শিরোমণি, দিনাজপুর। ৩। শ্রীযুত রাধাবল্লভ চৌধুরী, সেরপুর, মৈমনসিংহ।

জ্ঞাতব্য

হাটের কর্মচারী মহোদয়গণ যখন কার্য্যাস্তরে অল্প গ্রামে যাইবেন, তখন

তথায় একটি সাধারণ স্থান নির্দেশ-পূর্বক নামের হাটের উদ্দেশ্য-সূচক বক্তৃতা করিবেন এবং শুদ্ধভক্তি-সূচক নামগান ও ভাবগান করিয়া শ্রোতাগণকে শুদ্ধ-ভক্তি পথে আনিবার চেষ্টা করিবেন। গানগুলি যে কেবল কীর্তন সুরে হইবে, এমত নহে; কিন্তু যে-স্থানে যেমন রুচি দেখেন, সে-স্থানে তদনুরূপ সুরের (বৈঠকী, কালোওয়াতি, বাউল প্রভৃতি) গান করিবেন ও করাইবেন। ইহাতে এইমাত্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, পদগুলিতে শুদ্ধভক্তি-বিরুদ্ধ কোন কথা না থাকে। আমরা ক্রমশঃ সকল প্রকার সুরের গান তাঁহাদের সাহায্যার্থে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালায় প্রকাশ করিব।

স্বদীন অকিঞ্চন

শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগোক্রম-কল্লাটবী

চতুর্থ ক্রম

শ্রীশ্রীনামহট্ট

শ্রীশ্রীগোক্রমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনামহট্টের কর্মচারী মহোদয়গণ শ্রীচরণে কৃতাজ্ঞালি নিবেদন :—

১। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞা-মতে এই নামহট্ট পুনরায় প্রকটিত হইয়াছে। দেশ-বিদেশের সাধু-বৈষ্ণবগণ এই হাটের কর্মচারীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। হাটের কার্য বিশেষ উৎসাহ-সহকারে করা আবশ্যক। কতিপয় কর্মচারী মহোদয় স্থানে স্থানে শুদ্ধনাম-প্রচার-কার্যের বিবরণ পাঠাইতেছেন। কিন্তু অনেকেই তাঁহাদের কার্য-বিবরণ পাঠান নাই। আমরা যথাসাধ্য ব্যয় ও পরিশ্রমে কল্লাটবী ও সিদ্ধান্ত-মালা মুদ্রিত করিয়া পাঠাইতেছি। আশাকরি, প্রত্যেক কর্মচারী মহোদয় তাঁহার কার্য-বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়া তিন মাস অন্তর আমাদের নিকট পাঠাইবেন। কল্লাটবীতে ও সময়ে সময়ে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা'য় তাঁহাদের বিবরণ-সকলের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হইবে। চতুর্থ মাসের মধ্যে তাঁহাদের বিবরণ পাওয়া যাইবে না, আমরা মনে করিব যে, তাঁহারা আমাদের প্রতি দয়া করিলেন না এবং তাঁহারা শ্রীশ্রীনামহট্টের সম্বন্ধে কিছুই

করিবেন না।

২। শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য সুচারুরূপে হইতে গেলে কতকগুলি বক্তৃতা ও গানশক্তিবিশিষ্ট ব্রাজক-বিপণী সংগ্রহ হওয়া আবশ্যক। শুদ্ধভক্তদিগের মধ্যে এরূপ লোক অনেক পাওয়া যায় না। অতএব আমরা প্রস্তাব করি যে, হাটের কর্মচারী মহোদয়গণ কতকগুলি অল্পবয়স্ক কৃতবিত্ত ব্যক্তিদিগকে শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে জনসমাজে বক্তৃতা ও গান করিবার উৎসাহ দিবেন। এইরূপ করিলে অল্পদিনের মধ্যেই সুবক্তা ও সুগায়ক ব্রাজক-বিপণী ও বিপণিপতি পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ে সকলেই বিশেষ যত্ন করিবেন। অল্পবয়স্ক, বিনয়ী, উৎসাহী, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান কতকগুলি ব্যক্তিকে নির্জনস্থানে বক্তৃতা ও গান শিক্ষা দিয়া ক্রমশঃ গ্রামের মধ্যে, চত্বরে, বাজারে ও অন্ত্যন্ত সাধারণ স্থানে তাঁহাদের দ্বারা বক্তৃতা করাইবেন। এই সমস্ত চেষ্টা দ্বারা যে ফলোৎপন্ন হয়, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্ত লিখিবেন।

৩। বিলাত হইতে যে-সকল খৃষ্ট-ধর্মের প্রচারক অর্থাৎ মিশনারী এ প্রদেশে আসিয়া ধর্ম-প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা সেই কার্যের জন্ত বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ক্রিয়া নিঃস্বার্থ নয়, সুতরাং তাঁহাদের কার্যদ্বারা জগতের কোন মঙ্গল সাধন হয় না। আমাদের শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নামের হাট সেইরূপ নয়। আমাদের নাম-প্রচারকগণ নিঃস্বার্থে প্রভুর নিশান ধরিয়া গ্রামে-গ্রামে শ্রীমদগোক্রমচন্দ্রের আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন। এইপ্রকার ধর্ম-প্রচারদ্বারা অতি স্বল্পদিনের মধ্যেই কেবল ভারতভূমিতে নয়, কিন্তু সমস্ত ভূমণ্ডলে শ্রীচৈতন্য-দেবের খোল বাজিয়া উঠিবে এবং শুদ্ধ হরিভক্তি কি ব্রাহ্মণ, কি শ্রেষ্ঠ, সকলেই লাভ করিবে।

প্রচার-কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৩ই পৌষ শ্রীশ্রীগোক্রমচন্দ্রাব্দ ৪০৫, শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য আরম্ভ হয়। কলিকাতা কুমারটুলী শ্রীশ্রীগৌর-গোপীনাথ-কুঞ্জ, বিভিন্ন ষ্ট্রীটে শ্রীযুত রায় কানাই-লাল দে বাহাদুরের বাটীতে ও রামবাগান ভক্তিভবনে কয়েকজন হাটের কর্মচারী একত্রিত হইয়া নামোৎসব করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলায় আমলাঘোড়া গ্রামে শ্রীযুত বিপিনবিহারী ভক্তিরত্ন বিপণিপতি মহাশয় একটা প্রপল্লাশ্রম স্থাপন করত নিকটস্থ গ্রাম-সমূহে শুদ্ধ নাম প্রচার করিতেছেন।

হুগলী বদনগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুত হারাধন দত্ত ভক্তিनिधि বিপণিপতি মহাশয়

স্বগ্রামে প্রপল্লাশ্রম স্থাপন করতঃ তথা হইতে গ্রামে-গ্রামে নামোৎসব করাইতেছেন।

মৈমনসিংহ সেরপুরের ভূম্যধিকারী শ্রীযুত রাধাবল্লভ চৌধুরী বিপণিপতি মহাশয় প্রপল্লাশ্রম স্থাপন-পূর্বক নিকটস্থ গ্রামসমূহে শুদ্ধ নামতত্ত্ব প্রচার ও শুদ্ধ নামোৎসব করিতেছেন।

শ্রীযুত ব্রাজক-বিপণী কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের প্রযত্নে শ্রীরামপুর নগরে শ্রীযুত কালিদাস সাহা মহাশয়ের বাটীতে বিগত ২৩শে চৈত্র রবিবার হরিবাসর-দিবসে শ্রীনামোৎসব ও শুদ্ধনাম-বিষয়ক আলোচনা হইয়াছিল।

ব্রাজকবিপণী শ্রীযুত রঘুনন্দন কাব্যতীর্থ মহাশয়ের যত্নে শ্রীনবদ্বীপ-ধামে বৈশাখ মাসে (৪০৬) নামোৎসব ও বক্তৃতা হইয়াছিল।

সম্বলপুর নগরে শ্রীযুত মধুসূদন দাস ব্রাজক-বিপণী মহাশয়ের প্রযত্নে শেষ চৈত্র হইতে নামোৎসব হইতেছে।

ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত সূর্য্যনারায়ণ বিশ্বাস মহাশয়ের প্রযত্নে বাঁকুড়া, সোনা-মুণীর অন্তর্গত রাধামোহনপুর গ্রামে বিশেষ যত্ন-সহকারে শ্রীনামোৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

বর্ধমান জেলার গোপালপুর গ্রামে ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় শুদ্ধনাম গান ও শুদ্ধ নাম-তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন।

বাঁকুড়া রাইপুর গ্রামে ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত কালীপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তত্ত্ব হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা-গৃহে ১লা বৈশাখ তারিখ হইতে প্রতিদিন নাম প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীহট্ট কানাইবাজারে মৈনাবাসী ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত রাজীবলোচন দাস মহাশয় ঐ প্রদেশে শুদ্ধনাম প্রচারের বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন।

ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত যত্ননাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মেদিনীপুর জেলার রাম-জীবনপুর গ্রামের নিকটস্থ অনেকানেক গ্রামে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিশান উড়াইয়া শুদ্ধনাম প্রচার করিতেছেন। তাঁহার মধুর বক্তৃতায় বিগলিত-চিত্তে অনেকেই শুদ্ধনামাশ্রয় করিয়াছেন।

ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বসাক মহাশয় ঢাকা নগরে শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন।

বিপণিপতি শ্রীযুক্ত মহাস্ত গোরাচাঁদ দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম নবদ্বীপে নামকীর্্তন দ্বারা জীবের মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

শ্রীগোড়মবাসী নামহট্টের সেবকগণ উক্ত মহোদয়দিগের কার্য আলোচনা করিয়া আনন্দপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ করিতেছেন। এখন নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর নামের হাট পুনরায় জাগিয়া উঠিল। সকলই তাঁহার ইচ্ছা।

সন্দেহ নিরসন

গোড়ম-কল্লাটবীর দ্বিতীয় ধ্রুমে লিখিত মত প্রামাণিক, ধোবা ও দরজী ইহারা কি কার্য করেন, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন। প্রামাণিক, ধোবা ও দরজীর পদ অতিশয় উচ্চ। বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত ঐ তিনটি পদ কেহই গ্রহণ করিতে পারেন না। কুমতরূপ অভদ্র-লক্ষণ শাশ্র-কেশ দূর করিয়া বিপত্নীদিগকে ষাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণবতায় আনিতে পারেন, তাঁহারাই হাটের ক্ষৌরকারী প্রামাণিক। বিপথ-গমনদ্বারা ছুষিত চরিত্রস্বরূপ মলমুক্ত পরিচ্ছদ ধৌত করাইয়া ষাঁহারা বিশুদ্ধ ভক্ত-পরিচ্ছদ দিতে সক্ষম, তাঁহারাই হাটের ধোবা। কর্ম-জ্ঞান-যোগ-যোগ প্রভৃতি আর্ধ্য-ক্রিয়ারূপ অমিলিত বস্ত্র-সকলকে ষাঁহারা শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব-সূচীকাঙ্ক্ষারা গ্রহণ করতঃ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধ ব্যবহার উৎপন্ন করিতে পারেন, তাঁহারাই হাটের দরজী।

সন্নিধান

অনেকে ‘শ্রীশ্রী৩রাধাকৃষ্ণ,’ ‘শ্রীশ্রী৩নামসংকীর্তন,’ ‘শ্রীশ্রী৩মহাপ্রভু’—এইরূপ লিখিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদানুগত পণ্ডিতসকল সেই সেই রূপে লিখিলে আমরা আপত্তি করিতে পারি না; কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবের পক্ষে সেই সেই রূপে লেখা যুক্তি ও সদাচার-বিরুদ্ধ। “শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,” “শ্রীশ্রীনামসংকীর্তন”—এইরূপ, লিখিলেই যথেষ্ট। যেহেতু হরিনাম বা হরিবিষয়ক কথার পূর্বে ‘৩’ সংকেত লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি ‘৩’ শব্দ লিখিতে হয়, তাহার পূর্বে ‘৩ ঈশ্বর’ শব্দ লেখা যায়, তাহা কেবল হাশ্বাস্পদ হইয়া থাকে। ঐরূপ চিহ্ন ব্যবহার করা মৃত ব্যক্তিদের নামের পূর্বে অদ্বৈতবাদ-সম্মত মৃত-শব্দের পরিবর্তে মাত্র; ঐ চিহ্ন বৈষ্ণবদিগের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

পণ্য-বীথিকা-পতি :—যে-সকল মহাস্ত-সন্তান ও প্রভু-সন্তানগণ আপনাপন পণ্য-বীথিকায় বসিয়া নিঃস্বার্থ-ভাবে শুদ্ধ-নাম প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই নামের হাটে পণ্য-বীথিকা-পতি।

পঞ্চায়েৎ :—হাটের যখন যে-কোন কর্মচারী শ্রীগোড়ম ক্ষেত্রে ১০ জনের অধিক একত্রিত হইয়া হাটের মঙ্গলসাধন সম্বন্ধে বিষয়সকল সিদ্ধান্ত করিবেন,

তঁাহারাই তখন শ্রীশ্রীনামহট্টের পঞ্চায়েৎ অর্থাৎ হাটের মূল মহাজনের প্রতিনিধি।

পূর্ব প্রকাশিত তালিকার পর বিপণিপতি মহোদয়গণ :—

৪। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিচারক, বহরমপুর, খাগড়া, মর্শিদাবাদ। ৫। শ্রীযুক্ত হারাদন দত্ত ভক্তি-নিধি, বদনগঞ্জ, হুগলী। ৬। শ্রীযুক্ত মহাস্ত গোরচাঁদদাস বাবাজী, শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া।

দালালগণ :— ১। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুপ্ত, হাসখালি, নদীয়া। ২। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মৌলিক, দেওঘর, বৈষ্ণনাথ। ৩। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু, জাগুলী, নদীয়া। ৪। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল ভট্টাচার্য্য, আমঘাটা, স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

ব্রাজক-বিপণী মহোদয়গণ :— ২২। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সাহা, করিমপুর, নদীয়া। ৩০। শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী, বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র, খাগড়া মর্শিদাবাদ। ৩১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী, শ্রীরামপুর, হুগলী। ৩২। শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দত্ত, জাহানাবাদ, হুগলী। ৩৩। শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, হেডমাষ্টার রামজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৩৪। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, পোষ্টমাষ্টার, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ৩৫। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৪৬নং মিডিল রোড, ইটিলী, নাপিতবাজার, কলিকাতা। ৩৬। শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস সুনারী, আটারিয়া, সম্বলপুর। ৩৭। শ্রীযুক্ত রামলাল দাস, আমডহরা, বোলপুর, বীরভূম। ৩৮। শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ, নবদ্বীপ, নদীয়া। ৩৯। শ্রীযুক্ত ঘনেশ্বর সিংহ, তুদপাতুলী, খরিলপাড়া, শিলচর, কাছাড়। ৪০। শ্রীযুক্ত লোকনাথ হোড়, ৬৬নং শাখারীটোলা লেন, কলিকাতা। ৪১। শ্রীযুক্ত গুরুদাস ঘোষ, ৮নং বৃন্দাবন ঘোষের লেন, কলিকাতা। ৪২। শ্রীযুক্ত স্বারকনাথ চক্রবর্তী, ছুটী, গোবরাহাট, কটক। ৪৩। শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস, মৈনা, কানাইবাজার, শ্রীহট্ট। ৪৪। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, দেবখণ্ড, রামজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৪৫। শ্রীযুক্ত মধুরানাথ দাস কাটোয়া, বর্দ্ধমান। ৪৬। শ্রীযুক্ত হরলাল চক্রবর্তী, গ্রাম মুণ্ডকা, রাইপুর, বাঁকুড়া। ৪৭। শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায়, ৪র্থ শিক্ষক, বীরসিংহ, খারার, মেদিনীপুর। ৪৮। শ্রীযুক্ত লক্ষণদাস বাবাজী, কতরবগা, লাপান্দা, সম্বলপুর। ৪৯। শ্রীযুক্ত রামচরণ দাস বৈরাগী, দয়ালবাজার, রামজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৫০। শ্রীযুক্ত রামবল্লভ সর্বাধিকারী, মেমারী, বর্দ্ধমান। ৫১। শ্রীযুক্ত কিরীটী-

ভূষণ ধলবার, অম্বিকানগর, রাজবাটি, বাঁকুড়া। ৫২। শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবর্তী,
পাণ্ডুয়া, রামজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৫৩। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বসাক, ডেঃ পোঃ
মাঃ জেঃ আঃ, ঢাকা।

স্বরভিকুঞ্জ,
গোক্রমদ্বীপ
স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

স্বদীন অকিঞ্চন
শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগোক্রম-কল্পাতরী

পঞ্চম স্ক্রম

শ্রীশ্রীনামহট

শ্রীশ্রীগোক্রমচন্দ্রায় নমঃ

পরিদর্শন-বিবরণ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামাস্তর্গত শ্রীগোক্রমক্ষেত্রে শ্রীস্বরভিকুঞ্জে সম্প্রতি শ্রীশ্রীনামহটের মূল সংস্থাপিত আছে এবং ভারতভূমির সর্বত্র ইহার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে। স্থানে-স্থানে হাটের কার্য্য কিরূপ হইতেছে, তাহা দেখিবার অভিপ্রায়ে মূল হাটস্থিত কর্মচারিগণ সময়ে সময়ে দেশ-ভ্রমণে নিযুক্ত হন। আজ পর্য্যন্ত ঐ পরিদর্শক কর্মচারিগণ যাহা যাহা দৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সমুদয় এই বিবরণে প্রকাশিত হইল।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৬ চারিশত ছয়, ২১শে ভাদ্র রবিবারে নামহটের পরিমার্জক, সহরংকারী এবং আরও দুইটি কর্মচারী একযোগে হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর নগরে হাটের কার্য্য পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নূতন মন্দিরে ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের (অম্পষ্টাংশ) (২) গৌরপরায়ণ ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব উপস্থিত ছিলেন। ভক্তি ও বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা হইলে পর ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত কালীদাস সাহা মহাশয় কয়েকটি ভক্তকে লইয়া চতুর্থ গুটি ভক্তিসিদ্ধান্তমালা হইতে মধুর স্বরে শিক্ষাষ্টক পালা-গান করিয়াছিলেন। তত্রস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অকৃত্রিম গৌরভক্তি দর্শন করিয়া হাটের কর্মচারিগণ বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিলেন।

ঐতিহাসিক ৪০৬ চারিশত ছয়, ৫ই আশ্বিন সোমবার হাটের পরিমার্জক সহরংকারী ও পতাকাধারী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল নগরে সন্ধ্যার পর পৌছিলে তত্রস্থ ভক্ত মহোদয়গণ হরিসংকীর্তনের সহিত তাঁহাদিগকে সজ্জিত হরিসভায় লইয়া গেলেন; সহস্রাধিক নামপরায়ণ সমাগত ব্যক্তিগণ মহা-সমারোহে হরিসংকীর্তন করিয়াছিলেন। হাটের কর্মচারিগণ সেই রাত্রেই রামজীবনপুর গ্রামে যাত্রা করিলেন। পরদিন প্রাতে রামজীবনপুরের ভক্তগোষ্ঠী সকলের সহিত পরমানন্দে কীর্তন করিতে করিতে বিপণিপতি শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী পাইন মহাশয়ের প্রপন্নাশ্রমে শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য পরিদর্শন করিলেন। সহস্রাধিক ভক্তগণ মহাসমারোহে হরিশ্রবণ করিতেছিলেন; হাটের তত্রস্থ সেনাপতি শ্রীযুত উমাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় পরিমার্জক ভক্তিবিনোদ, সহরংকারী ভক্তিভূষণ ও ভক্ত সীতানাথ প্রভৃতি সমাগত হাটের কর্মচারীদিগকে অভিনন্দনের দ্বারা সম্বাদর করিলেন। পরিমার্জক ভক্তিবিনোদ মহাশয় শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য বিষয়িণী বক্তৃতা করিলেন। ঘাটাল চক্রের (অস্পষ্টাংশ) (৩) স্থূললিত বক্তৃতা ও নিজ-রচিত পদগান দ্বারা সমাগত ব্যক্তিদিগকে প্রেমে আপূরিত করিলেন। ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত রামদাস বাবাজী ও শ্রীযুত অধরচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়দ্বয় স্থমিষ্ট বক্তৃতা দ্বারা সভাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। হরিশ্রবণ ও বিশুদ্ধ নামসংকীর্তনের সহিত এক প্রহর রাত্রে সভাভঙ্গ হইল।

৭ই আশ্বিন প্রাতেই মহা-সমারোহের সহিত নগরকীর্তন বাহির হইল। সেই সময়ে রামজীবনপুর গ্রামের স্থানে স্থানে নিবাসী ভক্তমহোদয়গণ নিজ নিজ বাটীর দ্বারে পত্র-মণ্ডপ স্বেচ্ছাসজ্জিত করিয়া নগরের একটী অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন। এদিকে রাজপথ দিয়া সংকীর্তন চলিতেছে, মণ্ডপ হইতে ভক্তগণ প্রেমানন্দে হরিশ্রবণ করতঃ কীর্তনকারীদিগকে মণ্ডপে বসাইতেছেন, ব্রাজক-বিপণিগণ ভক্তিবিনোদের সহিত নামতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন, চতুর্দিক হইতে গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকগণ হ্রলুশ্রবণ করিতেছে, কোন স্থানে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ভঙ্গ করিয়া বালকগণ হরিবোল হরিবোল বলিয়া দৌড়িতেছে, ভক্তগণ পরস্পর আপ্যায়িত করিতেছেন,—এইরূপ অপূর্ব দৃশ্য সমস্ত লোকের মন হরণ করিয়াছিল। শ্রীযুত শ্রীবাসচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের বাটাতে, শ্রীযুত গঙ্গাধর পাল, শ্রীযুত রাধানাথ দাস, শ্রীযুত মাধবচন্দ্র দে, শ্রীযুত উমেশচন্দ্র মোদক, শ্রীযুত ত্রৈলোক্য দাস, বিপণিপতি শ্রীযুত যদুনাথ পাল ও দ্বিজকুলচূড়ামণি শ্রীযুত দীননাথ রায় মহোদয়দিগের ভবনে সংকীর্তন-সভার পৃথক পৃথক অধিবেশন হইয়াছিল।

অপরাহ্নে শ্রীনগর গ্রামে শ্রীনগর নামহট্ট প্রতিষ্ঠিত হরিসভাতে ভক্তিবিনোদ মহাশয় ও যাবতীয় কর্মচারী মহোদয়গণ বক্তৃতা করিয়া প্রায় দুই সহস্র লোকের শ্রীতি সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীযুত হৃদয়নাথ কর্মকার প্রভৃতি হাটের গায়কগণ মধুরস্বরে হরিনাম গান ও হাটের নর্তক শ্রীযুত সীতানাথ হড় মহাশয় প্রভৃতি কীর্তনে নৃত্য করতঃ সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

৮ই আশ্বিন অপরাহ্নে হাটের সমস্ত কর্মচারী বিপুল সমারোহে রামজীবনপুর গ্রামে নামকীর্তন করিতে করিতে শ্রীযুত উমেশচন্দ্র মোদক, শ্রীযুত অনন্ত গায়ন, শ্রীযুত রামচাঁদ দত্ত, শ্রীযুত শ্রীনিবাস রাউত, শ্রীযুত রামকল্প রাউত মহোদয়দিগের বাটীতে বহুসংখ্যক লোকের সমক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। অবশেষে শ্রীশ্রীপার্করীনাথ মহাদেবের নাট্যশালায় প্রায় ২৫০০ লোকের এক মহাসভা হয়, তাহাতে সেনাপতি মহাশয় সমস্ত বেদ-পুরাণ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছিলেন। পরিমার্জক ভক্তিবিনোদ মহাশয় শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব-প্রচারকালে মায়াবাদ-মতের নিরর্থকতা দেখাইয়াছিলেন। পরে বিপণিপতি শ্রীযুত যদুনাথ পাল মহাশয়ের প্রপন্নাশ্রমে রসিক-মণ্ডলীতে রস-কীর্তন হইয়াছিল।

৯ই আশ্বিন অপরাহ্নে হাটের সমস্ত কর্মচারী হাতীপুর দেবথণ্ডে উপস্থিত হন, তথায় জগজ্জননী ভদ্রকালীর নাট্যশালায় প্রায় তিন সহস্র লোক সমবেত ছিলেন। তত্রস্থ ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রযত্নে পত্রমণ্ডপ, তোরণ, গোপূরাদি প্রস্তুত হইয়াছিল, গ্রামস্থ মহাজনগণ সংকীর্তনের সহিত কর্মচারিদিগকে অগ্রসর হইয়া নদীতীর হইতে মণ্ডপে লইয়া গেলেন, গমন সময়ে নহবৎ বাজ ও গ্রামস্থ স্ত্রীলোকদিগের হলুধ্বনিতে গগন পরিপূরিত হইয়াছিল। যিনি সেই অপূর্ব শোভা দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি আর তাহা ভুলিতে পারিবেন না। সে-সময়ে যেন প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া সকলে আত্ম-বিশ্মরণ হইয়াছিলেন! ভক্তগণ মণ্ডপে বসিলে পর নিম্নলিখিত গীতটী বাউলস্বরে গাওয়া হইল।

গীত

নিতাই নাম হাটে, ও কে যাবিরে ভাই আয় ছুটে।

এসে পাষণ্ড জগাই মাধাই দুজন সকল হাটের মাল

নিলে লুটে ॥

হাটের অংশী মহাজন, শ্রীঅদ্বৈত, সনাতন,

ভাণ্ডারী শ্রীগদাধর পণ্ডিত বিচক্ষণ।

আছেন চৌকিদার হরিদাস আদি, হলেন শ্রীসঙ্কর

শ্রীশ্রীধর মুটে ।

দালাল কেশব ভারতী, শ্রীবিজ্ঞাচাম্পতি,

পরিচারক আছেন কৃষ্ণদাস প্রভৃতি,

হন কোষাধ্যক্ষ শ্রীবাস পণ্ডিত, ঝাড়ুদার কেদার জুটে ॥

হাটের মূল্য নিরূপণ, নয় ভক্তি প্রকরণ,

প্রেম হেন মুদ্রা সর্বসার সংযমন নাই কমি বেশী সমান ।

ও জন রে, সব এক মনে বোঝায় উঠে ॥

এই প্রেমের উদ্দেশ, এক সাধু উপদেশ,

স্বধাময় হরিনামরূপ সুসন্দেশ, এতে বড় নাই রে দ্বেষাদ্বেষ,

খায় একপাতে কাণাকুটে ॥

পরে “মহামায়ার বৈষ্ণব-বাৎসল্য” বিষয়ে হাটের পরিমার্জকের বক্তৃতা ও তদন্তে ব্রাজক-বিপণী মহাশয়গণের স্ববক্তৃতা হইয়াছিল এবং হাটের গায়ক মহাশয়দিগের সুললিত তানে হরিগুণগানে সভাস্থ সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল । ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় একটী সুদীর্ঘ পঞ্চময়ী বক্তৃতা পাঠ করিলেন । ঐ সভায় অনেকগুলি বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীগৌরানন্দের আনুগত্য স্বীকার-পূর্বক শ্রীনামহট্টের পক্ষকে অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন ।

১০ই আশ্বিন অপরাহ্নে শ্রীশ্রীনামহট্টের কর্মচারিগণ প্রথমে আমদান গ্রামে ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত প্রচারালয়ে প্রায় পাঁচশত লোকের সমক্ষে এবং তৎপরে সেরবাজ গ্রামের ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত অক্ষয়কুমার ঘোষের প্রচারালয়ে সাত আটশত লোকের সমক্ষে শ্রীশ্রীনামপ্রচারের ষথারীতি কার্য্য হইয়াছিল । উভয় স্থানেই নানাবিধ বক্তৃতা ও সঙ্গীত হইয়াছিল ।

১১ই আশ্বিন অপরাহ্নে শ্রীমবাজার হরিসভার সম্মুখে প্রায় তিন হাজার লোক সমবেত হন, তথায় শ্রীনামসংকীর্তন এবং ভক্তিবিনোদ, ভক্তিবৃষণ ও শ্রীযুত রামানন্দ বাবাজী মহাশয়গণ দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সমাগত লোকসকলকে শ্রীনামতত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন । শ্রীমবাজার গ্রামেও স্থানে স্থানে প্রচারমণ্ডল নিশ্চিত হইয়াছিল । শ্রীনামহট্টের কার্য্য তথায় জাহানাবাদচক্রের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুত হারাদন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের প্রযত্নে উত্তমরূপে নির্বাহিত হইতেছে, জানা গেল ।

১২ই আশ্বিন প্রাতে হাটের কর্মচারিগণ ভক্তিনিধি মহাশয়ের বদনগঞ্জের প্রপল্লবশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অপরাহ্নে কয়াপাট বাজারে একটি বিরাট সভা দেখা গেল; প্রায় তিন চারি সহস্র লোক বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত হাটের কর্মচারীদিগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নামকীর্তনের সহিত কর্মচারিগণ তথায় উপস্থিত হইলে, প্রথমে লোক-কলরব নিস্তব্ধ করিবার জন্ত কিঞ্চিৎ সময় অতিবাহিত হইল। তৎপরে ভক্তিনিধি মহাশয়ের বক্তৃতাস্ত্রে ভক্তিবিনোদ মহাশয় “বদন্তি তং তত্ত্ববিস্তৃতং” শ্রীভাগবতের এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া মায়াবাদ-নিরাসন ও ভক্তিতত্ত্ব-স্থাপন পূর্বক একটি দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করন, তৎপরে ব্রাজকবিপণী পণ্ডিত শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় একটি ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিলে অন্ততঃ ব্রাজকবিপণী শ্রীযুত পণ্ডিত রামানন্দ দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীনাম সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই সমস্ত বক্তৃতার সময়ে তত্রস্থ শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে যে ভক্তিরস উচ্ছলিত হইতেছিল, তাহা তাঁহাদের ঘন ঘন প্রেমপূর্ণ হরিশ্রবণিতে প্রকাশ হইয়াছিল।

১৪ই আশ্বিন রাত্রে ক্ষীরপাই গ্রামে শ্রীহারাদন দে মহাশয়ের মণ্ডপে প্রায় দুই তিন শত লোক সমবেত হইলে শ্রীহরিকীর্তন ও অবশেষে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের এক বক্তৃতা হইয়াছিল। গ্রামস্থ লোকেরা শ্রীশ্রীনামহট্টের উপকার পাইবার জন্ত ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১৬ই আশ্বিন অপরাহ্নে ঘাটাল নগরে সংকীর্তন ও নাম-প্রচার সভা হয়, তত্রস্থ প্রধান প্রধান রাজকীয় কর্মচারী মহাশয়গণ প্রচার কার্যে বিশেষ সহায়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সভামণ্ডপে ক্রমশঃ প্রায় সহস্র লোকের সমাগম হয়, তন্মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ ছিলেন। জীবতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও নামতত্ত্ব বিষয়ে ভক্তিবিনোদ একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাহাতে অনেকের মনে শ্রীনামহট্টের প্রতি ভক্তি সঞ্চার হইয়াছিল। দেখা গেল, ঘাটালে এপর্যন্ত নামহট্টের সমধিক কার্য্য হয় নাই, কিন্তু সে-দিবস অনেক সাধুলোক ভক্তবৃন্দ প্রেমের সহিত পরস্পর দলের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নামগানে সকলকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। আশা করা যায় যে, অতি শীঘ্রই রামজীবনপুরের ন্যায় ঘাটালে নামহট্টের বিস্তৃতি হইবে।

রামজীবনপুর, ঘাটাল ও অন্যান্য স্থানে যে-সকল গীত ও অভিনন্দন-কবিতা পঠিত হইয়াছিল, তাহাতে হাটের কর্মচারীদিগের অতিশ্রুতি বাক্য থাকায় এই কার্য্য-স্বিচরণীতে প্রকাশ করিতে কুষ্ঠিত হইলাম। ঘাটালে যে গীত হইয়াছিল

তাহা তত্রস্থ হরিসভা হইতে পৃথক ছাপা হইয়াছে।

ঘাটাল চক্র ও জাহানাবাদ চক্র পরিদর্শন করিয়া শ্রীশ্রীনামহট্টের কর্মচারিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, এই স্বল্পকালের মধ্যে হাটের কার্যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। সাধারণতঃ ব্রাজকবিপণী মহাশয়েরা বিশেষ যত্নের সহিত নিজ নিজ কার্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ ঘাটাল চক্রের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত যতুনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয়ের কার্যের বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার আয় কর্মচারী যদি প্রতি-চক্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিশেষ আনন্দের বিষয় হয়। অগ্ন্যায় চক্র পরিদর্শনকালে বোধ হয়, সে আনন্দ লাভ করা যাইবে।

এখন আমাদিগের বক্তব্য এই যে, কর্মচারী মহোদয়গণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখেন—

১। শ্রীশ্রীনামহট্টের মহিমা ঘরে ঘরে প্রকাশিত হয়, এই কার্যটি টহলদার পদাতিক মহাশয়দিগের উপর নির্ভর করে।

২। অনেক স্থানে আমরা দেখিলাম যে, নামগান বলিয়া কতকগুলি ভুক্তি-মুক্তি-কামপূর্ণ বাজে পদের গান হইতেছে। শ্রীনামহট্ট হইতে এইরূপ হওয়া উচিত নয়। পূর্বমহাজন-কৃত নাম, গীত এবং বৈষ্ণবসিদ্ধাস্তমালায় প্রকাশিত নাম-গীতসকল অথবা তদনুরূপ যে-কোন নাম রচিত হয়, তাহাই কেবল গীত হওয়া উচিত। আমরা আশা করি যে, চক্রপতি কর্মচারিগণ এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবেন।

৩। অনেক স্থানে প্রচারক্ষেত্রে তত্রস্থ ভক্তগণ কর্মচারীদিগকে ভোজন করাইবার যত্ন পান, তাহাতে তাঁহাদের রসাস্বাদনের অনেক ব্যাঘাত হয়, এইরূপ না হওয়াই ভাল। ইহার দ্বারা প্রয়োজনীয় আতিথ্যের নিষেধ করা হইল না।

৪। অনেক স্থানে বহুতর কালোয়াংগণ শ্রীনামহট্টের গায়কপদ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই পূর্ব হইতে প্রচলিত বৈঠকী গানসকল গাইয়া থাকেন, সেইসকল গান প্রায় শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ; আমাদের ইচ্ছা এই যে, শুদ্ধ-ভক্তি ও শুদ্ধনামযুক্ত বৈঠকীপদ-সকল প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। চক্রপতি মহাশয়গণ সেইরূপ পদ রাগিনী, তাল উল্লেখ করত প্রস্তুত করাইয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা বৈষ্ণবসিদ্ধাস্তমালায় প্রকাশ করিব।

৫। যে যে হরিসভায় শুদ্ধভক্তি ও শুদ্ধনামের আলোচনা নাই এবং অর্থ সংগ্রহ-পূর্বক হইয়া থাকে, সেই সকল হরিসভার সহিত শ্রীনামহট্টের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

রাখা উচিত নয়, নচেৎ শ্রীশ্রীনামহট্টের মহিমা থাকিবে না।

শ্রীরামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভূজ সহরৎকারী, শ্রীকেশদারনাথ দত্ত
ভক্তিবিনোদ, পরিমার্জক, শ্রীসীতানাথ দাস মহাপাত্র, পতাকাধারী।

হাটের কার্য

শ্রীধামনবদ্বীপান্তর্গত গোক্রমক্ষেত্রে স্বরভিকুঞ্জে শ্রীশ্রীনামহট্টের পরিমার্জক, প্রচারক প্রভৃতি কতিপয় কর্মচারী স্থানীয় ভক্তবৃন্দের নিয়ম-সেবা উপলক্ষে নামোৎসব করিয়াছিলেন। বিগত ২৭শে আশ্বিন হইতে ৩০শে কার্তিক পর্য্যন্ত প্রতি-দিবস আরতি, নামকীর্তন, ভক্তিগ্রন্থ-পঠন, ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন, সময়ে সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি-দর্শন এবং নগরকীর্তন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরেকে গোরাদহ, সপ্তঋষির ভজনস্থান, হংসবাহন, স্বরাট্ট শৈল, হরিহর ক্ষেত্র, হিরণ্য-কুঞ্জ প্রভৃতি প্রভুর লীলা-স্থান অন্বেষণ-পূর্ব্বক তথায় নামগান ও তত্ত্বস্থানের লীলা-বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল। তাহাতে সেই সকল লীলাস্থলীয় গ্রামবাসীরা স্থান-মাহাত্ম্য অবগত হইয়া কি পর্য্যন্ত আনন্দ অমুভব করিয়াছিলেন, তাহা বাক্যের দ্বারা বর্ণন করা হুঃসাধ্য। কেহ কেহ সেই সেই লীলা-স্থলে গড়াগড়ি দিয়া মনের উল্লাসে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কাহার কাহার অশ্রুপাত এবং সকলের অঙ্গে পুলক হইয়াছিল। হিরণ্যকুঞ্জে শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যানে নামগান হওয়াতে তিনি যথেষ্ট অমুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গোক্রম-মহাস্থ শ্রীযুত নীলমাধব চক্রবর্তী মহাশয়ের যত্নে উচ্চ সংকীর্তন-সহ পার নবদ্বীপ ভ্রমণ এবং প্রৌঢ়া মায়া প্রভৃতি নানা দেবালয়ে শুকনাম গান এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অঙ্গনে তাঁহার নাম স্থললিত-স্বরে কীর্তন হইয়াছিল। তৎকালে আবাল-বৃদ্ধ-বালক সকলেই স্থির চিত্তে শ্রবণ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং পুরাঙ্গনারা অশ্রুপূর্ণ-লোচনে গায়কদিগের উপর পুষ্পের ত্রায় বাতাসা বর্ষণ করিয়াছিলেন। তথায় অনেক বিজ্ঞ ও তদ্বজ্ঞ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। প্রভুর এরূপ হৃদয়রঞ্জক নাম পূর্ব্বের শ্রুতিগোচর হয় নাই।

সেনাপতি ও তত্বন পদাভিক

শ্রীশ্রীগোক্রম-কল্যাণবীর দ্বিতীয় ক্রমে যে বিংশতি প্রকার কর্মচারীর উল্লেখ আছে, তদ্ব্যতীত আর কয়েক প্রকার কর্মচারী নিযুক্ত হইতেছেন। নামের হাট যত বল প্রকাশ করিতেছেন, হাটের প্রতিপক্ষ পাষণ্ড কলি ততই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ করিতেছে। সসৈন্ত পাষণ্ড কলিকে দমন করিবার জন্ত

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অপ্রাকৃত প্রেমপূর্ণ ভগবন্মাম প্রচার-কার্যের সংরক্ষনার্থে একদল নূতন সেনা সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রধান সেনাপতি, প্রদেশস্থ সেনাপতি, চক্রস্থ সেনাপতি ও টহলদার, পদাতিক প্রভৃতি অনেক প্রকার কর্মচারিগণ উক্ত সেনার অঙ্গবিশেষ। টহলদার পদাতিকগণ প্রতি গ্রামে কার্য্য করিবেন। চক্রস্থ সেনাপতি, প্রদেশস্থ সেনাপতি ও প্রধান সেনাপতি মহোদয়গণ আবশ্যকমত শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা পাষণ্ড মত নিরসন-পূর্ব্বক ভগবন্মাম-মাহাত্ম্য স্থাপন করিবেন।

টহলদার মহোদয়দিগের নিম্নমানবনী

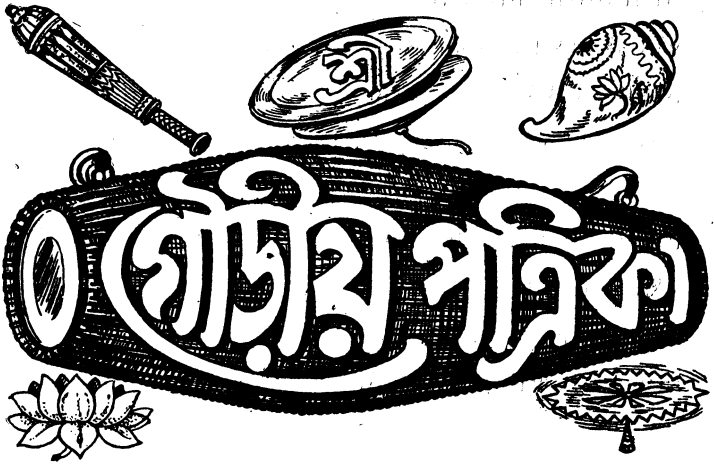
১। সাধুসম্মত বেশে ভক্তিভাবে করতালধ্বনি করিতে করিতে টহলদার পদাতিক মহাশয় তাঁহার অবকাশ-ক্রমে প্রতিদিন অন্যান্য পাঁচটা গৃহস্থের বাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রচার করিবেন। ২। আজ্ঞা প্রচার করিতে যতক্ষণ লাগে, তাঁহার অধিক্ষণ সেই গৃহস্থের বাটীতে থাকিবেন না। ৩। দৈন্ত্যমুচক স্বরে আজ্ঞা গান করিবেন। ৪। গৃহস্থের নিকট কোন পার্থিব বস্তু প্রার্থনা বা গ্রহণ করিবেন না। ৫। গৃহস্থ যদি কোন প্রকার রুঢ় ব্যবহার করেন, পদাতিক মহাশয় তাঁহাকে স্তম্ভিত বাক্যের সহিত সন্তুষ্ট করিতে যত্ন করিবেন। কখন কোন প্রকার ক্রোধ বা ষ্ট্রণা মনেও আনিবেন না। ৬। যদি কোন ব্যক্তি টহলদার মহাশয়ের সহিত কিছু বিতর্ক করিতে চাহেন, তবে তিনি স্বয়ং কোন বিষয় বিতর্ক না করিয়া নিকটস্থ সেনাপতি মহাশয়কে জানাইবেন। ৭। টহলদার মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীনামহট্টের একটা ছোট নিশান থাকিবে। ৮। যাহারা ভিক্ষা ও মদ্যোপজীবী, তাঁহারা টহলদার পদাতিক হইতে পারিবেন না। ৯। নামহট্টের কার্য্য করিয়া কেহ কোন পার্থিব সাহায্যের আশা করিবেন না। যে সত্বপায়ে তিনি নিজের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, সেই উপায়লব্ধ অর্থের দ্বারায় নিশান ও করতাল পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে হইবে। এরূপ হইলে নিঃস্বার্থ কার্য্যের দ্বারায় তিনি মূল মহাজন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পরিতুষ্ট করিবেন।

সেনাপতি মহোদয়দিগের নিম্নমানবনী

১। সেনাপতিগণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব সংস্থাপন করিবার জগৎ বেদ ও তদনুগত স্মৃতি ও মীমাংসা-শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিবেন।

২। তাঁহারা গ্রামে গ্রামে টহলদার পদাতিক নিযুক্ত করাইয়া তাঁহাদিগকে কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা দিবেন এবং আবশ্যক হইলে ভক্তিপূর্ণ শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদের পৃষ্ঠ-পোষণ করিবেন।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥
অত্র ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১ম বর্ষ } সঙ্কর্ষণ, ১০ দামোদর, ৪৬৩ গৌরাক্ষ
সোমবার, ৩০ আশ্বিন ১৩৫৬, ইং ১৭১০।৪৯ } ৮ম সংখ্যা

শ্রীলসরস্বতীগোস্থাম্যষ্টকম্

(১)

আশৈশবোপাসিতভক্তিয়োগং
হৃঃসঙ্গত্যাগায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞং ।
কৃষ্ণানুসন্ধাননিমগ্নচিত্তং
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্ ॥

(২)

শ্রীগৌরপাদাজমুভঙ্গরাজং
নাম্নাং প্রচারোত্তমপূর্ণহৃদং ।
শ্রীধামসেবাসু নিতাস্তচেষ্টং
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্ ॥

(৩)

শাস্ত্রার্থনির্দ্ধারণসম্বরণ্যং
ভক্তের্বিরুদ্ধাশয়ভেদদক্ষং ।
নিত্যং সতাং মানসরাজহংসং
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্ ॥

(৪)

নির্মায়া বিস্তারিসুবোধভাষ্যং
তত্ত্বাকলোকস্ত সুদৃক্ প্রদক্ষং ।
উৎপাদিতাশেষস্বধী প্রমোদং
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্ ॥

(৫)

গোপেশনেত্রোৎসববৃদ্ধিরামং
ঔদার্যমাধুর্য্যরসাক্ষিপূর্ণং ।
রাধাসরস্বতীরনিবাসযত্নং
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্ ॥

(৬)

শুদ্ধেন জ্ঞানেন জগজ্জনানাং
বিনাশিতং মোহঘনাক্রকারং ।
আচার্য্যব্যৰ্য্যেণ কৃপাময়েন
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্ ॥

(৭)

পারেসমুদ্রং গুরুগৌরবাণীম্
আল্লায়ধারা প্রসূতাং সমৃদ্ধাং ।
বিস্তার্য্য যোহত্যন্তমুদং প্রলেভে
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্ ॥

(৮)

চৈতন্যসংগীতিসহস্রবক্ত্রং
জীবন্ত দুঃখেন দয়াদ্র চিত্তং ।
ভূত্যেষু দীনেষু কৃপাগুণাক্ষিং
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্ ॥

শ্রীল সরস্বতী-গোষামাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যিনি আশৈশব ভক্তিযোগের উপাসক, দুঃসঙ্গ ত্যাগে দৃঢ়-সঙ্কল্প এবং কৃষ্ণাঙ্ক-সন্ধানে নিমগ্ন-চিত্ত, সেই শ্রীল সরস্বতী প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

যিনি শ্রীগৌরপাদপদ্মের মধুপগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নাম-প্রচারোত্তমে যাহার হৃদয় পরিপূর্ণ এবং শ্রীধাম-সেবায় যিনি সাতিশয় চেষ্টান্বিত, সেই শ্রীল সরস্বতী প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

যিনি শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত করিয়া সজ্জন-বরণ্য হইয়াছেন, যিনি ভক্তিবিরুদ্ধচিত্তকে দমন করিতে নিপুণ এবং সাধুগণের মানস-সরোবরে রাজহংস স্বরূপে নিত্য বিচরণশীল, সেই শ্রীল সরস্বতী প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

যিনি সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া তত্ত্ববিষয়ে অন্ধজগৎকে সুদর্শন প্রদান করিয়াছেন এবং সুধী ব্যক্তিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই শ্রীল সরস্বতী প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

যাঁহার রমণীয় স্বরূপ দর্শন করিয়া কৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধিত হয়, যিনি ঐদার্য্য ও মাধুর্য্যের পরিপূর্ণ সমুদ্র, যিনি অতীব আগ্রহে রাধাকুণ্ডতটে অবস্থান করিতেছেন, সেই শ্রীল সরস্বতী প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

যে কৃপাময় আচার্য্যশ্রেষ্ঠ কর্তৃক বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রদত্ত হইয়া জগদ্বাসীর অজ্ঞান তিমির বিদূরিত হইয়াছে, সেই শ্রীল সরস্বতী প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

যিনি আশ্রয়ধারা-প্রসৃত সমুদ্রিশালী শ্রীগুরু-গৌর-বাণী সমুদ্রপারে অর্থাৎ পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীল সরস্বতী প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

যিনি শ্রীচৈতন্য-গুণকীর্তনে সহস্র-মুখ, জীব-হৃৎথে যাঁহার হৃদয় বিগলিত এবং দীন ভূত্যের প্রতি যিনি কৃপাসিদ্ধ, সেই শ্রীল সরস্বতী প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

পাঞ্চরাত্রিক অধিকার

বৈষ্ণবগণের বিভিন্ন পরিচয়

বৈষ্ণবগণ ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নানা নামে পরিচিত। কোন ঐতিহাসিক তাঁহাদিগকে দ্বাদশটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সাত্বত, ভক্ত, ভাগবত, পাঞ্চরাত্রিক, বৈখানস, কর্ম্মহীন, অকিঞ্চন, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি নাম-ভেদ অনেকস্থলে কীর্ণিত হয়। আবার নির্বিশেষবাদীর অনুচরস্বরূপে পঞ্চদেবো-পাসকের অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব বা থিয়সফিষ্টগণের মধ্যে বৈষ্ণব পরিচয়াকাজ্জী ব্যক্তিরও অভাব নাই। শেষোক্ত পঞ্চোপাসকী নির্বিশেষ মত পোষণ করিয়া বৈষ্ণব-বিশ্বাস হইতে চ্যুত।

বৈষ্ণবগণ পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত ভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ

বৈষ্ণবগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও স্থূলতঃ তাঁহাদের মধ্যে দুইটি প্রবল বিভাগ দৃষ্ট হয়। অর্চন আশ্রয়ে বৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে পাঞ্চরাত্রিক এবং ভাবমার্গানুসরণে ভাগবত বলিয়া সংজ্ঞিত হন। শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশমতে শ্রীভাগ-বতমার্গীয় ও পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভেদ লক্ষিত হইলেও উভয়েই শ্রীভগবদ্বক্ত। পঞ্চরাত্র ও ভাগবত উভয়মতেই শুদ্ধভক্তিকেই লক্ষ্য করে। শ্রীচরিতামৃত মধ্যলীলা ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ১৬৯ সংখ্যায় শ্রীপ্রভুর উক্তি,—

এই ‘শুদ্ধভক্তি’, ইহা হৈতে ‘প্রেমা’ হয়।

পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥

পঞ্চরাত্র কাহাকে বলে ও তাহার অর্থ কি ?

পঞ্চরাত্র শব্দে পাঁচটি জ্ঞান বিষয়ক প্রণালী। রাধাতুর অর্থ দান করা। পঞ্চজ্ঞান বিষয়ক কথা যে শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়, তাহাই পঞ্চরাত্র। জ্ঞান-বচনই রাত্র। জ্ঞান পাঁচ প্রকার। তজ্জ্ঞ পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রকে পঞ্চরাত্র বলেন।

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।

তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ (নারদপঞ্চরাত্র ১।১।৪৪)

প্রথম সাত্ত্বিক জ্ঞান, দ্বিতীয় নিগূর্ণ জ্ঞান, তৃতীয় সর্বপর জ্ঞান, চতুর্থ রাজসিক জ্ঞান এবং পঞ্চম তামসজ্ঞান। রাজসিক জ্ঞান ভক্তের প্রাপ্য নহে এবং তামসিক জ্ঞান পণ্ডিতের বাঞ্ছনীয় নহে।

শ্রীরামানুজীয় অর্থ-পঞ্চক

শ্রীরামানুজ-শিষ্য কুরেশের পুত্র পরাশর ভট্ট। পরাশরের শিষ্য বেদান্তী ও অনুশিষ্য নম্বুর বরদরাজ। ইহার শিষ্য পিল্লাই লোকাচার্য্য। ইনি অর্থপঞ্চক নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অর্থপঞ্চকের বঙ্গানুবাদ পূর্বেই সজ্জনতোষণী পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে জীব, ঈশ্বর, পুরুষার্থ, উপায় ও বিরোধি-স্বরূপ—এই পঞ্চ স্বরূপ জ্ঞানের অন্তর্গত পঞ্চভেদে পঞ্চবিংশতি অর্থ কথিত।

শ্রীমাধ্বমতে ভেদ-পঞ্চক

শ্রীমাধ্বগণের মতে বস্তু বিষয়ে পঞ্চভেদ জ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরে জীবে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, ঈশ্বরে জড়ে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ ও জীবে জড়ে ভেদ—এই পঞ্চ জ্ঞান। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পঞ্চ বিষয়ক জ্ঞান-দ্বারা পুরুষার্থ জ্ঞান লাভ ঘটে।

পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও তদতিরিক্ত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও পুরুষ—পঞ্চ বিষয়ক পঞ্চ শুদ্ধজ্ঞানও পঞ্চরাত্র। নির্বিশেষবাদীর মতানুগত আগম-শাস্ত্রকেও পঞ্চোপাসকীগণ পঞ্চরাত্র আখ্যা দেন।

সাত প্রকার পঞ্চরাত্র মধ্যে পাঁচ প্রকার সাত্ত্বিক

পঞ্চরাত্র সাতটি। ১। ব্রাহ্ম, ২। শৈব, ৩। কোমার, ৪। বাশিষ্ঠ, ৫। কাপিল, ৬। গৌতমীয় ও ৭। নারদীয়। ইহা নারদীয় পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ কৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৩২ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, পাঁচটি পঞ্চরাত্রেই কৃষ্ণমহাত্ম্য বর্ণনপূর্বক গ্রন্থের প্রবৃতি হইয়াছে। বাশিষ্ঠ, নারদীয়, কাপিল, গৌতমীয় ও সনৎকুমারীয়—এই পাঁচটি সাত্ত্বিক পঞ্চরাত্র। এতদ্ব্যতিরিক্ত

হয়শীর্ষ, পৃথু, ধ্রুব প্রভৃতি পঞ্চরাত্রের অস্তিত্ব আছে। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবের মধ্যেও শ্রীগৌরানন্দ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ—এই পঞ্চ-তত্ত্বের অর্চন হইয়া থাকে।

অর্চনীয় পাঞ্চরাত্রিক অনুষ্ঠান ও বৈদিক ভাগবত অনুষ্ঠান পৃথক্

পাঞ্চরাত্রিকগণের অনুষ্ঠান আগমশাস্ত্রবিহিত, তজ্জন্তু পাঞ্চরাত্রিকগণ অর্চনপর। অযোগ্য ব্যক্তি অনুষ্ঠানপ্রভাবে যোগ্যতা লাভ করেন। যোগ্যব্যক্তিই বৈদিক প্রয়োগের অনুষ্ঠান করেন। নারদাদিপঞ্চরাত্র ও বৈদিক স্তপক ফল শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য এক হইলেও অনুষ্ঠানভেদ সর্বতোভাবে স্বীকার্য।

অর্চনপর বৈষ্ণব ত্রিবিধ ও তাঁহাদের লক্ষণ

অর্চনপর বৈষ্ণবগণের অধিকার ভাগবতগণের হ্রায় তিন প্রকার শাস্ত্রে কথিত আছে। অর্চনপর **কণিষ্ঠ বৈষ্ণব লক্ষণে** শাস্ত্র বলেন,—

শঙ্খচক্রাদ্যুর্দ্ধপুণ্ডধারণাত্মালক্ষণং ।

তন্নমস্করণকৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে ॥ (পাদ্মোত্তরখণ্ড)

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-চিহ্ন ধারণ এবং ললাটাদি উর্দ্ধ দ্বাদশাঙ্গে হরিমন্দির পুণ্ড ধারণ করিয়া যিনি আপনাকে অপ্রাকৃত বিষ্ণুদাস লক্ষণে অবগত আছেন এবং তাদৃশ বিষ্ণুমন্দির চিহ্নের নমস্করণরূপ অনুষ্ঠানে জীবের বৈষ্ণবত্ব কথিত হয়। অর্চনপর **মধ্যম বৈষ্ণব লক্ষণে** শাস্ত্র বলেন,—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ ।

অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥ (ঐ)

হরিতাপ, হরিপুণ্ড্র, বিষ্ণুদাস্তবোধক নাম, বিষ্ণুমন্ত্র ও বিষ্ণুযাগ—এই পঞ্চ সংস্কারবিশিষ্ট হইলে বৈষ্ণব, পরম ঐকান্তিক মহাভাগবত হইবার যোগ্য হন অর্থাৎ মধ্যম বৈষ্ণবাত্মা লাভ করেন। পঞ্চসংস্কার পূর্বে সজ্জনতোষণীতে আলোচিত হইয়াছে। অর্চনপর **উত্তম বৈষ্ণব লক্ষণে** শাস্ত্র বলেন,—

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ ।

অর্থ-পঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥ (ঐ)

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পঞ্চ সংস্কারবিশিষ্ট মধ্যম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, নয় প্রকার ইজ্যাকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া অর্থপঞ্চকে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে মহাভাগবত বলিয়া কথিত হন। তিনি সেই কালে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাদাতা গুরুর কার্য্য করিতে সমর্থ হন।

শ্রীগুরুর লক্ষণ

এজন্ত গুরুলক্ষণে শাস্ত্র-বচনসমূহ হরিভক্তিবিলাসে একরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে,—

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নাং ।

সর্বেষামেব লোকানাংসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৯ ধৃত পাদ্ম-বাক্য)

ব্রাহ্মণঃ সর্বকালজঃ কুর্ধ্যাৎ সর্বেষমুগ্রহঃ ।

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৬ ধৃত নারদ-পঞ্চরাত্র-বাক্য)

অধ্যাত্মবিদ্বৎস্বামী বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ।

উদ্ধর্তুং চৈব সংহর্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৪ ধৃত অগস্ত্য-সংহিতা-বাক্য)

তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে ।

দেবতোপাসকঃ শাস্ত্রো বিষয়েষপি নিস্পৃহঃ ।

অবদাতাম্বয়ঃ, শুদ্ধঃ স্বেচ্ছাচারতৎপরঃ ।

আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্বশাস্ত্রবিৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩২ ধৃত মন্ত্রমুক্তাবলী-বাক্য)

ধীমানমুদ্বৃত্তমতিঃ পূর্ণোহহন্তা বিমর্শকঃ ।

সংগোহর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ ॥

[মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অশেষ বৈষ্ণবধর্ম্মরত এবং শ্রীভগবদ্গাহ্যাদি জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ মনুষ্যমাত্রের গুরু, ইনি সমুদয় লোকের মধ্যে হরির ন্যায় পূজনীয় ।

সর্বকালজ্ঞ অর্থাৎ পঞ্চরাত্রবিধানোক্ত পঞ্চকালবেত্তা ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের প্রতি মন্ত্র প্রদানাদি দ্বারা অনুগ্রহ করিবেন ।

অর্থাৎ—যিনি আত্মবিষয়কজ্ঞানশীল, বেদাধ্যাপক, বেদশাস্ত্রের অর্থসমূহে সুপণ্ডিত, মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রসংহার করিতে সমর্থ, তিনি উত্তম ব্রাহ্মণ ।

তপস্বী, সত্যবাদী ও গৃহস্থ গুরু নামে অভিহিত ।

তিনি দেবতার উপাসক, শাস্ত্র এবং বিষয়সকলে স্পৃহাশূন্য ।

অর্থাৎ—তঁাহার বংশে কখনও পাতিত্যাदि দোষ উৎপন্ন হয় নাই, তিনি স্বয়ং শুদ্ধ, নিজোচিত আচারবিষয়ে তৎপর, আশ্রমযুক্ত, ক্রোধরহিত, বেদজ্ঞ এবং সর্বশাস্ত্রবেত্তা ।

তিনি বুদ্ধিমান, স্থিরবুদ্ধি, পূর্ণ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাশূন্য, অহিংসক,

বিবেচনাশীল, বাৎসল্যাদিগুণযুক্ত, ভগবৎপ্রতিমাসকলের পূজায় কৃতনিশ্চয়, কৃতজ্ঞ ও শিষ্যবৎসল।]

মহাকুলপ্রসূতোহপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।

সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ শ্রাদ্ধবৈষ্ণবঃ ॥

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ ।

বৈষ্ণবোহভিহিতোহভিজ্ঞৈরিতরোহশ্রাদ্ধবৈষ্ণবঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৪০, ৪১-ধৃত পাদ্ম-বাক্য)

[অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ, মহাকুলে উৎপন্ন হইলেও এবং সর্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেও সহস্রশাখা অধ্যয়ন করিলেও যদি বৈষ্ণব না হন, তাহা হইলে তিনি গুরু হইতে পারিবেন না। যিনি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন ও বিষ্ণুপূজায় তৎপর, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন, তন্নিম্ন অগ্র ব্যক্তি অবৈষ্ণব।]

নবেজ্য-কর্মের সংজ্ঞায় শ্রীল জীবগোস্বামী

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে নবেজ্যাকর্মের একরূপ সংজ্ঞা উদ্ধার করিয়াছেন,—

অর্চনং মন্ত্রপঠনং যোগো যাগো হি বন্দনং ।

নামসংকীর্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা ॥

তদীয়ারাদনক্ষেজ্য নবধা ভিद्यতে শুভে ।

নবকর্মবিধানেজ্য বিপ্রাণাং সততং স্মৃতা ॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৯৮ সংখ্যাদ্বিতীয় পাদ্যোক্ত-বাক্য)

১। অর্চন, ২। মন্ত্র পঠন, ৩। যোগ, ৪। যাগ, ৫। বন্দন, ৬। নামসংকীর্তন, ৭। সেবা, ৮। চিহ্নদ্বারা অঙ্কন, ৯। বৈষ্ণবপূজা। হে শুভে ! এই নয়টাকে ইজ্য বলে। এই নবকর্মবিধানে ব্রাহ্মণগণের সর্বদা ভগবদর্চন বিধেয় জানিতে হইবে।

অর্থপঞ্চক ব্যাখ্যায় শ্রীল জীবপ্রভু

শ্রীল জীবপ্রভু অর্থপঞ্চক ব্যাখ্যায় একরূপ লিখিয়াছেন,—

অর্থপঞ্চকবিশুদ্ধ উপাশ্রুঃ শ্রীভগবান্, তৎপরমং পদং তদ্ভ্যং তন্মন্ত্রঃ জীবাত্মা চেতি পঞ্চতত্ত্বজ্ঞাতৃহঃ । তচ্চ হয়শীর্ষে বিবৃতং সংক্ষিপ্য লিখ্যতে—

এক এবেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

পুণ্ডরীকবিশালাক্ষকৃষ্ণচ্ছুরিতমূর্দ্ধজঃ ॥

বৈকুণ্ঠাধিপতিদেব্যা নীলয়া চিৎস্বরূপয়া ।

স্বর্ণকান্ত্যা বিশালাক্ষ্যা স্বভাবাদ্ গাঢ়মাশ্রিতঃ ॥

নিত্যঃ সর্বগতঃ পূর্ণো ব্যাপকঃ সর্বকারণম্ ।

বেদগুহ্যো গভীরাগ্না নানাশক্ত্যোদয়ো নব ॥ ইত্যাদি ।

তৎপরমংপদং—স্থানতত্ত্বমতো বক্ষ্যে প্রকৃতে: পরমব্যয়ং ।

শুদ্ধসত্ত্বময়ং সূর্য্যচন্দ্রকোটিসমপ্রভম্ ॥

চিন্তামণিময়ং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণং ।

আধারং সর্বভূতানাং সর্বপ্রলয়বর্জিতম্ ॥

তদ্ভূতং—দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ ।

সর্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ ॥

ভবন্তি তাদৃশা বল্ল্যস্তদ্বৎকাপি তাদৃশং ।

গন্ধরূপং স্বাদুরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ ॥

হেয়াংশানাংভাবাচ্চ রসরূপং ভবেদ্ধি তৎ ।

ত্বগ্বীজক্ণেব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যদ্ববেৎ ॥

সর্বং তদ্বৌতিকং বিদ্ধি ন হ্যভূতময়ঞ্চ যৎ ।

রসস্ত যোগতো ব্রহ্মন্ ভৌতিকস্বাদুবদ্ববেৎ ॥

তস্মাৎ সাধ্যঃ রসো ব্রহ্মন্ রসঃ শ্রাদ্ ব্যাপকঃ পরঃ ।

রসবদ্বৌতিকং দ্রব্যমত্র শ্রাদ্ রসরূপকমিতি ॥

তদ্ব্যবঃ—বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতমাত্রয়োরিহ ।

অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মন্ তত্ত্ববিদ্বির্বিচারিতঃ ॥ ইত্যাদি ।

জীবাত্মা—মরুৎসাগরসংযোগে তরঙ্গাৎ কণিকা যথা ।

জায়ন্তে তৎ স্বরূপাশ্চ তদুপাধিসমাবৃত্তাঃ ॥

আল্লেখ্যাদুভয়োস্তদ্বদাত্মানশ্চ সহস্রশঃ ।

সঞ্জাতাঃ সর্বতো ব্রহ্মন্ মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপতঃ ॥

ইত্যাখ্যপি কিন্তু ভগবদাবির্ভাবাদিষু স্বশোপাসনাশাস্ত্রানুসারেণ অপরোপি বিশেষঃ কশ্চিজ্জৈয়ঃ ।

[অর্থপঞ্চকজ্ঞাত্ব, যথা—উপাশ্রু শ্রীভগবান্, ভগবানের পরমপদ তদীয় দ্রব্য, তদীয় মস্ত্র ও জীবাত্মা—এই পঞ্চতত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনিই অর্থপঞ্চক-জ্ঞাতা । এ বিষয় হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে বিবৃত হইয়াছে । এস্থলে কেবলমাত্র সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে :—

কৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, পদ্মপত্রসদৃশ বিশালনয়নযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণখচিত কেশপাশবিশিষ্ট। সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি বিশালাক্ষী, স্বর্ণকান্তি, চিৎস্বরূপা লীলাদেবী কর্তৃক স্বভাবতঃই দৃঢ়রূপে আলিঙ্গিত রহিয়াছেন। তিনি নিত্য, সর্বগত, পূর্ণ, ব্যাপক, সর্বকারণ, বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, স্বরূপতঃ গুহ্য, নানাবিধ শক্তির আশ্রয় এবং নিত্য নবভাবযুক্ত ইত্যাদি।

অনন্তর ভগবানের স্থানতত্ত্ব বলিব। উহা প্রকৃতির অতীত পদার্থ, অব্যয়, শুদ্ধসত্ত্বময় ও কোটীচন্দ্রসূর্য্যের প্রভায়ুক্ত। ঐ স্থান চিন্তামণিময়, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সর্বভূতাদ্যার ও সর্ববিধ প্রলয়বর্জিত। ইত্যাদি।

হে ব্রহ্মন্! এইবার সংক্ষেপে দ্রব্যতত্ত্ব বর্ণন করিব, তাহা শ্রবণ করন্। উক্ত স্থানে সর্বভোগপ্রদ কল্পবৃক্ষসমূহই একমাত্র বৃক্ষ, তথায় লতা সমূহও তাদৃশ সর্বভোগপ্রদ এবং তদুদ্ভূত ফলপুষ্পাদিও তাদৃশ। আবার সে স্থানে স্তম্ভস্তম্ভস্বাদু দ্রব্য, পুষ্পাদি যাহা কিছু অবস্থিত তাহাতে কোন হেয়াংশ না থাকায় সকলই রসস্বরূপ। ত্বক্, বীজ এবং কঠিনাংশ যাহা কিছু তাহাই হেয়াংশ, আর তাহা সকলই ভৌতিক; অতএব তাহা কখনও অভৌতিক হইতে পারে না। রস-সংযোগেই ভৌতিক বস্তু স্বাদুভাবযুক্ত হয়। অতএব হে ব্রহ্মন্! রসই পরম সাধ্য এবং ব্যাপক বস্তু। সাধারণতঃ ভৌতিক দ্রব্য রসযুক্ত, পরন্তু এ স্থানে চিন্ময় দ্রব্যসমূহ—সাক্ষাৎ রসস্বরূপ।

সম্প্রতি তদীয় মন্ত্রতত্ত্ব বলা যাইতেছে,—হে ব্রহ্মন্! দেবতা ও তদীয় মন্ত্রের মধ্যে বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ অবস্থিত। দেবতা—বাচ্য এবং মন্ত্র, তাঁহার বাচক। কিন্তু তত্ত্ববিদগণ বিচার-সহকারে মন্ত্র ও দেবতাকে অভিন্নরূপেই কীর্তন করিয়া থাকেন। ইত্যাদি।

এইরূপ জীবতত্ত্ব—হে ব্রহ্মন্! বায়ু ও সাগরের সংযোগে উৎপন্ন তরঙ্গ হইতে যেরূপ তৎস্বরূপ এবং তদীয় উপাধিসমাবৃত সহস্র সহস্র কণিকার উৎপত্তি হয়, সেইরূপ উভয়ের আশ্লেষবশতঃ মূর্ত ও অমূর্তরূপে সহস্র সহস্র আত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে। ইত্যাদি।

কিন্তু নিজ নিজ উপাসনা-শাস্ত্রানুসারে শ্রীভগবদাবির্ভাবাদিবিষয়ে এতদতিরিক্ত অপর কোন বিশেষভাবও জ্ঞাতব্য হইয়া থাকে।]

পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় ইহ জন্মেই ব্রাহ্মণতা লাভ হয়

পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে মধ্যম বৈষ্ণবের মন্ত্রগ্রহণরূপ অহুষ্ঠানের পর তাঁহার

ব্রাহ্মণতা লাভ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংশ্চং রসবিধানতঃ ।

তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥ (তত্ত্বসাগর-বচন)

[যে রূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেয়ই বিপ্রতা সাধিত হয় ।]

যশ্চ যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং ।

যদন্ত্যত্রাপি দৃশ্যেত তন্তেনৈব বিনির্দেশেৎ ॥ (ভাঃ ৭।১।১৩৫)

[মনুষ্যাগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যে স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণে তাহাকে নির্দেশ করিতে হইবে। (কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না ।)]

ভুক্তিরষ্টবিধা হেষ্ণা যস্মিন্ শ্লেচ্ছহপি বর্ততে

স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতাঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

[এই অষ্টবিধাভুক্তি যদি শ্লেচ্ছকুলোৎপন্ন ব্যক্তিতেও দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনিই বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী ও পণ্ডিত ।]

“কারণানি দ্বিজত্বশ্চ বৃত্তমেব তু কারণম্ ॥” (মঃ অনুঃ পঃ ১৪৩।৫০)

[জন্ম, সংস্কার, বেদ অধ্যয়ন ও সন্ততি—দ্বিজত্বের কারণ নহে ; বৃত্তই একমাত্র দ্বিজত্বের কারণ ।]

“শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥” (মঃ অনুঃ পঃ)

[এই সকল আচরিত শুভকর্মদ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন এবং বৈশ্যও ক্ষত্রিয় হইয়া থাকেন ।]

সুতরাং ইহজন্মেই পাঞ্চরাত্রিক অধিকারীর ব্রাহ্মণতা লাভে কেহই বাধা দিতে পারেন না। কাহার মতে পাঞ্চরাত্রিক মহাভাগবত স্ব জন্মান্তর-নাপেক্ষ, পরন্তু শাস্ত্রসমূহ, শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা বলেন না।

—শ্রীল প্রভুপাদ



সদগুণ ও ভক্তি

শুভ কত প্রকার ?

শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তির ছয়টি মাহাত্ম্যের মধ্যে শুভদত্ত্ব একটা মাহাত্ম্য বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত হইয়াছে। শুভ কত প্রকার এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে,—

শুভানি প্রীণনং সৰ্ব্বজগতামনুরক্ততা ।

সদগুণাঃ সুখমিত্যাদীত্যাখ্যানানি মনীষিভিঃ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ সাঃ লঃ ২৮)

ভক্তি যে-পুরুষে উদ্ভিতা হন তিনি সমস্ত জগৎকে প্রীতি দান করেন এবং সৰ্ব্ব জগতের অনুরাগভাজন হন। তিনি অনায়াসে সমস্ত সদগুণের আধার হন এবং সমস্ত পবিত্র সুখলাভ ও অনেক অল্পপ্রকার শুভ লাভ করেন। পণ্ডিতগণ এই সকলকে শুভ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন।

ভগবদ্ভক্তে যাবতীয় গুণ ও দেবতাগণের সমাবেশ

ভক্তপুরুষ যে সমস্ত সদগুণসম্পন্ন হন তাহা নিম্নলিখিত ভাগবত-বচনে কথিত হইয়াছে ;—

যশ্চাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চন।

সৰ্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে স্বরাঃ ।

হরাবভক্তস্ত কুতো মহদগুণা

মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ (ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবানে যাহার অকিঞ্চন ভক্তি হয় তাঁহাতে সমস্ত গুণের সহিত দেবতাগণ আশ্রয় গ্রহণ করেন। অসং বহির্ব্যাপারে যাহার মন ধাবমান এমন অভক্ত-জনের মহদগুণ কিরূপে হইতে পারে।

স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে ;—

এতে ন হৃদ্ভূতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ ।

হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্নাঃ পরতাপিনঃ ॥

অন্তঃশুদ্ধির্বহিঃশুদ্ধিস্তপঃ শাস্ত্যাদয়স্তথা ।

অমী গুণাঃ প্রপচ্ছন্তে হরিসেবাভিকামিনম্ ॥

হে ব্যাধ ! তোমার যে অহিংসাদিগুণসকল হইবে ইহা অন্তত নয়, যেহেতু যাহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত তাঁহারা স্বভাবতঃ পর-পীড়নে বিরত। অন্তঃশুদ্ধি ও

বহিঃশুদ্ধি তথা তপ ও শাস্ত্যাদিগুণসকল ও হরিসেবা-কামনায়ুক্ত পুরুষকে স্বয়ং আশ্রয় করে ।

বৈষ্ণবের সদগুণসমূহ

সদগুণ সকল চরিতামৃতে সংগৃহীত হইয়াছে, যথা ;—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম ।

নির্দোষ, বদান্ত, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥

সর্কোপকারক, শান্ত, কুষ্ণৈকশরণ ।

অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-বড়গুণ ॥

মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী ।

গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মোনী ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭৫-৭৭)

এই সমস্ত সদগুণ ভক্তির সহচর । এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল অগ্রে সঞ্চিত হইলে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয়, কি ভক্তিদেবী আবির্ভূত হইলে এই সকল গুণগণ স্বয়ং ভক্তকে আশ্রয় করে ?

ভক্তে গুণরাশি স্বয়ং উদ্ভিত হয়; উহা সংগ্রহের চেষ্টা অপ্রয়োজনীয়

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ভক্তিশাস্ত্রমতে জীবের কোন প্রকার ভক্তিবাসনারূপ স্বকৃতিবলে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয় । শ্রদ্ধা হইলে জীব সাধু-পদাশ্রয় করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয় । ভজনে প্রবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বেও তাহার অনেক অনর্থ অর্থাৎ সদগুণবিরোধী ধর্ম থাকে । ভজন করিতে করিতে সে সমস্ত অনর্থ অনায়াসে ভক্তি ও সাধুসঙ্গ বলে দ্রবীভূত হয় এবং তাহাদের স্থানে সদগুণসকল সহজেই উদয় হইয়া পড়ে । যে পর্য্যন্ত অনর্থনাশ ও সদগুণ প্রকাশ না হয়, সে পর্য্যন্ত ভজনাভাস বা নামাভাস হইতে থাকে । অনর্থনাশ ও সদগুণ প্রকাশ একদিকে ও শুদ্ধভজন বা শুদ্ধনাম অত্রদিকে যুগপৎ হইয়া থাকে । এই অবস্থার পরে আর অনর্থ বা পাপে সাধকের রুচি হয় না । অতএব শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য ;—

এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ ক্ষয় ।

নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৭)

কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্বজীবে দয়া, নিষ্পাপতা, সত্যসারতা, সমদর্শিত্ব, দৈন্ত, শাস্তি, গাম্ভীর্য, সরলতা, মৈত্রী, ফল, দক্ষতা, অসৎ কথায় ওদাসীত্ব, পবিত্রতা, তুচ্ছকাম ত্যাগ ইত্যাদি সকল গুণ সহজে উদয় হয় । অত্র গুণ উদয় করিবার প্রয়াস করা ভক্তজনের পক্ষে বিধেয় নয় । শুদ্ধভক্তির অমুশীলনই যথেষ্ট । অনর্থহানি ও সদগুণোদয় অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে ।

যোগ ও নৈতিক মার্গ অপেক্ষা সাধুসঙ্গেই সদগুণরাশির আবির্ভাব সম্ভব

যোগাভ্যাসে যে যম, নিয়ম, প্রত্যাহার শিক্ষার প্রথা আছে তাহা কষ্টকল্প, বহুকালব্যাপী এবং অনেক অবাস্তব ব্যাঘাতদ্বারা প্রতিহত হয়। যে পর্য্যন্ত ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা হয় নাই, সে পর্য্যন্ত জীবের যোগমার্গীয় গুণ সাধনের শ্রেয়তা দেখা যায়। অতএব উদিতশ্রদ্ধ পুরুষের সাধুসঙ্গে কেবল ভজন প্রয়াসেই সমস্ত গুণগণ উদয় হইবে। যোগমার্গে বা নৈতিকমার্গে গুণাভ্যাস হয়, তাহাতে ভক্তের প্রয়োজন নাই। তত্তন্মার্গে লব্ধগুণ পুরুষসকল ভক্তিহীন হইলে কুরুপা স্ত্রীর অলঙ্কার পরিধানের ত্রায় সুন্দর শোভা লাভ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে তাঁহারা যদি সাধুকুপায় ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা কোন ভাগ্যক্রমে লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই উত্তমা ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আশ্রয়ের উপদেশ

হে সদগুণশালি ভ্রাতৃবর্গ! আপনারা বৃথা সময় নাশ করিয়া লব্ধ সাঙ্গুণ্যের উত্তম ফলরূপ ভক্ত সাধুর পদাশ্রয় করিয়া জীবন ও ধর্ম সফল করুন। সদগুণ সঞ্চয় করিতে পারিলেই যে ভক্তি হইবে এরূপ নয়। কিন্তু ভক্তি হইলে সদগুণ অনায়াসে উপস্থিত হইবে। কৃষ্ণকশরণ ব্যতীত অত্র সদগুণ হইলেও যে পর্য্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয়, সে পর্য্যন্ত ভক্তি হইবে না। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত সমস্ত সদগুণেরও মাহাত্ম্য নাই। কৃষ্ণভক্তিবিহীন সদগুণসম্পন্ন জীবেরও জীবন বিফল বলিয়া জানিবেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

[সঙ্জনতোষণী ৫ম খণ্ড ১ম সংখ্যা ১১ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত]

সদাচার

‘আচার’ শব্দটী ইহ জগতে নিত্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং ইহা সং এবং অসং বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইলে পর, একই শব্দ পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থে ব্যাখ্যাত হয়। ঐহিক ও পারত্রিক যে-কোন বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে, তদ্বিষয়ের আচরণ অথবা বারংবার আবৃত্তি করিতে হয়। আচার শব্দে আমরা সাধারণতঃ ব্যবহারকেই লক্ষ্য করি, সং শব্দে নিত্য বা সাধু—অর্থই

স্বীকার করি, যে আচরণ দ্বারা নিত্য, সত্য, অবিনশ্বর এবং পরমাত্মতত্ত্ব শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকরের অসমোক্তত্ব উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ করা যায় এবং যে-সকল ভক্ত্যঙ্গ যাজনের দ্বারা কেবলমাত্র শ্রীগুরু, কৃষ্ণ ও কাঞ্চর্গণের নিত্য দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাত্মক সেবা-সুখাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই সদাচার নামে অভিহিত হয়। সাধুগণ কর্তৃক উপদিষ্ট, আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্মের পূর্ণাঙ্গ যাজনের নামই সদাচার। অমুরাগ ও বিরাগ সমস্তই আচরণ দ্বারা লাভ করা যায়। কোন্ ব্যক্তি কোন্ স্তরের বা প্রকৃতির তাহা তাহার আচরণের দ্বারা জানিতে পারা যায়। সং শব্দে যদি একমাত্র সত্য, নিত্য ও সনাতন বস্তুকে বুঝায়, তবে যিনি সেই সনাতন পরম পুরুষের তত্ত্ব বা সনাতনত্ব প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত করাইয়া দিতে পারেন, তিনিও সেই সনাতন পুরুষের প্রকাশ-বিগ্রহস্বরূপ সনাতন বস্তু।

“নাদেবো দেবমর্চয়েৎ”—এই শাস্ত্রবাণীদ্বারা আমরা জানিতে পারি যে অদেবতা যদ্রূপ দেবতার অর্চনে অধিকারী নহেন, তদ্রূপ বিষয়-বিগ্রহরূপ সনাতন বস্তুকে, আশ্রয় বিগ্রহ-স্বরূপ সনাতন বস্তু ছাড়া অত্র কেহ জীবের হৃদয়ে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব পতিত-পাবন পরম কারুণিক শ্রীগুরুদেবও সং শব্দবাচ্য। শ্রীগুরুদেব কর্তৃক আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্মই সদাচার নামে অভিহিত হয়। সদাচার শিক্ষা করিতে হইলে সর্বপ্রথম শরণাগত হইয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লইতে হইবে। নিত্য গোলক-বৃন্দাবন-বিহারী গোপীজনবল্লভ অনাদি-আদি সর্বকারণ-কারণ দ্বিভূজ মুরলীধর শ্রামসুন্দর, মদনমোহনের সেবার যোগ্যতা সদাচারিগণই লাভ করিয়া থাকেন। ভগবন্তুগণই সদাচারী শব্দবাচ্য। সেইজন্য ভগবান্ নারদকে বলিতেছেন,—

“নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।

মন্তুস্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥”

ভগবন্তুগণ সং বলিয়া ভগবান্ তাঁহাদের হৃদয়ে বাস করিয়া থাকেন। ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবান্ লভ্য নহেন। যথা,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্গ্যং ধর্ম উদ্ধব।

ন সাধ্যায়ন্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা ॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—প্রদীপ্ত-ভক্তি যেরূপ মৎপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, সাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, তপস্তা কিম্বা দান-ক্রিয়া তদ্রূপ মৎপ্রাপক হয় না।

কঠোপনিষদ বলেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যন্তশ্চৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥

(কঠ-১।২।২৩)

এই পরমাত্ম-বস্তু বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্য দ্বারা জানা যায় না, যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা প্রার্থনা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ং তাঁহার নিজ তনু প্রকটিত করেন ।

নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু । নামের সেবা দ্বারাই নামীর সেবা স্বতঃই সম্পাদিত হয় । সেবোন্মুখ অবস্থায় নামের সেবা করিলেই নামীর সাক্ষাৎ সেবা লাভ করিতে পারা যায়,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহমিচ্ছিয়ৈঃ ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব ক্ষুরত্যাদঃ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ২।১০৯)

সেবোন্মুখ জিহ্বাদ্বারাই নামীর সাক্ষাৎ সেবা লাভ করা যায় । পরিদৃষ্টমান জগতে যে-কোনও বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যেমন তজ্জ্ঞানোপদেশক গুরুর অন্তর্গত হইয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়, তদ্রূপ পরজগতের পরাংপর পরম পুরুষের তৎ উপলব্ধি করিতে হইলে আদৌ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা বেদজ্ঞ সদগুরুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ এবং তদুপদেশক্রমে ভজন-পন্থায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা আচরণ করা কর্তব্য । শাস্ত্র বলেন—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ।

সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ (মুক্ত ১।২।১২)

সেই ভগবদ্বস্তুর প্রেমভক্তি সহিত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য উত্তম শ্রেয়ঃ পিপাসু ব্যক্তি সমিদ্ধস্তে বেদত্যাগপর্যাজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদগুরুর সমীপে কায়-মনোবাক্যে গমন করিবেন । শ্রীগুরুদেবের নিকট কিভাবে গমন করিলে উত্তম শ্রেয়ঃ অবগত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে গীতায় শ্রীভগবান্ অজ্ঞানকে উপদেশ দিয়াছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ (গীঃ ৪।৩৪)

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি দ্বারাই তত্ত্ববস্তুকে জানিতে পারা যায় । এই ত্রিবিধা বৃত্তিদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্বক তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ করিয়া

থাকেন। আচার্য্যমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে, শ্রবণপথে সেই চেতন-বাণী অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া আমাদের মূগ্ধ আত্মাকে জাগ্রত করে। তাই শাস্ত্রে অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, সাধুসঙ্গে সদাচার পালন করিবার জ্ঞান আদেশ করিয়াছেন। যথা—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।

স্বীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

অসাধুগণ অসদাচারে রত। অসৎ শব্দে যাহা অনিত্য ও বিনশ্বর; যদ্বারা কেবলমাত্র ইহ জগতের ভোগবাসনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় ও অনন্ত নরকের দিকে প্রাপঞ্চিক জীবের মনকে ক্রমে ক্রমে টানিয়া লইয়া যায়। যাহা দেহত্যাগে জীবের সঙ্গে যায় না, সবই পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, তাহা অসৎ বা অনিত্য। স্বীসঙ্গীর সঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ—এই দুইই অসদাচার বলিয়া কথিত। সাধুর নিকট হইতে সদাচার শিক্ষা করা যায়। অসাধু ব্যক্তিগণ যে সদাচারের ভাণ করে, তাহা গ্রাম্যাচার বা অসদাচারের নামান্তর মাত্র। আমরা বন্ধাবস্থায় থাকিয়া মনে করি, কতই না শাস্ত্র-নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিতেছি, কতই না কৃষ্ণকথা আলাপ করিতেছি, কতই না ভক্তাঙ্গ যাজন করিতেছি—আমরা না জানি কৃষ্ণের কত প্রিয় কার্য্য করিতেছি; কিন্তু আমাদের এই সকলই কৰ্ম্ম-কাণ্ডের অন্তর্গত হইয়া যাইতেছে। আমরা অসাধুকে সাধুজ্ঞানে প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া যে ভক্তির অভিনয় করিতেছি, তাহা কখনই কৃষ্ণের প্রিয় হইতে পারে না। সাধুগণই একমাত্র কৃষ্ণের প্রিয়। তাই তাঁহারা শাস্ত্র কীর্ত্তন করেন। শাস্ত্র বলেন,—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ত্বম্।

মদগুণ্ডে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ (ভাঃ ৯।৪।৬৮)

সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়, তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ভিন্ন অণু কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

অসদ্বস্তুর আচরণ সাময়িক সুখলাভে জীবকুলকে মত্ত করিয়া তোলে, ইহা সত্য, কিন্তু ইহাতে মত্ত থাকিয়া যখন পুনঃ পুনঃ ঐহিক দুঃখ ভোগ করিতে থাকি, তখনই আমরা এই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত সংসঙ্গে সদাচার পালনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া থাকি। তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, অসৎসঙ্গের মোহে পতিত হইয়া আত্মার কি মহা-অকল্যাণই না সাধন

করিয়াছি। বহুরূপিনী মায়া পিশাচীকে কত ভাবেই না হৃদয়ের উচ্চ সিংহাসনে বসাইয়াছি। কিন্তু তাহার প্রতিদানস্বরূপ পাইয়াছি নির্ভুর প্রবঞ্চনাময় ব্যবহার। অসদাচারে প্রবৃত্ত হইয়া যখনই মায়াকে ভোগ করিতে ধাবিত হইতেছি, তখনই মায়া আমার দুর্ব্বুদ্ধিতার পুরস্কার-স্বরূপ আমাকে সংসাররূপ কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া আমার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন। সংসার যে কেবল অসার, ইহার মধ্যে কোন সারত্ব নাই, ইহা যে জ্বালাময়ী ও দুঃখপ্রদ—তাহা বিমুখ-মোহিনী মায়ার চেষ্টায় আমরা প্রতি পদে পদে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। দৈবী, গুণময়ী, দুস্পারা মায়ার কি মোহিনী শক্তি! আমি জড়ের সহিত এইরূপ আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, চৈতনকে ‘আমার’ না বলিয়া অনিত্য জড়বস্তুকে ‘আমার’ বলিয়া চীৎকার করিতেছি। হায়! কে আমায় এই মোহান্ধ-রূপ হইতে উদ্ধার করিবেন? কে আমার এই দুর্দশায় দুঃখী হইবেন? কে আমার নিত্য স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া দিবেন? জগতের জীবগণ আমারই মত দুস্পারা মায়ার কবলে কবলিত। আমি যেরূপ ত্রিতাপক্লিষ্ট, তাহারাও তদ্রূপ, আমি যেরূপ অজ্ঞান, তাহারাও সেইরূপ এবং আমারই শ্রায় তাহারাও বদ্ধ-ভূমিকায় অবস্থিত। স্তবরাং এক অন্ধ যেমন অগ্নি অন্ধকে পথ দেখাইতে অসমর্থ, সেইরূপ পরতত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ পণ্ডিতসম্মত কেবলমাত্র গুরুব্রহ্মসমূহ কখনও জীবসমূহকে উদ্ধার করিতে সমর্থ নহে। বর্তমান যুগে দৈনিক লক্ষ লক্ষ জীব হরি-বিমুখতাবশতঃ বৃথা কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতেছে। পতিত-পাবন পরম দয়াল নিত্যানন্দাভিন্ন কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবই মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। অত্থায়,—

তে তং ভুক্তা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশস্তি।

এবং ত্রয়ীধর্ম্মমতুপ্রপন্ন

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ (গীঃ ৯।২১)

অতএব সদগুরুর চরণাশ্রয়ে সদাচার গ্রহণ করিলে আমরা আমাদের নিত্য মঙ্গলস্বরূপ কৃষ্ণ-সেবাসুখ লাভ করিতে সমর্থ হইব।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যাশ্চ রূপাসিকুভ্য এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ ॥

—কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী

ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ, ভিষগব্রত

শ্রীশ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের রথযাত্রা মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণে দীনের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

(১)

এই যে বিরাট বিশ্ব দৃশ্য
হতেছে রম্য-চারু-মনোহর ।
তোমারই রচিত সকলই ত (প্রভু)
ভূমিত নিখিল জগৎ-ঈশ্বর ॥
তোমার মহিমা ব্রহ্মা হইতে
কোটা জীবগণ করিছে গান ।
ভূমিত সবার জনক-পালক,
শূলপাণি তব তত্ত্ব না পান ॥
বন্দি তোমার চরণ যুগল
জগন্নিবাস জগন্নাথ ।
রথের উপরে অপরূপ শোভা
রেবতীরমণ সুভদ্রাসাথ ॥

(২)

শিরে শোভে তব রতন মুকুট
শ্রবণ যুগলে মতির ফুল ।
ললাট শোভিত সুচারু তিলকে
নাসায় শোভিত মুকুতা-তুল ॥
ছলিছে গলায় সুরভি পূরিত
অপরূপ বন কুসুম-হার ।
চরণ যুগলে সোণার নুপুর
মহিমা তোমার গাহে অনিবার ॥
বন্দি তোমার চরণ যুগল
জগন্নিবাস জগন্নাথ ।
রথের উপরে অপরূপ শোভা
রেবতীরমণ সুভদ্রাসাথ ॥

(৩)

অমল কমল পলাশ-লোচন
সিন্ধু-ঝিয়ারি-মানসচোর ।
গাহিছে নারদ তব গুণগান
বীণার সূতানে হইয়া বিভোর ॥
গরুড়-আসন শমন-শাসন
তব তত্ত্ব বিধি ধ্যানে নাহি পায় ।
ত্রিতাপে তাপিত জীবের হৃদয়
জুড়ায় তোমার চরণ ছায়ায় ॥
বন্দি তোমার চরণ যুগল
জগন্নিবাস জগন্নাথ ।
রথের উপরে অপরূপ শোভা
রেবতীরমণ সুভদ্রাসাথ ॥

(৪)

নব মাধবীর সাক্ষ্যানবীন-
জলদ জিনিয়া তোমার বরণ ।
সুন্দর চির কৈশোর তুমি,
নীলাচলপতি, অনাথ-শরণ ॥
কমলা-সেবিত পদারবিন্দে
দেবী সুরধুনী জনম পান ।
তোমার যুগল চরণ কমল
নিখিল জীবের শান্তি-নিদান ॥
বন্দি তোমার চরণ যুগল
জগন্নিবাস জগন্নাথ ।
রথের উপরে অপরূপ শোভা
রেবতীরমণ সুভদ্রাসাথ ॥

(৫)

ধ্বজাদি বজ্র চিহ্ন শোভিত
তোমার অভয়, চরণ-তলে ।
মায়ার পীড়নে ব্যথিত প্রাণের
বেদনা ও ব্যথা নিবেদিবে ব'লে ॥

জীব অগণন নিতি নিরালায়,
নব অনুরাগে বসিয়া যতনে
করিছে সত্তত তব আরাধনা
নীরবে নিথরে স্তিমিত-নয়নে ॥

বন্দি তোমার যুগল চরণ
জগন্নিবাস জগন্নাথ ।

রথের উপরে অপরূপ শোভা
রেবতীরমণ সুভদ্রাসাথ ॥

(৬)

ঋষি অধুষিত কানন সতত
ঝঙ্কত তব বন্দনা-গানে ।
বিধি-হর-সুর-নর নিরবধি
রত তব হৃদী শ্রীচরণধ্যানে ॥

দেবগণসহ ত্রিভুবনবাসী
মধুর আরতি করিছে তোমার ।
কাঁসর-ঘণ্টা-শঙ্খ-নির্নাদে
মুখরিত তব মন্দির-দ্বার ॥

বন্দি তোমার যুগল চরণ
জগন্নিবাস জগন্নাথ ।

রথের উপরে অপরূপ শোভা
রেবতীরমণ সুভদ্রাসাথ ॥

(৭)

বিটপিপাতায় ভূধরের গায়
নব বিকশিত কুসুম কেশরে,
সুনীল অশ্বরে দিক্ দিগন্তরে
কোকিলের মধুমাখা কুলুস্বরে,
জলধি সলিলে, অনলে অনিলে
তোমার অনন্ত মাদুরী প্রকাশ ।
খ-জ্যোতি, তারকা, চন্দ্র-মিহিরে
তব অপরূপ জ্যোতি-বিকাশ ॥

বন্দি তোমার যুগল চরণ
জগন্নিবাস জগন্নাথ ।

রথের উপরে অপরূপ শোভা
রেবতীরমণ সুভদ্রাসাথ ॥

(৮)

হে প্রভু বিরাট বিশ্ব নিয়ন্তা !
যুগে যুগে তুমি হ'য়ে অবতার ।
দানব-দর্প করিয়া চূর্ণ
হরিলে পীড়িতা ধরণীর ভার ॥

হে দেব দয়াল জগজ্জীবন !
সাম-মধুর ললিত ছন্দে,
গাহি তব গুণ-গাথা নিতি নিতি
সেবক তোমার চরণ বন্দে ॥

বন্দি তোমার যুগল চরণ
জগন্নিবাস জগন্নাথ ।

রথের উপরে অপরূপ শোভা
রেবতীরমণ সুভদ্রাসাথ ॥

(৯)

মন্দির তব চারিযুগ ধরি' অশ্রু তুলিয়া বিরাট শির।
 আপন গরবে রয়েছে দাঁড়ায়ে পবিত্র করিয়া জলধি-তীর ॥
 মন্দির শিরে রতন চূড়ায় বিরাট চক্রে দলকে দামিনী।
 তোমারে হেরিতে আকুল পরাণে ছুটে নর-নারী দিবস-যামিনী ॥
 অলীক মায়ার ছলনে আমার হিতাহিত জ্ঞান হয়েছে লুপ্ত।
 জাগাও চরণ পরশে আমারে আমি যে মায়ার ষাটুতে সুপ্ত ॥
 বিষয়-বাসনা নীচতা দর্প অভিমান-আদি করিয়া চূর।
 চরণ সেবিতো দাওগো আমারে আলস্য জড়তা করিয়া দূর ॥
 বন্দি তোমার চরণ যুগল জগন্নিবাস জগন্নাথ।
 রথের উপরে অপরূপ শোভা রেবতীরমণ সুভদ্রাসাথ ॥

দীন-হীন সেবক—

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসাধিকারী (রায়)
 নারমা (মেদিনীপুর)

রথযাত্রা সংগীত

জয় জগন্নাথ জগত জীবন।
 জীব নিস্তারিতে আরোহিয়া রথে
 সর্ব সাধারণে দিলে দরশন ॥ (১)
 দিনেকের তরে শ্রীলক্ষ্মীরে ছ'লে
 রথযাত্রা করি' চলেছ গোকুলে,
 সখা সখী স্নেহে মিলিবেক বলে,
 ঐশ্বর্য্য ত্যজিয়ে মাধুর্য্যে মগন ॥ (২)
 গুণ্ডিচা মন্দির নিকুঞ্জ কানন,
 বিহারের স্থল যেন বৃন্দাবন,
 এদাস গোবিন্দ এহেন মিলন
 সদাই যাচে হে পতিত পাবন ॥ (৩)

—পণ্ডিত শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ দাস
 শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার গ্রাহক

বোস সাহেবের প্রশ্নের উত্তর

সুবিধাবাদীর ভক্তিকে ‘ভক্তি’ আখ্যা কেন দেওয়া হয় ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে সুবিধাবাদী কখনও ‘ভক্ত’ নহে বা তাহার ভক্তি-অনুশীলনের চেষ্টাসমূহও ভক্তির অঙ্গ নহে। যাত্রার দলের অভিনয় কিছু সত্য নহে। সং সাজিয়া রঙ্গ দেখাইয়া ঢং করিয়া জাগতিক ব্যক্তির কিছু আনন্দ বর্দ্ধন হইতে পারে, কিন্তু নিরন্তরকুহক বাস্তব-সত্যের নিকট তাহার এক কপর্দকও মূল্য নাই। যদিও আমরা ভগবান কপিলদেবের উক্তিতে চতুর্বিধ ভক্তির কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তাহার মধ্যে নিগুণ ভক্তিই বাস্তবিক ভক্তি পদবাচ্য। তাহারই অপর নাম পরাভক্তি, ঐকান্তিকী ভক্তি বা কেবলা ভক্তি। তাহাই জীবের কাম্য, তাহাই চরম ও পরম প্রয়োজন, তাহাই পঞ্চম পুরুষার্থ; তাহারই অপর নাম প্রেমভক্তি। এই প্রেম ভক্তির পূর্বাবস্থাই সাধন-ভক্তি। সাধন-কালে সাধকের চিন্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবচ্চরণে স্থাপিত হয় না। এই সময় অনেক প্রকার বাধা বিঘ্ন, চিন্তা-চাঞ্চল্যাदि দ্বারা অনেক সময় নানাবিধ আচরণ ঘটিয়া থাকে। তাহা হইতে ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্ত শাস্ত্রের নানাপ্রকার উক্তি দেখা যায়। সেগুলি না বুঝিয়া অথবা ভক্তির অঙ্গসকল সম্পূর্ণরূপে যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া অনেক সময় সাধক নানাপ্রকার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া থাকে বলিয়াই নানা ভাষায় পরাভক্তিকে জানাইবার চেষ্টা হইয়াছে। সেই সাধনাগুলি নিয়মিতরূপে না করিয়া নিজের খেয়ালমত—সুবিধামত করিয়া অপরের নিকট ‘ভক্ত’ নাম জাহির করিতে যাহাদের চেষ্টা, তাহারাই সুবিধাবাদী।

কিছুদিন পূর্বে দেশসেবার নাম করিয়া কারাবরণ করাটা যেন একটা মহা-গৌরবের বিষয় হইয়াছিল, বর্তমানে তদ্রূপ ‘ভক্ত’ নামে পরিচিত হওয়াটাও অনেকে গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করেন। তাহার ভক্তির যথাযথ সাধন করা সাধ্যাতীত বলিয়া খামখেয়ালীমত একটা কিছু করিয়া ভক্ত সাজিতে চান। কিন্তু সোনা পরীক্ষা করার কষ্টিপাথরের ন্যায় শুদ্ধ ভক্তিকে বাজাইয়া লইবার উপায় শাস্ত্রসকল নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন যে—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।

ঐকান্তিকী হরেভক্তিরূপপাতায়ৈব কল্পতে।

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৬ ধৃত ‘ব্রহ্মযামল’-বাক্য)

[অর্থাৎ—

ভক্তি যাহাতে শুদ্ধরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া আছে। শাস্ত্রগুলি কোন মানুষের মনগড়া কথা নহে। মানুষের মনঃকল্পিত কথাসকল ভিত্তিহীন। মনের ধর্ম পরিবর্তনশীল। পাঁচ মিনিট পূর্বের মন পাঁচ মিনিট পরে একরকম থাকেনা। সুতরাং “মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম” অর্থাৎ মননশীল (মনকে বশকারী) মুনিরও মতিভ্রম হইতে পারে; কিন্তু স্বয়ং ভগবানের সেরূপ কোন দোষ নাই বা থাকিতে পারেনা।

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।

আর্ষ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।৮৬)

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ এই দোষ চতুষ্টয়ের বিস্তৃত বিচার দেখাইয়াছেন।
ভ্রম—মিথ্যা জ্ঞান বা মিথ্যা মতি ; নৈয়ায়িকেরা যাহাকে অপ্রমা বলেন অর্থাৎ এক বস্তুতে অত্র বস্তুর জ্ঞান। ভ্রম দুই প্রকার—বিপর্যাস এবং সংশয়। দেহে আত্মবুদ্ধি—বিপর্যাস ; এটা পুরুষ না স্থাণু—এইরূপ বুদ্ধি—সংশয়। পিত্ত, দূরত্ব, মোহ, ভয় ইত্যাদি নানা কারণে ভ্রম নানা প্রকারে হইয়া থাকে। শর্করা অতি মধুর, কিন্তু রসনা পিত্তরোগাক্রান্ত হইলে তাহা তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। আমরা চন্দ্র-সূর্য্যকে একখানি থালার মত দেখি, বাস্তবিক তাহাদের আকার সেরূপ নহে। তাহার এত বড় যে আমাদের কল্পনাও আসে না। দূরত্বই এই ভ্রান্তির কারণ।
আত্মা—‘অহং’ শব্দবাচ্য, অজ, নিত্য এবং পরিণামশূন্য ; কিন্তু আমরা ‘আমি স্থূল’, ‘আমি ক্লশ’ ইত্যাদি বাক্যে দেহে আত্মবোধক অহং শব্দের প্রয়োগ করিয়া দেহকেই আত্মা মনে করি। মোহই এই ভ্রমের কারণ। রাত্রিতে রজ্জুকে সর্প ভ্রম করা হয়। ভয় এই ভ্রমের কারণ।
প্রমাদ—অনবধানতা বা আনমনা ভাব। যেমন নিকটে কোন শব্দ হইতেছে অথচ তাহার উপলব্ধি না করা।
বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনা করিবার চেষ্টা।
করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা। মনোযোগ থাকা সত্ত্বেও বস্তুর উত্তমরূপে অনুভূতি না হওয়া।

বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়ে প্রত্যক্ষীভূত বস্তুরও ভ্রম দর্শন জানা যায়। অতি দূরত্ব, অতি-সামান্য ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, চিত্তের অস্থৈর্য্য, দৃষ্ণের অতি সূক্ষ্মতা প্রভৃতি দোষে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভ্রমাদি সঙ্কুল হইয়া পড়ে।

ভ্রাণজ্ঞ, রাসন, শ্রাবণ, চাক্ষুষ, স্পর্শন ও মানসভেদে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছয় প্রকার। সবিকল্প ও নির্বিকল্প ভেদে এই ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ সাকল্যে দ্বাদশ প্রকার। সবিকল্প—মনোগ্রাহ ; নির্বিকল্প—অতীন্দ্রিয়। উহার অপর দুই

প্রকার বিভাগ আছে—বৈদ্যু প্রত্যক্ষ ও অবৈদ্যু প্রত্যক্ষ। বৈদ্যু প্রত্যক্ষে বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরোধ নাই। কেন না শব্দ প্রমাণই উহার মূল। কিন্তু অবৈদ্যু প্রত্যক্ষে সংশয় থাকিয়া যায়। অবৈদ্যু প্রত্যক্ষে ব্যভিচার লক্ষিত হয়। যেমন ঐন্দ্রজালিক-প্রদর্শিত ছিন্ন মায়ামুণ্ড দেখিয়া পরিচিত দেবদত্তের মুণ্ড বলিয়া প্রতীতি জন্মে। অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানেও এইরূপ ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি পূর্বে ইন্দ্রজাল-প্রদর্শিত মায়ামুণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং উহা যে মিথ্যা এই জ্ঞান যাহার জন্মিয়াছে—অর্থাৎ উহা যে ভ্রান্তি এইরূপ ধারণাবশে সস্থলে সে কোন ছিন্নমুণ্ড দেখিলেও তাহাতে তাহার বিশ্বাস জন্মে না, আকাশ-বাণীতেও যদি সে শুনিত পায় যে ইহা যথার্থ ছিন্নমুণ্ড, তথাপি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির কথা ভিন্ন কোন প্রকারে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ হয় না। বিচারশীল ব্যক্তিমাত্রেরই ইহা স্বীকার্য। এস্থলে প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নাই। কিন্তু শব্দ-প্রমাণ অতঃ কোন প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া স্বতই প্রমাণরূপে গৃহীত হয়।

আবার মনে করুন, দশটি লোকের মধ্যে একজন নিজকে ছাড়িয়া অপর নয় জনকে গণনা করিয়া বলিতেছে—আমাদের দশ জনের মধ্যে অপর একজন কোথায়? তখন যদি কেহ তাহাকে বলে তুমিই দশম—এই শব্দ তাহার শ্রবণ-পথে প্রবেশমাত্রই তাহার মোহ বিনষ্ট হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, যাহা সর্বপ্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাই সত্য। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কেননা সকলের একত্র মিলন সম্ভবপর নহে। অপিচ যাহা স্থলবিশেষে বা লৌকিক শাস্ত্রে বহু লোকের প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাদৃশ বস্তুরও প্রকৃতপক্ষে অগুরূপ প্রতীতি উপলব্ধি হয় অর্থাৎ যাহা বহুলোকে এক প্রকার সত্য বলিয়াই মনে করে, বিশেষ বিচারে তাহারও অগুরূপ প্রতীতি ঘটিয়া থাকে। অথবা পৌরুষেয় শাস্ত্রে (কোন মানুষের রচিত) যাহা সত্য বলিয়া নির্ণীত হয়, অপৌরুষেয় শাস্ত্রে তাহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না।

অনুমানেরও ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। ধূম দর্শনে বহির অনুমান হয়। বৃষ্টিদ্বারা পর্বতের অগ্নি সত্ত্ব নির্বাপিত হইলেও অনেক্ষণ পর্য্যন্ত অধিক পরিমাণে ধূম দৃষ্ট হয়; সেই ধূম দেখিয়া বহির অনুমান করিলে সে অনুমান প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। অনুমান অপেক্ষা শব্দ প্রমাণ কি প্রকারে বলবত্তর, তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—পর্বতে ধূম দেখিয়া শীতাতুর ব্যক্তি তৎসন্নিধানে গমনের চেষ্টা করিলে কোন ব্যক্তি যদি বলে—ওহে শীতাতুর পথিক! এই পর্বতে ধূম

দেখিয়া বহির সম্ভাবনা করিও না। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি বৃষ্টি দ্বারা এখনই অগ্নি নির্মাপিত হইয়াছে। এস্থলেও শব্দই প্রমাণরূপে স্থাপিত হইল। মানব সমাজে শিশুদিগের মাতাপিতার প্রমুখাং শব্দ শুনিয়াই উহাদের সকল প্রকার জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। মানব-শিশু যদি অপরের মুখে শুনিয়া শব্দজ্ঞান লাভ করিতে না পায়, তবে সে জড়মূকত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহার ভাষার ব্যবহার-সিদ্ধি একেবারে অসম্ভব।

এখন বিবেচনীয় এই যে, যে শব্দের প্রমাণ-শ্রেষ্ঠতা পতিপন্ন হইল, সেই সর্ব-প্রমাণশিরোমণি ‘শব্দ’ কাহাকে বলে? যদি বলা যায় যে ভ্রমপ্রমাদাদিরহিত বাক্যই শব্দ, কিন্তু এইরূপ সংজ্ঞানির্দেশ পর্যাপ্ত নহে। কেন না, একের পক্ষে যাহা ভ্রমাদি রহিত বলিয়া বিবেচিত হয়, অপরের পক্ষে তাহা সেরূপ নাও হইতে পারে। আরও দেখা যায় যে, শব্দ প্রমাণ প্রত্যক্ষ বিষয় নহে, উহা পরের মুখের কথা; স্মতরাং অপরের অন্তঃগত। যাহা নিজের প্রত্যক্ষানুগত নয়, যাহা অপরের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত, তাহা প্রমাণযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। স্মতরাং শব্দমাত্রই প্রমাণ নয়। কিন্তু যে শব্দ নিজ নিজ বিদ্যাবত্তা সহকারে সকলেই অভ্যাস করে, যে শব্দ অধিগত হইলে সকলের হৃদয়ে সর্ববিচার ক্ষুণ্ণিত হয়, যে শব্দজ্ঞানে পরম বিদ্যাবত্তা লাভ হইলে প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানও বিস্মৃত হয়, অনাদিত্ব নিবন্ধন যাহা স্বয়ংসিদ্ধ, যাহা পুনঃ পুনঃ জগৎসৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত, অনাদিসিদ্ধ, নিখিল ঐতিহ্য প্রমাণের মূল স্বরূপ সেই মহাবাক্য সমুদয়ই এস্থলে শব্দরূপে গৃহীত। এই শব্দই ‘শাস্ত্র’—ইহাই ‘বেদ’ নামে অভিহিত। এই বেদ অনাসিদ্ধ, অপৌরুষেয় ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া ইহাতে ভ্রমাদি দোষের সম্ভাবনা নাই।

অতএব বেদপ্রতিপাদিত—বেদের অন্তঃগত শাস্ত্রসকলের নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে না চলিলেই তাহাকে “স্ববিধাবাদী” বলা হয়। স্মতরাং স্থলবিশেষে তাহার ভজনচেষ্টাকে ভক্তি-শব্দে উল্লিখিত হইলেও উহা বাস্তব ভক্তি নহে। শুদ্ধ-ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

অন্ত-বাঙ্গা, অন্ত-পূজা ছাড়ি ‘জ্ঞান’ ‘কর্ম’।

আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণাত্মশীলন ॥

এই ‘শুদ্ধ-ভক্তি’ ইহা হৈতে ‘প্রেমা’ হয়।

পঞ্চ-রাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৯)

ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে গুণগোল কেন ?

গুণগোলের কারণ, মতের অমিল হওয়া। বর্তমান কাল—কলি। তাহার অর্থ বিবাদ। সকলেই স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠার্থে তর্ক বিবাদাদিতে মত্ত হয়; কিন্তু ভক্তগণ সেরূপ কার্যে ব্যস্ত নহেন। তাঁহারা শ্রীহরি-সেবায় সর্বদা মত্ত থাকেন। অভক্তগণ অনেক সময় তাঁহাদের কার্যে বিঘ্ন ঘটাইয়া গুণগোলের সৃষ্টি করেন। ত্রিভুবনের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া—ইন্দ্রাদি লোকপালগণকেও নিজ বশীভূত করিয়া কনক-কামিনীরত হিরণ্যকশিপু পঞ্চবর্ষব্যয় পুত্র প্রহ্লাদের ভগবদ্-ভজন কার্যে দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া নানা গুণগোলের সৃষ্টি করিয়াছিল। হিরণ্যকশিপু ব্রাহ্মণপুত্র হইয়াও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান না থাকায় নিজেকেই ব্রহ্ম বুদ্ধি করিয়া ত্রিজগতের উপর আধিপত্যকেই পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করিয়াছিল। আর প্রহ্লাদ জগতের সর্বস্বা শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপকরণ জ্ঞানে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া-ছিলেন বলিয়াই গুণগোল। ইহাই দেবাসুরের সংগ্রাম। দেব-প্রকৃতির ব্যক্তি দেবদেব নারায়ণ-সেবাই পরম-পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, আর অসুর প্রকৃতির লোক নারায়ণকে দিয়াও নিজ-সেবা আদায়ের চেষ্টা করেন এবং তিনিও তাঁহাদের ভোগের যোগানদার এইরূপ ধারণা করেন।

দেব-প্রকৃতির ধর্ম—পারমার্থিক, আর অসুর প্রকৃতির ধর্ম আর্থিক। যাহারা সামান্য প্রয়োজনের অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা আর্থিক, আর যাহারা পরম প্রয়োজনের চেষ্টাযুক্ত, তাঁহারা পারমার্থিক।

যাহারা দেহ ও মনের প্রয়োজন মিটাইতে ব্যস্ত—দেহ-মনের সুখ-সুবিধাকেই পরম কাম্য বিচার করেন, তাঁহারা আর্থিক। আর যাহারা আত্মার সেবায়—পরম পুরুষের প্রীতি বিধানের চেষ্টায় ব্যস্ত, তাঁহারা পারমার্থিক।

যে সকল কর্ম কেবল জগতের শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক সুখ-সুবিধা সাধন করে, তাহা আর্থিক। তাহাদের ঈশ্বর-পূজা, ঈশ-ভক্তি সবই নিজ-সুখ-সাধক। তাহাদের সন্ধ্যাবন্দনা ষাণ্ময়াদি সকলই নিজ নিজ প্রীতি বিধানের নিমিত্ত। তাহারা ভক্তের অনুকরণে অনেক সময় একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতির উপবাস করেন, গঙ্গাস্নান করেন, শ্রীবিগ্রহের সেবা করেন, গুরুকরণাদিও করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকলের গোড়াতেই গলদ। তাহাদের ঈশ্বরভক্তি বা ঈশ-পূজায় “শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম” নাই, অর্থাৎ কোন শুভ কর্মের অনুষ্ঠানকালে সঞ্চল করা হয়—“বিষ্ণুরোম্ তৎ সদাচ অমুকে মাসে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামঃ অহং ইদং করিষ্যে”; পুরোহিত মন্ত্র বলান আর যজমান মন্ত্র

আওড়াইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়েই উহার অর্থ বুঝেন না। ভক্ত কখনও মুখে ঐরূপ বুলি উচ্চারণ করিয়া নিশ্চিন্ত নহেন, তাঁহাদের সকল চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণপ্ৰীতিমূল্য। তাঁহাদের বিচার—

“মোর সেবা সে নিয়ম, অপরাধ হউ কিম্বা নরকে পতন।”
ভক্তের বিচার—

“মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর ।
অপিণু তুয়া পদে নন্দকিশোর ॥ ১
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে ।
দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে ॥ ২
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা ।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকার ॥ ৩
জন্মাণবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর ।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর ॥ ৪
কৌট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস ।
বহির্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ ॥ ৫
ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত ।
লভইতে তাঁক সদ্ব অনুরক্ত ॥ ৬
জনক জননী দয়িত তনয় ।
প্রভু গুরু পতি তুহঁ সর্বময় ॥ ৭
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান ।
রাধানাথ তুহঁ হামার পরাণ ॥ ৮

(শরণাগতি—১১)

অতএব ভক্ত ও অভক্তের কতকগুলি ক্রিয়ার মধ্যে বাহ্যিক সৌসাদৃশ্য থাকিলেও অন্তরনিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের পার্থক্যই যত গভীরগোল সৃষ্টি করিয়াছে। সাধারণ তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি এই অন্তরনিষ্ঠার বিষয় বুঝিতে না পারিয়াই উভয়কে এক করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু জড়ের সেবা, আত্মেঞ্জিয়-প্ৰীতি, আত্মপ্রসাদ বা আত্মশান্তির চেষ্টা আর পরম-পুরুষ পরমেশ্বরের প্ৰীতিবিধানের চেষ্টায় চিরকাল তারতম্য থাকিবে। তাহা কখনও সমজাতীয় হইবে না।

—ত্রিদিগ্‌ম্বামী শ্রীমদভক্তি ভূদেব শ্রোতী মহারাজ

স্মার্ত “শ্রমণের” বিশ্বাসঘাতকতা

অন্ধ ও সরল বিশ্বাসের পার্থক্য

অন্ধ ও সরল বিশ্বাস এক নহে। অসত্য বস্তুতে অন্ধ-বিশ্বাস স্থাপন করিলে সংশোধন-সম্ভাবনা থাকে না; কিন্তু সরল বিশ্বাস থাকিলে সংশোধন-সম্ভাবনা থাকে। সরল বিশ্বাসীর হৃদয়ে কিঞ্চিৎ উদারতা থাকায় তাহার চিত্ত সর্বদাই সত্য গ্রহণের জন্ত মুক্ত থাকে। অন্ধ-বিশ্বাসীর সে-সুযোগ থাকে না। ভগবান্ জীবের সরলতা দেখিয়াই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু এক অন্ধ অন্ধ অন্ধকে চালিত করিলে উভয়ই অন্ধরূপে পতিত হয় এবং তাহার উদ্ধার সম্ভাবনা আদৌ থাকে না। সুতরাং অন্ধ-বিশ্বাসীর পতন অবশ্যসম্ভাবী। আমরা কিন্তু সে-প্রকার অন্ধ-বিশ্বাসী নই বলিয়া ভগবান্ আমাদিগকে “ত্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকার” দ্বারা বিচার হইতে রক্ষা করিয়াছেন। কর্মজড় স্মার্তের পদাবলেনন করিতে হয় নাই।

উক্ত পঞ্জিকা স্বীকারের উদ্দেশ্য

আমরা বিগত শ্রীগৌরজন্ম-বাসরে “প্রাচীন নবদ্বীপ ত্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ” হইতে শ্রীহৃন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত “ত্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা” নামক একখানি দিন-পঞ্জী প্রাপ্ত হই। ইহার আবরণ-পৃষ্ঠাদিতে কিছু কিছু আপত্তিকর বিবরণাদি মুদ্রিত থাকিলেও আমরা সর্ব-সাধারণের মধ্যে ইহা প্রচারিত হইতে কোনও প্রকার আপত্তি করি নাই। কারণ, প্রচ্ছদপটে যাহাই থাকুক না কেন, মূল বিষয়, দিন-পঞ্জিকা, বিশুদ্ধ থাকিলেই সকলে উপবাস, উৎসব, পারণ, পর্বাতির দিন গোস্বামী মতে নির্ণয় করিতে পারিবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া কর্মজড় স্মার্তানুগত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। বাহ্যতঃ ইহার প্রচুর মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হইয়াছে—যাহাতে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ সাদরে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন।

প্রথমতঃ—পঞ্জিকার নামের পূর্বে “সচিত্র বিশুদ্ধ” কথা মুদ্রিত করিয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে তদ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, ইহাতে উপবাস, পর্বাদি কর্মজড় স্মার্ত-মতানুসারে লিপিবদ্ধ না হইয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ও গোস্বামী সিদ্ধান্ত অনুসারেই হইয়াছে।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকার বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয়তঃ—“প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রবর্তিত”—এই বাক্যটি “অন্তর প্রচ্ছদে” লিপিবদ্ধ হওয়ায় ইহার প্রতি সরল বিশ্বাসী শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে গাঢ় শ্রদ্ধা উৎপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে। কারণ জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ বদ্ধ জীবগণের নিত্য কল্যাণের জন্য প্রাকৃত স্মার্ত জ্যোতির্বিদ-গণের বিচারের ভ্রান্তি প্রদর্শন করাইয়া অহুমান ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে “বিশুদ্ধ নবদ্বীপ পঞ্জিকা” নামে একখানি পঞ্জিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। শুধু তাহাই নহে, এই পঞ্জিকার যে অভিনব বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা এই বর্তমান আলোচ্য পঞ্জিকার জর্নৈক সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার ‘নিবেদন’ শীর্ষক ভূমিকাতে বাহা লিখিয়াছেন তাহাও এইরূপ—“প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুবর বেক্ষপ শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া ব্যাকরণানুশীলন-প্রসঙ্গেও শ্রীহরিনাম করিবার অপূর্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তদ্রূপ বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর পঞ্জিকায় ব্যবহৃত মাস, পক্ষ, বার, নক্ষত্র, তিথি প্রভৃতির নাম বিভিন্ন বিষ্ণুনামে প্রকাশ পূর্বক ‘শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা’ প্রবর্তন দ্বারা পঞ্জিকানুশীলন-প্রসঙ্গেও শ্রীনামকীর্তনের অপূর্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। নিরন্তর শ্রীহরিনামানুশীলনে গোস্বামিপাদ-দ্বয়ের দান অভূতপূর্ব ও অতুলনীয়।”

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাসী সুধী সজ্জনমাত্রেরই স্বদৃঢ় বিশ্বাস বর্তমান। সেই বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া অযথা ভ্রান্ত ধারণাকেই সত্য বলিয়া চালাইবার অপচেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে শ্রীল প্রভুপাদের চরণে অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি। কারণ তাঁহার আচার-বিচার ও গণনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়াই তাঁহার প্রবর্তিত-ধারণার অযথা উল্লেখ করা হইয়াছে। স্তবরাং আমরা সরল বিশ্বাসে ইহা স্বীকার করিয়া ভুল করিয়াছি।

কর্মজড় স্মার্তগণ এই বৎসর (১৩৫৬) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-মন্দির হইতে পূনর্ঘাতা ২১শে শ্রাবণ মঙ্গলবারে বিচার করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণের বিচারে উহা শুদ্ধ নয়, তাহার পর দিবস ২২শে আষাঢ় বুধবারই বিশুদ্ধ পূনর্ঘাতা। শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা পরিচালনের কর্তৃপক্ষগণ উক্ত পঞ্জিকাকে এই বৎসর কর্মজড় স্মার্তগণের আনুগত্য করিতে পাঠাইয়াছেন। ইহাতে আমরা

বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। কর্মকর্তারা দায়িত্বশূন্য হইলে সাধারণের পরমার্থ হানি হইয়া থাকে, ইহা কি তাঁহারা জানেন না? আমরা তাঁহাদিগকে দায়িত্বহীন উদাসীন বলিব অথবা গোস্বামিবর্গের বিচারের উপর তাঁহাদের যেমন শ্রদ্ধা, স্মার্ত্তগণের বিচারেও ঠিক তেমনই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে বুঝিতে হইবে।

পঞ্জিকার সম্পাদক ও রচয়িতা

তৃতীয়তঃ—এই পঞ্জিকা “ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমদ্বক্তা প্রমোদ পুরী মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীমৎ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিকুসুম-সম্পাদিত” বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব বৎসরে এইরূপ পঞ্জী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী (ডাক্তার বাবু) সঙ্কলন ও প্রকাশ করিতেন। এই বৎসর সম্পাদক মধ্যে শ্রীপাদ পুরী মহারাজের নাম ও প্রকাশক মধ্যে শ্রীমান্ সুন্দর গোপালের নাম ব্যবহার করিয়া ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণকান্তি মহাশয় ইহার মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন অথবা কিছু দায়িত্ব এড়াইবেন মনে করিয়াছেন। আমরা বিশেষ ভাবেই জানি যে পঞ্জিকা-গণনা সম্বন্ধে উহাদের দুই জনের কাহারও কোন জ্ঞান বা হাত নাই। উহার জন্ত আমরা কেবল মাত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী মহাশয়কেই বিশেষভাবে দায়ী করিব।

তিনি আরও দায়িত্ব এড়াইবার জন্ত পঞ্জিকায় ‘নিবেদন’-শীর্ষক ভূমিকার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে গিয়া কোনও এক অখ্যাতনামা তাঁহার স্বনাম-বল্লভ ব্রহ্মচারীর নাম দেখাইয়াছেন। যদি প্রকৃতই তিনি কোনও ব্যক্তি হন এবং তাহাকে যতই শিক্ষিত দেখান হউক না কেন, তিনি শ্রীল প্রভুপাদের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমূলক জ্যোতির্বিজ্ঞায় পারদ্রুত হইয়া পঞ্জিকা-রচনা করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে এখনও কি সক্ষম হইয়াছেন? এই ব্যক্তির পরিচয় আমরা কেন, বহু সুখী-সজ্জনই জ্ঞাত নন। তিনিই যদি পঞ্জিকা রচনা করিয়াছেন বলিয়া ধরা হয়, তবে তাঁহার নামই বা গোপন করিয়া শ্রীপাদ পুরী মহারাজ ও স্মরণ ডাক্তার বাবুর নাম প্রয়োগ করিয়া পঞ্জিকা চালাইবার স্পৃহা হইল কেন? ইহার মধ্যে কি লোক-বঞ্চনা ও প্রতিষ্ঠা-লালসা নাই বলিতে হইবে?

“শ্রমণ”-সম্পাদক

ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল্, এম্, পি মহাশয় বোধহয় উক্ত পঞ্জিকা প্রকাশের দিনই শ্রীল প্রভুপাদ প্রবর্তিত ত্রিদিগু-সম্মাস গ্রহণ করিয়া অষ্টোত্তরশতনামী সম্মাসীর অন্ততম “শ্রমণ”—এই নাম গ্রহণ করেন। আমরা তাঁহার সম্মাস-মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি এবং বিধি অনুযায়ী

সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের পরিচয় দেওয়া কর্তব্য নয় মনে করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের শিরোনামায় তাঁহার পূর্ব নাম “শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী” ব্যবহার না করিয়া “শ্রমণ” নাম ব্যবহার করিয়াছি। আশ্চর্য—তিনি স্বয়ং যতি-বেশ গ্রহণ করার দিনই তাঁহার পূর্ব নাম পঞ্জীতে ব্যবহার করিলেন কেমন করিয়া? বোধহয় “শ্রমণ” নামটি বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণই অধিক ব্যবহার করেন বলিয়া উক্ত নামে তাঁহার তত রুচি হয় নাই বলিয়াই তাঁহার পূর্ব নাম ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ত নিশ্চয়ই জানা আছে যে, বৌদ্ধ ‘শ্রমণ’ ও বৈষ্ণব ‘শ্রমণ’ এক নহে—যদিও বাহ্যতঃ শব্দ দুইটি একই।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত শ্রীপাদ শ্রমণ মহারাজকে “স্মার্ত্ত” বলিয়াছি। যেহেতু তিনি গোস্বামি-মত সর্বতোভাবে গ্রহণ না করিয়া স্মার্ত্তমতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পুনর্ধাত্রার দিন নিরূপণ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত একাদশীর উপবাসের পরদিবস পারণের সময় নির্ণয় বিচারে যে ভুল করিয়াছেন আমরা পরে তাহা প্রদর্শন করিব। শ্রীল প্রভুপাদের বিচার অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া তাহা পালন না করায় বিশ্বাসঘাতকতাও হইয়াছে। তজ্জগুই তাঁহাকে আমরা বিশ্বাসঘাতক বলিয়াছি। আমাদের ‘স্মার্ত্ত’ ও ‘বিশ্বাসঘাতক’ এই বিশেষণদ্বয় তাঁহার পক্ষে বোধহয় আদৌ অনুপযুক্ত হয় নাই।

ভ্রম হেতু ত্রুটি স্বীকার

উপরোক্ত বিভিন্ন কারণে আমরা ‘শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা’খানি বিশ্বাস ও স্বীকার করিয়া তাহার নির্দ্ধারিত বিচার অনুসারে পরীক্ষা পালন করিতে গিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইতেছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর-ইচ্ছায় রক্ষা পাইয়াছি। উক্ত পঞ্জিকা অনুসারে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় গত রথষাত্রা উৎসবের তালিকা মধ্যে ভুল বশতঃ ২১শে আষাঢ় ১৩৫৬, ৫ই জুলাই ১৯৪৯, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীজগন্নাথের পুনর্ধাত্রা লিখিয়া প্রচার করা হয়। (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় ১৬০ পৃষ্ঠার শেষ অংশ দ্রষ্টব্য।) এতদ্ব্যতীত উক্ত মর্শ্বে নিমন্ত্রণ পত্রও পৃথক্ ভাবে ভারতের সর্বত্র প্রেরণ করা হয়। ষাহারা আমাদের নিমন্ত্রণ পত্র ও শ্রীপত্রিকা অনুসারে ২১শে আষাঢ় মঙ্গলবার পুনর্ধাত্রা পালন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা আমাদের ভ্রম ও ত্রুটি স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। সূদী পাঠক ও পার্শ্বিকাবর্গ সকলেই বুঝিতেছেন ইহা আমাদের জ্ঞানকৃত ভ্রম বা ত্রুটি নয়। অজ্ঞ লোকের প্রচারিত পাজির উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছি। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ভ্রম সংশোধন পূর্বক ২২শে আষাঢ় বুধবার,

১৩৫৬ তারিখেই পুনর্ঘাট করা হয়। এই ভ্রম এত অল্প সময়ের মধ্যে ধরা পড়ে যে, অতীত সকলকে এই সংশোধিত সংবাদ জানাইবার সময় ও সুযোগ ছিল না। তজ্জন্তু আমরা সকলের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

রথ-যাত্রার তিথি-বিচার

উৎকলমতে রথ-যাত্রা কর্তব্য

মাননীয় ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ওরফে শ্রীভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ ‘শ্রীনবদীপ-পঞ্জিকা’ নামক একখানি পঞ্জিকা সম্পাদন করিয়া তাহা বিশুদ্ধ ও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-সম্মত বলিয়া সর্বসাধারণে প্রকাশ ও প্রচার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্ঘাট দিবসের বিচার উক্ত পঞ্জিকিতে যাহা দেখিয়াছি তাহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বা গোস্বামি-মতের বিচারে সম্পূর্ণ বিপরীত।

বিগত ২১শে আষাঢ় ১৩৫৬, ৫ই জুলাই ১৯৪৯, দশমী তিথি, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্ঘাট দিবস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে গোস্বামি-মতে এই দিবস পুনর্ঘাট নহে। তাহার পর দিন ২২শে আষাঢ় বুধবার একাদশী তিথিতেই প্রকৃত বিশুদ্ধ ও গোস্বামি-সিদ্ধান্ত-সম্মত পুনর্ঘাট। উক্ত ডাক্তার বাবু ওরফে শ্রমণ মহারাজ যে-সমস্ত পঞ্জিকা আদর্শ মনে করিয়া ‘শ্রীনবদীপ-পঞ্জিকা’ প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—“২১শে আষাঢ় **স্মার্তমতে**” শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্ঘাট। সুতরাং গোস্বামিমতে ঐ দিন পুনর্ঘাট নহে, ইহা ত সাধারণ জ্ঞান। শুধু তাহাই নহে, উক্ত স্মার্ত-পঞ্জিকাকারগণ তাহার পরদিবস ২২শে আষাঢ় বুধবার **উৎকলমতে** শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্ঘাট উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতেও শ্রমণ মহারাজের চোখের ছানি কাটে নাই। তিনি হয়ত মনে করিয়াছেন, উৎকল-মত সকলে গ্রহণ করিবে কেন? কিন্তু রথযাত্রাদি সম্বন্ধে উৎকল-মত গ্রহণ করাই যে গোস্বামি-সম্মত বিচার—তাহা বোধ হয় তিনি জানেন না। গোস্বামিমতের একমাত্র বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তপূর্ণ স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রমাণ এই সম্বন্ধে নিম্নে উদ্ধার করিলাম। প্রমাণটি ডাক্তারবাবু ভাল করিয়া দেখিয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইলে সুখী হইব। যথা—

কিস্কীদৃগ্ভক্তিসংদর্শি জগন্নাথানুসারতঃ।

দোলা-চন্দন-কীলাল-রথযাত্রাশ্চ কারণেৎ ॥

(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ১৪শ বিলাস ১০৪)

যড়্গোস্বামীর অগ্রতম শ্রেষ্ঠ গোস্বামী শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু-চরণ ইহার টীকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও আমাদের আলোচ্য । যথা—

কিস্তি—ঈদৃশী মূর্তিপূজা, যাত্রোৎসবাদিরূপা যা ভক্তিঃ তস্তাঃ সমাগ্দর্শন-শীলস্ত লোকগ্রাহকস্ত শ্রীজগন্নাথদেবস্ত অনুসারতঃ যস্মিন্ দিনে যথা তৎক্ষেত্রে ভবেত্তদ্দিনেহপি তথা দোলযাত্রাং, চন্দনযাত্রাং, জলযাত্রাং, রথযাত্রাঞ্চ কুর্যাদেবেত্যর্থঃ ।

অর্থাৎ—কিন্তু এই প্রকার মূর্তিপূজা ও যাত্রোৎসবাদি ভক্তির আদর্শ-স্বরূপ, লোকগ্রাহক জগন্নাথদেবের অনুসারে (উৎকলমতে) দোলযাত্রা, চন্দনযাত্রা, স্নান-যাত্রা ও রথযাত্রা করিবে । তথায় এই সকল যাত্রা যে যে দিনে হইয়া থাকে তদনুসারে করিতে হইবে ।

সুতরাং দোলযাত্রা, রথযাত্রাদি কয়েকটা পর্ব উৎকলমতেই পালন করিতে হইবে । ইহা শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মত । ইহা উল্লঙ্ঘন করিয়া স্মার্তানুগত্য কখনও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না ।

রথযাত্রার প্রথম দিবস

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসবের দিন উৎকলমতে স্থির আছে । এসম্বন্ধে কাহারও কোনও মতভেদ দৃষ্ট হয় না । সুতরাং এ-স্থলে অধিক আলোচনা না করিয়া এই সম্বন্ধে দুই একটি প্রমাণ উদ্ধার করিয়াই নিরস্ত হইব ।

স্কন্দপুরাণ উৎকল খণ্ড ৩৩ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে—

আষাঢ়স্ত সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা । ৩৫ ॥

* * * *

বিজয়স্ব রথে নাম গুণ্ডিচামণ্ডপং প্রতি ॥ ৩৭ ॥

অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয় পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত দ্বিতীয়াতে * * *

আপনি রথারোহণে গুণ্ডিচা-মণ্ডপে যাত্রা করুন ।

এই সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মে যাহা দেখিতে পাই তাহাও উক্ত বচনের অন্তরূপ ।
যথা—

আষাঢ়স্ত সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা ।

তস্তাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়া সহ ।

যত্রোৎসবং প্রবৃত্তাথ প্রীগয়েচ্চ দ্বিজান্ বহুন ॥

অর্থাৎ আষাঢ় মাসের পুণ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রার অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। সুভদ্রা ও বলরামের সহিত জগন্নাথ-দেবকে রথে আরোহণ করাইয়া এই উৎসব করিতে হয়। “স্বাস্থ্যভাবে তিথৌ কার্য্য”—এই ত্রায় অল্পসারে পুষ্যা নক্ষত্র না পাইলেও কেবল দ্বিতীয়া তিথির উপরই নির্ভর করিয়া উৎসব করিবে। যাহা হউক এ-সম্বন্ধে কাহারও কোনও মতভেদ না থাকায় অধিক লেখা নিম্প্রয়োজন।

একাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্ঘাট্রা

পুনর্ঘাট্রা লইয়াই অযথা মতভেদ লক্ষিত হয়; সুতরাং এসম্বন্ধে দু'একটা অকাট্য প্রমাণ বিশেষ প্রয়োজন। স্কন্দ পুরাণের উৎকল খণ্ড ৩৫ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

অষ্টমেহহি পুনঃ কৃৎয়া দক্ষিণাভিমুখান্ রথান্।

ভূষয়েদ্বস্ত্রমালৈশ্চ পতাকৈশ্চামরাদিভিঃ ॥ ৭ ॥

নবম্যাং বাসয়েদেবান্ তেষু প্রাতঃ সমুদ্বিমং।

দক্ষিণাভিমুখী যাত্রা বিষ্ণোরেষা সুচল্লভা ॥ ৮ ॥

কার্য্য প্রযত্নতঃ সা হি ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ।

যথা পূর্বা তথা চেয়ং তে বিমুক্তিপ্রদায়িকৈঃ ॥ ৯ ॥

যাত্রাপ্রবেশৌ দেবশ্চ এক এবোৎসবে যতঃ।

পুরাবিদৌ বদন্ত্যেতাং যাত্রাং নবদিনাঙ্ঘিকাম্ ॥ ১০ ॥

অর্থাৎ অষ্টম দিবসে রথত্রয়কে পুনরায় দক্ষিণাভিমুখ করিয়া বস্ত্র, মাল্য, পতাকা ও চামরাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিবে। তৎপরে নবমী তিথিতে (নবম দিবসে) প্রাতঃকালে মহাসমারোহের সহিত সেই রথত্রয়োপরি দেবত্রয়কে পূর্ববৎ অধিষ্ঠিত করিবে। ভগবান্ বিষ্ণুর দক্ষিণাভিমুখী এই পুনর্ঘাট্রা অতি চল্লভ। মানবগণকে ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া সাতিশয় যত্নসহকারে উহা সম্পাদন করিতে হইবে। পূর্বযাত্রা ও পুনর্ঘাট্রা, উভয়ই মুক্তিদায়ক। ভগবানের নিজ মন্দির হইতে মহাবেদীতে যাত্রা ও তথা হইতে পুনর্বার যে, নিজ মন্দিরে প্রবেশ, এই উভয় কার্য্য একই উৎসব বলিয়া পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ ভগবানের ঐ রথযাত্রাকে নব-দিনাঙ্ঘিকা যাত্রা বলিয়া থাকেন।

উক্ত স্থলে ‘নবম্যাং’ শব্দে নবমী তিথি বুঝাইলেও উহার অর্থ নবমী তিথি কেহই স্বীকার করেন না। বিশেষতঃ শ্রমণ মহারাজও নবমী পার করিয়া দশমীতেই পুনর্ঘাট্রা বিধেয় বলিয়া পাজিতে লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উহা

নবমী তিথি অর্থ ধরিলে, উহার পূর্বাঙ্গের সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। উক্ত ১০ম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে রথযাত্রা উৎসব নবদিনাঙ্কিকা। সুতরাং দ্বিতীয়া হইতে নব-দিনাঙ্কিকা রথ-যাত্রা হইলে, পুনর্যাত্রা একাদশী তিথিতেই সাব্যস্ত হয়। অষ্টম দিবসে রথত্রয়কে দক্ষিণাভিমুখে ঘুরাইয়া বিবিধ মালা পতাকাদ্বারা সাজাইবার উপদেশ আছে। সুতরাং উহা ‘নবমী তিথি’ এই অর্থে না হইয়া, ‘নবম দিবস’-অর্থে ‘নবম্যাং’ আর্ষ প্রয়োগ হইয়াছে।

পুনর্যাত্রা সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ

এতদ্ব্যতীত পদ্মপুরাণ-বচন দেখিলে সকল বিবাদই মিটিয়া যায়। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল—

আষাঢ়স্য দ্বিতীয়ায়াং রথং কুর্যাদিশেষতঃ।

আষাঢ়শুক্লেকাদশ্যাং জপহোমমহোৎসবম্ ॥

অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা করিয়া শুক্লা একাদশীর দিন পুনর্যাত্রা করিতে হইবে। এইদিন জপহোমাদি মহোৎসব বিধেয়।

সুতরাং স্মার্তমতে দশমীতে পুনর্যাত্রা হইবার কোনও যুক্তি বা কারণ নাই। একাদশী তিথিই সর্বতোভাবে শুদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত। কোথাও “সপ্তাহং সরিতন্তীরে মম যাত্রা ভবিষ্যতি” (বিষ্ণুধর্মের অশ্বত্থ) এরূপ উক্তি দৃষ্ট হইলেও উহার সঙ্গতি করা বিশেষ প্রয়োজন। এখানে সপ্তাহ বলিলে “যাত্রা ও পুনর্যাত্রা” এই দুই দিবস বাদে অন্ততঃ নিখুঁত সাতদিন সরোবর-তীরে অবস্থান বুঝিতে হইবে। সুতরাং ‘সপ্তাহং’ শব্দের এরূপ অর্থ করিলে শাস্ত্রের সমস্ত বাক্যের সহিতই সামঞ্জস্য রক্ষা হয়।

মাননীয় শ্রীপাদ শ্রমণ মহারাজ ওরফে ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেই আনন্দিত হইব এবং ভবিষ্যতে পঞ্জিকা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবেন ইহাই প্রার্থনা। নচেৎ এরূপ ভুল-পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়া মঙ্গলেচ্ছু সরল ব্যক্তিদের পরমার্থ নষ্ট করিবেন না।

রথ-যাত্রা সম্বন্ধে দু'চারটি কথা

পুরীর রথ বৌদ্ধ-রথের অনুকরণ নহে

আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উদ্ভ্রান্ত স্বশ্রীকাতর ব্যক্তিগণের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায় যে, ভারতীয় বিশেষতঃ শ্রীশ্রীপুরীধামের রথযাত্রা মহোৎসব বৌদ্ধগণের রথযাত্রার অনুকরণে হইয়াছে। বৌদ্ধ শ্রমণগণ বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব দিবসে রথযাত্রা মহোৎসব করিতেন। অবশ্য ইহা গ্রায়সঙ্গত ভাবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শ্রমণগণ গোস্বামিমতে রথোৎসব করিতেন না। বৌদ্ধ গণের মধ্যে রথযাত্রার প্রচলন সম্বন্ধে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বলেন যে ফাহিয়ান্ নামক একজন চীন-দেশীয় পরিব্রাজকের উক্তিই প্রধান প্রমাণ। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বুদ্ধের রথযাত্রা দর্শন করিয়াছেন। ইহার পূর্বে ভারতে অত্র কোনও রথের সন্ধান উক্ত ডাক্তার বাবু আর পান নাই। গোস্বামিবর্গ প্রাচীনতন শাস্ত্রাদিতে যে রথের সন্ধান পাইয়া তাহার বিধি-ব্যবস্থা বেরূপভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বোধহয় ডাক্তারী-বিদ্যা আলোচনার ফলে ডাক্তার রাজেন বাবু ও ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ওরফে শ্রমণ মহারাজের চোখে (বৌদ্ধ ও স্মার্ত) ছানি পড়ায় দেখিতে পান নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বৌদ্ধ সম্বন্ধ যেন স্বভাবতঃই উভয় ডাক্তার বাবুর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বৈষ্ণব বিচার ত্যাগ করিলেই বৌদ্ধ, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বা স্মার্ত হইতে হয়।

রথারোহণের অপর নাম পাহাড়ি বা পাণ্ডু বিজয়

উক্ত পঞ্চম শতাব্দির ফাহিয়ানের জন্মের আরও ২০০ শত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে দ্রাবিড়ের অন্তর্গত পাণ্ড্যদেশ নামক একটা দেশে পাণ্ডু-বিজয় বা পাণ্ড্য-বিজয় নামে একজন মহা পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বৌদ্ধগণের প্রবল প্রতাপের ফলে বৈষ্ণব-ধর্ম কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষীণপ্রভ হইয়াছিল। সেই সময় শ্রীদেবেশ্বর নামে উক্ত রাজার একজন পুরোহিতের স্মরণ-প্রভাবে পাণ্ড্যরাজ সমস্ত বৌদ্ধ-বিপ্লব ধ্বংস করিয়া শুদ্ধ সনাতন ধর্মের সন্নাচার ও উৎসবদির অনুষ্ঠান পুনঃ প্রবর্তন করেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুষভদ্রাদেবীকে রথে করিয়া সুন্দরাচলে নির্জনে সংরক্ষণ করেন। এখনও শ্রীজগন্নাথদেবের রথারোহণকে সেই রাজা পাণ্ড্যবিজয়ের নামানুসারে “পাণ্ডুবিজয়” বা “পাহাড়ি” বলিয়া থাকে এবং পাণ্ড্য-বিজয়ের পুরোহিতের নামানুসারে সেবাহিতগণের নাম ‘পাণ্ডু’ হইয়াছে।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের প্রাচীনতা

উক্ত পাণ্ডুবিজয় রাজার পুরোহিত বা মন্ত্রী শ্রীদেবেশ্বর। তাঁহার পুত্র দেবতনু ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ‘আদি বিষ্ণুস্বামী’ নামে পরিচিত হন এবং অষ্টোত্তরশত-নামী ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী শিষ্য করেন। তিনি বৌদ্ধমত ধ্বংস করিয়া সর্বত্র বৈষ্ণব মত প্রচার করেন। ইহা আচার্য্য শ্রীল শঙ্করের আবির্ভাবের বহু শত বৎসর পূর্বের ঘটনা। দশনামী সন্ন্যাসীর কথা আধুনিক, পৌরাণিক নহে। যুগ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের কথা প্রচলিত রহিয়াছে; কিন্তু কেবলমাত্র দশনামীর একদণ্ড-সন্ন্যাস অত্যন্ত আধুনিক এবং সেদিনের শঙ্কর-প্রবর্তিত সন্ন্যাস মাত্র।

বৈদিক যুগে রথ ও রথযাত্রা

প্রাচীন বৈদিক যুগেও রথের চলন ছিল। কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীতে রথ-শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। যদিও তাহা রূপকভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তথাপি তাহার দ্বারা সেই যুগে রথের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। তৃতীয় মন্ত্র যথা—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।

বুদ্ধিঃ তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥

এতদ্ব্যতীত বেদের অন্তর্গত বিষ্ণুর ও সূর্য্যের রথের কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারত, পদ্মপুরাণ, স্বন্দপুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্ম, উৎকল-খণ্ড, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণশাস্ত্রেও রথের উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন অর্জুনের রথে কৃষ্ণ সারথী ছিলেন বলিয়া প্রাচীনকালে যুদ্ধের যান-বাহনকেই রথ শব্দের দ্বারা আখ্যাত করিত। ইহার মূলে কিছু সত্যতা থাকিলেও ‘রথ’ ও রথযাত্রা পর্বাদি যে বৌদ্ধ যুগেরও অনেক পূর্ব্বেকার এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন; স্মৃতির্য্যং তাঁহারা কাহারও আলোকরণিক নহেন; পরন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই ভারতীয় ধর্ম্ম-চিন্তাস্রোতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের ধর্ম্ম-বিজ্ঞান রচিত হইয়াছে। “যাহা নাই বেদে, তাহা নাই জগতে”—এই সত্য কথাটী ভারতের সর্বত্রই সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। আমরা ইহার প্রমাণস্বরূপ Oldfield (ওলড্‌ফিল্ড) নামক জর্নৈক প্রবীণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের উক্তি নিয়ে উদ্ধার করিলাম—

The Buddhist Festival is evidently adopted from the Hindu Festival of Jagannath, in honour of Jagannath and

His brother Balaram, and Kumari representing their sister Subhadra—(Oldfield's sketches from Nepal vol, II p, 316).

অর্থাৎ বৌদ্ধগণের রথযাত্রা উৎসব জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসব হইতেই গৃহীত হইয়াছে। এই উৎসব জগন্নাথ, তাঁহার ভ্রাতা বলরাম ও তাঁহাদের উভয়ের ভগ্নী সুভদ্রার সম্মানের জন্ত করা হয়।

আমরা দুঃখের সহিত ডাক্তার বাবুর ঞ্চার আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণকে বলিতে চাই যে, ইয়োরোপের বা পাশ্চাত্য-দেশীয় পণ্ডিতগণ বিশেষ জোরের সহিতই বলিয়া থাকেন “বৌদ্ধ রথ ভারতীয় রথের অনুরূপে হইয়াছে।” আর আমাদের দেশীয় তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিসকল বলেন— “ভারতীয় রথই বৌদ্ধ রথের অনুরূপে হইয়াছে।” ইহা হইতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি হইতে পারে? অতএব আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহারা স্বশ্রীকাতর এবং পরশ্রী-গৌরব। খোলা ভাষায় বলিতে গেলে নিজ-শ্রী দর্শনে কাতর ও দুঃখিত, কিন্তু পরশ্রীতে গৌরবান্বিত বোধ করেন।

ইয়োরোপ ও নেপালে রথযাত্রা

উক্ত ওল্ডফিল্ড সাহেব নেপালের রথযাত্রা প্রসঙ্গ লিখিতে গিয়া ঐ প্রকার কথা লিখিয়াছেন। নেপালে শিবের ও বুদ্ধের উভয়েরই বিভিন্ন প্রকার রথযাত্রার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

এই রথযাত্রা কেবল ভারতে বা তাহার সন্নিকটস্থ দেশেই হইয়া থাকে এরূপ নহে। আজকাল যাহাকে আমরা সুসভ্য দেশ বা জাতি বলিয়া মনে করি, তাহাদের মধ্যেও ইহার প্রচলন রহিয়াছে। ইয়োরোপের অন্তর্গত সিসিলি দ্বীপেও করুণাময় দেবতার মাতা **মেরীর** সম্মানার্থ এইরূপ রথযাত্রা হইত এবং পূর্বে পুণ্যালাভের জন্ত ভারতে যেরূপ বীভৎস ও নির্মম কাণ্ড হইত, সিসিলিতেও সেইরূপ হইত। আমরা পাশ্চাত্য বিদুষী শ্রীমতী কারাসিওলোর (**Madam Henrietta Caraciolo**) লিখিত প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠকগণের অবগতির জন্ত নিম্নে উদ্ধার করিলাম—

' A Colossal **Car** is dragged by a long team of buffaloes through the irregular and illpaved streets. Upon this are erected a great variety of objects, such as Sun, Moon and principal planets, set in rotary motion and diminishing proportionately in size as they approach the summit of the structure. This erection is in itself really imposing ;

sumptuously decorated and put in movement in honour of her who gave birth to the God of charity. But its function recalls to mind the famed car of Jagannath. (Memories of Henrietta Caraciolo P. 21).

অর্থাৎ সুদীর্ঘ মহিষ শ্রেণী-দ্বারা একটি বিরাট রথ প্রস্তুত-নির্মিত বন্ধুর পথের উপর দিয়া আকর্ষণ করা হয়। এই রথোপরি বিবিধ দৃশ্যাবলী সজ্জিত থাকে, তন্মধ্যে ঘূর্ণ্যমান চন্দ্র-সূর্যাদি প্রধান প্রধান গ্রহরাজি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রহ-সমূহ ঘুরিতে ঘুরিতে রথের শীর্ষদেশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে ক্রমশঃ উহার ক্ষুদ্র দেখাইতে থাকে। এই দৃশ্যটি বস্তুতঃই মনোহর। করুণাময় দেবতার জননীর (মেরী) প্রতি সম্মান প্রদর্শন-কল্পে এই বস্তুটি নির্মিত ও বহু অর্থ ব্যয়ে সজ্জিত হইয়া চালিত হয়। কিন্তু এই উৎসবটি প্রসিদ্ধ জগন্নাথের রথের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

রথযাত্রায় গুণ্ডিচা মন্দির

রথযাত্রা মহোৎসবের সর্বাপেক্ষা প্রধান অঙ্গই গুণ্ডিচা মন্দির। সূতদ্রা ও বলদেবসহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রতিবৎসর এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিতে যে যান-বাহন অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাই সমগ্র পৃথিবী-বিখ্যাত রথ নামে খ্যাত। গুণ্ডিচা মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব 'যাত্রা ও পুনর্যাত্রা'র দিবসদ্বয় ব্যতীত অন্ততঃপক্ষে নিখুঁত এক সপ্তাহকাল তথায় অবস্থান করেন। এখানকার ইতিহাস এই যে, সত্যযুগে ইন্দ্রহ্যম্ন নামে একজন ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণব মহারাজ ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পরম ভক্ত এবং পুরীতে তাঁহার প্রচুর সেবা-কীর্তি আজও বর্তমান। তাঁহারই মহিষীর নাম ছিল 'গুণ্ডিচাদেবী'; তাঁহার নামানুসারেই এই মন্দিরের নাম "গুণ্ডিচা-মন্দির" হইয়াছে। পুনর্যাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথদেব এখান হইতেই পুনরায় তাঁহার অভভেদী অত্যুচ্চ শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া থাকেন।

গুণ্ডিচা মন্দির হইতে ফিরিয়া যাইবার দিন নির্দ্ধারণ লইয়াই গোস্বামিগণের বিচারের সহিত স্মার্ত ও বৌদ্ধগণের মতভেদ হইয়াছে। গোস্বামিগণের বিচারই সর্বাদ্বন্দ্ব-ও বিশুদ্ধ এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ এই বিচারই অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমাদের ডাক্তার বাবু শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ওরফে 'শ্রমণ' মহারাজ গোস্বামিমত ত্যাগ করিয়া ভ্রমক্রমে তাঁহার প্রচারিত 'শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা'য় স্মার্তমতে বা বৌদ্ধমতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথের পুনর্যাত্রার দিন স্থির করিয়া বৈষ্ণব-শ্রমণ না হইয়া বৌদ্ধ-শ্রমণ নামের স্বার্থকতা করিয়াছেন। আমরা শাস্ত্র

যুক্তিদ্বারা তাঁহার উক্ত দিন-নির্ণয়ের ভ্রান্তি এই সংখ্যায়ই পৃথক প্রবন্ধদ্বয়ে প্রকাশ করিয়াছি। “স্মার্ত্ত শ্রমণের বিশ্বাসঘাতকতা” ও “রথ-যাত্রার তিথি-বিচার” শীর্ষক পূর্ব প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য।

ব্রজবাসী শ্রীস্বাধিকারানন্দজীর পত্র

শ্রীশ্রীভাগবতচরণে দণ্ডবন্দিত পূর্ব্বিকেষম্—

পরম কারুণিক শ্রীল কেশব মহারাজ এইমাত্র আপনার আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে প্রকাশিত “গৌড়ীয়ের” সম্মান এবং মর্যাদা আপনার পত্রিকাই সংরক্ষণ করিতে পারিবে। দুর্ভাগ্য—প্রবন্ধ লিখিবার সামর্থ্য আমার একেবারেই নাই—যদি কিঞ্চিন্নাত্রও থাকিত, তাহা হইলে আপনার সেবা করিয়া ধন্য হইতাম। রূপাপূর্ব্বক সন্তোষকে শ্রীপাদ বন মহারাজের ঠিকানায় পত্রিকা পাঠাইতে লিখিবেন। শ্রীপাদ বন মহারাজও আপনার পত্রিকার বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। গুণীর গুণ কাহারও নিকট অপ্রকাশিত থাকে না। আমি প্রতি বৎসরই ঝুলনের দুই মাস বৃন্দাবনে থাকি—ইহার কারণ আপনি ভালরূপেই জানেন। আপনি আমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

প্রণতঃ দাসাভাস—শ্রীস্বাধিকারানন্দ (ব্রহ্মচারী)

নন্দগ্রাম (মথুরা) ৬/৬/৪৯

মাননীয় চন্দ্র বাবুর পত্র

পরম পূজ্যপাদ গৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণ কমলেশু

অসংখ্য দণ্ডবন্দিত পুরঃসর নিবেদনম্—

মহাশয়! আপনার প্রেরিত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা গৌড়ীয় ও তৎসঙ্গে একখানা কার্ড পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। শুদ্ধভক্তি প্রকাশক ও সুসিদ্ধান্ত পূর্ণ ‘গৌড়ীয় পত্রিকা’ কয় খানা আমি ভক্তি গ্রন্থের ত্রায় নিয়মিতরূপে পাঠ করিয়া থাকি। কতিপয় বর্ষ পূর্বে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারার্থে ‘গৌড়ীয়’ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কতিপয় গুরুদ্রোহীর গুরুপরাধের ফলে কয়েক বৎসরের তরে পত্রিকা খানা অপ্রকট ছিলেন। কিন্তু কলিহত জীবের দুর্দশা দেখে আজ কতিপয় বৎসরান্তে শ্রীমন্ন্যপ্রভুর আচরিত

ও প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম প্রচারার্থে তিনি “গৌড়ীয়-পত্রিকা” নামে জগতে প্রকট হইয়াছেন।

কতিপয় বৎসর পূর্বে ‘গৌড়ীয়’ যখন শুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম প্রচারার্থে জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ‘গৌড়ীয়ের’ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া একাধারে ১৩শ বৎসর পর্যন্ত গৌড়ীয়ের গ্রাহক ছিলাম। আমি বহুদিন হইতে অজ্ঞতা বশতঃ ও ভ্রম ধারণার বশবর্তী হইয়া স্নানির্মল আত্ম ধর্মের বা বৈষ্ণব ধর্মের গ্নানি স্বরূপ কৃত্রিম বেশধারী আউল, বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি অসং সম্প্রদায় সমূহের কদর্যা ভোগ সুখকর ব্যবসায়ী গোসাইন্দের ও শাস্ত্রের কুব্যাখ্যাকারী কপট বৈষ্ণব বেশধারীদের কবলে পড়িয়া প্রকৃত পথ ভ্রষ্ট হইয়া অন্ধের রাস্তায় ছিলাম। যেদিন ‘শ্রীগৌড়ীয়’ রূপা করে আমার দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই দিন হইতেই আমি ‘শ্রীগৌড়ীয়ের’ অহৈতুকী রূপায় প্রকৃত বিশুদ্ধ স্নানির্মল পথের তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি। সারাজীবন যে সকল অপসিদ্ধান্ত হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম তাহা ‘গৌড়ীয়ের’ অহৈতুকী রূপায় সমূলে উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে। আবার তিনি রূপা করে ‘গৌড়ীয়পত্রিকা’ নাম ধরে আমাকে ভোগময় সংসার হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত পুনশ্চ দ্বারে উদ্ভিপত হইয়াছেন।

আমি ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার’ গ্রাহক হইব ইহা নহে; শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর রূপার ভিখারী হইয়া যাহাতে ‘গৌড়ীয়-পত্রিকার’ প্রচার হয় তদ্বিষয়ে প্রাণ পণে চেষ্টা করিতেছি ও করিব। কারণ বর্তমান সময় জগতে শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম প্রচারক একথানাও পারমার্থিক পত্রিকা নাই, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় নয় কি?

আপনারা শ্রীপত্রিকা যোগে দেশের ও সমাজের যে সংস্কার আরম্ভ করিয়াছেন তাহা অতীব মঙ্গল দায়ক। মনে হয় শ্রীমহাপ্রভু আপনাদের দ্বারা তাঁহার ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জন সমাজে প্রচার করিতেছেন। তাঁহার কার্য্য জয় যুক্ত হউক, এবং আপনারাও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর রূপা ভাজন হইয়া জয় যুক্ত হউন।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্ত-পদরেণু-প্রার্থী—শ্রীচন্দ্রকুমার দাস
গ্রাম দাসদী, ত্রিপুরা।

ভ্রম সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ৫ম সংখ্যার ১৭৭ পৃষ্ঠায় ২য় পংক্তিতে “স্বাদস্ত” স্থানে “স্বাদস্ত” আর ৬ষ্ঠ পংক্তিতে “প্রকৃত” স্থানে “প্রাকৃত” হইবে।

—প্রকাশক

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

ধর্মঃ সৃষ্টিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।

নোংপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥
অন্য ধর্ম সৃষ্টরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১ম বর্ষ

}

অনিরুদ্ধ, ১১ কেশব, ৪৬৩ গৌরাব
বুধবার, ৩০ কা্তিক ১৩৫৬, ইং ১৬।১১।৪৯

}

৯ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদয়িতদাসদশকম্

(ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমন্ত্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-মহারাজ-কৃতম্)

নীতে যস্মিন্ নিশান্তে নয়নজলভরৈঃ স্নাতগাত্রার্ঘ্যদানাং
উচ্চৈরুৎক্রেণতাং শ্রীবৃষকপিস্মৃতযাধীরয়া স্বীয়গোষ্ঠীম্।
পৃথ্বী গাঢ়াক্ষক্যারৈহ তনয়নমণীবাবৃত্তা যেন হীনা
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্ ॥ ১ ॥

যস্য শ্রীপাদপদ্মাং প্রবহতি জগতি প্রেমপীযুষধারা
 যস্য শ্রীপাদপদ্মচ্যুতমধু সততং ভূতাভঙ্গান্ বিভর্তি।
 যস্য শ্রীপাদপদ্মাং ব্রজরসিকজনো মোদতে সম্প্রশস্য
 যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্ ॥ ২ ॥

বাৎসল্যাং যচ্চ পিত্রো জগতি বহুমতং কৈতবং কেবলং তৎ
 দাম্পত্যং দস্যুতৈব স্বজনগণ-কৃতা বন্ধুতা বধনেতি।
 বৈকুণ্ঠস্নেহমূর্তেঃ পদনখকিরণৈর্ঘস্য সন্দর্শিতোহস্মি
 যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্ ॥ ৩ ॥

যা বাণী কর্ণলগ্না বিলসতি সততং কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে
 কর্ণক্ৰোড়াজ্জনানাং কিমু নয়নগতাং সৈব মূর্তিং প্রকাশ্য।
 নীলাদ্রীশস্য নেত্রার্পণভবনগতা নেত্রতারাবিধেয়া
 যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্ ॥ ৪ ॥

গৌরেন্দোরস্তশৈলে কিমু কনকঘনো হেমস্নজ্জম্বুনঢ়া
 আবিভূতঃ প্রবর্ধৈর্নিখিলজনপদং প্লাবয়ন্ দাবদন্ধম্।
 গৌরাবির্ভাবভূমৌ রজসি চ সহসা সংজুগোপ স্বয়ং স্বং
 যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্ ॥ ৫ ॥

গৌরো গৌরস্য শিষ্যো গুরুরপি জগতাং গায়তাং গৌরগাথা
 গোঁড়ে গোড়ীয়-গোষ্ঠ্যাত্রিতগণ-গরিমা দ্রাবিড়ে গৌরগব্বী।
 গান্ধর্ব্বা গৌরবাঢ্যো গিরিধরপরমপ্রেয়সাং যো গরিষ্ঠো
 যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্ ॥ ৬ ॥

যো রাধাকৃষ্ণনামামৃতজলনিধিনাপ্লাবয়দ্বিশ্বমেত-
 দায়েচ্ছাশেষলোকং দ্বিজনূপবণিজং শূদ্রশূদ্রাপকৃষ্টম্।
 মুক্তৈঃ সিদ্ধৈরগম্যঃ পতিতজনসখো গৌরকারুণ্যশক্তি-
 যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্ ॥ ৭ ॥

অপাশা বর্ততে তং পুরটবরবপুলোঁকিতুং লোকশনং
 দীর্ঘং নীলাজনেত্রং তিলকুসুমনসং নিন্দিতাকৈন্দুভালম্ ।
 সৌম্যং শুভ্রাংশুদন্তং শতদলবদনং দীর্ঘবাহুং বরেণ্যং
 যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়নং হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্ ॥ ৮ ॥

গৌরাকে শূণ্যবাণাঘিতনিগমমিতে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্থ্যাং
 পৌষে মাসে মঘায়ামমরগণগুরোর্বাসরে বৈ নিশান্তে ।
 দাসো যো রাধিকায়্যা অতিশয়দয়িতো নিত্যলীলাপ্রবিষ্টো
 যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়নং হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্ ॥ ৯ ॥

হাহাকারৈর্জ্ঞানানাং গুরুচরণজুঘাং পূরিতাত্তনভশ্চ
 যাতোহসৌ কুত্র বিশ্বং প্রভুপদবিরহাক্লান্ত শূণ্যায়িতং মে ।
 পাদাজে নিত্যভূত্যাঃ ক্ষণমপি বিরহং নোৎসাহে সোঢ়ুমত্র
 যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়নং হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীশ্রীদয়িত-দাস-দশকের অনুবাদ

শ্রীশ্রীবৃষভানুন্দিনী নিশান্তকালে লক্ষ লক্ষ বিলাপকারী, নয়নধারাসিঞ্চিত-
 গাত্র জনগণের মধ্য হইতে যাহাকে অধীরভাবে নিজ গোষ্ঠীমধ্যে আকর্ষণ করিলে
 যাহাকে হারাইয়া এই পৃথিবী হতনয়নমণিজনের ত্রায় (সরস্বতী ঠাকুরের গুঢ়
 নাম “নয়নমণি”) গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল,—হে (প্রভুদর্শনবিরহিত)
 আমার দীন নয়ন ! (পক্ষান্তরে হে দীনোদ্ধারণ ! অথবা সঙ্কে না লইবার
 জন্ত করুণাতে কৃপণতাপ্রকাশকারী হে নয়ন নামক প্রভুজন) ঐ মহাপুরুষ
 যেখানে, শীঘ্র এই কিস্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ১ ॥

যাহার পাদপদ্ম হইতে জগতে প্রেমসুধানদী প্রবাহিত হইতেছে, যাহার
 পাদপদ্মচ্যুত মধু নিরন্তর পান করিতে করিতে অম্লচর-মধুকরগণ নিজ নিজ জীবন
 ধারণ করিতেছে, ব্রজের বিশ্রান্ত-রসাম্রিত জন যাহার পাদপদ্মের প্রশংসা করিতে
 সুখবোধ করিয়া থাকেন—হে দীন নয়ন ! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই
 কিস্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ২ ॥

মাতাপিতার বাৎসল্য বলিয়া জগতে যাহা বহুমানিত, (হরিভক্তির বাধা-রূপে) তাহা ছলনা মাত্র, সমাজপ্রচলিত তথাকথিত পবিত্র দাম্পত্য-প্রেম (উভয়ের সম্ভাব্য নিরুপাধিক প্রেমসম্পদ অর্জনের উত্তমলুপ্তনকারী আত্মরিক প্রচেষ্টারূপে) দৃশ্যতা ভিন্ন কিছুই নয় এবং বন্ধুতা বঞ্চনামাত্র—এই সমুদায় বিচার যে অপ্রাকৃত স্নেহময় বিগ্রহ মহাপুরুষের পদনথকিরণের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে—হে দীন নয়ন, ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিস্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের কণ্ঠস্বররূপে যে বাণী সর্বদা জনগণের কর্ণকোড়ে বিলাস করিতেন, তিনিই কি কর্ণ হইতে নয়নগোচর মূর্তি প্রকাশ করিয়া শ্রীনীলাচলচন্দ্রের (রথযাত্রাকালে) নয়নার্ণবরূপ প্রসাদপ্রাপ্ত প্রাসাদে প্রকটিত হইয়া “নয়নমণি” নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিতেন ? হে দীন নয়ন ! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই ভৃত্যকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ৪ ॥

শ্রীভাগবতোক্ত জম্বুনদের নির্মল স্বর্ণময় জল আকর্ষণ করিয়া কি এই কাঞ্চনবর্ণ মেঘ শ্রীগৌরচন্দ্রের অন্তগমনশৈলে উদিত হইয়া (ত্রিতাপ)-দাবায়িদন্ধ সমুদয় দেশকে প্রচুর বর্ষণ দ্বারা প্লাবিত করিতে করিতে শ্রীগৌরান্দের উদয়ভূমিরজে অকস্মাৎ আত্মগোপন করিলেন ! হে দীন নয়ন ! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিস্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ৫ ॥

যিনি গৌরবর্ণ এবং শ্রীগৌরগাথাগানকারী নিখিল জগতের (স্বাভাবিক) গুরু হইয়াও যিনি শ্রীগৌরকিশোর নামক কোন মহাত্মার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, যিনি সমগ্র গোড়মণ্ডলে শুদ্ধ গোড়ীয় গোষ্ঠীর আশ্রয়দাতৃগণের গরিমাস্থল, যিনি জাবিড়-বৈষ্ণবগণের (লক্ষ্মী-নারায়ণোপাসকগণের) নিকট শ্রীগৌরপ্রদত্ত (শ্রীরাধা-গোবিন্দের ব্রজ-ভজনের কথা) কীর্তন করিতে গরু অমুভব করেন, শ্রীগাঙ্গার্কীর গণেশ ও ষাঁহার গরিমাসম্পদ দৃষ্ট হয় এবং গিরিধারীর পরম প্রিয়মণ্ডলে যিনি শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ—হে দীন নয়ন ! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিস্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ৬ ॥

যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণনামায়ত-সমুদ্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অপশূদ্র এমন কি স্নেচ্ছ পর্য্যন্ত অশেষ লোকাত্মক সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করিয়াছেন, মুক্ত ও সিদ্ধগণের অগম্য হইয়াও যিনি পতিতজনবন্ধু এবং শ্রীগৌরান্দের করুণাশক্তি বলিয়া পরিচিত—হে দীন নয়ন ! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিস্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ৭ ॥

সেই লোকমঙ্গলকর পুরটস্থন্দর মূর্তি-দর্শনের কি আশা আছে? সেই স্তূপীর্ষ, নীলকমলনয়ন ও তিলফুলজয়ী নাসিকা, সেই অর্দ্ধচন্দ্রধিকারী ললাট, সেই সৌম্য-বদনকমল, সেই শুভ্রজ্যোতিঃ দন্তপংক্তি ও সেই আজানুলম্বিত বাহুসমম্বিত রমণীয় বিগ্রহের পুনর্দর্শনের কি আশা আছে? হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিস্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ৮ ॥

চারি শত পঞ্চাশৎ সংখ্যক (৪৫০) গৌরাক্ষে পৌষ মাসে, কৃষ্ণপক্ষে, চতুর্থী তিথিতে মঘা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে নিশান্ত সময়ে শ্রীমতী বুধভানুন্দিনীর অতীব দয়িত অলুচর গিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন—হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র আমাকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ৯ ॥

জনসাধারণের ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবারত শিষ্যগণের হাহাকারে সমস্ত পৃথিবী ও আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল। ঐ মহাপুরুষ কোথায় গেলেন? হায়! সমস্ত বিশ্ব আজ প্রভুপাদ-বিরহে শূন্যবোধ হইতেছে। পাদপদ্মের নিত্য ভূত্য ক্ষণমাত্র বিরহও সহ করিতে অসমর্থ। হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিস্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ১০ ॥

[শ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃতম্ হইতে উদ্ধৃত]

বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত

বদ্ধাবস্থা ও বিবর্ত

জীব বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত—এই তিনটি অবস্থায় অধিষ্ঠিত। ভগবানে এই অবস্থাত্রয় অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে অবস্থিত। বদ্ধাবস্থার সত্তা ভগবান্ হইতে উদ্ভূত না হইলে তাহার স্থায়িত্ব মিথ্যা হয়। মায়াবাদী বলেন প্রাকৃত বদ্ধাবস্থা মিথ্যা কিন্তু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বলেন নশ্বর (অর্থাৎ কালক্ষুদ্র)। জীবসত্তায় বদ্ধত্ব বিবর্তবাদের উদাহরণ অর্থাৎ স্থূল দেহকে দেহী-জ্ঞান বিবর্তবাদ-প্রসূত; প্রাকৃত বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানাভাবকেই বিবর্ত বলে।

ভগবানের শক্তি-পরিণত ত্রিবিধ জগৎ

ভগবান্ কখনই বদ্ধ, তটস্থ বা মুক্ত হন না, আবার বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ভাবত্রয় তাহা হইতেই সম্ভূত। ভগবানের বহিরঙ্গ বা মায়াশক্তি পরিণত হইয়া এই বদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করে। তাঁহার অন্তরঙ্গাশক্তি পরিণত হইয়া জড়-মায়াতীত

বৈকুণ্ঠ বা গোলোক প্রকাশ করেন। ভগবানের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ শক্তির মধ্যবর্তী তটস্থা-শক্তি পরিণত হইয়া অসংখ্য অণুচৈতন্য বা জীব প্রকটমান হন।

তটস্থা-শক্তি-পরিণত অণুচৈতন্য জীব

অণুচৈতন্য জীব তটস্থা শক্তির পরিণাম বলিয়া গোলোক বা বৈকুণ্ঠে অবস্থান কালে অন্তরঙ্গ শক্তির আশ্রিত। যখন জীব জড় জগতে অবস্থান করেন, তখন তিনি বহিরঙ্গ বা মায়া শক্তির অধীন। জড়-জগৎ ও বৈকুণ্ঠ উভয় ধামে জীব অবস্থান করিতে পারেন বলিয়া তিনি তটস্থা শক্তির পরিণাম। যেরূপ জল ও ভূমির মধ্যবর্তী গণিতাগত রেখাকে তট বলে, তদ্রূপ ভগবানের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ শক্তির অনির্বচনীয় অন্তঃস্থলে তটস্থা শক্তির অধিষ্ঠান।

ভগবান্ শক্তিমান্ ও তাঁহার চারিট বিশেষত্ব

বিভূ-চৈতন্য ভগবান্ তটস্থা শক্তিজাত নহেন। (এমন কি) তিনি যেকালে প্রপঞ্চে উদিত হন তৎকালে তিনি তটস্থা শক্তি-পরিণত জীবের ত্রায় বদ্ধভাব লাভ করেন না। কেন না শক্তি, শক্তিমানের অধীন এবং তদাশ্রিত শক্তি তাঁহার উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সর্বশেষমুখীসম্পন্ন আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত বেদান্তের অচিন্ত্যদৈতাদৈত মত ব্যক্ত করিতে গিয়া স্বরূপ, তদ্রূপ বৈভব, জীব ও প্রধান—এই চারিট বিশেষ সংজ্ঞায় তত্ত্বের নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবত্তা স্বরূপ বিগ্রহ; গোলোক, বৈকুণ্ঠ, পার্শ্ব ও তথাকার বস্তুসকল তদ্রূপ বৈভব বিগ্রহ; জীব তটস্থা বিগ্রহ এবং প্রধান, অবিজ্ঞা ও মায়াময়। প্রধানের পরিণাম বদ্ধভাব, জীবের পরিণাম তটস্থা ভাব, তদ্রূপ বৈভবের পরিণাম মুক্ত ধাম বৈকুণ্ঠ বা গোলোক।

জীবের অগ্নিতা বিধান

ভগবান্ অন্বয়ভাবে তদ্রূপ বৈভবে লক্ষিত হন, ব্যতিরেকভাবে দেবীধামের অস্তিত্ব সম্পাদন করেন; তটধামে অন্বয় ও ব্যতিরেকের যুগপৎ অস্তিত্ব বিকাশ করিয়া জীবের অগ্নিতা বিধান করেন।

তটস্থা জীবের বদ্ধাবস্থা

জীব তটস্থবশতঃ বদ্ধ বা মুক্ত পরিচয়ে অভিহিত হইবার যোগ্যতা-বিশিষ্ট। যখন তিনি প্রকৃতির অধীন তখন তাঁহার স্থূল শরীর ও প্রাকৃতিক জ্ঞানে লিপ্ত শরীর বা মন তাহার আশ্রয়দাতা। জীবের প্রাকৃত অভিমানের নাম বদ্ধাবস্থা। সজ্জনগণ বলেন জীবের কৃষ্ণস্মৃতি বিস্মরণ হইলেই জীব ইহ জগতে নিজাস্তিত্ব অনুভব করেন, বস্তুতঃ তিনি কৃষ্ণদাস। অসং সাম্প্রদায়িকের মতে জড়োপাধি

রাহিতাই জীবের মুক্ত স্বরূপ। তাদৃশ মায়াবাদিগণ বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের নিত্য অধিষ্ঠান নিজ বদ্ধধর্মের প্রাবল্যে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। স্তূতরাং (কেবল) তটস্থ-ধর্ম-বর্ণন করিয়াই বিচার নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা অনুভব করেন। (বস্তুতঃ) নির্বিশেষবাদের বুদ্ধি-চাতুরী তটস্থ ধর্মের অক্ষুট বিকাশমাত্র।

স্বরূপ ও শক্তি স্বীকার না করিয়া মায়াবাদী ভ্রান্ত

বেদান্ত-মতের সবিশেষ ব্যাখ্যায় তটস্থধর্মের স্পষ্টাভিধান লক্ষিত হয়। মায়াবাদী নির্বিশেষমত অবলম্বন করিয়া ভগবানের নিত্যস্বরূপ ও অনন্তৈশ্বর্য্য বিকাশিনী শক্তি লক্ষ্য করিতে না পারিয়া তদ্রূপ বৈভবের নিত্য অধিষ্ঠান ধারণা করিতে অসমর্থ হন। মায়াবাদীর ইহা আত্ম-বঞ্চনামাত্র, যেহেতু মায়াবাদীর মতে শক্তিমাত্রেই প্রাকৃত, হেয় ও কালক্ষুর। নিত্যবদ্ধ মায়াবাদী কখনই নিত্যমুক্ত হইতে পারেন না, তজ্জগৎ তিনি বিবর্তবাদের আশ্রয়ে আপনাকে জীবমুক্ত বলিয়া মিথ্যা কল্পনা করেন। আবার তাদৃশ মিথ্যা কল্পনাতে সত্য আরোপ করিয়া নিজবাদের অকর্মণ্যতা প্রদর্শন করেন।

নির্বিশেষবাদীর মত খণ্ডনে শ্রীল রামানুজের দুইটি যুক্তি

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য নির্বিশেষ মতের অকর্মণ্যতা বুঝাইতে গিয়া দুইটি কথার অবতারণা করিয়াছেন। প্রথমতঃ রামানুজ বলেন নির্বিশেষবাদীর কল্পিতমত প্রচারে সত্যতা নাই। যদি মায়াবাদী মিথ্যার হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাইয়া থাকেন এবং তাঁহার বিশ্বাস সত্য হয়, তাহা হইলে উপদেশী ও উপদেশ গৃহীতার মধ্যে ভেদ নিরস্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নির্বিশেষবাদী যদি তাঁহার প্রচারিত সত্যে উপনীত হইতে না পারিয়া কতকগুলি কল্পিত মিথ্যা মায়াবাদ উপদেশ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার নিজ অক্ষমতাবশতঃ সত্য নিরূপণে অধিকার হয় নাই। জীবের বদ্ধ ও তটস্থ অবস্থাদ্বয় কখনই মুক্ত রাজ্যের স্বরূপ-পরিচয় দিতে সমর্থ হয় না। আপনাকে বদ্ধ-বিশ্বাস করিয়া মুক্তি বর্ণন করিতে গিয়া নির্বিশেষবাদ গ্রহণপূর্ব্বক তটাবস্থাকেই মুক্তাবস্থা জানিয়া ভ্রান্ত হয়। তটাবস্থায় নির্বিশেষ মত অধিষ্ঠিত। মায়াবাদী তটস্থরাজ্য অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত মুক্তরাজ্যে যাইতে পারেন না। সেখানে তাঁহার অস্থিতা পুনরায় মায়াশক্তির কবলে গ্রস্ত হইয়া পড়ে।

অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও কেবলাদ্বৈতবাদের পার্থক্য প্রদর্শন

আজকাল মায়াবাদী সম্প্রদায় শ্রীমহাপ্রভুর অমল শিক্ষাকে তাহাদেরও পণ্য-দ্রব্য বলিয়া প্রচার করিতেও ক্রটি করেন না। বস্তুতঃ কেবলাদ্বৈতবাদের চিন্তা-

শ্রোত কখনই অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদের সহিত এক নহে। অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদে জীবের বন্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ত্রিবিধ অবস্থান সত্য বলিয়া স্বীকৃত, কিন্তু কেবলাদ্বৈত মায়াবাদে বন্ধ ও তটস্থ অবস্থাদ্বয়ের নিত্য সত্যত্ব অস্বীকৃত। নির্বিশেষবাদী মুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত সবিশেষের কথা জানেন না, বা জানিয়াও সত্য অপলাপ করিতে চেষ্টা করেন।

অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে চিৎ ও জড় জগতের যুগপৎ স্থিতি

সাধুগণ বলেন ভগবৎ সংসারে অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত হওয়ার নাম মুক্তি। মায়াবাদী বলেন তটস্থ লক্ষণ লাভই মুক্তি। মায়াবাদীর কল্পিত নির্বিশেষ বিধি অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ স্বীকার করেন না। তিনি অবিচিন্ত্য শক্তিবলে পূর্ণৈশ্বর্যে নিত্যবিরাজমান অপ্রাকৃত রাজ্য অব্যাহত রাখিতে পারেন এবং তাহার অহু করণে জীবের বন্ধ সংসার বা দেবী ধামরূপ মায়াশক্তি পরিণাম যুগপৎ প্রকট করিতে পারেন। জাগ্রত, নিদ্রিত ও সুষুপ্ত যেমন বন্ধ জীবের অবস্থাত্রয়, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠাবস্থান, তটস্থ শক্তিবিশিষ্ট, জীবের দেবীধামে বন্ধ সংসার গ্রহণ, অবস্থাত্রয় লাভ করা নিত্য ধর্ম।

—শ্রীল প্রভুপাদ

বেদান্ত দর্শন

গোবিন্দ-ভাষ্যের প্রকাশ

আমরা শ্রীযুত কৃষ্ণগোপালভক্ত সম্পাদিত বেদান্তদর্শন পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। এই গ্রন্থে মহর্ষি বেদব্যাসকৃত উত্তর-মীমাংসা অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র, সটীক গোবিন্দ-ভাষ্য, তথা শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি-কৃত বঙ্কাল্লাবাদ ও বিবৃতি মুদ্রিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে-সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নক্ষত্রের গ্রায় উদিত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মসূত্রের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানী ও ভক্ত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ মতের সংস্থাপন করিয়াছেন; এমত কি, যে সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন নাই, সে সম্প্রদায় ভারতে কিছুমাত্র আচার্য্যত্ব-সম্মান লাভ করেন নাই।

ব্রহ্মসূত্রের পরিচয়

ব্রহ্মসূত্রের পরিচয় এই যে, বেদান্তসকল উপনিষৎ আকারে নিত্য বর্তমান ; উপনিষদ্বাক্যসকল সৰ্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও দুৰ্ভোধ্য । এক বাক্যের অর্থের সহিত অল্প বাক্যের কি সম্বন্ধ তাহা সহজে বুঝা যায় না, সূত্রাং বিজ্ঞার্থী ব্যক্তির পক্ষে উপনিষৎ পাঠে বিশেষ ফল হওয়া কঠিন । সদগুরু-উপদেশ ব্যতীত উপনিষদর্থ কখনই হৃদয়ঙ্গম হয় না । উপনিষদই বেদের শিরোভাগ । আত্মজ্ঞান ও জীবের কর্তব্যতা কেবল উপনিষদেই আছে । উপনিষদর্থ না জ্ঞানিলে মানব-জন্ম সফল করা যায় না । ভগবান্ বাদরাযণ এই বিষয় হৃদয়ে আলোচনা করিয়া সমস্ত উপনিষদ্বাক্যের বিষয় বিভাগপূর্বক যে সূত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই নাম ব্রহ্মসূত্র । সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব মীমাংসার ন্যায় ব্রহ্মসূত্র কেবল বিচার-নৈপুণ্যমাত্র নয় ; কিন্তু বেদ-শিরোভাগের যথার্থ তাৎপর্য নির্ণায়ক অর্থাগ্রন্থ বলিয়া ইহাকে সকলেই পূজা করিয়া থাকেন । যথার্থ তত্ত্ব-জ্ঞান সংগ্রহ করিবার জন্য যাহাদের স্পৃহা আছে, তাঁহারা অল্প কোন শাস্ত্রে অধিক পরিশ্রম না করিয়া ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করুন ।

সারদাপীঠে শ্রীশঙ্কর কর্তৃক বোধায়ন-ভাষ্য-সংগোপিত

ব্রহ্মসূত্রার্থ সংগ্রহ করাও জীবের পক্ষে সহজ নয়, সূত্রপাঠ করিলেই যে অর্থ বোধ হয় এরূপ নয়, সূত্রের ভাষ্য ব্যতীত সূত্রার্থ বোধগম্য হয় না, অথবা কোন সদগুরুর নিকট সূত্রার্থ শিক্ষা করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয়, এস্থলে কঠিন এই যে, সূত্রের যথার্থ ভাষ্য কোথায় পাওয়া যায় অথবা সূত্রার্থ নির্ণায়ক সদগুরুই বা কোথায় পাওয়া যায় । বোধায়ন ঋষি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছিল । সারদাপীঠ হইতে বহু যত্নসহকারে শ্রীরামানুজ স্বামী সেই ভাষ্য সংগ্রহ করিয়া নিজের শ্রীভাষ্য রচনা করেন—এরূপ সংস্কৃত প্রপন্নামৃত গ্রন্থে দেখা যায় । সারদাপীঠ শ্রীশঙ্করাচার্যের স্থানবিশেষ । শঙ্কর স্বামী অনেক যত্নে ঐ বোধায়ন-ভাষ্য নিজ মঠে রাখিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ কি ? শঙ্কর স্বামী সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার, তিনি কার্যোদ্ধারের জন্য স্বীয় শারীরিক ভাষ্য রচনা করেন, সেই ভাষ্যের প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্য বোধায়ন-ভাষ্যকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এরূপ জনশ্রুতি আছে ।

শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য

বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্রের কর্তা । সূত্রসকল রচনা করিয়া তিনি বিচার করিলেন যে, যে কারণে উপনিষদর্থ সংগ্রহপূর্বক সূত্র রচনা করিলাম তাহা সফল হইল না,

আমি স্বয়ং কোন ভাষ্য না করিলে সূত্র কিরূপে প্রচলিত হইবে। শ্রীনারদের উপদেশে তিনি যখন শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিলেন, সেই সময়ে সূত্রার্থ প্রকাশ করিবার যত্ন হইতেছিল, ব্যাসদেব তখন শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে প্রণয়ন করিলেন, ইহা নানা পুরাণে কথিত আছে।

শঙ্করস্বামি-কর্তৃক ব্রহ্মসূত্রের উক্ত ভাষ্যদ্বয় সংগোপন

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অকৃত্রিম ভাষ্য হইলেও বৌদায়ন ঋষি তদীয় গুরুর আজ্ঞায় একটা রীতিমত ভাষ্য প্রস্তুত করিলেন। জগতে ব্রহ্মসূত্রের দুইটা ভাষ্য বিরাজমান হইল। শঙ্করস্বামী ভগবদাজ্ঞা পালনরূপ কার্যোদ্ধারের জন্ত মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা করত পূর্বোক্ত উভয় ভাষ্যের যাহাতে গোপন হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বেদান্তের মধুর রস-প্রকাশক গোবিন্দ-ভাষ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ

সংস্করণাবতার শ্রীমাদানুজ বৌদায়ন-ভাষ্য সংগ্রহ করত শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন-পূর্বক স্বীয় শ্রীভাষ্য জগতে প্রচার করিয়া সূত্রের যথার্থ অর্থ জগৎকে দিয়াছিলেন। সেই শ্রীভাষ্যে যে মধুর রসান্বিত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত ছিল, তাহা সাধু জিজ্ঞাসুদিগকে দিবার জন্ত শ্রীমদগোবিন্দ-দেব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে আজ্ঞা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রিত সর্ববেদাধ্যয়নশীল বলদেব জয়পুর প্রদেশে এই গোবিন্দ-ভাষ্যের আবিষ্কার করেন। শ্রীমদগোবিন্দ-ভাষ্যই অল্প সকল ভাষ্যের মধ্যে অধিক উপাদেয় হইবে সন্দেহ কি? মায়াবাদ-দূষিত পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, ভক্ত-মণ্ডলীতে গোবিন্দ-ভাষ্যের তুল্য আর মাননীয় গ্রন্থ নাই—ইহা বলিলে অত্যাক্তি হয় না।

পঞ্চাঙ্গী ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন পাদের পরিচয়

ব্রহ্মসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে চারিটা করিয়া পাদ আছে। বলদেব নিজভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—তত্র প্রথমে লক্ষণে সর্বেষাং বেদানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ। দ্বিতীয়ে সর্ব শাস্ত্রাবিরোধঃ। তৃতীয়ে ব্রহ্মাপ্তিসাধনানি। চতুর্থে তু তদাপ্তিঃ ফলমিতি। যত্র নিকামধর্ম-নির্ম্মলচিত্তঃ সংপ্রসঙ্গলুক্কঃ শ্রদ্ধালুঃ শান্ত্যাদিমান্ অধিকারী। সম্বন্ধো বাচ্যবাচকভাবঃ। বিষয়ো নিরবতো বিশুদ্ধানন্তগুণগণোহচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ। প্রয়োজনস্বশেষ-দোষবিনাশপূরঃসরস্বতঃ সাক্ষাৎকার ইত্যুপরিষ্পষ্টং ভাবি। যন্তাং খলু বিষয়-সংশয়-পূর্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত-সঙ্গতিভেদাং পঞ্চায়াঙ্গানি ভবন্তি। স্ত্রীয়াধিকরণং। বিষয়ো বিচারযোগ্যবাক্যং। সঙ্গতিরহ শাস্ত্রাদিবিষয়তয়া বহুবিধাপি ন বিতায়তে।

শ্রীযুত গামলাল গোস্বামী প্রভু ইহার এই প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন—
 এই ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাদ্যায় সমস্ত বেদের **ব্রহ্মে সমন্বয়**। দ্বিতীয়ে সকল শাস্ত্রের
 সহিত **বিরোধ পরিহার**। তৃতীয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির **সাধন**। চতুর্থে ব্রহ্ম প্রাপ্তিই
পুরুষার্থ উক্ত হইয়াছে। নিকাম ধর্ম, নির্মল-চিত্ত, সংপ্রসঙ্গলুক্ক, শ্রদ্ধালু,
 শমদয়াদিসম্পন্ন জীব এই শাস্ত্রের **অধিকারী**। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম
 ইহার বাচ্য, সূত্ররাং পরস্পর বাচ্যবাচক **সম্বন্ধ**। শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয়,
 নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধানন্তগুণগণ অচিন্ত্যানন্দশক্তিসচ্চিদানন্দপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষ
 দোষবিনাশ পুরঃসর তৎসাক্ষাৎকারই ইহার **প্রয়োজন**। এই শাস্ত্রে বিষয়,
সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি এই পাঁচটাই ত্রায়াবয়ব। অধিকরণ
 অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশবিশেষের নামই ত্রায়। বিচারযোগ্য বাক্যের নাম বিষয়।
 এক ধর্মিত্বে পরস্পর বিরোধী নানা প্রকার অর্থ বিচারের নাম **সংশয়**। প্রতিকূল
 অর্থের নাম **পূর্বপক্ষ**। প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম **সিদ্ধান্ত**।
 পূর্বোক্তের অর্থদ্বয়ের নাম **সঙ্গতি**। এই সঙ্গতি বহুবিধ, তাহা বাহুল্যভয়ে বিবৃত
 হইল না; শাস্ত্রার্থাবগতিতে স্থানবিশেষে স্বয়ংই বিবৃত হইবে।

গোবিন্দ-ভাষ্য অতি উপাদেয়, সূত্ররাং বৈষ্ণবমাত্রেরই পাঠ্য

এই গ্রন্থের পাঠক মহাশয়গণ দেখুন যে, এই সূত্র-ভাষ্য কিরূপ উপাদেয়,
 আবার গোস্বামী যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা কিরূপ প্রাজ্ঞ ও নির্দোষ।
 অতএব বৈষ্ণব-জগতের বিশেষ উপকার-স্বরূপ এই গ্রন্থখানি সকলেই যত্নপূর্বক
 সংগ্রহ করুন। অনেকেই মনে মনে করেন আমি বৈষ্ণব, কিন্তু কি কি বিষয়
 জানিলে ও কি কি করিলে জীব বৈষ্ণবপদবাচ্য হন, তাহা অবগত হইতে গেলে
 শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য পাঠ করা আবশ্যক। এই গোবিন্দ-ভাষ্য-বেদান্তই বৈষ্ণবের
 পক্ষে অমূল্য নিধি।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সঙ্জনতোষণী ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৭ম পৃষ্ঠা)

ঠাকুর নরহরি

জয় প্রভু নরহরি, গুরুসেবা-মূর্তি ধরি',

শুদ্ধগুরুদাস্ত-পরায়ণ ।

এসেছিল এ'ধরাতে, গুরুসেবা শিখাইতে,

সর্বেন্দ্রিয়ে সেবায় মগন ॥ ১ ॥

নিশিদিন গুরুসেবা, হেন দেখিয়াছে কেবা,

গুরুপদে আত্মনিবেদন

করেছিলে মহাশয়, জয় জয় তব জয়,

বন্দি তব রাতুল চরণ ॥ ২ ॥

গুরুদেব শ্রীভকতি শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী,

অদ্বিতীয় মহামহাজন ।

তঁাহার করুণাবলে, অনায়াসে ভক্তি মিলে,

একমাত্র ভুবন-পাবন ॥ ৩ ॥

তঁাহার সুযোগ্য পাত্র, গুরুসেবা কৃত্য মাত্র,

আদর্শ সে প্রভুর চরণ ।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ হউ মোর সুসম্পদ,

বাঞ্ছি গুরুবৈষ্ণব-সেবন ॥ ৪ ॥

(গুরু) বৈষ্ণবের কৃপা হ'লে, হেলায় গোবিন্দ মিলে,

বর্ণিলেন সব মহাজন ।

কঁরযোড়ে প্রণিপাত, শত শত দণ্ডবৎ,

দিবা নিশি করিব স্মরণ ॥ ৫ ॥

হেন গুরু-বৈষ্ণবেতে, রতি না জন্মিল চিতে,

পতিতা পাষণ্ডী ছরজন ।

অধমা পতিতা মুঞি, শুন বৈষ্ণব গোসাঞী,

তুমিত' পতিত-উদ্ধারণ ॥ ৬ ॥

গোলোকে বৈকুণ্ঠে থাক, চরণে স্মরণ রাখ,
পালনীয় কুকুর সমান ।

সুযোগ্য দয়ার পাত্র, কোথা না পাইবে মাত্র,
অহৈতুকী কৃপা কর দান ॥ ৭ ॥

যদি মোর কৰ্ম্মদোষে, গো-গর্দভ বা মহিষে,
জন্ম হয়, হইলে মরণ ।

তাহে কোন ক্ষতি নাই, তবাভীষ্ট সেবা চাই,
তিলমাত্র কর বিতরণ ॥ ৮ ॥

শিরে বর্ষি' কৃপাবারি, কেশে আকর্ষণ করি,
টানিয়া রাখহ তব পায় ।

শ্রীমুখ-অমৃত-বাণী, হরিকথা তরঙ্গিনী,
শ্রবণিতে প্রাণ সদা চায় ॥ ৯ ॥

অপরাধপুঞ্জ পদে, করিয়াছি দিবারাতে,
অনন্তের অন্ত যদি পাই ।

অপরাধ নাহি অন্ত, মুণ্ডি অপরাধী-মন্দ,
বর্গিবারে কোন শক্তি নাই ॥ ১০ ॥

জগা, মাধা, অজামিল, আমা' হতে অনাবিল,
পাপকর্মে শেষ মোর নাই ।

সাধুগুরু-কৃপা হ'লে, হেলায় পাষণ গলে,
তুয়া বিনা গতি কোথা পাই ॥ ১১ ॥

আমি ক্ষুদ্র জীবধম, তুমি হও ভক্তোত্তম,
শক্তি ধর ব্রহ্মাণ্ড তারিতে ।

সেই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে, ধ'রে রইনু মায়া-রে,
তুমি বিনা নারি উদ্ধারিতে ॥ ১২ ॥

গঙ্গা পতিত-পাবনী, বন্দি সেই স্বরধুনী,
যাঁর স্পর্শ হৈলে প্রাপকয় ।

কৃষ্ণভক্ত দরশিলে, নিঃশ্রেয়ঃ কল্যাণ মিলে,
পাপ-তাপ নাশে সুনিশ্চয় ॥ ১৩ ॥

ঠাকুর নরহরি বিনা, উপায় কিছু দেখিনা,
কৃপা কর এ অধমা প্রতি ।

তোমার পাদ-সরোজে চিত্ত যেন সদা মজে
গাই যেন তব গুণ খ্যাতি ॥ ১৪ ॥

—শ্রীসরোজবাসিনী ঘোষ ।

বানারিপাড়া (বরিশাল)

শ্রীগৌড়ীয়ের পুনরাবির্ভাব

যুগাচার্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রকট কাল হইতে ‘গৌড়ীয়’ পত্রিকার নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় পাঠকবর্গের বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল । শ্রীল প্রভুপাদের আচরিত ও প্রচারিত, শুদ্ধ রূপান্তর ভক্তিবিনোদ-ধারায় স্নাত হইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া সকলেই অতি দুঃখিতান্তঃকরণে কালযাপন করিতেছিলেন । পুনরায় তাঁহার একনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সেবকগণ জীবের কল্যাণ কামনায় মাসিক পত্রিকাকারে “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” বাহির করিয়াছেন ।

পারমাথিক শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা জীবের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া বদ্ধজীবকে ভক্তিপথে আকৃষ্ট করেন । শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম হইতে আবির্ভূত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের আচার ও প্রচারের নিত্য পূজায় ইহ ও পর-জগতের যাবতীয় সৌন্দর্যের খনি হইয়াছেন । শ্রীপত্রিকার অপ্রাকৃত সৌন্দর্যরাশি অপ্রাকৃত ধাম-নিবাসী গৌরপুর-যাত্রী গৌড়ীয়গণই সন্দর্শন করিয়া থাকেন । গৌড়ীয়ের প্রত্যেকটি সংবাদ, প্রত্যেকটি ছত্র, প্রত্যেকটি শব্দ অপ্রাকৃত সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া যখন মানবের দ্বারে উপস্থিত হন, তখন জীবের অজ্ঞান-তমঃ নষ্ট হইয়া যায় ।

শ্রীমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ প্রেমধর্ম ও শুদ্ধ বৈরাগ্যের কথা শিক্ষা দিতে এবং বর্তমান অপ, উপ, ছল, মিছা, কপট-ধর্ম্মাদিগকে মিরস্ত করিতে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকাই সমর্থ। আজকাল যে শাস্ত্রবাণী ও ধর্ম্ম লইয়া ছিনি-মিনি খেলা হয়, তাহা যে অতিশয় অবৈধ ব্যাপার এবং অত্যাতিলাষজনিত ভক্তির আবরণে ঘোর অভক্তি আচরণ, তাহা একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়ই শিক্ষা দিতে পারেন।

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।

দাম্ভ-বাৎসল্যাদি-ভাবে না হয় গোচর ॥

সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।

সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২০০)

এসব কথার গূঢ় তত্ত্ব ও গাভীর্ঘ্য শ্রীপত্রিকাই জানাইতে সক্ষম। শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা অগ্রে পরে কী কথা; শ্রীনন্দ-যশোমতীর পর্য্যন্ত গোচর হয় না। স্তবরাং হাটবাজারে শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলারস কীর্তন করিয়া সংসারে শুধুই অনর্থের আমন্ত্রণ করা হয়—একথা স্পষ্ট ভাষায় মেঘ-গভীর-নাদে ব্যক্ত করিবার সাহস একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ছাড়া আর কাহার? যে কথাদ্বারা সত্যাত্ম-সন্ধিস্থ সজ্জনমণ্ডলীর প্রাণে অপরিমিত বল সঞ্চারিত হইতে পারে, সে-কথা একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়ই পরিবেশন করিতে সমর্থ। সমগ্র সৌন্দর্য্যের একমাত্র মালিক যে অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীমদনমোহন—ইহা জানিবার সৌভাগ্য শ্রীগৌড়ীয়ের পঠন-পাঠন হইতেই সম্ভবপর। শ্রীগৌরসুন্দর ব্যতীত এত বড় কথা আর কেহ কীর্তন করেন নাই এবং ইহার সন্ধান দিয়াছেন শ্রীগৌড়ীয়। যে মহাপুরুষের প্রত্যেকটি কথা স্তূতীক্স অস্ত্রের ত্রায় হৃদয়ের কু-গ্রন্থিগুলি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছিল, সেই যুগাচার্য্যবর্ষ্য গুণবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-পাদের সন্ধান শ্রীগৌড়ীয় হইতেই পাওয়া গিয়াছে।

এই শ্রীগৌড়ীয়ের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যাত্মভূতিতে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা থাকিলেও আমার মনে হয়, শ্রীগৌড়ীয় বিশ্ব-বান্ধবরূপে অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের পসরা লইয়া আমার ত্রায় সৌন্দর্য্য-ভোগলিপ্সু বদ্ধ জীবের দ্বারে দ্বারে যদি উপস্থিত হন, তাহা হইলে জানা যাইবে শ্রীগৌড়ীয়ের সৌন্দর্য্য আমাদের ভোগের ইন্ধন নহে এবং যাহাতে ভাবী কালেরও অনন্ত কোটি জন্ম স্বকর্মানুযায়ী প্রাপ্য-ফল-নিরয়াদি লাভ না হয়, সেই বন্দোবস্তে চলিলে শ্রীগৌড়ীয়ের রূপায় শ্রীগৌড়ীয়ের প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইতে পারিবে। যদিও পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগে স্বভাব-দোষ পরিত্যাগ করা সম্ভবপর নহে, ভোগস্পৃহা পরিপূর্ণ-

মাত্রায় শয়নে স্বপনে জাগরুক রহিয়াছে, তথাপি হৃদয়ে একান্ত আশা—
 শ্রীগৌড়ীয়ের রূপায় যেন উপলব্ধি হয় যে, প্রাকৃত সৌন্দর্য্য ভোগ পিপাসায়
 প্রধাবিত হওয়া অগ্নিতে পতঙ্গের বাষ্প প্রদানের স্থায় প্রকার ভেদ। ইহা মৃত্যুকে
 আলিঙ্গন করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীগৌড়ীয়ের রূপায়, শ্রীগুরুদেব ও
 শ্রীবৈষ্ণবের রূপায় ও শ্রীকৃষ্ণ রূপায় ইহাই যেন উপলব্ধি হয় যে, আমরা কোন
 প্রকারই ভোগের মালিক নহি। এমন কি ভগবন্মাম, ভগবদ্রূপ, ভগবদ্গুণ,
 ভগবল্লীলা সমস্তেরই ভোগকর্তা একমাত্র শ্রীভগবান্। অনেক সময় আমরা
 ভোগের প্রকার বদলাইতে যাইয়া ভগবল্লীলা, ভগবদ্গুণ, ভগবদ্রূপ, ভগবন্মাম-
 কথা শ্রবণে তৃপ্ত হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি—হে ভগবন্!
 তুমি অমুক বেশে ও অমুক রূপে আমার হৃদয়ে বসিয়া থাকিয়া আমার তপ্ত প্রাণ
 জুড়াইয়া দাও। ইহাও সৌন্দর্য্য ভোগের অন্য প্রকার বিশুদ্ধ সংস্করণ।
 শ্রীভগবানের রূপে, গুণে, লীলায় ও নামে পূজা-বিধিই রহিয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়
 পত্রিকা এবস্থিধি বিধি ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া জড়াকৃষ্ট বদ্ধজীবের চিত্ত আকর্ষণ
 করিয়াছেন ও করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয় রূপা করিয়া স্ব-প্রকাশ শক্তিতে বতটুকু সৌন্দর্য্য দর্শন করাইবেন,
 ততটুকুই জীব জানিবে এবং তাহাই কীৰ্ত্তন করিয়া স্ব-সৌভাগ্য লাভ করা
 যাইতে পারে—এই ভরসায় শ্রীগৌড়ীয়ানুগণের শ্রীচরণ-রেণু প্রার্থিনী হইয়া
 রহিলাম।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-রূপা-প্রার্থিনী

—শ্রীদয়াময়ী দেবী

খিদিরপুর।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ধর্ম্মের আলোচনা

বর্তমান বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের অবসানে জগতের মানবকুল কি করিবেন,
 রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি হইবে, ধর্ম্মের স্থান কোথায় থাকিবে ইত্যাদি বিষয়ে
 গভীর গবেষণা হইতেছে। এই সম্বন্ধে ভারতের শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্মাবলম্বী সাধুগণ
 উদাসীন থাকিতে পারেন না।

ভারতীয় কংগ্রেসের অনেক কথার আদর করিলেও সাধুগণের দিক হইতে
 কংগ্রেসের অনেক চিন্তা ও কার্যাবলী সাধুগণের ভবিষ্যতের বিশেষ ক্ষতিকারক

বলিয়া অনেকে মনে করেন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আলোচনা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু ধর্মের দিক হইতেও পৃথিবী প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সাধুসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

সাধুগণই ধর্মের পথ প্রদর্শক

বিশ্বের সর্বত্র এক মনুষ্যভেদী আর্তনাদ উথিত হইয়াছে—মানুষ তাহার মনুষ্যত্ব ভুলিয়া জন্তু-ধর্মের তাড়নায় উন্মত্ত; মানব-রক্ত-প্রবাহে মেদিনী প্রাণিতা; লক্ষ লক্ষ মানবের মৃতদেহের পর্বতপ্রমাণ স্তুপের পশ্চাৎ হইতে কামানের অগ্নি-বর্ষণে আরও সহস্র সহস্র নরদেহ প্রতি মুহূর্তে ভস্মশ্রাং হইতেছে। কেহ হস্ত-শূত্র, কেহ বা পদশূত্র, কেহ বা বধির, আবার কেহ বা চক্ষুহারা হইয়া গগনস্পর্শী আর্তনাদে পৃথিবী কম্পিত করিয়াও মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে ত্রাণ পাইতেছে না; কাহারও বা এক বিন্দু জলের অভাবে বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। তথাপি বিরাম নাই, মানবের এই কলুষ-বৃত্তির নিবৃত্তি নাই। তথাকথিত মঙ্গলহিতৈষণার বিকৃত কল্পনার করাল-কবলে আত্মবিসর্জনকারী মদ-মদিরা পানোন্মত্ত মনুষ্যত্ব-হারা মানব জন্তু-ধর্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। চৈতন্য-ধর্মের কথা আজ কে শুনিবে? সত্য-পথভ্রষ্ট, দিশাহারা জগৎ অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া বরণ করিয়া থাকিলেও, প্রত্যেক প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে আপাততঃ অপ্রিয়, কিন্তু বস্তুতঃ শ্রেয়ঃপদ কর্তব্যের অহুরোধে বর্তমানের এই মহাভুর্দিনে এই রুদ্রলীলার মহা-ক্ষেত্রে, মানব-জাতির এই সর্বনাশী জন্তু-ধর্মের প্রেরণার তাণ্ডব নৃত্যের বিরাট ও বিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাহাদের মনুষ্যজীবনের চেতন ধর্মের কথাই নির্ভীকচিত্তে কীর্তন করিতে হইবে। মানব জাতিকে পশু-বৃত্তির প্রহেলিকা হইতে মুখ ফিরাইয়া সত্যোজ্জ্বল চৈতন্য ধর্মের পথ প্রদর্শন করান ভারতের সাধু-সমাজের যে চিরন্তন প্রথা, তাহা সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ ও কুধারণা

প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্ম কি এবং ধর্ম মানব-সমাজকে পরস্পর সংঘর্ষযুক্ত দৈনন্দিন বহু জটিল সমস্যার স্তমীমাংসা করিতে সমর্থ কি না, এতৎসম্বন্ধে বিশ্বের সর্বত্র এক সন্দেহের উদ্ভব হইয়াছে। তথাকথিত পণ্ডিতসম্মত সমাজ-নেতাগণের মুখে প্রায়শই শুনিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম মানবের দুঃখ-দৈন্য দূর করিতে পারে নাই—এক কথায়, ধর্ম ব্যক্তিবিশেষের সুসময়ে নিভূতে কবির কল্পনার ছায়া

উপভোগ্য বিষয়মাত্র। কেহ বা বলেন—ধর্ম ধর্ম করিয়া দেশটা উচ্ছন্ন গেল। যাহাদের দুইবেলা একমুঠা অন্ন মুখে দিবার নাই, যাহাদের পরিধানে শতছিন্ন একখানি বস্ত্র পর্যন্ত জোটে না, যাহারা পর-পদদলিত হইয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে বিগত দ্বিশতাব্দী কাল যাবৎ আবদ্ধ থাকিয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে, তাহাদের মুখে আবার ধর্মকথা। ধর্মই দেশের ও দেশের সর্বনাশ আনয়ন করিয়াছে। আবার কেহ বা উদার নীতি অবলম্বন করিয়া বলেন—দুঃস্থ মতগুলি উৎপাটিত করিয়া মানবকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সমাজের ও বিশ্বের ভবিষ্যৎ নেতাগণকে প্রথম হইতেই পূর্ণ (?) মানুষ হইবার জন্য শিক্ষা দিতে হইবে। কেবল একদেশীয় শিক্ষা দিলে চলিবে না, যাহাতে বাহুবলে, মনোবলে, নীতিবলে, আধ্যাত্মিকবলে ও পারমাণ্বিক বা ধর্মবলে বলীয়ান হয়, প্রত্যেক যুবককে তদ্রূপ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাহাদের বিচারে ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু সেই ধর্মশিক্ষা কৃষ্টি-জীবনের অন্তর্ভুক্ত বহু বিষয়ের অন্ততম একটি বিষয়মাত্র। সাহিত্য-চর্চা, প্রত্নতত্ত্বচর্চা, সঙ্গীতচর্চা, চিত্রবিজ্ঞা-চর্চা যেমন প্রয়োজন, আত্ম-ধর্মালোচনাও তদ্রূপ একটি শিক্ষা বা আলোচনার বিষয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্ম-শিক্ষা অল্প শিক্ষার অন্ততম নহে। সুতরাং এই শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমেই প্রকৃত গুরুর আবশ্যক। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৫)

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্বশ্রয়।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে কয় ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।১০৬)

ব্রহ্মসংহিতায় পঞ্চম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে বলিতেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

[অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব কারণের কারণ।]

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ নবম অধ্যায় ৩৫ শ্লোকে ব্রহ্মা নারদকে শিক্ষা দিয়াছেন—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্তং তত্ত্বজিজ্ঞাস্তান্নাত্মনঃ।

অনয়ব্যতিরেকাত্মাং যং শ্রুতং সর্বত্র সর্বদা ॥

[অর্থাৎ যিনি আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু তিনি অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা বিষয় বিচার-পূর্বক যে বস্তু সর্বত্র ও সর্বদা নিত্য, তাহারই অনুসন্ধান করিবেন। তাৎপর্য্য; প্রেমরহস্য যে উপায়ে সাধিত হয় তাহার নাম সাধন-ভক্তি। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু পুরুষ সদগুরুচরণ হইতে অন্বয়ব্যতিরেকে অর্থাৎ বিধিনিষেধ শিক্ষাপূর্বক তত্ত্বানুশীলন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন।]

যাঁহাদের বিচারে শিক্ষার প্রয়োজন আছে—এইরূপ মনে উদয় হয়, তাঁহাদিগকে ভগবান্ গুরুরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন—

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈতন্যরূপে।

শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।

অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৫৮, ৪৭)

অতএব ভগবান্ নিত্য বস্তু হইয়া সর্বক্ষণ জীবকে অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুইরূপে শিক্ষা দিতেছেন। সুতরাং জীবমাত্রই তাঁহার শিক্ষার দাস। দীক্ষাগুরু স্বয়ংই শিক্ষাগুরু। যে স্থানে দীক্ষাগুরু স্বয়ং শিক্ষাগুরুর কার্য্য না করেন এবং পৃথগ্ভাবে অত্র কেহ গুরুসেবা শিক্ষা দেন, সেস্থলে শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু অভিন্ন। অত্র অভিন্ন বলিয়া যে বিচার তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে।

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।

যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৮৩)

“জীব স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া ভোগীর সজ্জায় কৃষ্ণসেবাবিমুখ হয়। কেহ বা অজ্ঞানবশতঃ কোন কোন সময়ে, ভগবৎ সেবাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য নহে বলিয়া মনে করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সকল প্রাণীই নিত্যকাল তাঁহার দাস্যে অবস্থিত। ভগবৎসেবা না করিলে জীবের স্বভাব-বিপর্য্যয়ে অমঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্য-দাস্যই অণুচিৎ জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম। স্বরূপের বৃত্তি ভুলিয়া গিয়া বদ্ধজীব যে অত্র চেষ্টা করেন, তাহা অচিদভোগের আকর্ষণমাত্র। চৈতন্যোদয় হইলে তাঁহার হৃদয়ে চৈতন্যদাস্য স্বভাবতঃই প্রকাশিত হয়। চৈতন্য-সেবা-বঞ্চিত হইয়া বদ্ধজীবের অনুষ্ঠানে অপর বস্তুর উপর প্রভুত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তৎকালেও তিনি চৈতন্যের অযোগ্য দাসমাত্র।”

ঈশ্বরের লীলা ক্ষুদ্র জীব বুঝিতে অক্ষম। তাই পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—

দৌ ভূতসর্গে ১ লোকেহস্মিন্ দৈব আশ্রয় এব চ।

বিষ্ণুভক্তঃ শ্রুতো দৈব আশ্রয়স্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥

ভগবান্ এই প্রকার লীলা অভিনয়ে যুগে যুগে গুরুরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই যুগে অর্থাৎ কলি যুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীব-জগৎকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র শিক্ষা।

“গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে।”,

(প্রেমবিবর্ত)

সুতরাং গৌরশিক্ষা লাভ করিতে হইলে গৌরান্বিত ভক্তগণের নিত্য সঙ্গ করিতে হইবে এবং সাধুসঙ্গ-প্রভাবেই বর্তমান সময়ে সর্বতোভাবে নির্ভয় ও প্রসন্নতা লাভ হইবে।

ধর্মই ভারতের গৌরব ও শাস্তিদাতা

পরিশেষে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার ৩২ পৃষ্ঠায় “ধর্মই ভারতের গৌরব ও শাস্তিদাতা” শীর্ষক অনুচ্ছেদ আপনাদের স্মরণ করাইয়া আমার প্রবন্ধের বক্তব্য শেষ করিতেছি—

“ধর্মান্ধীন রাষ্ট্রই ভারতের গৌরব এবং ধর্মই ভারতকে চিরদিন পরিচালনা করিয়াছেন। ধর্ম বলিতে কোন সঙ্কীর্ণতা, হীনতা বা কোন প্রকার অনু-পাদেয়তাকে লক্ষ্য করে না। ধর্ম ও ধর্মের ভাণ এক নহে। ধর্মধর্মজীর সঙ্কীর্ণা অসং ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া কর্তব্য নহে। পার্থিব চিন্তাশ্রোত মাতৃষকে অধঃপাতিত করিয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করে। খাণ্ড, বজ্র, বাসগৃহ প্রভৃতির ব্যবস্থা করাই আমাদের পরাশাস্তি লাভের উপায় নহে। ঋাহারা ঐগুলি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের চরম সীমায় উঠিয়াছেন তাঁহারাও যে অশান্তির গভীরতম জলধিগর্ভে নিমজ্জিত আছেন, ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। শাস্তি একটা পৃথক্ তত্ত্ব। পার্থিব বস্তু তাহা কখনই সম্পাদন করিতে পারে না।”

বাঙ্কাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ ॥

—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

মথুরা

স্বাধীনতা

অধিকাংশ লোকেরই ধারণা যে, দেশকে স্বাধীন করিতে না পারিলে মনও স্বাধীন হয় না, মন স্বাধীন না হইলে ধর্ম-কর্ম কিছুই হয় না। বাস্তবিক কি তাহাই ঠিক? তাঁহারা যে বাস্তব ধর্মালুষ্ঠান করিবার ভয়ে, মন এখন পরাধীন আছে বলিয়া তাহাতে আলস্য প্রকাশ করেন, তাহার পরিণাম বড়ই ভয়াবহ।

কেবল ধর্মালুষ্ঠান ব্যতীত আর সকল কাজেই তাঁহাদের মন বেশ স্বাধীন-ভাবে বিচরণ করিতেছে দেখা যায়। স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্তি, ইন্দ্রিয়তর্পণে লালসা, উত্তম উত্তম দ্রব্যাদির ব্যবহার প্রভৃতি কার্যে মন বেশ উৎফুল্ল, বেশ স্বাধীন থাকে। তখন মনের কোন বিকার বা তাহাতে কোনরূপ বিশৃঙ্খলতা থাকে না; কিন্তু যখনই কোন সাধু আসিয়া হরিভজনের উপদেশ দেন, তখনই ঐ পূর্বোক্ত প্রলাপ আরম্ভ হয়। দৈবী-মায়া অত্যন্ত বলিয়মী বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। রোগীকে ঔষধ খাইতে বলিলে ঔষধ যদি তীব্র হয়, তবে রোগী যেমন বৈद्यের সঙ্গে ঝগড়া করে এবং ঔষধ সেবনে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তদ্রূপ ভবব্যাধিগ্রস্ত জীব আমরা, সদবৈद्य হিত-উপদেশ প্রদান করিয়া যখন মায়াবদ্ধ আমাদের নিকট গাহিয়া থাকেন—“এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি। হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি ॥” তখন আমরা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠি—“ওগো, না-না, আমি তাহা লইব না, আপনারা আমার মায়ার ফোড়া কাটিয়া জোরে টিপিয়া ধরিয়া তাহার পূজ-রক্ত বাহির করিয়া কষ্ট দিতে চাহেন, স্ততরাং আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে; সেও বরং ভাল জন্ম জন্ম আমার ব্যাধি থাকুক, কিন্তু ঐ আসক্তি ফোড়ায় অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দিব না। সাধুগণ যে আমার মনের আসক্তিগুলি ছেদন করিবেন তাহা সহ্য হইবে না। শাস্ত্র বলেন—“সন্ত এবাস্ত্র ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।” —এই বাক্য সফল করিতে কখনও দিব না।

‘স্বদেশ’ ‘স্বদেশ’ করিয়া যে আমরা চীৎকার করিতেছি স্বদেশ কোথায়? তাহা কি কেহ একবারও ভাবিয়াছি? এই যে আকাশ, বাতাস, জল, মাঠ, ফুল, ফল ইত্যাদির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া “সোনার দেশ” বলিয়া ইহার প্রতি ক্রমেই আসক্তি বৃদ্ধি করিয়া ফেলিতেছি—ইহা কি বাস্তবিক আমার? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ঐরূপ চীৎকার করিলেই কি ইহাকে রক্ষা করিতে পারিব? এখানকার মাটি এখানেই আছে, এখানেই ছিল ও এখানেই থাকিবে।

আবার সব সময়ে ইহা থাকিবে না এবং আমিও আর এখানে আসিব কিনা তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। ইহা ত' আমার নয়, ইহা যদি আমার হইত তবে আমার সঙ্গে ইহার নিত্য সম্বন্ধ থাকিত। কোন প্রাকৃত কবিও গাহিয়াছেন—“স্বদেশ স্বদেশ করিস্ তোরা, এদেশ তোদের নয়।”

“আমি” শব্দের বিচার করিলে জানা যায় যে, “আমি” একটা নিত্য চেতন বস্তু। আর এই যে জড় দেশ, মাটী, জল, বাতাস এসকলই অনিত্য। নিত্য ‘আমি’র বাসস্থান গোলোক-বৈকুণ্ঠে। তাহাই আমার স্বদেশ। গোলোকপতি ও তাঁহার নিজ জনই আমার আত্মীয়স্বজন, তাঁহাদিগকে অবাধে ভালবাসিতে পারাই আমার বাস্তবিক স্বাধীনতার ফল। নিত্যানিত্য বিবেকই আমার বাস্তব স্বাধীন জ্ঞান; নিত্যবস্তু ভগবানের সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত থাকাই প্রকৃত স্বাধীন ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, নতুবা আমার জ্ঞায় একটা প্রকাণ্ড মূর্খ হুনিয়ায় আর কেহই নাই। হে ভক্তগণ! আপনারা এই অধমকে কৃপা করুন,—ইহাই আমার প্রার্থনা। ভগবদভক্তগণের কৃপা লাভ করিলেই শ্রীগোলোকপতির কৃপা নিশ্চিতরূপে লাভ করিতে পারিব।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ প্রার্থী

—শ্রীহরিদাস রায়

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জৈনৈক ছাত্র (নারমা)

• শ্রীকৃষ্ণকৃপা

অনুগ্রহ করেন যা'রে শ্রীনন্দনন্দন।
 আগে তা'র ধন আদি করেন হরণ ॥
 ইথে যদি ভক্ত জন না ছাড়ে তাঁহারে।
 দিবানিশি কান্দে কৃপা পাইবার তরে ॥
 বিয়োগ-জনিত শোক পরিহার করি।
 শান্ত চিত্তে দিবানিশি বলে হরি হরি ॥
 কৃষ্ণে জানে মাতা পিতা বন্ধু ধন জন।
 শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে সব করয়ে গ্রহণ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ শূণ্য ব্রহ্মপদ হ'লে ।
 অনায়াসে করে ত্যাগ অতি অবহেলে ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-সুখের তরে নরকেতে বাস ।
 করিতে না হয় দ্বিধা সেই কৃষ্ণদাস ॥
 আত্ম-সুখছুখে সদা দিয়ে জলাঞ্জলি ।
 বাঞ্ছয়ে কৃষ্ণের সুখ হ'য়ে কুতূহলী ॥
 ধন আদির বিয়োগেতে শোক না করিয়া ।
 হরি-পাদ-পদ্মে মন রাখয়ে অর্পিয়া ॥
 শ্রীগুরু-বৈষ্ণব সঙ্গ অবেষণ করি' ।
 সে সঙ্কে করয়ে বাস আর ভজে হরি ॥
 জাতি-ধন-বিদ্যা-রূপে মত্ত না হইয়া ।
 অকিঞ্চন হ'য়ে ফিরে কৃষ্ণ নাম গাইয়া ॥
 এমত স্মৃতি যদি লভে কোন জন ।
 তা'রে কৃষ্ণ কৃপা করি' দেন দরশন ॥
 যদি কোন অজ্ঞ শিশু পিতা মাতা স্থানে ।
 বিষ মাগে নিজ বুদ্ধি-দোষের কারণে ॥
 তবে সেই বিজ্ঞ পিতা, অজ্ঞের ক্রন্দন ।
 বিষ দিয়া কভু নাহি করে নিবারণ ॥
 সেইমত কৃষ্ণ অজ্ঞের অনিত্য হরিয়া ।
 শ্রীচরণে দেন স্থান করুণা করিয়া ॥
 ইথে সুখছুখ ভাবি যেই জন ছার ।
 না ভজে শ্রীকৃষ্ণপদ ধিক্ জন্ম তার ॥
 প্রজ্ঞান কেশব কবে কৃপা কণা দিয়া ।
 কর্ণামৃতে উদ্ধারিবেন দুর্জ্ঞান জানিয়া ॥
 নিজগণে গণ্য করি দিবেন আশ্রয় ।
 তবে সে জানিব কৃষ্ণ কৃপা সুনিশ্চয় ॥

—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত দাসাধিকারী

সাঁইথিয়া হরিসভা, (বীরভূম)

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক সম্বন্ধে দুই একটি কথা

অচিন্ত্যানন্তশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ মাতা যশোদার দামবন্ধন স্বীকার করিয়া মাতার বিমুগ্ধবাৎসল্য প্রেমরসনির্ঘাস পূর্ণরূপে আশ্বাদন করেন এবং জগতে নিজের ভক্তাধীনতার চরম পরিচয় প্রদান করেন। সেই পরম মনোহর শ্রীদামবন্ধনলীলা তিনি কার্তিক শুক্লা প্রতিপদে প্রকটিত করেন। পরমথলু কার্তিক মাস দামোদর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার ইহাই প্রধান হেতু। বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্র শ্রীহরিভক্তিবিলাস-প্রণেতা আচার্য্যপাদ শ্রীগোপালভট্টগোস্বামী কার্তিককৃত্য প্রসঙ্গে কার্তিক মাসে প্রতিদিন শ্রীরাধা-দামোদরের পূজা এবং শ্রীদামোদরাষ্টক নামক স্তোত্র পাঠের বিধি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

রাধিকাং প্রতিমাং বিপ্রাঃ পূজয়েৎ কার্ত্তিকে তু যঃ ।

তশ্চ তুষ্ণতি তৎপ্রীতৈ্য শ্রীমান্ দামোদরো হরিরিতি ॥

দামোদরাষ্টকং নাম স্তোত্রং দামোদরার্কনং ।

নিত্যং দামোদরাক্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতং ।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬।২৫-২৬)

যিনি কার্তিক মাসে শ্রীরাধিকার প্রীত্যর্থে তাঁহার পূজা বিধান করেন শ্রীমান্ দামোদর হরি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। শ্রীদামোদরাষ্টক স্তোত্র পদ্যপুরাণে শ্রীনারদ শৌনকাদি সম্বাদে শ্রীসত্যব্রত-মুনিকর্তৃক কথিত হইয়াছে। আচার্য্য-পাদ বলিয়াছেন যে এই স্তোত্র নিত্যসিদ্ধ, ইহা শ্রীসত্যব্রত মুনি হইতে প্রকটিত হইয়াছেন এবং ইহা শ্রীদামোদর কৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিতে সমর্থ। তিনি স্বানুভূতিপূর্ণ বিস্তৃত ব্যাখ্যায় এই স্তোত্রের দামোদরাক্ষিত্ব প্রকৃষ্টরূপে পরিষ্কৃত করিয়াছেন। আমরা সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও তাঁহার চরণ স্মরণ করিয়া তাঁহার সেই অমৃতময়ী ব্যাখ্যায় তাৎপর্যানুসারে সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ সহ স্তোত্রটী প্রকাশ করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীদামোদরাষ্টক স্তোত্র ভগবান্ শ্রীদামোদরের বশীকরণমন্ত্রস্বরূপ। ইহা পাঠ করিলে শ্রীদামোদর হরি তুষ্ট ও বশীভূত হইবেন, স্তবরাং ইহা বৈষ্ণব মাত্রেই নিত্য পাঠ্য। 'আমরা সর্ব-সাধারণের সুবিধার জন্ত সানুবাদ সেই স্তোত্রটী পর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়া এই পুণ্য উর্জ-ব্রতকালে প্রত্যহ সকালে পাঠ ও কীর্তনের জন্ত এই শুভ কার্তিক মাসে তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। শ্রীদামোদর হরির তুষ্টবিধান এবং তদীয়জনগণের রূপাকগালাভই আমাদের একমাত্র লালসা।

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

(১)

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসংকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্ ।
যশোদাভিয়োলুখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যন্ততোদ্রুত্য গোপা ॥

(২)

রুদন্তঃমুহূর্নে ত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাস্তোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্ ।
মুহুঃ শ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিতগ্রৈবং দামোদরং ভক্তিবন্ধম্ ॥

(৩)

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্ ।
তদীয়েশিতপ্তেষু ভক্তৈর্জিতহং
পুনঃ প্রেমতন্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥

(৪)

বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিঃ বা
ন চান্মং বর্ণেহহং বরেশাদপীহ ।
ইদন্তে বপুনর্নাথ গোপালবাং
সদা মে মনস্ত্রাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥

(৫)

ইদন্তে মুখাস্তোজমব্যক্তনীলৈ-
বর্তং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপা ।
মুহুশ্চুস্বিতং বিশ্ববক্ত্রাধরং মে
মনস্ত্রাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥

(৬)

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণে
প্রসীদ প্রভো হৃৎখজালাক্ৰিমগ্নম্ ।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু
গৃহাণেশ মামজ্জমেধ্যাক্ষি দৃশ্যঃ ॥

(৭)

কুবেরাভ্যাজৌ বন্ধমূর্ত্যৌব যদ্বং
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌচ ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রাহো মেহস্তি দামোদরেহ ॥

(৮)

নমস্তেহস্ত দায়ে ক্ষুরদীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্ত্রা ধাম্নে ।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয় প্রিয়ায়ৈ
নমোহনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যাঁহার কর্ণে কুণ্ডল দোড়ুল্যমান, যিনি গোকুলে দীপ্তিমান, যিনি নবনীত
অপহরণ করিয়া মা যশোদার ভয়ে উদ্‌খল হইতে লক্ষ প্রদানপূরক ধাবমান,
যশোদা অতিশয় বেগে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া যাঁহার পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিয়াছেন, সেই
সচ্চিদানন্দরূপ পরমেশ্বর শ্রীদামোদরের চরণে প্রণত হইতেছি ॥ ১ ॥

মাতৃদেবীকর্তৃক প্রসূত হইবার আশঙ্কায় যিনি ক্রন্দন করিতে করিতে
করকমলদ্বয় দ্বারা চক্ষুদ্বয় পুনঃ পুনঃ মার্জনা করিতেছেন, যাঁহার নেত্রদ্বয় সাতঙ্ক-

দৃষ্টিযুক্ত, মূহুমূহু শ্বাস ও কম্প নিবন্ধন যাহার মুক্তাময় কণ্ঠহার দোহুল্যমান, হইতেছে, এবং যশোদা কর্তৃক যাহার উদর রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ আমি সেই ভক্তিবদ্ধ শ্রীদামোদরের পাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি ॥ ২ ॥

এই প্রকার বাল্যলীলাসমূহদ্বারা যিনি গোকুলবাসিগণকে আনন্দকুণ্ডে ভাসমান রাখিয়াছেন, “শিথিলৈশ্বর্য্য প্রেমিক ভক্তগণ কর্তৃক আমি জিত হইয়াছি,” এই উক্তি যিনি ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিতেছেন, আমি প্রেমভরে পুনরায় সেই পরমেশ্বর শ্রীদামোদরের পাদপদ্মে শতশত বন্দনা জ্ঞাপন করিতেছি ॥ ৩ ॥

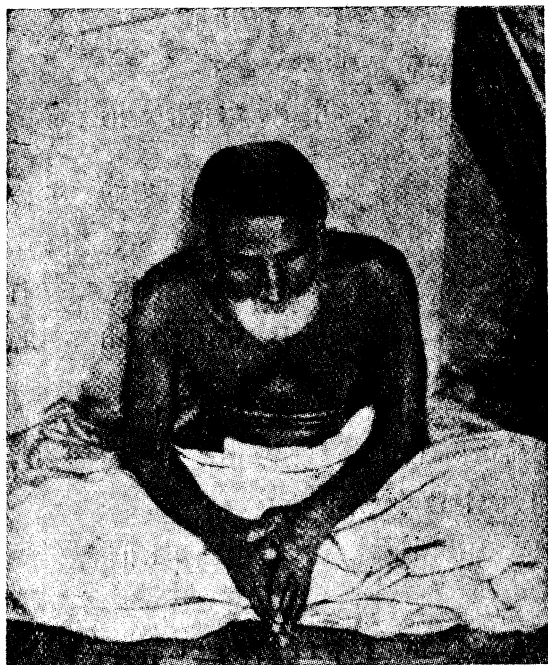
হে মাধুর্য্যালীলাপর দেব! আপনি সর্ব্বপ্রকার বরপ্রদানে সমর্থ হইলেও আমি আপনার নিকট চতুর্থ বর্গ মোক্ষ, মোক্ষের অবধি ঘনস্থ-বিশেষাত্মক শ্রীবৈকুণ্ঠলোক অথবা অন্ত কোন বর প্রার্থনা করি না। হে নাথ! আমার হৃদয়ে যেন আপনার বালগোপাল-বিগ্রহ নিত্য প্রকাশিত থাকেন। এতদ্ব্যতীত অন্ত কোনও বরে আমার আবশ্যক নাই ॥ ৪ ॥

হে দেব। আপনার যে বদনকমল অব্যক্তনীল ও স্নিগ্ধরক্তবর্ণ কুন্তলসমূহদ্বারা বেষ্টিত এবং মা যশোদার মুখপদ্মস্থ লোহিতবর্ণ বিষোষ্ঠের পুনঃ-পুনঃ-চুষন প্রাপ্ত, আপনার সেই মুখাস্থ আমার হৃদয়ে প্রকাশিত থাকুন। অপর লক্ষ লক্ষ লাভেও আমার প্রয়োজন নাই ॥ ৫ ॥

হে দেব! হে দামোদর! হে অনন্ত! হে বিষ্ণে! হে প্রভো! আপনার পাদপদ্মে আমি প্রণত হইতেছি। আপনার সেবাবিমুখতা-রূপ দুঃখ-পরম্পরা-সমুদ্রে নিমগ্ন আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি রূপাদৃষ্টি বর্ষণপূর্ব্বক আমাকে উক্ত দুঃখ হইতে উদ্ধার করুন, আমার দর্শনপথে উদ্ভিত হউন ॥ ৬ ॥

হে দামোদর! আপনি যে প্রকার উদুখলে প্রেমরজ্জুবদ্ধ হইয়া নলকুবর ও মণিগ্রীব নামক কুবের-তনয়দ্বয়কে মুক্তি ও ভক্তির পাত্র করিয়াছিলেন, আমাকেও সেই প্রকার প্রেমভক্তি প্রদান করুন। (কুবেরাশ্রয়দ্বয়ের গায়) মোক্ষে আমার আগ্রহ নাই। (আপনার প্রকৃষ্ট-আনন্দ-বিধানরূপ প্রেমভক্তিরই আমি প্রার্থী) ॥ ৭ ॥

হে দামোদর! বিশ্বের এবং নিখিল তেজেরও (ব্রহ্মেরও) আশ্রয়স্বরূপ আপনার উদরের বন্ধন-দামকে আমি নমস্কার করি। আপনার প্রিয়তমা শ্রীরাধিকার পাদপদ্মে প্রণত হইতেছি। হে অনন্তলীল! হে দেব! আপনার পাদপদ্মে নমস্কার ॥ ৮ ॥



গোলোকগত শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস

বাবাজী মহোদয়ের বিজ্ঞে

ভক্তি-উচ্ছ্বাস

বৈষ্ণবকুলের তুমি আচার্য্য ঠাকুর ।

শ্রীগৌরকিশোরদাস কৃষ্ণভক্তশূর ॥

শ্রীহরিবাসররাত্র উজ্জ্বলত শেষ ।

প্রপঞ্চ ছাড়িয়া তব স্বাধাম প্রবেশ ॥ ১ ॥

প্রচ্ছন্ন রূপেতে ছিলে আদর্শ মানব ।

অলৌকিক হরিভক্তি অতুলনা সব ॥

ছই করি গঙ্গাতীরে মাত্র তৃণাসন ।

কঠোর বৈরাগ্য ব্রত করিলে সাধন ॥ ২ ॥

অষ্টযাম স্মরি লীলা কর অনশন ।
 শরীরে ভাস্কর তেজ অপূর্ব দর্শন ॥
 কখন তগুল মুষ্টি কখন কলাই ।
 তাহা পাই প্রেমানন্দে থাকিতে সদাই ॥ ৩ ॥

অনাদি চিন্ময় ধাম গৌরাজ্জ বিলাস ।
 জড়াতীত শুদ্ধ সত্ত্ব সন্ধিনী প্রকাশ ॥
 শোভিত নদীয়াধাম সুরনদী তীরে ।
 নিত্যধামে নিত্যলীলা ভক্তনেত্রে স্মুরে ॥ ৪ ॥

পরমা বৈষ্ণবী মাতা গঙ্গা ভাগীরথী ।
 তাঁর তটে অপ্রকট একাদশী তিথি ॥
 পাইয়া তোমার সঙ্গ নামপরায়ণ ।
 ক্রোড়েতে রাখিল নিজ পবিত্র কারণ ॥ ৫ ॥

সচ্চিৎ আনন্দ তনু গৌরাজ্জ সেবন ।
 চিদানন্দ ধামে থাক গৌর প্রিয়জন ॥
 শ্রীগৌরমণ্ডল অভিন্ন শ্রীবৃন্দাবন ।
 রাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌরাজ্জ একত্রে মিলন ॥ ৬ ॥

তোমার ভজন রীতি মহিমার কণ ।
 অধমের কি শক্তি করিতে বর্ণন ॥
 করিতে কহিব কিছু আপনা পবিত্রী
 অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্ত মধুর চরিত্র ॥ ৭ ॥

যুবাকালে গৃহত্যাগ কৃষ্ণৈকশরণ ।
 ত্রিমিয়া শ্রীবৃন্দাবন দ্বাদশ কানন ॥
 পুণ্যতীর্থ নবদ্বীপ ধাম নিরমল ।
 তথা আসি অবস্থান সাধন অমল ॥ ৮ ॥

দিন দিন ভক্তিপ্রভা হইল বিস্তৃত ।
 চারিদিকে নবদ্বীপ করি আলোকিত ॥
 পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মে সার উপদেশ ।
 ভাগ্যবান নরনারী শুনিত বিশেষ ॥ ৯ ॥

যতদিন থাকে জীব অবিদ্যা অধীন ।
 জড়কর্ম্ম কামনায় বদ্ধ অর্কবাটীন ॥
 নিকাম বৈষ্ণব ধর্ম্ম পবিত্র উজ্জল ।
 সাধুর কৃপায় পায় নাশে অমঙ্গল ॥ ১০ ॥

অতীত কালের স্মৃতি আছে মোর মনে ।
 যেদিন প্রথম এলে সুরভি ভবনে ॥
 শ্রীঅঙ্গে পুলকাবলি মুখে কৃষ্ণনাম ।
 তোমা হেরি সর্ব্বজনে করিছু প্রণাম ॥ ১১ ॥

বুঝিয়া প্রভাব তব বিনোদ ঠাকুর ।
 স্নায় কুঞ্জে রাখিলেন করি সমাদর ॥
 ভকতিবিনোদ-পত্নী মম ঠাকুরাণী ।
 প্রসাদান্ন দিল মাতা তোমারে আপনি ॥ ১২ ॥

শুনিবু মহিমা তব মোর প্রভু স্থানে ।
 উত্তমাধিকারী সেবা করিবে যতনে ॥
 পরম বিরক্ত শাস্ত্র মহাভাগবত ।
 কৃষ্ণ সে ইহার বশ বিশুদ্ধ ভকত ॥ ১৩ ॥

স্বানন্দসুখদকুঞ্জ সরস্বতী তীরে ।
 ভকতিবিনোদ পাশ ছিলে অতঃপরে ॥
 তোমা চিনিলেন মোর আচার্য্য ঠাকুর ।
 বৈষ্ণবে বৈষ্ণব চিনে অগ্ন্যজনে দূর ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধক্ষেত্র শ্রীগৌড়ক্ষেত্রে ঠাকুর আনয় ।
 শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ মধ্যাহ্ন সময় ॥
 বিনোদের মুখামৃত ভাগবত রস ।
 শুনিয়া সাহসিক ভাবে হইতে অবশ ॥ ১৫ ॥

অশ্রুজলে পুলকিত রোমাঞ্চ উদয় ।
 মহাপ্রেমে আবিষ্ট হইতে মহাশয় ॥
 কৃষ্ণানন্দে মগ্ন তনু, কখন সমাধি ।
 ভাগবত রসে ডগ মগ্ন নিরবধি ॥ ১৬ ॥

জন্মভূমি মায়াপুর শচীর অঙ্গনে ।
 ছিলে তুমি কতদিন দেখেছি নয়নে ॥
 অদূরে শ্রীনাথপুর শূন্য লোকালয় ।
 একাকী থাকিতে তথা মহৎ আশয় ॥ ১৭ ॥

ধামবাসী ঘরে ঘরে করি মাধুকরী ।
 ধাম পরিক্রমা করি ভ্রমিতে নগরী ॥
 শরীরে কোপীন মাত্র ছিন্ন সেই বাস ।
 প্রসন্ন বদন সদা নাম-রসোল্লাস ॥ ১৮ ॥

নবদ্বীপ কুলিয়ায় জাহ্নবী পুলিনে ।
 কাটাইলে বহুকাল যুগল ভঞ্জে ॥
 দীনহীন ভিক্ষুবেশ সদা সংকীর্ণন ।
 রাখিলে অক্ষয় কীর্তি ভুবন পাবন ॥ ১৯ ॥

পতিত পাবনী গঙ্গা হিমাদ্রিনন্দিনী ।
 ধর্মক্ষেত্র নবদ্বীপে লীলার সঙ্গিনী ॥
 অলঙ্কিতে মহাদেবী তোমার আবাসে ।
 গৌর-নাম-গুণ-লীলা শুনিত উল্লাসে ॥ ২০ ॥

পরম-বৈকুণ্ঠ সুখ লভি ভক্তগণ ।

করিত শ্রীহরিনাম শ্রবণ কীর্তন ॥

সে সুখ সম্পদ এবে হইয়াছে লয় ।

অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন মোদের হৃদয় ॥ ২১ ॥

একদিন মধুমাসে গোধূলি সময় ।

তোমার দর্শনে মোরা যাই নদীয়ায় ॥

দেখিলু অনেক ভক্ত হইয়া বেষ্টিত ।

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র লহ অসংখ্যাত ॥ ২২ ॥

দর্শনে আনন্দোদয়, করিলু প্রণতি ।

সুধা'লে কুশল বার্তা হয়ে হৃষ্টমতি ॥

সর্বজীবে সমদৃষ্টি মিত্র সন্নিহিত ।

সকলের পূজা তুমি সদয়-বরণ ॥ ২৩ ॥

পতিত অধম আমি মায়াব কিঙ্কর ।

সুখ আশে এ সংসারে আমি নিরন্তর ॥

গৌরাজ্ঞ স্বজন তুমি নিত্যসিদ্ধ জন ।

কর প্রভু আমাদের মঙ্গল বিধান ॥ ২৪ ॥

শিক্ষা দিলা গৌরচন্দ্র আসি ভূমণ্ডলে ।

পরচর্চকের গতি নাহি কোন কালে ॥

শুনিবু তোমার কাছে সেই উপদেশ ।

বিধিব্রতে কৃষ্ণনাম করিবে বিশেষ ॥ ২৫ ॥

নিঃসঙ্গ হইবে কিম্বা স্বজাতীয়াশয় ।

মহাপাপ হয় শুনি বৈষ্ণব নিন্দায় ॥

আমার নিকট থাক, বল কৃষ্ণনাম ।

হৃৎভাগ্য প্রবল আশা না পূরিল কাম ॥ ২৬ ॥

তব দাস বনমালী ভাগ্যবান্ জন ।
 করিল তোমার সেবা ছিল অকিঞ্চন ॥
 অহৈতুকী কৃপা তব দেখিছু নয়নে ।
 রাখিলে শ্রীঅঙ্গ এবে তাঁহার অঙ্গনে ॥ ২৭ ॥

তবানুকম্পিত য়াঁরা সুকৃত সজ্জন ।
 তোমার বিজয়ে সবে শোকেতে মগন ॥
 অন্ধকার নবদ্বীপ আমার নয়নে ।
 শূণ্য হেরি গঙ্গাতীর তোমার বিহনে ॥ ২৮ ॥

ভকতি বিনোদ জয় অধম তারণ ।
 জয় গৌর নিত্যানন্দ জয় ভক্তগণ ॥
 জয় নবদ্বীপ জয় সমাধি আলয় ।
 শ্রীগৌরকিশোরদাস জয় জয় জয় ॥ ২৯ ॥

দীনহীন

—শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা ঘোষ

বনগ্রাম

বোস সাহেবের প্রশ্নের উত্তর

“ধর্মমাগে ও সাম্প্রদায়িক দল গঠনের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত”

এই কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, দল-গঠন ব্যাপারটা ব্যবহার-জগতে যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, সেই চিন্তাধারা লইয়া অপ্রাকৃত রাজ্যের ধারণা অসম্ভব ।
 ভক্তগণ—স্থিতপ্রজ্ঞ ; তাঁহারা বিষয় লইয়া মামলা সৃষ্টি করার ছায়া দলাদলি করেন না । গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে বলিতেছেন—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মন্তেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

দুঃখেষু দুঃখিমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমূনিরুচ্যতে ॥

যঃ সৰ্ব্বত্রানভিন্নেহস্তত্ত্বং প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

যদা সংহরতে চায়ং কুশ্মোহঙ্গানীব সৰ্ব্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়ানৌন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

বিষয়া বিনিবৰ্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।

রসবৰ্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবৰ্ত্ততে ॥

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ।

ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনী হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥

তানি সৰ্ব্বানি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।

বশে হি যন্তেইন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ (গীতা-২।৫৫-৬১)

[অর্থাৎ—ভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ ! যে সময় জীব সমস্ত মনোগত কাম পরিত্যাগ করেন এবং আত্মায় অর্থাৎ প্রত্যাহত-মনে আনন্দস্বরূপ আত্মার স্বরূপ-দর্শনে পরিতুষ্ট হন, তখন তাহাকে ‘স্থিতপ্রজ্ঞ’ বলি ।

শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্লেশ উপস্থিত হইলেও যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, তত্ত্বদ্বিষয়ে স্থখ উপস্থিত হইলেও যাহার স্পৃহা হয় না, এবং যিনি স্বকৃত-কার্যে অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত, তিনিই ‘স্থিতধী’ মুনি অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ ।

তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়,—যিনি সমস্ত জড়বিষয়ে স্নেহশূন্য ও জড়ীয় শুভাশুভ লাভ করিয়াও তাহাতে রাগ-দ্বेष করেন না । শরীর যেকাল-পর্য্যন্ত থাকিবে, সেকাল পর্য্যন্ত জড় ও জড়-সম্বন্ধী লাভালাভ অনিবার্য্য, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সেই সকল লাভালাভে অনুরাগ বা বিদ্বেষ করেন না, যেহেতু তাঁহার প্রজ্ঞা সমাধিতে স্থিত ।

ইন্দ্রিয় সকল বাহ্য-বিষয়ে স্বাধীন হইয়া বিচরণ করিতে চাহে, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয় সকল বুদ্ধির অধীন হইয়া শব্দাদি-ইন্দ্রিয়ার্থে স্বাধীনরূপে বিচরণ করিতে পারে না, বুদ্ধির অনুজ্ঞামত কার্য্য করে । কুর্ষ্ম যেরূপ অঙ্গ সকল ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বান্তরে গ্রহণ করে, তদ্রূপ স্থিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয়সকল বুদ্ধির ইচ্ছামত কখনও স্থির হইয়া থাকে, কখনও বা উপযুক্ত বিষয়ে চালিত হয় ।

স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষেরা পরমতত্ত্বের সৌন্দর্য্য দর্শন পূর্ব্বক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সামান্য জড়ীয় বিষয়-রাগ ত্যাগ করেন । অতিমূঢ় ব্যক্তিগণের জন্ম ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরাহার-দ্বারা সংযমিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও জীবের পরমাত্ম-রাগমার্গ ব্যতীত নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না । উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করে ।

শুদ্ধজ্ঞানমার্গী পণ্ডিতগণ জড়োপরতিমার্গ-দ্বারা চিত্তকে রাগরহিত করিবার যত্ন করেন, তথাপি তাহাদের অভ্যস্ত ক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়সকল মনকে জড়-বিষয়ে সময়ে সময়ে নিক্ষিপ্ত করে; কিন্তু পরমাত্মরাগমার্গে সেরূপ পতনের আশঙ্কা নাই।

যুক্তবৈরাগ্যরূপ যোগমার্গস্থিত যে পুরুষ আমার প্রতি শুদ্ধভক্তির উদ্দেশে কর্মযোগ আচরণ করত ইন্দ্রিয়সকলকে যথাস্থানে নিয়মিত করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।]

উল্লিখিত শ্লোকসমূহের অর্থ মনোযোগ সহকারে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভক্তগণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় লইয়া ব্যস্ত নহেন, তাঁহাদের সমস্তই “যুক্ত” বিচার অর্থাৎ সকল কার্যই ভগবৎ-সেবানুকূল। অতএব অভক্ত-দিগের ক্রিয়া-কলাপের সম্পূর্ণ বিপরীত হইবেই। ভক্তগণ জাগতিক ব্যাপারে কামক্রোধ-তাড়িত জীবের মত ভক্তিহীনদিগের সহিত দলাদলির মতলবে একটা পৃথক্ দল গঠন করেন না। তাঁহারা নিজ অভীষ্টদেবের সেবায়ই সর্বক্ষণ ব্যস্ত; অতএব তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইবার যোগ্যতাভাবে অভক্তদিগের পৃথক্ দল আপনাআপনিই হইয়া পড়ে। ভক্তগণ সর্বদা অভক্তকে রূপা করিতে উন্মুখ—তাঁহারা ভক্তদিগের সঙ্গে সর্বদাধ্য সর্বৈশ্বরেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় যোগদান করিয়া প্রকৃত মঙ্গল লাভ করুন—এজন্ত দ্বারে দ্বারে কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া বহিস্মুখগণের মায়ানিদ্রা ভাঙ্গাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত। তাঁহারা পরদুঃখ-দুঃখী। যাহারা দুর্ভাগা, তাহারা ভক্তদিগের সেই কাতর আহ্বানে সাড়া না দিয়া মায়ার নেশা ছুটিয়া যাইবার ভয়ে দূরে দূরে থাকে, আর ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ ভক্তসঙ্গক্রমে উন্নতি লাভ করেন। ভক্তগণের বাক্য—“উত্তীর্ণত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।” হে অনভিজ্ঞ জীব, তোমার মায়ানিদ্রা হইতে উঠ, জাগ, শ্রেষ্ঠ আচার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গক্রমে উপদেশ লাভ করিয়া জাগ্রত হও। সুতরাং প্রচ্ছন্ন দল গঠনের কথা এখানে খাপ খায় না। ইহা দল নহে—ক্রম-পন্থায় তর-তম অবস্থা। এজন্তই বর্ণাশ্রম ধর্মের বিচার। ওয় প্রশ্নে ইহা আরও পরিস্ফুট হইবে।

“সরল সহজ ‘বিমুক্তত্ব’ ও ‘সম্বন্ধজ্ঞান’কে জটিল করিয়া তোলা”

এই কথার তাৎপর্য্য, যাহার যে বিষয়ে যথেষ্ট অধিকার নাই তাহার নিকট সেই বিষয়টী জটিল বোধ হয়। আমরা বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম যে, কোন মনীষি বলিয়াছেন—“অসম্ভব-শব্দটী মুখের অভিধানে দৃষ্ট হয়” অর্থাৎ জগতে

অসম্ভব বলিয়া কোন ব্যাপার নাই, সবই সম্ভব ; যে যেটীতে অপারগ, তাহাই তাহার নিকট জটিল । গণিত-শাস্ত্রে অপকবুদ্ধির নিকট বড় বড় অঙ্ক অতুল্য জটিল মনে হয়, কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি তাহা অতি প্রাঞ্জল করিয়া বুঝাইয়া থাকেন । অধুনাতন জীবগণের বিষ্ণুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা নিরর্থক বলিয়াই ধারণা । যদি পূর্ব পূর্ব বৈষ্ণবরাজগণের ত্রায় বৈষ্ণবরাজ্য থাকিত, ভগবদ্ভক্তির আলোচনা—বৈষ্ণবশাস্ত্রের চর্চায় বাধ্যবাধকতা থাকিত, তবে আজ পৃথিবীর আবহাওয়া অন্তরূপ হইত । কিন্তু যাহার আশ্রয়ে জীব প্রতিষ্ঠিত, যাহার অভাবে বাস্তব সংসার অচল, তাহারই সম্বন্ধে জগৎ অন্তর্যমনস্ক । বড় বড় নামজাদা বিদ্বান্ এবং তথাকথিত মহাপুরুষ (?) প্রভৃতির সম্মোহিত বাক্যজালে নিরীহ জীবগণের বুদ্ধি সমাচ্ছন্ন । ভগবদ্বিমুখ অভক্তগণের মায়াচ্ছন্ন বিভাবুদ্ধির দৌড়ে—ভোগ-পিপাসু কলিহত জীবগণের ভোগের তাণ্ডব নৃত্যে অজ্ঞ অসহায় অবোধগণ ভ্রান্ত ; অসংকে সং ভ্রম—সাধুকে অসাধু জ্ঞান—কর্ম্মকেই ভক্তি বলিয়া জ্ঞান—কতকগুলি মুষ্টিমেয় জীবের দেহেন্দ্রিয়তর্পণকেই ভগবৎ-সেবা-ভ্রান্তি সমগ্র জগতের সর্বনাশ উপস্থিত করিয়াছে । আজ ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা অপেক্ষা মিথ্যাকথার আদর—নাটক-নভেলের নায়ক-নায়িকার ভোগপর বিচার-সম্বলিত গল্পই সত্য ; নভেলীধরণে সংসার করাই বাহাদুরী ; সনাতন পন্থা—চির-প্রচলিত সনাতন ধর্ম্মের আচরণ করা দুর্বলচিত্ত ধর্ম্মভীক ব্যক্তির কার্য—এই সকল ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়ায় জগতের এই দুর্দশা । পাপ-মলিন-চিত্ত-ব্যক্তির ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধা নাই, ভগবৎ-সেবায় বিশ্বাস নাই । তাই শাস্ত্র বলেন—

“যাবৎ পাপৈশস্ত মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি ।

ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্মাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদগুরৌ তথা ॥”

অর্থাৎ যতদিন জীবগণের চিত্ত পাপে মলিন থাকে, ততদিন শাস্ত্রে—সত্যবুদ্ধি এবং সদগুরুতে—প্রকৃত সাধুতে ‘সৎ’ বুদ্ধি হয় না ।

“নাশ্চ পন্থা বিত্ততে অয়নায়” কথাগুলি সমস্তটী আলোচনা না করিলে উহার তাৎপর্য্য কিরূপে বুঝা যাইবে ? শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলিতেছেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-

মাদিত্যাবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।

তমেব বিদিত্যতিমৃত্যুমেতি

নাশ্চ পন্থা বিত্ততেহয়নায় ॥ (শ্বেতাশ্বতর—৩।৮)

উপরিউক্ত মস্ত্রের পূর্ববর্তী মস্ত্রের উল্লেখ করিলে এই মস্ত্রের অর্থ সুবোধ্য হইবে—

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং

যথানিকায়ং সৰ্বভূতেষু গৃঢ়ম্ ।

বিশ্বশৈকং পরিবেষ্টিতারং

ঈশং তং জাহ্নবামৃতা ভবন্তি ॥ (শ্বেতাস্থতর—৩।৭)

যিনি সমস্ত জীব ও হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রাণীর শরীরে যিনি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত এবং সৰ্ব্ব বিশ্বের ব্যাপক ঈশ্বরকে জানিলে অমৃত হইয়া থাকে অর্থাৎ মৃত্যুধর্মকে চিরতরে অতিক্রম করে। তৎপরবর্তী মস্ত্রে বলিতেছেন—আমি সেই মহান পুরুষকে জানি, তিনি সূর্য্যের ত্রায় স্বয়ং প্রকাশরূপ। তাঁহাকে জানিলেই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন। তদ্ব্যতীত পরম ধামে গমনের অন্ত পন্থা নাই।

সকলেই গমন করিতেছে ও ফিরিতেছে অর্থাৎ জীবগণ সংসারে জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া ক্রমশঃ মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ ও দেবতাদি যোনিতে নিজ নিজ কর্মফলে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে। ভগবৎপাদপদ্মের অম্লসন্ধান না করিয়া নিজের প্রকৃত পরিচয়ের সন্ধান না লইয়া ভ্রান্ত পথিকের ত্রায় বিপথে ঘুরিয়া দুঃখ বরণ করায় কৃষ্ণবহিষ্মুখতা দোষে দুঃখ পাইতেছেন। তাহাদের সেই দুঃখের অবসানের উপায় নির্দেশ করিতে গিয়া কৃপামুখি পরদুঃখদুঃখী ত্রিচৈতন্যদেব, পণ্ডিত গৌসাই ও কবিরাজ গোস্বামী সরল ভাষায় বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহিষ্মুখ ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)

কৃষ্ণ-বহিষ্মুখ হঞা ভোগ বাঞ্ছা করে ।

নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয় ।

মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥

“আমি নিত্য কৃষ্ণদাস”—এই কথা ভুলে ।

মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বলে ॥

কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র ।

কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র ॥

কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্যে, নরকে বা কভু ।

কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু ॥ (প্রেমবিবর্ত)

ব্রহ্মাও ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।

গুরু কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১)

তাতে কৃষ্ণ ভঞ্জে, করে গুরুর সেবন ।

মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

হরিবিমুখ ভোগাসক্ত জীব এই সরল কথাগুলিকেও জটিল মনে করে । শ্রীভগবানের সঙ্গে যে জীবের নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা না জানিয়া বা জানিতে চেষ্টা না করিয়া জড় অনিত্য সম্বন্ধে দেহ, গৃহ, স্ত্রী-পুত্রাদিতে মমতা-বুদ্ধিবশে দুঃখ পাইতেছে । সে সত্য সত্য এ দুঃখের অবসান চায় না । মরীচিকায় জলভ্রমের স্থায় দুঃখকেই স্বথবোধ করিয়া তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে । এজন্ত সাধু-শাস্ত্রগণ বহিস্মৃতিতা নিরসনের জন্য তারস্বরে আমাদের দুঃখের কথা ও দুঃখ নিবারণের উপায় ঘোষণা করিতেছেন । সেই সকল শাস্ত্র সম্প্রদায়-দোষহুঁষ্ট হইবে কিরূপে ? শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

মায়ামুক্ত জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান ।

জীবেরে রূপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥

শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান ।

‘কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা’—জীবের হয় জ্ঞান ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২—২৩)

অর্থাৎ জীব নিজের বুদ্ধির দোড় থামাইয়া দিয়া, আলেয়ার পিছনে না ছুটিয়া প্রকৃত মঙ্গলনির্দেশকারী সাধু বা শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ দিলে নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিবে এবং তাহার সকল দুঃখের অবসান হইবে ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদভক্তি ভূদেব শ্রোতি মহারাজ

মাননীয় চন্দ্র বাবুর পত্র

(পূর্ব প্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ৩২০ পৃষ্ঠার পর)

প্রভো ! আমি কয়েকটা বিষয়ে সমস্তায় পড়িয়া মনে বড় কষ্ট অনুভব করিতেছি । সমস্তার সমাধান স্বেচ্ছাক্রমে সম্পন্ন করিতে একমাত্র আপনারই সমর্থ । তাই আপনাদের শরণাপন্ন হইলাম । রূপা নেত্রে অবলোকন করিয়া এ অধমকে দত্ত করুন ।

প্রশ্ন

- ১। শ্রীমতী রাধারাণীর পাদপদ্মে তুলসী প্রদান করা যায় কিনা?
- ২। বৈষ্ণবের পক্ষান্ন মহাপ্রসাদ উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের গ্রহণীয় কিনা?
- ৩। ভগবান যখন 'ভাবগ্রাহী' তখন যিনি যে নামেই তাঁহাকে ডাকুন, সে ডাক তাঁহার নিকট পৌছে কিনা?

৪। শ্রীমন্নমহাপ্রভু সনাতন শিক্ষায় বলিলেন—

“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।”

তিনি জীবকে “বিষ্ণু দাস”, “নারায়ণ দাস,” “ব্রহ্মজ্ঞানী ও পরমাত্মযোগী” না বলিয়া “নিত্য কৃষ্ণদাস” বলিবার গূঢ়তাৎপর্য কি?

৫। ভেকধারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি কখন ও কি প্রকারে হইয়াছে?

৬। ভেকধারী বৈষ্ণবগণ কোন্ শ্রেণী ও কোন্ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব? তাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর ধর্মের অন্তর্গত কিনা?

৭। এতদ্দেশে যে ভেকধারী বৈষ্ণবগণ আখড়া স্থাপন করেন, ও সেবাদাসী রাখেন, তাহা কোনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অঙ্গমোদিত কিনা?

৮। এই শ্রেণীর ভেকধারী বৈষ্ণবগণ দ্বারা, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবাকার্য্য হইতে পারে কি? এবং ঐরূপ সেবার প্রসাদ গৃহী বৈষ্ণবগণের গ্রহণীয় কিনা?

৯। মংস্ত্রাশীকে বৈষ্ণব সংজ্ঞা দেওয়া যায় কিনা? এসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া সন্দেহ নিরসন করিবেন।

১০। মংস্ত্রাশীকে গুরুপদে বরণ করিয়া ‘দীক্ষা মন্ত্র’ গ্রহণ করিলে দীক্ষা সিদ্ধ হয় কিনা? এবং তিনি গুরু পদবাচ্য হইতে পারেন কি?

শ্রীপত্রিকায় উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করিয়া এ দাসের মনোবাসনা অবশ্য পূর্ণ করিবেন।

এখন আমি পত্রের উপসংহারে দুই চারিটা কথা শ্রীপাদপদ্মে জ্ঞাপন করিতেছি—আমাদের দেশস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকদের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ মত দেখা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্র প্রমুখ কতিপয় বৈষ্ণব নিত্যধাম-গত শ্রীল সিদ্ধান্ত সরস্বতীপাদের আত্মগত্যে ভজন সাধন ও আচার প্রচার করিতেছেন। আর জগবন্ধু শীল আদি কতিপয় মঠের শিষ্য শ্রীল প্রভুপাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের উপদেশাদি উপেক্ষা করিয়া শ্রীল অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী মহাশয়ের উপদেশকে অকাট্য শাস্ত্র-যুক্তিপূর্ণ বলিয়া সর্ব-সাধারণের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন। উভয় পক্ষের মধ্যে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ দ্বৈষা-

দেখী ও মনোমালিন্ত চলিতেছে। সাধারণ শাস্ত্র জ্ঞানহীন লোকসকল এই সকল ব্যপার দর্শন করিয়া কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন তাহা ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীল অনন্তবাসুদেবের অনুগত সেবকদল এক অভিনব মত প্রচার করিতেছেন যে, দ্বাত্রিংশক্ষর শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কেবল জপ্য, কীর্তনীয় নহে। তাহাদের এইরূপ অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয় প্রলাপবাক্য কোনও সম্প্রদায়ের লোকই গ্রাহ করেন না। যাহা হউক শ্রীপত্রে এ সম্বন্ধে দয়া করিয়া অবশ্য কিছু কিছু আলোচনা করিবেন।

প্রভো কৃপা করিয়া আমাকে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া নিয়মিত রূপে পত্রিকা পাঠাইয়া কৃতার্থ করিবেন। আপনাদের কৃপা ভিক্ষা পাইলে মধ্যে মধ্যে ২।৪টী প্রস্ন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ২।১ খানা প্রবন্ধ পাঠাইবার বাসনা করি।

আর একটি সংবাদ—জ্ঞানৈক বৈষ্ণবের আহ্বানে আজ কয়েক দিবস হইল আমি কুমিল্লার নিকটবর্তী অশ্বখতলা গ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে যাওয়ার সময় ১ম সংখ্যা গৌড়ীয়-পত্রিকা খানি সঙ্গে লইয়াছিলাম। সেখানে ভক্ত ও অন্তান্ত লোকের নিকট ২।৩ দিন যাবৎ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রচারের উদ্দেশ্য ও মহিমা বিশদ ভাবে কীর্তন করিয়াছিলাম। ভক্তটী ইতিপূর্বেও সং সিদ্ধান্ত প্রচারকারী গৌড়ীয়ের মহিমা কিছু কিছু পরিজ্ঞাত আছেন। তিনি আমাকে অতি উৎকর্ষার সহিত বলিয়াছিলেন যে, আপনি বাড়ী বাইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীপত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া অবশ্য জানাইবেন, তিনি যেন যে চারি সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশ হইয়াছে তাহা আমার নামে ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইয়া পত্রিকার ভিক্ষা স্বরূপ ৪ টাকা আদায় করিয়া লহেন।

অতএব মহাশয়, শ্রীযুক্ত রাজ মোহন পাল, জিলা ত্রিপুরা উক্ত ঠিকানায় ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ সংখ্যা ভিঃ পিঃ করিবেন। শ্রীশ্রীচরণে দণ্ডবৎসম্ভারমিতি।

শুদ্ধভক্ত-পদরেণু-প্রার্থী

—শ্রীচন্দ্রকুমার দাস

গ্রাম দাসদী, ত্রিপুরা।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

৩০ পদ্মনাভ, ২০ আশ্বিন, ৭ অক্টোবর, শুক্রবার—পৌর্ণমাস্তারস্ত-পক্ষে কার্তিক-ব্রত, দামোদর-ব্রত, উর্জ্জব্রত বা নিয়ম-সেবা আরম্ভ।

১১ দামোদর, ১ কার্তিক, ১৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার—শ্রীম্মা একাদশীর উপবাস।

১২ দামোদর, ২ কার্তিক, ১৯ অক্টোবর, বুধবার—পূর্বাহ্ন ৯২৭ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব।

১৫ দামোদর, ৫ কার্তিক, ২২ অক্টোবর, শনিবার—শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব।

২২ দামোদর, ১২ কার্তিক, ২৯ অক্টোবর, শনিবার—শ্রীগোপাষ্টমী ও শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী। শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত ও শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যের তিরোভাব।

২৫ দামোদর, ১৫ কার্তিক, ১ নবেম্বর, মঙ্গলবার—শ্রীউথানৈকাদশীর উপবাস। পরমহংস বাবাজী শ্রীল গোরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব। শ্রীভীষ্ম-পঞ্চক।

২৬ দামোদর, ১৬ কার্তিক, ২ নবেম্বর, বুধবার—পূর্বাহ্ন ৯২৮ মধ্যে উথানৈকাদশীর পারণ। শ্রীল গোরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা।

২৮ দামোদর, ১৮ কার্তিক, ৪ নবেম্বর, শুক্রবার—বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী। শ্রীল ভূগভ গোস্বামী ও শ্রীল কালীধ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব।

২৯ দামোদর, ১৯ কার্তিক, ৫ নবেম্বর, শনিবার—পৌর্ণমাস্তারস্ত-পক্ষে চাতুর্দশাব্রত ও উর্জ্জব্রত সমাপ্ত। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের হৈমন্তিকী রাসযাত্রা। শ্রীল স্বন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীল নিম্বার্ক আচার্যের আবির্ভাব।

১১ কেশব, ৩০ কার্তিক, ১৬ নবেম্বর, বুধবার—উৎপল্লা একাদশীর উপবাস। তৎপর দিবস পূর্বাহ্ন ৯৩২ মধ্যে একাদশীর পারণ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্কে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্কে অহৈতুকী ভক্তি বিরশূন্য ॥
অন্য ধর্ম স্বচরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই ভ্রম ॥

১ম বর্ষ

কারণোদশায়ী, ১০ নারায়ণ, ৪৬৩ গৌরাক
বৃহস্পতিবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬; ১৫।১২।৪৯ { ১০ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীমদগৌরকিশোরনমস্কারদশকম্
(ত্রিদণ্ডস্বামি-শ্রীমন্তকিরক-শ্রীধর-মহারাজ-কৃতম্)

(১)

(২)

গুরোগুরো মে পরমো গুরুস্বং
বরণ্য ! গৌরাজগণাগ্রগণ্যে ।
প্রসীদ ভূত্যে দয়িতাশ্রিতে তে
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥

সরস্বতীনাম-জগৎপ্রসিদ্ধং
প্রভুং জগত্যাং পতিতৈকবন্ধুম্ ।
ত্বমেব দেব ! প্রকটীচকার
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥

(৩)

কচিদ্রজারণ্যবিবিজ্ঞবাসী
 হ্রদি ব্রজদ্বন্দ্বরহো-বিলাসী ।
 বহিবিরাগী স্ববধুতবেষী
 নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যাম্ ॥

(৭)

মহাযশোভক্তিবিনোদবন্ধো !
 মহাপ্রভুপ্রেমসুধৈকসিন্ধো !
 আহো জগন্নাথদয়াম্পদেন্দো !
 নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যাম্ ॥

(৪)

কচিং পুনর্গৌরবনাস্তচারী
 সুরাপগাতীররজোবিহারী
 পবিত্রকৌপীনকরকধারী
 নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যাম্ ॥

(৮)

সমাপ্য রাধাত্রতমুক্তমং ত্ব-
 মবাপ্য দামোদরজাগরাহম্ ।
 গতোহসি রাধাদরসথারিঙ্গিং
 নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যাম্ ॥

(৫)

সদা হরেনাম মুদা রটন্তঃ
 গৃহে গৃহে মাধুকরীমটন্তম্ ।
 নমন্তি দেবা অপি যং মহাস্তম্
 নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যাম্ ॥

(৯)

বিহায় সঙ্গং কুলিয়ালয়ানাং
 প্রগৃহ্য সেবাং দয়িতামুগন্তা ।
 বিভাসি মায়াপুরমন্দিরস্থে
 নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যাম্ ॥

(৬)

কচিদ্রুদন্তঞ্চ হসন্তটন্তঃ
 নিজেষ্টদেবপ্রণয়াভিভূতম্ ।
 নমন্তি গায়ন্তমলং জনা দ্বাং
 নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যাম্ ॥

(১০)

সদা নিমগ্নোহ্যাপরাধপক্ষে
 হ্রাহৈতুকীমেষ কৃপাঞ্চ যাচে ।
 দয়াং সমুদ্ভূত্যা বিধেহি দীনং
 নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যাম্ ॥

শ্রীমদগৌরকিশোর-নমস্কার-দশকের অনুবাদ

হে গুরু গুরো ! আমার পরমগুরু, তুমি শ্রীগৌরান্দ-গণের অগ্রগণ্য সমাজে
 পরম বরেন্য । তোমার দয়িতদাসের আশ্রিত এই ভূত্যের প্রতি প্রসন্ন হও ।
 হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥১॥

হে দেব ! জগতে পতিত জনের একমাত্র বন্ধু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামক ভুবনরিখ্যাত প্রভুকে তুমিই প্রকাশ করিয়াছ। হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥২॥

তুমি কখন ব্রজধামে একান্ত বাস করিয়া ব্রজকিশোরযুগলের পরম গোপনীয় বিলাসপরায়ণ ; কিন্তু বাহিরে বৈরাগ্যবিধি পালন কর, কভু বা অবধূত বেশ গ্রহণ কর। হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৩॥

কখনও বা তুমি গৌরবনামে বিচরণ কর—গঙ্গাতটে সৈকতভূমিতে পরিভ্রমণ কর ; পবিত্র কৌপীন ও করঙ্গধারী হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৪॥

সর্বদা পরমস্থখে শ্রীহরিনামগানকারী এবং গৃহে গৃহে মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণকারী যে মহাপুরুষকে দেবতাগণও নমস্কার করিয়া থাকেন—হে গৌরকিশোর ! সেই তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৫॥

নিজের ইষ্টদেবতার প্রণয়াভিভূত হইয়া কখন নৃত্য, কখন রোদন, কখন হাস্য, আবার কখন উচ্চ গীতপরায়ণ তোমাকে জনগণ প্রভূত নমস্কার বিধান করিয়া থাকেন। হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৬॥

হে মহাযশ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বন্ধো, হে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের একমাত্র প্রেমামৃতসিন্ধো ! হে বৈষ্ণবসার্কভৌম শ্রীজগন্নাথের কৃপাভাজন চন্দ্র ! হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৭॥

পরমোত্তম উজ্জ্বরত উদ্‌বাপন করিয়া শ্রীদামোদরের উত্থান-দিন-অবলম্বনে তুমি শ্রীরাধিকার আদরের সখীত্বসম্পন্ন প্রাপ্ত হইয়াছ। হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৮॥

কুলিয়া নগরের অধিবাসিগণের সঙ্গ পরিহার করিয়া তোমার অন্তর্গত শ্রীদয়িতদাসের সেবা অঙ্গীকারপূর্বক শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীমন্দিরে তুমি বিরাজ করিতেছ। হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৯॥

সর্বদা অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন থাকিয়াও এই (রচনাকারী) তোমার অহৈতুকী কৃপা বাঞ্ছা করিতেছে। দীন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া দয়া বিধান কর। হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥১০॥

শ্রীমধ্বমুনি চরিত

(জন্ম, দেশ ও কাল)

দেশের পারিপার্শ্বিক পরিচয়

উত্তরে হিমালয় এবং অগ্নি দিকত্রে সমুদ্রবেষ্টিত ভূখণ্ড ভারতবর্ষ। ভারতের মধ্যদেশে বিষ্ণুগিরি অবস্থিত। বিষ্ণুর উত্তরাংশ আৰ্য্যাবর্ত এবং দক্ষিণভাগ দাক্ষিণাত্য নামে প্রসিদ্ধ।

দাক্ষিণাত্যে পূর্বাচল ও পশ্চিমাচল নামে দুইটি গিরি শ্রেণী বিরাজমান। পশ্চিমাচলকেই সংস্কৃত ঐতিহ্যে ‘সহ-পর্বত’ বলিয়া উল্লিখিত হয়। এই সহ গিরিমালার পশ্চিমে তিনটি প্রদেশ আছে। বোম্বাইর দক্ষিণাংশ হইতে কোন্-কান্, তদক্ষিণে ক্যানরা এবং তাহার দক্ষিণে কেরল রাজ্য। কোন্-কান্, ক্যানরা এবং কেরল—এই প্রদেশত্রয়ের পশ্চিম সীমা পশ্চিম-সাগর বা আরব সমুদ্র দ্বারা আবদ্ধ। কোন্-কান্ প্রদেশের ভাষা মহারাষ্ট্রীয়ের গ্রায়। বর্তমান সময়ের ম্যালিবোর জিলা এবং কোচিন ও ত্রিবাকুর দেশীয় শাসনাধীন রাজ্যদ্বয় কেরলাস্তুর্গত ভূমি।

ক্যানরা প্রদেশ সম্প্রতি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তর ক্যানরা জিলা, বোম্বাই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ ক্যানরা জিলা মাদ্রাজ বিভাগে অবস্থিত। উত্তর ক্যানরায় কেবল ক্যানরার ভাষা প্রচলিত আছে, পরন্তু দক্ষিণ ক্যানরায় ক্যানরাজ, তেলেগু এবং মলায়লম্—তিন ভাষাই প্রচলিত দেখা যায়। উত্তর ক্যানরা জিলায় আটটি তালুক ও দক্ষিণ ক্যানরায় পাঁচটি তালুক বা উপবিভাগ আছে।

উড়ুপী তালুকের দূরত্ব

দক্ষিণ ক্যানরার উত্তরাংশে খোশালপুর বা কুণ্ডাপুর তালুক। তদক্ষিণে উড়ুপী তালুক, তদক্ষিণে ম্যাঙ্গোলোর তালুক। ম্যাঙ্গোলোরের পূর্বে পুস্তুর বা উল্লিননগড়ি তালুক এবং দক্ষিণে কাষাডগড় তালুক। দক্ষিণ ক্যানরা ১৪ অংশ ৩১ কলা উত্তর অক্ষাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫।৩১ উত্তর অক্ষাংশ পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট আছে। কলিকাতা হইতে ক্যানরা জিলা ৫৬ মিনিট পশ্চিমে অবস্থিত অর্থাৎ কলিকাতায় ১২টার সময় তথায় ১১টা ৪ মিনিট হয়।

উড়ুপী তালুকের প্রধান নগর উড়ুপী

দক্ষিণ ক্যানরা জিলার প্রধান নগর ম্যাঙ্গোলোর। উহা ম্যাঙ্গোলোর

তালুকের অন্তর্গত এবং নেত্রাবতী নদীর উপর স্থিত। কাষাড়গড় চন্দ্রগিরি বা পয়ষিনী নদীর উপরে। উড়ুপী তালুকের প্রধান স্থান উড়ুপী। উড়ুপী তালুকের উত্তরাংশে কুণ্ডাপুর, পূর্বাংশে মহিশূর রাজ্য, দক্ষিণে ম্যান্ডোলোদ তালুক এবং পশ্চিমে আরব সাগর।

উড়ুপীর নিকট পাজকাক্ষেত্রের সন্নিহিত তীর্থপঞ্চক

বর্তমান উড়ুপী নগরের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে পাজকাক্ষেত্র নামে একটি জনপদ ছিল। উড়ুপী হইতে পাজকাক্ষেত্র সমুদ্রকূলে কিঞ্চিদধিক এক ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত। সম্প্রতি পাজকাক্ষেত্র নির্জন ত্যক্তপল্লী। এখানে **দণ্ডতীর্থ** নামে এক পুষ্করিণী আছে এবং বিমানগিরি নামে পর্বতের উপর দেবী দুর্গার মন্দির আছে। বিমানগিরির পাদদেশে উপত্যকায় পাজকাক্ষেত্র। পৌরাণিক-গণের নিদ্দেশে সহ্যাদ্রিতে ত্রেতাযুগে পরশুরাম নির্জন বাস করেন। উড়ুপী ও তন্নিকটবর্তী পাজকাক্ষেত্রের সন্নিহিত ক্রোশব্যাপী স্থানমধ্যেই **পরশুতীর্থ**, **ধনুস্তীর্থ**, **গদাতীর্থ**, এবং **বাণতীর্থ** বিরাজমান। এই সকল তীর্থ, তীর্থ-যাত্রীর এখনও পরম শান্তির কেন্দ্র।

উড়ুপীর অপর নাম রজতপীঠপুর

উড়ুপী নগরে চন্দ্রমৌলেশ্বর **শিবমূর্তি** বহুকাল হইতে আছেন। গ্রামের নাম উড়ুপী চন্দ্র-মৌলেশ্বর হইতে উদ্ভূত। ‘উড়ুপ’ শব্দে ‘চন্দ্র’ এবং উড়ুপী বলিয়া ‘চন্দ্র-মৌলেশ্বর’কেই সাধারণতঃ স্বল্পাক্ষরে লক্ষ্য করা হয়। এই উড়ুপী নগরই **রজতপীঠপুর** বলিয়া আখ্যাত হয়। এখানে অনন্তেশ্বরেরও এক মন্দির পূর্বকাল হইতে আছে। অনন্তেশ্বর ও চন্দ্র-মৌলেশ্বরের মন্দির উভয়ই পূর্বমুখী ও একটি অপরটির পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত।

শ্রীঅনন্তেশ্বরের লিঙ্গমূর্তি—শৈব-চক্ষে শিব ও বৈষ্ণব-চক্ষে পরশুরাম

সহ-গিরিরাজের পশ্চিমে সমুদ্রকূলবাসী ব্রাহ্মণগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ কোন্কান্, কেহ বা সারস্বত এবং অগ্র কেহ বা শিবাল্লী বলিয়া নিজ ব্রাহ্মণশাখার পরিচয় প্রদান করেন। কোন্কান্ ব্রাহ্মণ ও সারস্বত ব্রাহ্মণ দেশ হইতে শ্রেণী স্থির করিয়াছেন। শিবাল্লীগণ তদ্রূপ নহেন। ক্যানারি ভাষায় শিবাল্লী বা ‘শিববেল্লী’ শব্দে ‘শিবের রূপা’ বুঝায়। ইহার রজতপীঠ-পুরস্থ অনন্তেশ্বরের রৌপ্য সিংহাসনের উল্লেখে নিজ পরিচয় প্রদান করেন। অনন্তেশ্বরের মূর্তি লিঙ্গমূর্তি, কিন্তু অনেকে বলেন, পরশুরাম স্বয়ং ঐরূপে রৌপ্যসিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। কেহ কেহ বলেন অনন্তেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি।

শৈবগণ শিব-বুদ্ধিতে শিব-সহস্রনাম এবং বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু-বুদ্ধিতে একই অনন্তেশ্বরের বিষ্ণু-সহস্র-নাম দ্বারা পরিতোষ বিধান করেন। বিষ্ণু বিগ্রহ যেক্রপ অস্ত্র পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে পূজিত হন, অনন্তেশ্বর তাদৃশ নহেন। ইহার তন্ত্র-মতে পূজা হইয়া থাকে। দক্ষিণ ক্যানারার এই সকল গ্রামে ভূত-প্রেতেরও উপাসনা অতীবধি প্রচলিত আছে। এ প্রদেশে বিষ্ণুমন্দির বা বিষ্ণুবিগ্রহ-সংখ্যা নিতান্ত বিরল।

তুলুব রাজ্য ও কুম্ভা নগরী

কাষাড়গড় ও বেকালের মধ্যে চন্দ্রগিরি বা পয়স্বিনী নদী প্রাচীন তুলুব রাজ্যের দক্ষিণ সীমা বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। তুলুব রাজ্যের অধিবাসীগণের ভাষা টুলু। শিবালী ব্রাহ্মণগণ টুলু ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকেন।

কাষাড়গড় জনপদের চারি ক্রোশ উত্তরে সমুদ্রকূলে কুম্ভা নামী নগরী, এখানে রেলওয়ে স্টেশন আছে। এই নগরী পূর্বকালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। এখানে এক সামন্তরাজের বাস ছিল। ইহাদের অধীনেই ম্যাক্জোলার ও উডুপী তালুকগুলি ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। আজও কুম্ভার সামন্ত রাজবংশ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট বৃত্তিভোগ করিয়া রাজ্য বলিয়া পরিচিত আছেন।

শ্রীশ্রীমন্মথধ্বাচার্য্যের জন্মস্থান

রজতপীঠপুর বা শিবালী বা উডুপী গ্রামের সমিহিত পাজকাক্ষেত্রে শ্রীমন্মথধ্বাচার্য্য প্রথম সূর্যালোক দর্শন করেন। পাজকা ক্ষেত্রে অতাপিও তাঁহার জন্মস্থান নির্দিষ্ট আছে। তাঁহার অভ্যুদয় কালের পর্ণকুটীরাধিষ্ঠিত স্থান তাঁহার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন কোন সেবক কর্তৃক পরে পাষণনির্মিত গৃহে পরিণত হইয়াছে। তবে পাথরের ঘর ক্ষুদ্র ও পল্লীটি জনহীন; পূর্বের স্থিতি-চিহ্ন মাত্র অতাপি বর্তমান আছে।

শ্রীমন্মথমুনির পিতা মধ্যগেহের প্রার্থনা।

উডুপী নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অতি ক্রেশে শুক্ল-বিশ্বার্জ্জনপূর্বক পতিব্রতা পত্নীর সহিত দিনপাত করিতেন। সাংসারিক বিচারক্রমে পুত্রই পিতার পারত্রিক মঙ্গলের হেতু জ্ঞান করিয়া অনন্তেশ্বরের নিকট দেবসদৃশ একটা অপত্য লাভের প্রার্থনা করেন। এই দম্পতীর দুইটা পুত্র হইয়া অকালে পরলোকগত হওয়ায় এবং দরিদ্রতাবশতঃ উডুপী গ্রামের বাস-স্থান ত্যাগপূর্বক পাজকাক্ষেত্রে গমন করেন। ইহাদের একমাত্র কন্যা ছিল,

কিন্তু নৈষ্ঠিক বিপ্রপুঙ্গব পুত্রার্থী হইয়া প্রত্যহই উড়ুপীতে অনন্তেশ্বরের নিকট আগমন করিতেন। ইহার ফলে এক বিধুবৎ সংক্রান্তির দিনে অসংখ্য লোক কোন পর্বোপলক্ষে অনন্তেশ্বর-মন্দিরে সমাগত হইলে এক সাধু, মন্দিরের সম্মুখস্থ স্তম্ভের ধ্বজোপরি উঠিয়া উচ্চরবে অনতিকাল মধ্যে বায়ুর অবতারের প্রসঙ্গ প্রচার করিলেন। তাহাতে ‘মধ্যগেহ’ তাঁহার বর প্রার্থনা সিদ্ধ হইল বৃষ্টিতে পারিলেন।

মধ্যগেহ-নামের উদ্দেশ্য

পাজকাক্ষেত্রে আরও কতিপয় সমজাতীয় ব্রাহ্মণের বাস ছিল। এক বংশীয় কতকগুলি ব্যক্তি একটী পল্লীতে বাস করিলে পূবের বাড়ী, পশ্চিমের বাড়ী, মাঝের বাড়ী, পার্শ্বের বাড়ী প্রভৃতি সংজ্ঞা দ্বারা পরস্পরের বাড়ীর কর্তৃপক্ষ-গণকে সংজ্ঞিত করা হয়। এই প্রকার সংজ্ঞা পূর্বেও দেওয়া হইত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের পিতৃদেবও এইরূপ সংজ্ঞাক্রমে ‘মধ্যগেহ’ বলিয়া কথিত হন। অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিগণের উল্লেখ করিতে হইলে কার্য্যক্ষেত্রে ঐরূপ নামকরণের আবশ্যকতা লক্ষিত হয়। শ্রীমধ্বমুনির পূর্বপুরুষগণ পবিত্র ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন। পাজকাক্ষেত্রে ভট্ট পল্লীর মধ্যগেহ ভট্ট পরম সদাচার-নিপুণ এবং আনুষ্ঠানিক বিপ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মধ্যগেহ ভট্টের নাম মধেজী ভট্ট; তুলু ভাষায় নডুভনুত্তিলয় অর্থাৎ মাঝের বাড়ী।

শ্রীমধ্বের পূর্ব নাম বাসুদেব, মাতা বেদবিজ্ঞা

তৎকালে তুলুব দেশে বিষ্ণুবিগ্রহের বিরল অধিষ্ঠান ছিল। বিশেষতঃ শিবালী ব্রাহ্মণকুল সাধারণ-বিচারে শৈবধর্ম্মাবলম্বী বিপ্র বলিয়া পরিচিত। এই কুলে আমাদের বৈষ্ণবাচার্য্য উদ্ভূত হন। পিতা মধ্যগেহ ও মাতা বেদবিজ্ঞা অনন্তেশ্বরের রূপায় দেবোপম পুত্ররত্ন লাভ করিয়া তনয়ের নাম বাসুদেব রাখিয়াছিলেন। বাসুদেবের মাতৃদেবী বেদবিজ্ঞা, কাহারও মতে বেদবতী সংজ্ঞায় কথিত হইয়াছেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পূবের বাড়ী মাঝের বাড়ীর সন্ত-প্রসূত স্কুমার শিশুর জন্ত এক দ্বন্দ্ববতী গাভী প্রদান করিয়াছিলেন। ‘মধ্যগেহ ভট্ট শিবালী ব্রাহ্মণ হইলেও ভগবান্ বিষ্ণুতে তাঁহার যথেষ্ট মতি ছিল। পুত্রের নামকরণে বাসুদেব সংজ্ঞাই তাহার বিশিষ্ট পরিচয়। এই কুলে বিষ্ণুর পারতম্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা জ্ঞান কিছুকাল হইতে পুষ্টলাভ করিতেছিল, ইহারও

নিদর্শন পাওয়া যায়।

মধ্বের আবির্ভাবক্ষেত্রে রামানুজের প্রভাবের অভাব

যদিও শ্রীরামানুজাচার্য্য মধ্বজন্মের দুই শতাব্দী পূর্বে অবৈষ্ণব মত নিবসন পূর্বক লোক সমাজে নারায়ণের সর্বোত্তমতা স্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি সহ্যাদ্রির পশ্চিম বিভাগে তৎকালীয় রামানুজীয় বিশিষ্টাঈতালোক প্রবেশ করে নাই। সহ্যাদ্রির প্রাক্ প্রদেশ কর্ণাট ও চোল দেশে রামানুজ-প্রভাব ন্যূনাদিক অঈতপন্থীগণের কঠোর গ্রন্থি অবশ্যই শিথিল করে। শঙ্করের অহং-ব্রহ্মোপাসনার কুফল অচ্যুতপেক্ষ্য স্বীয় গুরুর নিকট হইতে অন্তিম কালে গৌণভাবে শ্রুত হইয়াছিলেন। স্মৃতরাং ভাগবত সম্প্রদায়ের কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব মধ্বাবির্ভাব কালের পূর্বেও তুলুব দেশে লক্ষিত হয়।

সহ্যাদ্রির পশ্চিমে পাঞ্চরাত্র অপেক্ষা ভাগবতের প্রাবল্য

শ্রীমধ্বাবির্ভাবের পূর্ব হইতে আমরা পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত সম্প্রদায়ের কথা শুনিয়া থাকি। পাঞ্চরাত্রিকগণের মধ্যে শঙ্খ-চক্রাদি মুদ্রাধারণ-বিধি প্রবর্তিত ছিল, পরন্তু ভাগবতগণ গোপীচন্দন বা গোপী মৃত্তিকা দ্বারা তিলকাদি অঙ্কিত করিতেন। এক্ষণেও তুলুব দেশে মধ্ব-বৈষ্ণবগণের মধ্যে পাঞ্চরাত্রিক ব্যবহারমত মুদ্রা ধারণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তুলুব দেশীয় ভাগবত সম্প্রদায় মধ্বগণের ত্রায় মুদ্রাদি ধারণ করেন না। মধ্ব জন্মের পূর্বে রামানুজীয় পাঞ্চরাত্রিক মত সহ্যাদ্রির পশ্চিমে প্রাবল্য লাভ না করিলেও তথায় ভাগবত সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠান প্রস্বের বিষয় হইতে পারে না। শঙ্কর-মতের প্রবল বিস্তৃতি, অনেকটা রামানুজীয়গণের পাঞ্চরাত্রিক ধর্ম এবং ভাগবত সম্প্রদায়ের বৈভবক্রমে পঙ্কিত হয়। শিবাল্লীগণের মধ্যে সেই ফল মধ্বের উদয়কালের পূর্বেই কিছু কিছু লক্ষিত হয়।

বৈষ্ণবের জন্ম—কর্মফলাধীন নহে

কর্মফলবশে যে-প্রকার অবৈষ্ণব জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণপূর্বক নিজ যোগ্য কর্মফল ভোগ করেন এবং ভোগান্তে বাসনাবশে পুনরায় কর্মযোগ্য শরীর পাইয়া কর্মফল লাভ করেন, নিত্য বিষ্ণুদাস বৈষ্ণবগণ তাদৃশ নহেন। জীবের সৌভাগ্যক্রমে কখনও তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীনারায়ণ নিজে অবতার হইয়া জীবের মঙ্গল বিধান করেন। কখনও বা বৈকুণ্ঠস্থ নিজ পার্শ্বদগণকে ধরাধামে অবতারণপূর্বক লৌকিক তত্ত্ব গ্রহণ করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করেন। যে কালে ধর্মের ম্লানি উপস্থিত হইয়া অধর্মের প্রবলতা হয়, তৎকালে ভগবান্

মর্ত্য জীবলোকে শুভাগমনপূর্বক ধর্ম স্থাপন করেন। যেসকল শ্রীরামানুজীয় পূর্বতন সিদ্ধমূরিসকল বৈকুণ্ঠ হইতে কালে কালে অবতীর্ণ হইয়া হরিকৈষ্কর্ষের প্রভাব অজ্ঞান জীবহৃদয়ে বিকাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ সকল বৈষ্ণবগণের নিত্য স্বরূপ আছে। বৈকুণ্ঠ নিত্য স্বরূপ, সিদ্ধিকালে আপনা হইতেই পরিস্ফুট হয়। সেই নিত্য পার্শ্বদত্তর অবতার বলিয়া বৈষ্ণবগণ সমাজে পরিচিত হন।

নির্বিশেষবাদী কর্মফলবাদ্য

নির্বিশেষবাদী বৈকুণ্ঠের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া সিদ্ধিতে মোহ প্রভৃতি ভাবমাত্র অবস্থিত বিশ্বাস করেন। সুতরাং নির্বিশেষ-বাদের অধীনে যে-সকল কর্মফলবাদী জগতে উদিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মতে ভগবানের বা ভক্তের নিত্য স্নান, স্বরূপ, স্বগুণ, স্বক্ৰিয়া নাই, কেবল মায়া বা কুণ্ঠাদ্বারা পরিমিত হইয়া তাঁহারা কর্মফল ভোগ করেন। অবৈষ্ণবগণের নিত্য পরিচয়ে মোহ ভাব আবদ্ধ, তজ্জন্ম তাঁহারা বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ না হইয়া মায়াবাজ্যে ভ্রান্তিবশতঃ কর্মফল মাত্র ভোগের যোগ্য।

আচার্য্য মধ্বমুনির দেহ নিত্য, কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের দেহ

অনিত্য ও মিথ্যা।

আমাদের আচার্য্য শ্রীমধ্বমুনি, মনু, জৈমিনী প্রভৃতির ন্যায় কর্ম-ফল-নিগড়ে আবদ্ধ ছিলেন না। বলিয়া বৈকুণ্ঠে তাঁহার নিত্য বিগ্রহ আছে। বিশেষতঃ নির্বিশেষবাদীগণের মতে চিন্ময়-বিগ্রহ বা পরিচয়াদি বিশেষ সমূহ কুণ্ঠা বৃত্তির ক্রিয়াবিশেষ। স্বর্গ-নিরুদ্ভাদি ধামে দেব-কীটাদি দেহ নশ্বর ও মায়াবাজ্যে মিথ্যা। সেজন্ম শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে নির্বিশেষবাদীগণ শঙ্করাবতার নির্দেশ করিলেও তাদৃশ রুদ্র মহাশয়ের অনিত্য দেহ মিথ্যামাত্র জানিতে হইবে। বৈষ্ণবের শ্রীঅঙ্গ তাদৃশ নহে।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীল প্রভুপাদ

সাধুজনসঙ্গ

মানব-জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

এই সুবিস্তীর্ণ জগতীতলে আমরা অসংখ্য মানব-নিচয় দেখিতে পাই। স্থূলভাবে সে-সমস্ত মানব-মণ্ডলীকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি। **প্রথম শ্রেণীর** মানবগণ ঈশ্বরবিমুখ। তাহারা মায়ামুগ্ধ হইয়া ‘আমি’, ‘আমার’ ইত্যাকার অভিমানের বশবর্তী হইয়া এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্বার্থপর হইয়া বিধিবিহীন বা যথেষ্টাচারী, কেহ নৈতিক, কেহ কর্মী, এবং কেহ বা জ্ঞানাভিমानी। **দ্বিতীয় শ্রেণীর** মানবগণ ঈশ্বর-উন্মুখ। তাঁহারা এই জগতে বর্তমান থাকিয়াও ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন উপায়াবলম্বনহেতু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কর্মযোগী, নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম আচরণ করেন, কেহ জ্ঞানী, বৈরাগ্য সহকারে ঈশ্বাধ্যান প্রভৃতি ক্রিয়া করেন, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী, আসন-প্রাণায়াম সহকারে আত্মা-পরমাত্মার সংযোগ সাধন করেন, আর কেহ বা ভক্ত, সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানবমধ্যে ভক্তই শ্রেষ্ঠ

ইহাদের মধ্যে ঈশ্বরানুগ্রহ লাভে কাঁহার যোগ্যতা অধিক তাহা বিচার করিতে হইলে সর্বোপনিষদসার শ্রীভগবদগীতা গ্রন্থ আলোচনা করা কর্তব্য। শাস্ত্রপর সরল-বিশ্বাসী সহজেই ভক্তির শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে সন্দিগ্ধ তর্কপর ব্যক্তিগণ বহুতর তর্ক সৃষ্টি করিয়াও এবিষয় মীমাংসা করিতে পারেন না। তর্ক-মন সব সময়েই তাহার হৃদয়-ক্ষেত্র দূষিত রাখে। কর্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির যোগ্যতা বিচার স্থলে ভগবান্ কহিয়াছেন, যথা গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে,—

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ।

কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদযোগী ভবাজ্জন ॥

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরাত্মনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৬-৪৭॥

তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান যোগাবলম্বী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। কর্মযোগী অপেক্ষাও যোগী অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগ-পরায়ণ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও। কিন্তু যাহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে অনন্তচিত্ত হইয়া আমার ভজনা করেন, তাঁহারা সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কারণ শ্রদ্ধাবান্ সাধকই ভক্ত-যোগী, এবং “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ”, একমাত্র ভক্তিদ্বারা সাধক আমাকে জানিতে পারে।

প্রকৃত সাধুসঙ্গের অভাবে কর্মজ্ঞানাতির স্রষ্টি

এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়া মানবগণ দেশভেদে ও অবস্থাভেদে সংস্কার, শিক্ষা ও সঙ্গক্রমে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করিয়াছেন। সেইজগৎ কেহ বা কর্মপ্রিয়, কেহ জ্ঞানী, আর কেহ বা ভক্ত। ঈশ্বর স্বরূপতঃ কি বস্তু, জীবের স্বরূপ কি, মায়া-নির্মিত এই জগতই বা কি এবং ইহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি, জীবের উদ্দেশ্য কি, এবং কি উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—এইরূপ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্বের বিশুদ্ধ বিচার এবং প্রকৃত সাধু-সঙ্গের অভাবও এই ভিন্ন ভাবের অগ্র মুখ্যতম হেতু। বস্তুতঃ পরমেশ্বর এক বস্তু, এবং জীবও স্বরূপতঃ এক বস্তু, তবে যে মানববৃন্দের মধ্যে এইরূপ রুচি বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, তাহা সংস্কার, শিক্ষা ও সঙ্গ-জনিত ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। সর্বোপাধিমুক্ত, ভগবন্ত্বাভিজ্ঞ সাধুর সঙ্গ ও উপদেশক্রমেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, এবং তদ্রূপ সাধুর রূপাবলেই সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। সাধু-সঙ্গ ও সাধু-রূপা ব্যতীত বিশুদ্ধতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার অগ্র উপায় নাই।

সাধুসঙ্গই সংসারোত্তরণের একমাত্র উপায়

কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহ লাভে যত্নবান্ হইয়াও কোন কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়াই হউক, অথবা অজ্ঞায় আত্ম-নির্ভরবশতঃই হউক, সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না, এবং সাধু-সঙ্গ লাভ করিবার চেষ্টাও করেন না। ইহা তাঁহাদের মায়া-মুগ্ধতার পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেননা সংসার-মাগরে ভাসমান মানবের পক্ষে সাধু-সঙ্গই একমাত্র উপায়; তদ্ব্যতীত অগ্র উপায় নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন,—

“ক্ষণমপি সঙ্গজন-সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবাবর্ণব-তরণে নৌকা ॥”

ভক্ত-সঙ্গক্রমেই ভক্তি লাভ হয়

কিন্তু দুঃখের বিষয় এবস্তুত সাধুসঙ্গে তাঁহাদের রতি জন্মে না। যদি বা কেহ সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা মুখে স্বীকার করেন, অন্তর তাহা চায় না। ইহা দুর্ভাগ্যের পরিচয়। শাস্ত্রে আছে—

ভক্তিস্ত ভগবন্তু-সঙ্গেন পরিজায়তে।

সংসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ স্বকৃতৈঃ পূর্বসঙ্কিতৈঃ ॥

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

ভক্তসঙ্ক্রমেই ভক্তি লাভ হয়। পূর্ব-সঞ্চিত বহু স্মৃতি ফলেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়। যদিও স্মৃতির অভাববশতঃ কাহারও ভাগ্যে সাধুসঙ্গ ঘটিতেছে না, ব্যাকুল হইয়া যত্ন ও চেষ্টা করিলে সাধুসঙ্গ দুর্লভ হয় না। এ-জগতে স্থানে স্থানে সাধু বর্তমান আছেন, চেষ্টা করিলেই তাঁহাদের দর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু চেষ্টা না করিয়াই ঘরে বসিয়া সাধুসঙ্গ হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিলে কি হইবে?

সংসার-প্রবিষ্ট জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গই সুখলাভের উপায়

মানবগণ এই মায়িক সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পান্থহারা পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। কোন্ পথে গেলে সুখ হইবে, কি উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—এবং চিন্তায় আকুল হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সাধুসঙ্গ লাভ হইলে সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে, গন্তব্য পথ সম্মুখে দেখা যাইবে, শ্রীমদ্ভাগবতে—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো বদা ভবেজ্জনশ্চ তর্হ্যচ্যুত সংসমাগমঃ।

সংসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদগতো পুরাবরেশে ত্রয়ি জায়তে রতিঃ ॥

(ভাঃ ১০।৫।৫৩)

[হে অচ্যুত, এইরূপে সংসরণশীল ব্যক্তির যৎকালে বন্ধনদশার শেষ হয়, তখনই সংসঙ্গ ঘটিয়া থাকে এবং যখন সংসমাগম হয়, তখনই সাধুজনের পরম গতিস্বরূপ, নিখিল কার্য্যকারণ-নিয়ন্তা আপনার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই মুক্তি লাভ হয়।]

মায়াভিনিবেশবশতঃ জীবের ভগবদ্ভৈমুখ্য এত প্রবল হইয়াছে যে, বিষয়ী মানব এক মুহূর্ত্তও বিষয় চিন্তা, বিষয় সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। বিস্তর চেষ্টা করিয়াও মায়ার নিকট পরাজিত হইতে হয়। কিন্তু সাধুগণ যে হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাহা শ্রবণে অচিরেই মায়াবন্ধন খুলিয়া যায়। যথা ভাগবতে,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীৰ্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জ্ঞানগদা দাম্বপর্ববত্ৰ নি শ্রদ্ধা রতিভক্তিরত্নক্রমিষ্যতি ॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

[সাধুদিগের প্রকৃত সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক যে সকল শুদ্ধহৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে কথিতে শীঘ্রই অবিষ্টানিবৃত্তির বদ্বন্দ্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে

রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদ্ভিত হইবে।]

নির্জ্ঞানবাসে কৃষ্ণভক্তি হয় না, উহা সাধুসঙ্গ সাপেক্ষ

অনেকে এরূপ মনে করিতে পারেন, সাধুসঙ্গের ফল হরিকথা শ্রবণ বা কীর্তন ; 'তাহা গ্রহণার্থে বা নিজে নির্জ্ঞানে বসিয়া করা যাইতে পারে, তবে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন কি ? আর ভক্তি লাভই বা সাধুসঙ্গ সাপেক্ষ কেন, এই সন্দেহ দূরীকরণার্থ শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু কহিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ' ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥

মহৎ-রূপা বিনা কোন কন্মের 'ভক্তি' নয় ।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ, সংসার নহে ক্ষয় ॥

'সাধুসঙ্গ,' 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কথ্য ।

লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০, ৫১, ৫৪)

মহৎ-রূপা ব্যতীত কোনও কন্মের দ্বারা ভক্তি লাভ হয় না

সাধুসঙ্গ এবং সাধু-রূপা ব্যতীত কোন কন্মেরই ভক্তি লাভ হয় না । ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গেও মহৎ-রূপা লাভ হইয়া সর্বসিদ্ধি-সার ভক্তি লাভ হইতে পারে । কিন্তু মহৎ-রূপা ব্যতীত কিছুতেই কিছু হইবে না । ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

রহুগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপণাদগৃহায়া ।

ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিস্থৈর্ঘোষিনা মহৎপাদরজোহভিষেকম্ ॥ (ভাঃ ৫।১২।১২)

[হে রহুগণ, মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্যা গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনা-দ্বারা ভগবন্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় না ।]

মহাজনের পদরজাভিষিক্ত হইলেই তাহা লাভ হয় । শ্রীশ্রীপ্রহ্লাদ কহিয়াছেন, ভাগবতে,—

নৈবাং মতিস্তাবকুরুক্রমাজ্জিৎ স্পৃশতানর্থাপগমো যদর্থঃ ।

মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং নিক্ষিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ (ভাঃ ৭।৫।৩২)

[নিক্ষিঞ্চন অর্থাৎ নিরস্তবিষয়াভিমান পরমহংস মহাবৈষ্ণবগণের পদরজে যেপর্য্যন্ত ঐসকল ইন্দ্রিয়-তর্পণপরারণ ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয়, তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না, অর্থাৎ তাহারা মহৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি বরণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি তাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না ।]

সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য

সাধুসঙ্গ মাহাত্ম্য-সূচক এবস্থি বাক্য সকল শাস্ত্র ভূয়ঃ ভূয়ঃ বলিতেছেন। সাধুসঙ্গের কেন যে এত মাহাত্ম্য, এত বল, এত ফল, তাহা বলা যায় না। তবে একমাত্র বলা যাইতে পারে, সাধুসঙ্গ অভাবে কেহ কেহ বহু জন্ম সাধন করিয়াও কৃষ্ণভক্তি পান নাই। তাঁহারাই আবার সাধুসঙ্গে অতি শীঘ্র ভক্তি লাভ করিয়াছেন। সাধুসঙ্গে যে কত মাধুরী আছে, সাধুসঙ্গে সাধুমুখ-বিনিঃসৃত হরিকথায় যে কত আকর্ষণী শক্তি আছে, সাধু-চরিত্রের যে কত প্রবল বল আছে, তাহা যিনি সাধুসঙ্গ করিয়াছেন, তিনিই জানেন। সাধুসঙ্গ-বিহীন তাকিকগণ, মুক্তকণ্ঠে কহিতেছেন,—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্ত মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ (ভাঃ ১।১৮।১৩)

[ভগবৎসঙ্গীর সহিত নিমেষকাল মাত্র সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয় তাহার সহিত যখন স্বর্গ বা মোক্ষেরও তুলনার সম্ভাবনা করা যায় না, তখন মরণশীল মানবের তুচ্ছ রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা আর অধিক কি বলিব।]

সাধুর অন্তর-লক্ষণ

ভগবদগ্ৰহ লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গ অবশ্য কর্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধুসঙ্গ করিবার পূর্বে সাধু কে, তাহার বিচার আবশ্যক। নতুবা সাধু বলিয়া অসাধুসঙ্গ গ্রহণ করিলে বিশেষ অমঙ্গল ঘটবার সম্ভাবনা। শাস্ত্রে সাধুর লক্ষণ-সূচক একটা বাক্য আছে, যথা—

নির্কৈরঃ সদয়ঃ শাস্তো দস্তাহঙ্কারবর্জিতঃ ।

নিরপেক্ষো মুনির্বাঁতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে ॥

পাঠক ! সাধু ও বৈষ্ণব ভিন্ন মনে করিবেন না। বৈষ্ণবের লক্ষণ কি তদন্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

—যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম ।

সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১১১)

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে ।

সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে ॥

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম ।

তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান' ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭২, ৭৪)

কিন্তু এই সমস্ত লক্ষণগুলি অন্তরে থাকে, সুতরাং ইহা দ্বারা সহসা সাধুর পরিচয় জানা যায় না।

সাধুর বাহ্য-লক্ষণ

অন্তরের ক্রিয়া শুদ্ধ হরিনাম গ্রহণ ব্যতীত সাধুর বাহ্য আচার ক্রিয়াক্রম, তাহা মহাপ্রভু কহিয়াছেন, যথা চরিতামৃতে—

অসংসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।

দ্বীপসঙ্গী—এক অসাধু, ‘কৃষ্ণভক্ত’ আর ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

এবম্বিধ অসাধুসঙ্গ পরিত্যাগই বৈষ্ণবের বাহ্য আচার; তাহা যাহার হইয়াছে, তিনিই বৈষ্ণব। তাঁহার সঙ্গেই সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। পক্ষান্তরে যাহারা অসংসঙ্গ ত্যাগের প্রতি কোন যত্ন না করিয়া হরিনাম গ্রহণাদি ভক্তি-অঙ্গ সাধন করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবপ্রায় বা বৈষ্ণবভাস। তাঁহাদের সঙ্গে সাধুসঙ্গের ফল হওয়া অসম্ভব।

সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে

সাধুসঙ্গ কি? সাধুর সহিত কথা কহিলেই সঙ্গ হয় না, সঙ্গ শব্দের অর্থ প্রীতি বা আসক্তি। শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী প্রীতির লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন,—

দদাতি প্রতিগৃহ্মাতি গুহমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।

ভুঙ্কতে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥ (উপদেশামৃত—৪)

কৃষ্ণ সেবোপযোগী কোন দ্রব্য সাধুকে দেওয়া, সাধুর নিকট হইতে তদ্রূপ কোন দ্রব্য গ্রহণ করা, কৃষ্ণ সম্বন্ধ-সূচক গুহ্য কথা সাধুকে বলা এবং জিজ্ঞাসা করা, হর্ষমনে সাধুর নিকট হইতে কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন করা এবং সাধুকে মহাপ্রসাদ ভোজন করানই সাধুসঙ্গ। মূল কথা, বিষয়ী বন্ধু-বান্ধবের প্রতি অন্তরাসক্তি ত্যাগ করিয়া সাধুকেই প্রাণের বন্ধু জানিয়া সাধুর সহিত কৃষ্ণ-সম্বন্ধের আলাপ-ব্যবহার করিলেই সাধুসঙ্গ হয়।

সাধুর নিকট বিষয়-কথার আলোচনা—সাধুসঙ্গ নহে

সাধুর নিকট গিয়া ‘এদেশে বড় গরম, সে দেশে শরীর ভাল থাকে; এ বাবু বড় ভাল, চাউল, ধান্য কিরূপ হইবে’ ইত্যাকার মায়াবিকারের প্রলাপ বকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধু স্বানুভাবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হয়ত প্রশংসার কথা ‘হু’একটি উত্তর দেন, কিন্তু তাহাতে কি সাধুসঙ্গ হয় বা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়? সাধুর নিকটে যাইয়া প্রীতি-সহকারে তাঁহার সহিত ভগবৎ কথার আলোচনাই সাধুসঙ্গ। তাহাতেই ভক্তিলাভ হয়। শ্রদ্ধাবান সাধকগণ বিশেষ সতর্ক হইয়া,

কৃষ্ণকথা ও বিষয়-কথার পার্থক্য অবগত হইয়া সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করিবেন। মূল কথা এই, যে কথা কৃষ্ণ-উন্মুখ করায়, তাহাই কৃষ্ণ-কথা। আর যে কথা কৃষ্ণ-বিমুখ করাইয়া বিষয়-উন্মুখ করায়, তাহাই বিষয়-কথা।

সাধুসঙ্গের আবশ্যিকতা

সাধুসঙ্গের আবশ্যিকতা জ্ঞাপনার্থ অধিক আর বলিবার কিছু প্রয়োজন নাই। শ্রদ্ধাবান্ সাধকমাত্রই সাধুসঙ্গে যত্নপর হউন। শ্রদ্ধালু হইয়াও যাহারা ভজনে কোন উন্নতি করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা সাধুসঙ্গ করুন। সাধুসঙ্গাভাবই তাঁহাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়াছে। গৌরচন্দ্রের এই বাক্য কয়েকটা সকলেই মনে রাখুন।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের ‘শ্রদ্ধা’ যদি হয়।

তবে সেই জীব ‘সাধুসঙ্গ’ করয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৩৯)

মায়ামুগ্ধ জীবের প্রতি মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

‘নিত্যবন্ধ’—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহিস্মৃৎ ।

নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈষ্ঠ পায় ॥

তঁার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায় ।

কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২, ১৪-১৫)

কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু কহিতেছেন,—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায় ।

সব ত্যজি’ তবে তিহঁ। কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩০৫)।

হরিনাম-পরায়ণ সাধককে প্রভু কহিতেছেন,—

অসাধু-সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয় ।

নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয় ॥

কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ ।

যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর ।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই ।

সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥ (প্রেমবিবর্ত)

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারস্থিত মানবগণকে মহাপ্রভু একমাত্র সাধুসঙ্গ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিবেন সাধুসঙ্গের কত মহিমা ! এই সংসারক্ষেত্রে সাধুসঙ্গ কল্পতরু সদৃশ !!

সাধুসঙ্গের প্রভাব

সাধুসঙ্গের অধার মহিমা কে অবিশ্বাস করিবে? কে না জানে, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গবলে পাপাচারী বারনারী কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছিল? কে না শুনিয়াছেন, ভক্তবর নারদের সঙ্গ ও কৃপাবলে অতি নিষ্ঠুর-হৃদয় ব্যাধও হরিভক্তি লাভ করিয়া ক্ষুদ্র পিপীলিকার প্রাণনাশ বিষয়ে কত সতর্ক হইয়াছিল? পাষণ্ড-প্রধান জগাই প্রথমতঃ নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গলাভ করিয়াই ত' কোমল হৃদয়ের পরিচয় দিয়া শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাপাত্র হইয়াছিল। পতিতপাবন নিতাইচাঁদের সঙ্গ ও কৃপা ব্যতীত কিরূপেই বা 'জগাই মাধাই উদ্ধার হইত? অতএব সকলেই সাধুর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধানু হইয়া সাধুসঙ্গে প্রাণ-মন মজাইয়া "জয় রাধাশ্যাম" বলিয়া জীবন-মন কৃতার্থ করুন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সঙ্জনতোষণী ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

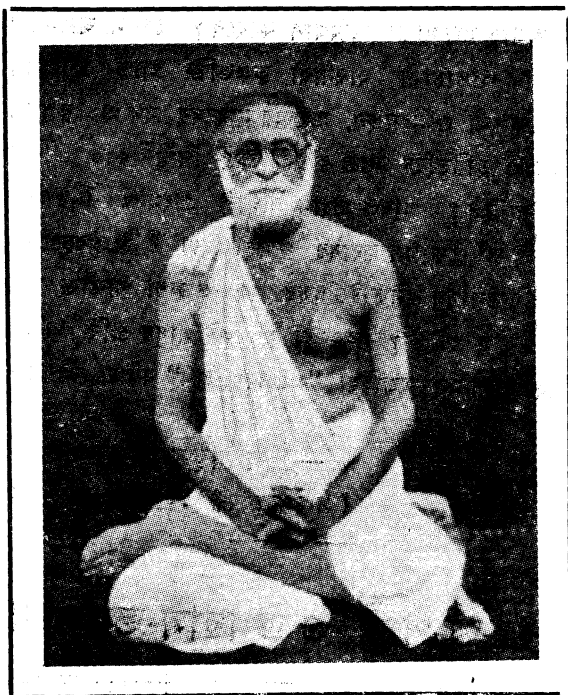
বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

১২ কেশব, ১ অগ্রহায়ণ, ১৭ নবেম্বর, বৃহস্পতিবার—পূর্বাহ্ন ৯।৩২ মধ্যে উৎপন্ন একাদশীর পারণ। শ্রীকালীয়কৃষ্ণদাস ও শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরের তিরোভাব।

২৬ কেশব, ১৫ অগ্রহায়ণ, ১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার—মোক্ষদা একাদশীর উপবাস।

২৭ কেশব, ১৬ অগ্রহায়ণ, ২ ডিসেম্বর, শুক্রবার—পূর্বাহ্ন ৯।৩৮ মধ্যে একাদশীর পারণ।

৪ নারায়ণ, ২৩ অগ্রহায়ণ, ৯ ডিসেম্বর, শুক্রবার—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিত্রাজকাচার্য্যবর্য্য (১০৮) অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তিরোভাব তিথি-পূজা। শ্রীধাম নন্দীপ সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে, চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে এবং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির যাবতীয় শাখা মঠে দ্বাদশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব।



শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দশক

(১)

প্রকাশ হইতে আজও অবধি
 যাহার অভয় যুগল চরণ,
 অর্ঘ্য-ভকতি কুসুম-সস্তারে
 পূজেন সতত অসংখ্য স্মজন ॥

দিনমণি জিনি' অমিত প্রতাপে
 যুগধর্ম ভবে প্রচারিলা যিনি
 আশ্রিত জনের আতঙ্ক নাশিলা
 গোলোক হইতে বরাভয় আনি' ॥

সেই প্রভুপাদ জগতের গুরু,
 গাহ তাঁর জয় কাঁপায়ে ধরণী ।
 চরণ তাঁহার ছুরতিক্রম্য
 ভব মহোদধি পারের তরণী ॥

(২)

শরণাগতের পালক যে জন
পতিত জনের গতি ও মুক্তি,
যাঁহারে হেরিলে অলীক মোহের
বাঁধন টুটিয়া উপজে ভকতি ॥

ধূর্ত কখন পারে না চিন্তা
করিতে যাঁহার যুগল চরণ,
অনর্থের ঘন উড়ে যায় যাঁর
হেরিলে অমল কমল আনন ॥

সেই প্রভুপাদ জগতের গুরু
গাহ তাঁর জয় কাঁপায়ে ধরণী ।
চরণ তাঁহার ছরতিক্রমা
ভব মহোদধি পারের তরণী ॥

(৩)

সুবর্ণ জিনিয়া সুবর্ণ যাঁহার
অতি স্বকোমল দীর্ঘ কলেবর,
কনকমণ্ডাল জিনি ছুটি বাহু
মুরতি যাঁহার জন-মনোহর ॥

দানিল মুক্তি বদ্ধ মানবে
যাঁহার অভয় যুগল চরণ,
যাঁহার চরণ-নখর-কিরণে
কলুষ-আধার করে পলায়ন ॥

সেই প্রভুপাদ জগতের গুরু
গাহ তাঁর জয় কাঁপায়ে ধরণী ।
চরণ তাঁহার ছরতিক্রমা
ভব মহোদধি পারের তরণী ॥

(৪)

তাৰাগণ-মাৰে শশধৰ সম
 সেবক মাৰাৰে শোভিত যে জন,
 যাঁৰ যুগপতি সম গুৰুগৰজনে
 জীৱেৰ অশুভ কৰে পলায়ন ॥

পদযুগ যাঁৰ আনে সুমঙ্গল
 অনুগত-দীন মানবগণেৰ,
 যাঁহাৰ কৰুণাসুধা-অবলেপে
 শুকায় কলুষ ক্ষত হৃদয়েৰ ॥

সেই প্ৰভুপাদ জগতেৰ গুৰু
 গাহ তাঁৰ জয় কাঁপায়ে ধৰণী।
 চৰণ তাঁহাৰ তুৰতিক্ৰম্য
 ভব মহোদধি পাৰেৰ তৰণী ॥

(৫)

যাঁ' হতে বিশ্বে হল বিঘোষিত
 নদীয়া চাঁদেৰ কৰুণা অমল,
 কাঙাল মানবে কৰিলা ধন্য
 প্ৰদানি যে জন চৰণ কমল ॥

উজল হইল গোড়-আকাশে
 ভকতি মিহিৰ যাঁহাৰ কৃপায়,
 যাঁৰ লীলা-গুণ পশু-পাখী গায়
 কাননে, ভ্ৰমৰ কুসুম-শাখায় ॥

সেই প্ৰভুপাদ জগতেৰ গুৰু
 গাহ তাঁৰ জয় কাঁপায়ে ধৰণী।
 চৰণ তাঁহাৰ তুৰতিক্ৰম্য
 ভব মহোদধি পাৰেৰ তৰণী ॥

(৬)

চরণ ষাঁহার আশ্রয়-স্থল
 গৌর-আশ্রিত জনের সতত,
 শ্রীগুরু-গৌরকিশোর-দাস্তে
 যিনি অবিচারে চির অধিষ্ঠিত ॥

ভকতিবিনোদ-চরণে পরম
 আদর কুপায় দেখা'লে যে জন,
 কাঁদিত ষাঁহার মহান্ হৃদয়
 হেরিলে জীবের মলিন বদন ॥

সেই প্রভুপাদ জগতের গুরু
 গাহ তাঁর জয় কাঁপায়ে ধরণী
 চরণ তাঁহার ছুরতিক্রম্য
 ভব মহোদধি পারের তরণী ॥

(৭)

যিনি রূপ-রঘু-সনাতন-কীর্ত্তি
 লভিয়া জগতে হইয়া শ্রেষ্ঠ,
 প্রচারি জগতে শ্রীজীব-অমর-
 কীর্ত্তি, হইলা শ্রীহরি-প্রেষ্ঠ ॥

গৌর-প্রিয়জন-অপার মহিমা
 বিশ্ব-মাঝারে করিয়া প্রচার,
 যিনি তাঁহাদের চির সহচর.
 যিনি এ' বিশ্বে আনন্দ অপার ॥

সেই প্রভুপাদ জগতের গুরু
 গাহ তাঁর জয় কাঁপায়ে ধরণী ।
 চরণ তাঁহার ছুরতিক্রম্য
 ভব মহোদধি পারের তরণী ॥

(৮)

যিনি জীবগণে রূপা বরষিয়া
মূর্তিমান হরি-কীর্তন-স্বরূপ,
নিজ-জন যিনি শচী ছুলালের,
হৃদয়ে যাঁহার রাজে গৌররূপ ॥

বরদেস্তপণ অর্চিত যাঁহার
বিশ্ব পূজিত কমল চরণ,
জলধির পারে উড়িল যাঁহার
তুষার ধবল বিজয় কেতন ॥

সেই প্রভুপাদ জগতের গুরু
গাহ তাঁর জয় কাঁপায়ে ধরণী ।
চরণ তাঁহার ছুরতিক্রম্য
ভব মহোদধি পারের তরণী ॥

(৯)

পরমহংস শ্রেষ্ঠ যে জন
পরমার্থ ধনে হ'য়ে মহাধনী ।
পতিত মানবে তারিবার তরে
ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস রচিলেন যিনি ॥

যাঁহার চরণ সন্ন্যাসীগণ-
সেবিত সতত, যিনি মহাজন,
জাগরিত হয় চেতন, যাঁহার
পরশি' বিশ্ব পূজিত চরণ ॥

সেই প্রভুপাদ জগতের গুরু
গাহ তাঁর জয় কাঁপায়ে ধরণী
চরণ তাঁহার ছুরতিক্রম্য
ভব মহোদধি পারের তরণী ॥

(১০)

যে জন বার্ষভানবীর প্রিয়
 গোলোকের পতি কৃষ্ণ অনুচর,
 যাঁহার চরণ অতি সুমহান
 অপূর্ব পাবনী মহাশক্তিধর ॥

যাঁহার অভয় কর পরশনে
 দূরে যায় জীব-মহাভবরোগ,
 যাঁর করুণায় শ্রীহরি-চরণ-
 রেণু ধারণের পেয়েছি সুযোগ ॥

সেই প্রভুপাদ জগতের গুরু
 গাহ তাঁর জয় কাঁপায়ে ধরনী ।
 চরণ তাঁহার ছুরতিক্রম্য
 ভব মহোদধি পারের তরনী ॥

কৃপাশীর্বাদাকাজ্ঞী—

দাসানুদাসাভাস

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসাধিকারী (রায়)

(নরিমা)

বোস সাহেবের প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ঃ—ধর্ম-সনাতন, কিন্তু বাহাদের আশ্রয় করিয়া ধর্ম পরিষ্কৃত ও সত্যজ্যোতিতে আলোকিত, তাহাদের মন ও মনীষা অনিত্য এবং যুগে যুগে পরিবর্তনশীল । সেই জন্য নিয়ামকগণ কি বজ্রকঠিন ভাষায় ত্রিগুণাতীত একই পন্থার সঙ্গ নির্দেশ দিতে পারেন না ? বাধা কোথায় ? তাঁহারাও কি রাজনীতিবিদদের মত ভোটাধিকারে বঞ্চিত হইবার ভয় রাখেন ?

সহুত্তরঃ—বোস সাহেব কি ধারণায় বশবর্তী হইয়া এই কথাগুলি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না । তবে আমার ধারণাতে বাহা বুঝিয়াছি, তদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, ধর্ম এক ও সনাতন, তাহা চিরকালই

এক। তাহার পরিবর্তন কোন দিনই হয় না। কিন্তু ভোগী-সম্প্রদায় অথবা অম্বরের দল তাহাকে নিজ নিজ মনোদর্শের ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিয়া তাহার রূপান্তর চেষ্টা করেন। অজ্ঞ শ্রেণীর লোক ঐ শ্রেণীর কবলে পড়িয়া অনেক সময় ভ্রান্ত মতকেই সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া বসেন। অধিক কি, লৌকিকী বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী ব্যক্তিগণও এই সনাতন ধর্মকে নিজ নিজ প্রাকৃত বিদ্যা-বুদ্ধির বলে অল্পপ্রকার বুঝিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের অমুগত বক্তৃ-গণকেও তাঁহাদের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলেন। স্বতরাং অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রকৃত ধর্মবিষয়ে অজ্ঞ থাকিয়া যায়। এই সনাতন ধর্ম অতি গূঢ় ও দুর্কৌধ্য। ভাষার সরলতা বা কাঠিন্দে ইহা বুঝা যায় না। একমাত্র পরমার্থবিৎ ব্যক্তির আনুগত্য ও রূপাই সনাতন ধর্ম জানিবার একমাত্র উপায়। শ্রীমদ্ভাগ-বত (৩।৩।২০-২১) বলেন,—

সয়ন্তুনীর্দয়ঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।

প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্ভৈয়্যাসকির্ভয়ম্ ॥

দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্মং ভাগবতং ভট্টাঃ ।

শুভং বিশুদ্ধং দুর্কৌধ্যং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥

পরম বৈষ্ণব শ্রীযমরাজ নিজ দূতগণের নিকট বলিয়াছেন—হে দূতগণ! এই সনাতন ধর্ম অতি গোপনীয়, বিশুদ্ধ ও দুর্কৌধ্য; কিন্তু এই ধর্মের বিষয় অবগত হইলে আর মৃত্যু-ধর্মের অধীন থাকিতে হয় না, চিরতরে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারা যায়। ইহা দুর্কৌধ্য বলিয়া সকলের বোধগম্য হয় না। যদি বল যে কেহই যদি জানিতে না পারে, তবে ইহার সত্তা বিষয়ে প্রশ্ন কি? তদুত্তরে বলিতেছেন শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীমহাদেব, শ্রীসনৎকুমার, ভগবান্ শ্রীকপিলদেব, স্বায়ম্ভুব মনু, ভক্তবর শ্রীপ্রহ্লাদ, রাজর্ষি জনক, শ্রীভীষ্মদেব, শ্রীবলিরাজা, শ্রীশুকদেব ও আমি—এই দ্বাদশজন মহাজন এই সনাতন ধর্মের বিষয় বিশেষরূপে জানি। এই দ্বাদশ মহাজনের রূপায় এই সনাতন ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জগতে প্রচারিত হইয়াছে। ইহারা এই মহাজনগণের আনুগত্য হইয়া ধর্ম অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা শিষ্য-পারম্পর্য্যে এই সনাতন ধর্মের জ্ঞান জগতে প্রচার করিয়াছেন, করিতেছেন ও ভবিষ্যতে করিবেন। এই দ্বাদশ মহাজনের আনুগত্যকে অস্বীকার করিয়া বড় বড় মনোবিগণ নিজ নিজ মনো-ধর্মের বলে ইহাকে বুঝিতে গিয়া বিপরীত অবস্থা লাভ করিয়াছেন। কেহ নাস্তিক, কেহ ভোগী, কেহ ত্যাগী, কেহ সন্দেহবাদী, কেহ নিরাকারবাদী;

বৈতানিকে মহতি কৰ্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥

উক্ত শ্লোকের টাকায় শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলিতেছেন—“যথা মৃতসঞ্জী-
বনৌষধমজ্ঞানন্তো বৈভ্যা রোগনির্হরণায় ত্রিকটুক নিষাদীনি স্মরন্তি, তথা
মৃতশুশুভ্রপ্রমুখদ্বাদশব্যতিরেকেণায়ং মহাজনোহতিগুহ্যমিদমজ্ঞাত্বা দ্বাদশাব্যাদিকং
স্মরন্তীতি । কিঞ্চ মায়ায়া দেব্যা অলং বিমোহিতমতিরয়ং জনঃ মধু মধুরং যথা
ভবত্যেবং পুষ্পিতায়াং পুষ্পস্থানীযৈরর্থবাদৈর্মনোহরায়াং ত্রয়াং জড়ীকৃতাতা
অভিনিবিষ্টা মতির্ধন্য অতএব মহত্যেব কশ্মণি অগ্নিষ্টোমাদৌ শ্রদ্ধয়া যুজ্যমানঃ
নাগ্নে প্রবর্ততে । দৃশ্যতে হি প্রাকৃতস্ত লোকস্ত মহতি মন্তাদৌ শ্রদ্ধা অগ্নে
চাশ্রদ্ধা । তস্মাদস্ত গ্রাহকোহনাস্তীতি তৈনোক্তম্ । যদ্বা স্বাধীনঃ সিংহোহস্তী-
ত্যেতাবতাস্থ-শ্বশৃগালাদি-বারণায় তং যথা ন প্রযুক্ততে, তথাতিতুচ্ছহাং পাপস্ত
ন তন্নিরসনায় পরমমঙ্গলং হরেনান্ম স্মরন্তি । যদ্বা নামমাহাত্ম্যজ্ঞানে সর্বমুক্তি-
প্রসঙ্গাদিত্যেবা দিক্ ।” অর্থাৎ মৃতসঞ্জীবন ঔষধ না জানিয়া বৈভগণ যেরূপ
রোগনাশার্থ ত্রিকটু নিষাদি প্রয়োগ করেন, তদ্রূপ সয়ন্তু-শুভ্রপ্রমুখ দ্বাদশ মহাজন
ব্যতিরিক্ত অন্য মহাজন (?) এই গুহ্য বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্মতত্ত্ব না জানিয়া
দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাদির উপদেশ করেন বা অনুষ্ঠান করেন । তাহারা দৈবী-
মায়ায় বিমোহিত-মতি, তাহারা বেদের ত্রিবর্গকেই অতি মধুর জ্ঞান করিয়া
অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞকেই আড়ম্বরযুক্ত জ্ঞানে তাহারই অনুষ্ঠানে তৎপর হন, কিন্তু
শ্রীহরিনাম কেবল রসনায় উচ্চারিত হন বলিয়া তাঁহাকে অল্প জ্ঞান করেন ।
সিংহ বর্তমান থাকিলে অশ্ব-শ্ব-শৃগালাদি বিতাড়নে সিংহকে নিযুক্ত করিতে হয়
না, তাহারা সিংহের ভয়ে আপনি পলাইয়া যায় ; তদ্রূপ ক্ষুদ্র পাপাদি বিনাশার্থ
পরম-মঙ্গল হরিনাম গ্রহণ করিতে হয় না, তাহা এক নামাভাসেই দূর হয় ;
অথবা নাম-মাহাত্ম্য-জ্ঞানেই সর্বপ্রকার মুক্তি হইয়া থাকে । অতএব সাংখ্য,
পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা দর্শনের প্রচারকগণ সকলেই দৈবী-
মায়ায় বিমোহিত । উল্লিখিত মহাজনগণের মন ও মনীষা অনিত্য ও যুগে যুগে
পরিবর্তনশীল নহে ; তাঁহাদের সকলের বাক্য সর্বকালে সর্বদেশে সর্বজনচিত্ত

সংশোধনার্থ একই প্রকার—সকল বেদের সার—সকল মহাজনের বাক্যের একমাত্র উদ্দেশ্য—

স্বৰ্ভব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিষ্মৰ্ভব্যো ন জাতুচিৎ ।

সৰ্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরিব কিস্করাঃ ॥

(পদ্মপুরাণ—৭২।১০০)

সর্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিবে—ইহাই বিধি, আর কদাচ তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না—ইহাই নিষেধ। অত্যাশ্রয় সকল বিধি-নিষেধই এই বিধি-নিষেধের কিস্কর। শাস্ত্রসকল তারঃস্বরে কীৰ্ত্তন করিতেছেন ইহা করিও না—ও পথে চলিও না, কিন্তু জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া শ্রীভগবানের আজ্ঞাকেও অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া আসিতেছে—অনাদিকাল ধরিয়া মায়ায় লাথি খাইয়া ত্রিতাপ জালায় জর্জরিত হইতেছে, তথাপি চেতন হইতেছে না। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর বাক্য,—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান ।

জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥

শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান ।

‘কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা’—জীবের হয় জ্ঞান ॥

(চৈঃ চঃ ২০।১২২-২৩)

শাস্ত্রের আদেশ বজ্রকঠিন ভাষায়ই কথিত আছে। কিন্তু “ধাবৎ পাপৈশ্চ মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি । ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ শ্রুতং সদ্ভুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা ॥” যতদিন চিত্ত পাপে মলিন থাকে, ততদিন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি ও সদ্গুরুতে সদ্ভুদ্ধি হয় না। সুতরাং শাস্ত্রের চীৎকার কে শুনিবে? ভোগী স্তুবিধাবাদী দেহারামীর দল দেহকেই সর্বস্ব—ভোগকেই সর্বস্ব বোধে অনিত্য বস্তুর পশ্চাতে উন্নত্তের ত্রায় ধাবিত। কে তাহাদের নেশা ছুটাইবে? যতদিন না ভোগে নাকাল হইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ততদিন তাহার ঔষধ নাই। এ-জন্তই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের বাক্য,—

মতিন্ কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোহভিপণ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।

অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃপুনশ্চর্কিতচর্কণানাম্ ॥ (ভাঃ ৭।৫।৩০)

গৃহই একমাত্র ব্রত অর্থাৎ সঙ্কল্প যাহাদের তাহাদিগকে গৃহব্রত বলে অর্থাৎ ঘরপাগলা এই গৃহব্রতগণের মতি স্বেচ্ছায় অথবা অপরের উপদেশে কখনও কৃষ্ণপাদপদ্মে যায় না। কারণ তাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস, ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে না

পারিয়া—রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় ভোগের কামনায় নিরন্তর তত্ত্বপ্রাপ্তি চেষ্টা করে। তাহাদের বিষয় ভোগ চর্কিত চর্চণ করার জ্বায়। এই কার্যের ফলে তাহারা অন্ধতামিশ্র নরকে গমন করে, তথাপি চেতন হয় না। তাহার কারণ কি তদন্তরে বলিতেছেন,—

ন তে বিদ্যঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং ছরাশয়া যে বহিঃস্বর্গমানিনঃ ।

অন্ধা যথাকৈরূপনীয়মানাস্তেহপীশতন্ত্র্যামুরুদান্নি বদ্ধাঃ ॥ (ভাঃ ৭।৫।৩১) ।

যাহারা বাহ্য অর্থ—রূপ-রসাদিকেই পরম প্রয়োজন বোধ করে, তাহারা ছরাশয়। তাহারা স্বার্থের একমাত্র গতি অর্থাৎ পরম পরাকাষ্ঠা যে বিষ্ণু, তাহা জানে না। সুতরাং অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের জ্বায় তাহারা ঈশ্বরের বেদরূপ-রজ্জুতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ অর্থাৎ বেদের মধুপুষ্পিত কাম্যকর্মে আসক্তচিত্ত হওয়ায় শ্রীহরিপাদপদকে পরম পুরুষার্থ বোধ করে না। সুতরাং অন্ধের নির্দিষ্ট পথে গমনকারী অন্ধ বেক্রপ গর্তে কণ্টকাদিতে পতিত হইয়া দুঃখ পায়, তাহারাও তদ্রূপ কাম্য-কর্মকেই পরম প্রয়োজন বোধে কর্ম করিয়া অন্ধতমঃ নরকে (দুঃখপূর্ণ স্থানে) পতিত হইয়া থাকে।

সুতরাং শাস্ত্রের বজ্রকঠিন ভাষায় ত্রিগুণাতীত পন্থার সর্বল নির্দেশ একমাত্র শ্রীনাম কীর্তনের ব্যবস্থা নানারূপে নানায়ুক্তিতে নিয়ামকগণ প্রচার করিলেও অজ্ঞানের কর্ণগোচর হয় না। নিয়ামকগণ ভোটের কাঙ্গাল নহেন। জড়-প্রতিষ্ঠাকে তাঁহারা শূকরী-বিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। নিয়ামকশ্রেষ্ঠ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা স্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ

কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নহু মনঃ ।

সদা হং সেবস্ব প্রভুদয়িত সামন্তমতুলং

যথা তাং নিকাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সং ॥ (শ্রীমদঃশিক্ষা-৭)

সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিলেও কেন ভগবচ্চরণে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না— তদন্তরে বলিতেছেন যে, হে মন ! নির্লজ্জা স্বপচ-রমণী প্রতিষ্ঠাশা আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে। তখন নির্মল সাধু প্রেম সে হৃদয়কে স্পর্শ করিবে কেন ? তুমি প্রভুদয়িত অতুল সামন্তকে সর্বদা সেবা কর। তিনি অতি শীঘ্র সেই চণ্ডালিনীকে দূর করিতঃ নির্মল সাধু প্রেমকে তোমার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট করিবেন।

অন্য সমস্ত অনর্থ দূর হইলেও প্রতিষ্ঠাশা সহজে যায় না। সেই আশা হইতে সর্বপ্রকার কপটতা হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া পুষ্ট হয়। প্রতিষ্ঠাশা সকল

অনর্থের মূল হইয়াও দোষ স্বীকার করে না। অতএব নির্লজ্জ। যশরূপ কুকুর মাংসভোজন তৎপর বলিয়া তাহাকে স্বপচরমণী বলা হইয়াছে। স্বনিষ্ঠগণ ধার্মিক, দাতা, নিষ্পাপ ইত্যাদি পরিচয়ের প্রতিষ্ঠার আশা করিয়া থাকেন। পরিনিষ্ঠিত তত্ত্বগণ “আমি বিষ্ণুভক্ত, আমি স্বষ্ট বুদ্ধিয়াছি, আমি অনাসক্ত” ইত্যাদি রূপ কথা ঘোষনার প্রত্যাশা করেন। নিরপেক্ষ ভক্তগণ “আমি নির্মল বৈরাগী, আমি শাস্ত্রার্থ উত্তম বুদ্ধিয়াছি, আমি ভক্তি-তত্ত্বে সিদ্ধ হইয়াছি” এরূপ প্রতিষ্ঠা অন্বেষণ করেন। যে পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাশা দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত কপটতা যায় না। নিষ্কপট না হইলে নির্মল সাধু প্রেম লাভ হয় না। সেজ্ঞ প্রভুদয়িত অতুল সামন্তের সেবার কথা বলিয়াছেন। প্রভুদয়িত—শুদ্ধ কৃষ্ণদাস। তাঁহার তুলনা নাই বলিয়া অতুল। তিনি প্রভুর সেনাপতি-বিশেষ। শুদ্ধ বৈষ্ণবের হৃদয়ে হ্লাদিনী শক্তির রশ্মি প্রতিফলিত হয়। সেই শক্তি সহজে অগ্র হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া সে হৃদয়ের দৃষ্টতা দূর্বর্ষক প্রেম উৎপন্ন করেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবের আলিঙ্গন, চরণ-ধূলি, চরণামৃত, উপদেশ—সমস্তই সেই শক্তির সঞ্চারক। এই শ্লোকের অনুরূপ গীতি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় গান করিয়াছেন,—

কপটতা হৈলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পূর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে ॥
শুন মন নিগুঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা ধুষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যতকাল করিবে নর্ত্তন ॥
কাপট্য তদুপপত্তি, না ছাড়িবে মম মতি,
স্বপচিনী যাহে হয় দূর।
তদর্থ্যে যতন করি, প্রভু-প্রেষ্ঠ-পদ ধরি,
সেবা তুমি করহ প্রচুর ॥
তৈহ প্রভু সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
স্বপচিনী সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাদিয়া ॥

সুতরাং শুদ্ধ নিয়ামকগণ ভোটের বঞ্চিত হইবার ভয় রাখেন না। দুর্গত জীবকে ভগবচ্চরণে আকৃষ্ট করিবার জন্ত কাঁদিয়া থাকেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিতেছেন,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োনিপত্য

কুত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।

হে সাধবঃ সকলময়ের বিহায় দূরা-

চৈতন্ত্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥

(শ্রীচৈতন্ত্যচন্দ্রামৃতম্-৮।২০)

দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া শত শত কাকুতি মিনতি, শ্রীচৈতন্ত্যচন্দ্রের শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইবার জন্ত সকলকে প্রার্থনা করিতেছেন। ঈদৃশ পর-দুঃখ-দুঃখী মহান্ত-গণের কাতর বাক্যও মায়ামোহিত জীবের কর্ণগোচর হয় না—হৃদয় গলে না। সবই ছুঁদেব! সুতরাং বজ্রকঠিন ভাষায়ও হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয় না, স্থলঙ্গুলবৎ চিত্তবৃত্তি যথাপূর্ব্ব তথা পর। এজন্যই শ্রীতুলসীদাস গাহিয়াছেন,—

মাচ্চা কহে তো মারে লাঠ্যা বুঠা জগৎ ভুলাই।

গোরস গলি গলি ফিরে স্বর্য্য বৈঠল বিকাই ॥

চোরকো ছোড়ে সাধুকো বাঁধে পথিককো লাগাওয়ে ফাঁসি।

ধন্য কলিযুগ, তেরি তামাসা দুঃখ লাগে আউর হাসি ॥

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমন্তজিভুদেব শ্রৌতী মহারাজ

অভাব

পরিদৃশ্যমান জগতে অবিচ্ছিন্ন উপহিত জীব-মাত্রেরই ভাবধারা লক্ষ্য করিলে বেশ ভালভাবেই বোঝা যায় যে, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তীতার মধ্যে সর্বপ্রকার কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকিলেও যেন কোন অভাব তাহাদের বিশেষভাবে পীড়ন করিতেছে। পশু, পক্ষী, কীট হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য-দেবাদি পর্য্যন্ত তাহাদের স্ব স্ব অভাব সর্বতোভাবে দূরীকরণের জন্ত সর্বক্ষণ তৎপর। কিন্তু কাহার কি প্রকার অভাব তাহা বোঝা কঠিন। মনুষ্যের প্রাণীর অভাব, মনুষ্যের সহিত সর্বাংশে এক্য থাকিলেও ব্যক্ত-অব্যক্তভাবে অভাব নিরাকরণের বা দূরীকরণের জন্ত জ্ঞান-প্রাচুর্য্য মনুষ্যেই বর্তমান; কিন্তু ঐ জ্ঞান যে জ্ঞানের

দ্বারা মানুষ অত্যান্ত প্রাণী অপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়, সেই জ্ঞানের ফলস্বরূপে যাহা দেখা যায়, তাহা দ্বারা মানুষ-জ্ঞানের গরীমার কিছু আছে বলিয়া ধারণা করা যায় না। অভাবের সত্ত্বা কোথায়?

এমন একটা স্থানে জীব উপস্থিত হইয়াছে, যেখানে শান্তির লেশমাত্র নাই। অশান্তির পূতিগন্ধময় আবহাওয়ার মধ্যে লালিত-পালিত হইয়া চায় কি না শান্তি! জৈব-চিন্তের নিত্যভিলষিত শান্তির অপ্রাপ্তিহেতু সর্বসময়েই অভাব অনুভব করিয়া থাকে। জীবের তথাকথিত শান্তির প্রকারভেদ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহা অসংখ্য প্রকার—এমন কি, যাহা জীবনের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত গণনা করিয়া উঠা যায় না। বালকের শান্তি, যুবকের শান্তি, বৃদ্ধের শান্তি, পুরুষের শান্তি, স্ত্রীর শান্তি—একের সহিত অণ্ডের পার্থক্য সংরক্ষিত করিয়া চলিতেছে। যে সমস্ত বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া জীব শান্তির আশা করে, তাহাদের নিকট হইতে নিজাভিলষিত অভাব পরিপূরণের জন্ত নিজের স্বাধীনতাকেও বলিদান করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। হতভাগ্য জীব নিয়তই তাহাদেরই নিকট হইতে বঞ্চিত হইলেও তাহাদের রূপা-কটাক্ষের মধ্যে থাকিবার জন্ত জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু হায়, দুর্ভাগ্য জীব বোঝে না যে, সে যে-সমস্ত বস্তুর পশ্চাতে প্রদাবিত হইতেছে, তাহা সমস্তই শান্তিময়। সুতরাং তাহার দ্বারা শান্তির অভাব মিটাইবার সম্ভাবনা না থাকায় তাহাতে তাহার ভাগ্যে প্রতারণা ব্যতীত আর কিছু লাভ হয় না।

অভাবের জালায় জীবের চিত্ত সর্বসময়ে জলিতেছে। এই জালা নির্বাপিত হইবার উপায় একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া দেখা যায় না। গীতাতে বলিয়াছেন—

“নাসতো বিদ্বতে ভাবো নাভাবো বিদ্বতে সতঃ।

উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তুশ্চনয়োন্তুদ্বদিশিভিঃ॥” (গীতা—২।১৬)

সৎ ও অসৎ-ভেদে বস্তু দুই প্রকার, অসতে অভাব দেখা যায়, সতে অভাব নাই। যেখানে অভাব পরিদৃষ্ট হয়, সেখানে নাশ সম্ভব। এই কারণে জীব সমস্ত হইয়াও অভাবযুক্ত বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ায় চিরকালই অভাব অনুভব করিতেছে। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শরূপ বিষয় পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকে সর্বক্ষণ আকর্ষণ করিতেছে।

এই ‘বিষয়’ জীবের চরম মৃগ্যাস্বরূপ হওয়ায়, বাস্তব শান্তিপ্রদ বিষয় হইতে জীব তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে; সেইজন্ত শান্তির লেশমাত্র পাইতেছে না; কেবলই

প্রতারণিত হইতেছে। কারণ অসং বস্তুর গঠনেই কেবল বন্ধনা ছাড়া আর কিছুই নাই। আজ যে-স্বরূপ জীবের নিকট প্রকাশিত করিয়া জীবের অভাব মিটাবার ভরসা প্রদান করিতেছে, পরমুহূর্ত্তে সেই স্বরূপ পরিবর্তিত হইয়া অল্প স্বরূপে জীবের অভাবকে চির-বন্ধিত করিয়া অভাবের আঁশ্বনে দ্বিগুণ হইতেও বহুগুণে প্রজ্জ্বলিত করতঃ জীবের চিন্তকে ভঙ্গস্থূপে পরিণত করিতেছে। তাই শাস্ত্র বলেন—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্মিদেশা-

স্তেবাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ ॥

উৎসৃজ্যতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবন্ধি-

স্থামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুক্ত্যাদ্যদাস্তে ॥” (ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ২।৬)

কামাদি ষড়্‌রিপুর দাসত্বে চিরশান্তি লাভের জন্ত জীব সর্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াও শান্তির নিকট উপস্থিত হইতে পারে না, তজ্জন্তই গীতার পূর্ব্ববাক্য স্মরণ করিলে অসং বস্তুর চাহিদা পরিপূরণের জন্ত চেষ্টা না করিয়া সদ্বস্তুর অনুশীলন করিলে বাস্তব অভাব চিরতরে নিবৃত্ত হইবে। গীতা বলেন— “আঠৈঅব হ্যাত্মনো বন্ধুরাঠৈঅব রিপুরাত্মনঃ।” (গীতা—৬।৫) আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। যেখানে জীবাত্মা ঈশ-বিমুখতা লাভ করতঃ স্বেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্ত দৈবী-মায়াকে আশ্রয় করে, সেখানে চেতনের সাক্ষাৎ ক্রিয়া না থাকিলেও চিদাভাস মনের চৈতন্য-শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিষয়ের সহিত সঙ্গন্ধ স্থাপন করে; এই কারণে আত্মার বাস্তব-সত্ত্বার অনুপলব্ধাবস্থায় অপ্রাপ্ত বল চেতনের অস্বাস্থ্য লক্ষণের আত্মাভিমাত্রী মনই চির শত্রুর কার্য্য করিয়া চির অভাবের পথে টানিয়া আনে।

যেখানে “সন্ত এবাশ্চ ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥”—এই উক্তি অনুসারে সদ্বস্তুর অনুশীলনকারী সাধু-সঙ্গদ্বারা সং ও অসতের তত্ত্ব অবগত হইয়া অবিচ্ছিন্ন-উপহৃত বিরূপগ্রস্ত জীবস্বরূপে শ্রেষ্ঠ হইয়াও অনর্থ কল্পনা করিতেছে, সেখানে সাধুকুপায় নিজতত্ত্ব অবগত হইয়া আত্মার নিত্য কৃত্য—পরমাত্মার সেবা সন্নিধানে নিজেকে পৌছাইবার জন্ত কৃষ্ণ-বিমুখিনী মায়ার সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবার স্বযোগ লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। সেইস্থানে আত্মাই আত্মার বন্ধু।

স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার জন্ত জীবের অভাব। এই অভাবই জীবকে স্বভাব হইতে তফাৎ করিয়াছে। বাস্তব অভাবের অহুভূতি যেখানে, সেখানে

জীব স্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। জৈবস্বরূপে বাস্তব অভাব না থাকায় সে সর্বক্ষণ অভাব-বিহীন বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হইবার জন্ত প্রয়াসী ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, জীব এমন বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে যে—

“পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।

মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥”

এই ভাব দূরীকরণার্থ এবং বাস্তব স্বভাবের জাগরণের জন্ত জাগ্রত ব্যক্তির সঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন। গীতায় বলিয়াছেন—

“যা নিশা সর্বভূতানাং তস্মাং জাগর্তি সংযমী।

যস্মাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ ॥” (গীতা—২।৬৯)

জীব ভোগপ্রবণতাহেতু ঈশ্বরারাধনায় নিদ্রিত, আর ভোগেতে জাগ্রত, কিন্তু সংযমী পুরুষ ভোগেতে নিদ্রিত এবং ঈশ্বরারাধনায় জাগ্রত। এমন জাগ্রত পুরুষের সঙ্গদ্বারা জীবের ভোগের নেশা ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া বাস্তব অভাব নিবৃত্তি হইয়া যায়।

যেখানে ভোগ সেইখানেই অভাবের সূচনা বা তাড়না। ভগবানের সহিত জীবের স্বরূপ অবস্থায় অভাবের সূচনা বা তাড়না কোনটাই লক্ষিত হয় না। অতএব ভগবানে প্রীতি করাই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম ; এই স্বধর্ম হইতে চ্যুতি-বশতঃ জীবের দুঃখ, কষ্ট, জালা ও যন্ত্রণা। এখন যাহাতে জীবগণ তাহাদের বাস্তব অভাব দূরীকরণার্থ সাধন করিতে পারে, তজ্জন্ত এই অমূল্য জীবন—যাহা মনুষ্যাকারে লাভ হইয়াছে তাহাকে সর্বতোভাবে নিযুক্ত করা প্রয়োজন। ভগবান্ জীবের, জীব ভগবানের ; কিন্তু জীব তাহার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যে দুঃখ-কষ্ট আভব বোধ করিতেছে তাহা চিরকালের জন্ত প্রশমিত হইয়া নিত্য শান্তি, নিত্য আনন্দলাভ করিতে পারিবে ও সমস্ত অভাব দূরীভূত হইবে, যদি সে তাহার আরাধ্য বস্তুর সন্ধানের জন্ত চেষ্টাপর হয়। সেই বস্তুকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র উপায়। আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তির উন্মেষ হইলে আর কোন প্রকার অস্থবিধা থাকিতে পারে না। সেই ভক্তি-বৃত্তি জীবের স্বভাব-সিদ্ধ হইলেও তাহাকে প্রকাশ করিতে বহু বাধা-বিঘ্নকে আতিক্রম করিতে হইবে। “শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টক-ফোটি-কঙ্কঃ।” ভক্তিপথ অনুসন্ধানকারী সাধুজনের আশ্রয় গ্রহণই জীবের একমাত্র কর্তব্য। তাহা হইলে ক্রম-পর্যায়ে সমূহ বাধা-বিপত্তি দূরে সরিয়া যাইবে, ও আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তি প্রকাশিত হইবে। তখন আর অণু কোন সাধনের প্রয়োজন হইবে না।

এখন দেখা যাইতেছে, ইহ জগতে বহু প্রকারের অভাবের দ্বারা ক্লিষ্ট হইলেও বাস্তব অভাব অজ্ঞাত থাকায় অনন্ত জীবন এই প্রকারে অতিবাহিত হইয়াছে। ভগবৎ প্রাপ্তিই বর্তমান বন্ধ জীবের একমাত্র অভাব। এই অভাব মিটিলে সকল অভাবই দূরীভূত হইবে এবং পরাশাস্তির অধিকারী হইবে। ভগবৎ-সেবা ব্যতীত অগ্নাত অভাব বাস্তব অভাব নয়। এই সমস্ত প্রাকৃত অভাবই জীবকে স্বভাব হইতে চ্যুত করিয়াছে। অতএব ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ অভাব জীবের যাহাতে মিটিয়া যায় তজ্জন্ম জীবের ঐকান্তিক সাধনের প্রয়োজন।

—শ্রীভক্তিকুমুদ সন্ত

অযোধ্যায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

প্রতি বৎসরই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে যে যে তীর্থস্থানে পরিক্রমা ও উৰ্জ্জ্বলত পালিত হয়, তত্তৎস্থানে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব বিরাটভাবে পালিত ও অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পূর্ব বৎসরে শ্রীব্রজমণ্ডলে, শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডলে, শ্রীকালীধামে, শ্রীবৈষ্ণবনাথ-ধামে ও শ্রীদ্বারকা-ধামে উক্ত মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সূসম্পন্ন হইয়াছে। এ বৎসরও উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগুস্বামী শ্রীশ্রীমহাক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের আনুগত্যে ও নির্দেশে শ্রীঅযোধ্যা পরিক্রমাকালে গত ৫ই কার্তিক, ২২শে অক্টোবর শনিবার দিবস শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব বিপুলভাবে ও সূচাকরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অবশ্য এই উৎসব উক্ত সমিতির অগ্নাত শাখা-মঠ সমূহেও যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা পরে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিব। এস্থলে শ্রীঅযোধ্যা-ধামে উক্ত মহোৎসব ও অনুষ্ঠানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্রাহ্মমূহূর্ত্ত হইতে মঙ্গলারাত্রিক, কীর্ত্তন প্রভৃতি নিয়মসেবার দৈনন্দিন সেবা-পঞ্জী যথারীতি স্বর্গুভাবে পালিত হইবার পর শ্রীপরিক্রমা-সভ্যের নিয়ামক মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তদ্বিবসের বিশেষ কৃত্য শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসবের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করেন। এতদ্ব্যতীত স্বামোজী মহারাজের কয়েকজন একনিষ্ঠ সেবক

ও গুজরাট দেশীয় কয়েকটা শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়ের নিকট ‘অন্নকূট’ সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত নিম্নে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইল :—

অন্ন ও প্রসাদ সম্বন্ধে শাস্ত্র ও বেদান্তের বিচার

শ্রুতিতে “অন্নং বৈ ব্রহ্ম” মন্ত্রে অন্নকে ব্রহ্মবস্তু বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। শ্রুতার্থ্য বিদ্বদ্রুটি-বৃত্তিতে উপলব্ধি করিতে হয়। সাধারণ রুচি “অন্ন” শব্দ বলিলে যাহা লক্ষ্য করে, সেই বিচার গ্রহণ করিলে আমাদের গায় বদ্ধজীবের বহির্শ্মুখতা ও ভোগবুদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি হইতে জ্ঞাত ‘অন্ন’ কখনও ‘ব্রহ্ম’ হইতে পারে না। “ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।” শ্রীহরিকে নিবেদিত অন্ন ব্রহ্মের গায় নির্বিকার এবং সাক্ষাৎ বিষ্ণুসদৃশ। অপ্রাকৃত বস্তুই ব্রহ্ম। শব্দরূপেই তাহা কর্ণের দ্বারা গ্রহণীয়। তজ্জন্ত তাহাকে শব্দ-ব্রহ্ম বলা হয়। স্তবরাং ‘অন্নং ব্রহ্ম’ বলিলে হরিকথাই—অন্ন, তাহা আত্মার পুষ্টি, তুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকে। হরিকথা-রূপ চিন্ময় অন্ন গ্রহণে আত্মা বিকশিত ও সঞ্জীবিত হয়। তাহাই সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রসাদ। হরিকথাকেই আমরা ভগবৎ প্রসাদ বলিয়া লক্ষ্য করিতে পারি। সেই হরিকথা-রূপ অন্নই ব্রহ্ম। হরিকথাই স্বয়ং হরিবস্তু। ‘ব্রহ্ম’ শব্দের শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সম্মত অর্থে একমাত্র বিষ্ণুই লক্ষিত হন। আমাদের পূর্ব পূর্ব মহাজনগণ ও গুরুবর্গ সেই হরিকথা-রূপ অন্নের কূট বা পর্বত রচনা করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নব-নবায়মানভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণের উল্লাস বর্দ্ধন অর্থাৎ গো-বর্দ্ধন ও তাঁহার পূজা করিয়াছেন। আজ শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসবের এই শুভ তিথিতে তাঁহাদের গুণকীর্তন করাই আমাদের একমাত্র কৃত্য।

গোবর্দ্ধন-তত্ত্বের আলোচনা

স্বামীজী মহারাজ আলোচনামুখে আরও বলেন যে, শ্রীগোবর্দ্ধন হরিদাস-বর্ষা। আশ্রয়-বিগ্রহ হইলেও ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাকে বিষয়-বিগ্রহরূপে দর্শন করেন। গোবর্দ্ধনশিলা সাক্ষাৎ গণ্ডকী শিলার গায় পূজিত হইয়া থাকেন। গোবর্দ্ধন-ধারী ও গোবর্দ্ধন একই বস্তু। অসমোদ্ধরূপে কৃষ্ণকাম বা কৃষ্ণপ্রীতি যাহা নিরন্তর নব-নবায়মান হইয়া বর্দ্ধিত—তাহাই গোবর্দ্ধন। ইন্দের গায় শ্রেষ্ঠ দেবদেবীর পূজা অপেক্ষা গোবর্দ্ধনের পূজাই সর্বতোভাবে করণীয়—ভাগবতের ইহাই শিক্ষা—ইত্যাদি।

শ্রীল নরোত্তমানন্দ প্রভুর পাঠ

বেলা অনুমান ১০ ঘটিকার সময় পুনরায় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্তনান্তে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য চতুর্থ অধ্যায় হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের স্বপ্ন-সমাধিতে 'বৃজ'-স্থাপিত গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপাল-দেবের সন্ধান, নিবিড় জঙ্গল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার ও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনে প্রতিষ্ঠা, শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব এবং শ্রীপুরীপাদের অতিমর্ত্য চরিত্রাবলী পাঠ করেন। রাত্রেও পণ্ডিতজী শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ, চতুর্বিংশ অধ্যায়-বর্ণিত ব্রজের নন্দাদি গোপগণের শ্রীকৃষ্ণদেশে ইন্দ্রপূজার পরিবর্তে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা, কুপিত ইন্দ্রের ঝড়-বৃষ্টিদ্বারা প্রতিশোধ লইবার আশ্রয় চেষ্টা, বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন উত্তোলনপূর্বক সপ্তাহকাল ধারণ ও তদাশ্রিত ব্রজবাসিগণকে তন্নিম্নে আশ্রয় প্রদান, স্বীয় মৃত্যু অবগত হইয়া চূর্ণীকৃত-দর্প ইন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আগমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা ও স্তব প্রভৃতি বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বিধান করেন।

শ্রীঅন্নকূটের আয়োজন

এদিকে নিয়ামক মহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেবা-চেষ্টা বিষয়িনী উৎসাহপূর্ণ বাণীতে উৎসাহিত হইয়া পরিক্রমায় যোগদানকারী মঠের আশ্রিত সেবক ও অন্তগতা সেবিকাগণ পূর্ব হইতেই শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসবের বহুবিধ বিচিত্র নৈবেদ্য-সম্ভার অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত করিতেছিলেন। নৈবেদ্য প্রস্তুতের সময় শুষ্ক, অর্দ্ধশুষ্ক, অশুষ্ক বিবিধ ইন্ধনের প্রচণ্ড ধূম চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইতে দেখিয়া বিরাট রাজহুয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু এই ভোগরন্ধন-যজ্ঞ শত রাজহুয়-যজ্ঞ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ— ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে আমরা শ্রীঅন্নকূট মহোৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিব। মঠাশ্রিত ভক্ত ও মহিলাগণ তাঁহাদের স্ব স্ব দেশে প্রচলিত ও রুচিপ্রদ বিবিধ ভোগ-সামগ্রী প্রস্তুত করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত শ্রীগিরিধারী ও শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রিয় ভোজ্য বস্তু এই অন্নকূটে যথাসম্ভব প্রস্তুত হইয়াছিল। যথাসময় শ্রীঅন্নকূট মহোৎসবের ভোগ-সামগ্রী প্রস্তুত হইলে লক্ষণ কিলার (লচ্‌মন কিলার) মূল মন্দিরের পার্শ্বস্থিত কক্ষে শ্রীমন্নহাপ্রভুর সিংহাসনের সম্মুখে যাবতীয় নৈবেদ্য-সম্ভার পুষ্প-মলিকার ভাষায় স্ফুজলে সংরক্ষিত হয়। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর অন্নকূট মহোৎসবের অনু-

সরণে অন্নস্তূপের চতুর্পার্শ্বে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ধাতু ও মৃন্ময় পাত্রাদিতে খেচরান্ন, পুষ্পান্ন, পরমান্ন, মালপো, রুটী, পুরী, লুচি, ফলমূল, বিভিন্ন ব্যঞ্জন, পিঠাপানা, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সর, ছানা, মাখন প্রভৃতি সজ্জিত করা হয়। বহুবিধ বিচিত্র ভোগ-সামগ্রীতে ভোগ-মণ্ডপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য, নৈবেদ্যসকল পুষ্প ও পুষ্পমালাদ্বারা সুশোভিত করা হয় এবং প্রচুর তুলসীপত্রদ্বারা নিবেদিত হয়। দুই শতাধিক ভোগ-সামগ্রী ক্রমপর্যায়ে সুসজ্জিত হওয়ায় এক অপূর্ব রমণীয় দৃশ্য হইয়াছিল।

শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের শঙ্কর ও অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সুসজ্জিত সিংহাসনোপরি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিজয়-বিগ্রহ নানাবিধ স্বর্ণ-রৌপ্যাদি অলঙ্কার ও সুগন্ধি পুষ্প-মালিকা-বিভূষিত হইয়া দর্শকগণের চিত্তাকর্ষণ করিতেছিলেন। সিংহাসন, শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তর, শ্রীমন্দিরের প্রধান প্রবেশ-পথ ও জগমোহন প্রভৃতি বিচিত্রবর্ণের পতাকা, দেবদারুপত্র, নানাপ্রকার পুষ্প ও আম্রপল্লবাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। সর্বপ্রকার নৈবেদ্য-সম্ভার সজ্জিত হইলে শ্রীগিরিধারী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চনাস্ত্রে ভোগারতি কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাজ-গাঙ্গার্কিকা-গিরিধারীর বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্বাটিত হইয়া আরাত্রিকাদি সম্পন্ন হয়। এই সময়ে দর্শনার্থীদের অত্যধিক ভীড় হওয়ায় সকলেরই আগমন-নির্গমনের ব্যাঘাত হইতে থাকে। কখন মন্দিরের দ্বার উদ্বাটিত হইবে এবং শ্রীঅন্নকূট দর্শন করিবেন—এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহারা বহুক্ষণ যাবৎ ব্যগ্রভাবে উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন। এতক্ষণে দর্শন লাভ করিয়া যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। লক্ষণ কিলার মোহান্ত-মহারাজ তাঁহার ম্যানেজার, অনুগত শিষ্য-প্রশিষ্যাди সঙ্গে লইয়া স্বয়ং অন্নকূটের এইরূপ বিরাট আয়োজন দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত ও চমৎকৃত হন। ঐতিদেশীয় ভক্তগণ পূর্বে এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব শ্রীঅন্নকূট মহোৎসবের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিপুল আয়োজন কখনও দর্শন করেন নাই। তাঁহারা প্রত্যেকেই ইহা দর্শন করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন। বেলা ৩টা পর্য্যন্ত দর্শনার্থিগণকে শ্রীঅন্নকূট দর্শনের সুযোগ দেওয়া হয়। পরে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। উপস্থিত দর্শনার্থী নর-নারী—আহূত, অনাহূত, বরাহূত সকলকেই অন্নকূটের বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দীন-দুঃখী, দরিদ্রগণও ইহা হইতে বাদ যায় নাই। সকলেই শ্রীঅন্নকূট দর্শন ও মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া আপনাদিগকে ধন্যতিক্ষণ মনে করিয়াছেন। কিঞ্চিদধিক দুইশত প্রকার বিচিত্রভোগ নিবেদন

করা হয়। পাঠকবর্গের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্ত পরে তাহার তালিকা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

—প্রকাশক

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ

বিরহে আলোচ্য বিষয়

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১ই ডিসেম্বর, শুক্রবার শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদের বিরহ-দিবসে শিষ্যের কি কর্তব্য, তাহা স্থির হওয়া আবশ্যক। স্মার্ত্ত-বিধানের ক্রিয়া-কলাপ বৈষ্ণব-রীতি অনুসারে যতদূর যাহা করা প্রয়োজন, তাহা সকলেই অবশ্য করিবেন ও করিয়া থাকেন। আমরা বর্ত্তমানে সে বিষয়ে অধিক আলোচনা না করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মনো-ভীষ্টের কথা সকলকেই স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। বিশেষতঃ এই দুর্ভাগ্যের বিরহ-তিথির কথা স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয়ে যে বিষয়টি সর্ব্বতোভাবে জাগরুক হইতেছে, তাহারই দুই একটি কথা আন্তি-নিবেদনস্বরূপ জ্ঞাপন করিতেছি। সাধারণতঃ বিরহে সাস্তুনার আবশ্যক। বিরহ-ব্যথিত হৃদয় সাস্তুনা পাইলে সঞ্জীবিত থাকে। নচেৎ পুনঃ পুনঃ বিরহ-যাতনা তাহাকে দশম-দশায় উপনীত করায়। যিনি যতটা পরিমাণ শ্রীগুরুপাদপদে আসক্তচিত্ত ছিলেন, তিনি তত-টুকুই তাঁহার বিরহ অনুভব করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বঞ্চনা লীলা

শ্রীগুরুপাদপদ আমাদের দ্রবস্থা এবং স্বাতন্ত্র্যের প্রতি আঘাত না করিয়া সকলের স্বাভাবিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শিক্ষাভিমানিকে কৃপা করিয়া বঞ্চনা করিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া শ্রীগুরুদেবের অসমোদ্ধ দূরদর্শিতার কথা চিন্তা করিয়া তাঁহারই শ্রীপাদপদে চির-বিক্রীত হইতেছি। যাহারা একান্তই বঞ্চিত হইতে ইচ্ছুক, শ্রীগুরুদেব তাহাদিগকে কি করিতে পারেন? স্বতন্ত্রতায় হাত দিলে জৈব-সত্ত্বার প্রতি কশাঘাত করা হয়। ইহা ভগবদ্দিছার একান্ত বিরুদ্ধ। সুতরাং ভগবৎ-সেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী শ্রীগুরুপাদপদে ভগবদ্দিছার বিরোধ অস্বাভাবিক। তথাপি বঞ্চনাদ্বারাও অল্পগতজনকে কৃপা করিয়া তিনি 'কৃপা-বারিধি' নামের সার্থকতা করিয়াছেন। এইরূপ বঞ্চনার গুঢ়-রহস্য অনুধাবন করিবে কে? পার্থিব-বস্তুর ভোগবাসনায় প্রমত্ত আমা-দের হৃদয়ের গতিরোধ করিবার সর্ব্বোত্তম উপায়—“বঞ্চয়েৎ দ্রবিশাদিভিঃ”

শ্রীগুরুদেবের অর্থে ও দ্রব্যে আমাদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তিকে আজ তাঁহার বিরহাগ্নিতে ভস্মীভূত করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে তিনি আমাদের প্রচুর দ্রবিণাদি দ্বারা রূপা করিয়াছেন। আজ তাঁহার অপ্রকটে তাহা লাভের ব্যাঘাত হওয়ায় বিরহ-যাতনা অধিক বলিয়া মনে হইয়া থাকে। এইরূপ বিরহ অপেক্ষা ‘শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের যে শিক্ষা দান করিতেন, সেই শিক্ষা লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।’ এইরূপ অভাব অনুভূতি উন্নততর বিরহ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের পারমহংস্য উক্তি

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হৃদয়ের দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া প্রচুর প্রতিষ্ঠায় বিভূষিত করিয়া আমাকে সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাসুচক উৎসাহ-বাণী আমার মানস-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর হওয়ায়, দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে তাঁহার ঐকরূপ বাণী আকঙ্ক্ষা করিয়া আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইয়া লইয়াছি। শুধু তাহাই নহে, মূঢ় মন শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেই বঞ্চনামূলক উৎসাহ-বাণীর উদ্দিষ্ট-বস্তু বলিয়া নিজেকে জ্ঞান করিয়া দস্তের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। ইহাতে আমি শ্রীমন্নহা-প্রভুর শিক্ষা—“তৃণাদপি” শ্লোকের সমাধি দান করিয়াছি। শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্য মূর্ত্ত-স্বরূপে “যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ ক্ষুরে”—বাক্যের সার্থকতা নিত্য বর্ত্তমান। ‘যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে কালিন্দী’—শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইহা স্বভাব। তজ্জন্ম আমাদের হ্রায় পৃতিগন্ধময় পার্শ্ব-জগতের যাবতীয় আবর্জ্জনযুক্ত নদী-নালা মহাভাগবতের দৃষ্টিতে পরম পবিত্র কালিন্দীস্বরূপ দৃষ্ট হইলেও আমরা তাহাকে কালিন্দী বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমার হৃদয়ের ময়লা আমি সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত আছি। যে-কোন শৈলই গিরি গোবর্দ্ধন নহে। আমার দস্ত-রূপ অত্যাচ্ছ প্রস্তরসদৃশ শৈলকে মহাভাগবত গোবর্দ্ধন দর্শন করিলেও আমার পক্ষে তাহা গোবর্দ্ধন নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রচুর প্রশংসা করিয়া আমার উন্নতি সাধনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। আমি তাঁহার হৃদয়ের গূঢ়তম অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া তাহাতেই স্ফীত হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট উহার দাবী করিতেছি। তাঁহার অবর্ত্তমানে সেই স্তব-স্তুতি-মূলক বাক্য শ্রবণ করিয়া মনরূপ ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের তর্পণ হইতেছে না ভাবিয়া বিরহ অনুভব করিতেছি। কিন্তু আজ শ্রীল প্রভুপাদের ভূ-কম্পিত কঠোর বজ্র-গম্ভীর শিক্ষা-বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া আমার দস্তশৈলের বিনাশসাধন করাই বিরহ-দিবসের কর্তব্য।

শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাসার

শ্রীল প্রভুপাদ সিংহ-স্বরে বজ্রদণ্ডে হংকম্প-ভাষায় আমাদেরকে যে-সমস্ত শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি প্রধান শিক্ষা আজ আমার হৃদয়ে জাগরুক হইতেছে। আমাদের ভবিষ্যৎ দুর্দ্দেবের কথা চিন্তা করিয়া আমাদের উদ্ধারের জন্ত সাধন-মার্গের উন্নততম শিক্ষাসমূহের তাঁহার অগ্রতম শিক্ষা—সাধু-বৈষ্ণব সঙ্গে থাকিয়া হরিনাম কীর্তনের দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করা। ভজন বলিতে কৃষ্ণকীর্তনই একমাত্র ভজন। ইহাই শ্রীরূপ-রঘুনাথের শিক্ষা। গোপনে তথাকথিত নির্জনে বসিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাকে কখনই ভজন বলিয়া শাস্ত্রকারগণ শিক্ষা দেন নাই। ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পরায়ণ প্রতিষ্ঠাকামী অলস ব্যক্তিসকল ভজন কাহাকে বলে জানিতে না পারিয়া, হরিনামের পরিবর্তে অন্ধকূপ-সদৃশ গৃহের কোণে বসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় ‘কাছি টানাকে’ই হরিনাম বলিয়া মনে করিয়া অধঃপতিত হইতেছে। কৃষ্ণ-শক্তির অভাবহেতু দুর্বলতাবশে অলস ব্যক্তিসকল কৃষ্ণসেবা-তৎপর গুরুদাস্তকে কর্ম বলিয়া মনে করিয়া, শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-দিবসে তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতেছে। কর্ম ও ভক্তির তারতম্য তাহারা বুঝিতে পারে না। সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণসেবা যদি কর্ম হয়, তাহা হইলে সর্বেন্দ্রিয়ের পক্ষাঘাত হওয়াই কি ভগবদ্ভক্তি? আজ শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিতে হৃদয়-দৌর্বল্যাগ্রস্ত প্রতিষ্ঠাকামী জীবসমূহেব গুরুদ্রোহীতার কথা স্মরণ করিয়া হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ ‘নির্জন’ বলিতে দুর্জন-সঙ্গ ত্যাগ ও সজ্জনসঙ্গ গ্রহণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ‘নির্জন’ শব্দের যে-কোন অর্থই শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যুক্তিবিরুদ্ধ ও শ্রীগুরুপাদপদ্যের মনোভীষ্ট প্রচারের বিরুদ্ধ। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রার্থনা—আপনারা ঐ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আন্তরিক ইচ্ছার প্রতিকূল আচরণ না করিয়া অমূল্যভাবেই তাঁহার মনোভীষ্টের সহায়ক হইবেন। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের মঙ্গল বিধানার্থ তাঁহার যে মনোভীষ্ট উপদেশ-গীতি সংরক্ষণ করিয়াছেন, আজ সেই গীতিটাই এই বিরহ-তিথি বাসরে আমাদের একমাত্র জীবাতু হউক। (ক্রমশঃ)

পরিপ্রশ্নমূলক পত্রদ্বয়

(১) মোক্তার মহাশয়ের পত্র

Sewri, 4th August, '49.

শ্রীশ্রীভাগবতচরণে অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্বক নিবেদন—

পরম পূজনীয় শ্রীল কেশব মহারাজ ! আপনার প্রেরিত শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা-খানি পাঠ করিয়া পরমোপকৃত ও পরমানন্দিত হইয়াছি। এইরূপ জগন্মঙ্গল-কারিণী শ্রীপত্রিকা জগতে দুর্লভ ও মঙ্গলাকাজী ব্যক্তিমাত্রেরই পাঠ্য, সন্দেহ নাই। 'উত্তমাভক্তি' প্রবন্ধটি যে-সংখ্যায় বাহির হইয়াছে তাহা আমি পাই নাই। দয়া করিয়া পাঠাইতে প্রার্থনা।

স্মার্তগণের মতে অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশী করণীয় হইলেও তাহা অশাস্ত্রীয় এবং তৎপরদিন একাদশী করা বিধি—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত, এই কথা শুনিয়াছি। এ সম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ শাস্ত্র-বিচার আপনার শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিলে আমরা সকলেই উপকৃত ও সুখী হইব। আশা করি কৃপা করিয়া আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। আপনি আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

কৃপাভিক্ষু—শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায় (মোক্তার),
সিউরী (বীরভূম)।

(২) অধিকারী মহাশয়ের পত্র

প্রপূজ্য শ্রীপাদ কেশব মহারাজ,—

আপনার প্রকাশিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার কয়েক সংখ্যা এই বালিয়াটী মঠে দেখিলাম। আপনি কৃপা করিয়া আমার নিম্নলিখিত এই প্রশ্ন কয়টির উত্তর শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বিশেষ বাঞ্ছিত হইব। প্রকাশিত পত্রিকার এক সংখ্যা বালিয়াটী মঠে পাঠাইলে আমি দেখিতে পারিব। নিবেদন ইতি—

প্রশ্ন :—১। গুরুকরণের প্রয়োজন কি ?

২। গুরুকরণ না করিলে জীবের কি ক্ষতি হয় ?

৩। গ্রন্থ দেখিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিলেই বা দোষ কি ?

৪। স্ত্রী-গুরু ও পুরুষ-গুরুর মধ্যে তারতম্য আছে কিনা ?

৫। কুলগুরু পরিত্যাগ করিলে কি হয় ?

শ্রীগৌড়ীয় সেবক—শ্রীবিনোদবিহারী অধিকারী,
গ্রাম—বালিয়াটী (ঢাকা)।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ক্ষে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম । অত্র ধর্ম সৃষ্টরূপে পালে যেই জন ।
অধোক্ক্ষে অহৈতুকী ভক্তি বিষ্মশূঢ় ॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১ম বর্ষ } ক্ষীরোদশায়ী, ১০ মাঘ, ৪৬৩ গৌরাদ
শনিবার, ৩০ পৌষ, ১৩৫৬ ; ইং ১৪।১।৫০ { ১১শ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরহদশকম্

(ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-মহারাজ-কৃতম্)

হা হা ভক্তিবিনোদঠকুর ! গুরো ! দ্বাবিংশতিস্তে সমা
দীর্ঘাদুঃখভরাদশেষবিরহাদুঃস্থীকৃতা ভূরিয়ম্ ।
জীবানাং বহুজন্মপুণ্যানিবহাকৃষ্টো মহীমণ্ডলে
আবির্ভাবকৃপাং চকার চ ভবান্ শ্রীগৌরশক্তিঃ স্বয়ম্ ॥১॥

দীনোহং চিরছুক্‌তিন্‌হি ভবংপাদাজ্জধূলিকণা-
 স্নানানন্দনিধিঃ প্রপন্নশুভদং লব্ধুং সমর্থোহভবম্ ।
 কিস্তৌদার্য্যগুণাত্তবাতিযশসঃ কারুণ্যশক্তিঃ স্বয়ম্
 শ্রীশ্রীগৌরমহাপ্রভোঃ প্রকটিতা বিশ্বং সমগ্রহীং ॥২॥

হে দেব ! স্তবনে তবাখিলগুণানাং তে বিরঞ্চাদয়ে
 দেবা ব্যর্থমনোরথাঃ কিমু বয়ং মর্ত্যাদমাঃ কুর্স্মহে ।
 এতন্মো বিবুধৈঃ কদাপ্যতিশয়ালঙ্কার ইত্যুচ্যতাং
 শাস্ত্রেষেব 'ন পারয়েহহ'মিতি যদগীতং মুকুন্দেন তৎ ॥৩॥

ধর্ম্মশর্ম্মগতোহজ্ঞতৈব সততা যোগশ্চ ভোগাত্মকো
 জ্ঞানে শূন্যগতির্জপেন তপসা খ্যাতির্জিঘাংসৈব চ ।
 দানে দান্তিকতাহনুরাগভজনে ছুষ্টাপচারো যদা
 বুদ্ধিঃ বুদ্ধিমতাং বিভেদ হি তদা ধাত্রা ভবান্‌ প্রেষিতঃ ॥৪॥

বিশ্বেহস্মিন্‌ কিরনৈর্ঘথা হিমকরঃ সঞ্জীবয়নোষধী-
 নক্ষত্রাণি চ রঞ্জয়ন্নিজশুধাং বিস্তারয়ন্‌ রাজতে ।
 সচ্ছাত্রাণি চ তোষয়ন্‌ বুধগণং সম্মোদয়ন্তে তথা
 নূনং ভূমিতলে শুভোদয় ইতি হ্লাদো বহুঃ সাহিত্যম্ ॥৫॥

লোকানাং হিতকাম্যয়া ভগবতো ভক্তিপ্রচারস্তুয়া
 গ্রন্থানাং রচনৈঃ সতামভিমতৈর্নানানিধৈর্দর্শিতঃ ।
 আচার্য্যৈঃ কৃতপূর্ব্বমেব কিল তদ্ভামানুজাতৈবুঁধৈঃ
 প্রেমাস্তোনিধিবিগ্রহস্য ভবতো মাহাত্ম্যাসীমা ন তৎ ॥৬॥

যদ্ধান্নঃ খলু ধাম চৈব নিগমে ব্রহ্মোতি সংজ্ঞায়তে
 যস্ত্যাংশস্য কলৈব দুঃখনিকরৈর্ঘোগেশ্বরৈর্মুগ্যতে ।
 বৈকুণ্ঠে পরমুক্তভৃঙ্গচরণো নারায়ণো যঃ স্বয়ম্
 তস্ত্যাংশী ভগবান্‌ স্বয়ং রসবপুঃ কৃষ্ণো ভবান্‌ তৎপ্রদঃ ॥৭॥

সৰ্ব্বাচিন্ত্যময়ে পরাংপরপুরে গোলোক-বৃন্দাবনে
 চিল্লীলারসরঙ্গিনী পরিবৃত্তা সা রাধিকা শ্রীহরেঃ ।
 বাৎসল্যাদিরসৈশ্চ সেবিত-তনোমাধুৰ্য্যসেবাসুখং
 নিত্যং যত্র মুদা তনোতি হি ভবান্ তদ্ধামসেবাশ্রদঃ ॥৮॥

শ্রীগৌরানুমতং স্বরূপবিদিতং রূপাগ্রজেনাদৃতং
 রূপাঠেঃ পরিবেশিতং রঘুগণৈরাশ্বাদিতং সেবিতম্ ।
 জীবাঠৈরভিরক্ষিতং শুক-শিব ব্রহ্মাদি-সম্মানিতং
 শ্রীরাধাপদসেবনামৃতমহো তদাতুমীশো ভবান্ ॥৯॥

ক্বাহং মন্দমতিস্থতীবপতিতঃ ক্ব হং জগৎপাবনঃ
 ভো স্বামিন্ কৃপয়াপরাধনিচয়ো নূনং হয়া ক্ষম্যতাম্ ।
 যাচেহং করুণানিধে! বরমিমং পাদাজমূলে ভবৎ-
 সৰ্ব্বস্বাবধি-রাধিকা-দয়িত-দাসানাং গণে গণ্যতাম্ ॥১০॥

শ্রীভক্তিবিনোদবিরহদশকের অনুবাদ

হা হা! ভক্তিবিনোদ ঠাকুর! হে পরমগুরো! এই দ্বাবিংশবর্ষকাল
 দীর্ঘদুঃখময় আপন অপরিসীম বিরহে এই পৃথিবী দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। জীব-
 গণের বহুজন্ম-স্বকৃতিপুঞ্জদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌরশক্তি আপনি স্বয়ং এই
 ভূমণ্ডলে রূপাপূর্বক আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥১॥

আমি দীন ও অতি দুষ্কৃতি, তজ্জগুই আর পাদপদ্মধূলিকণায় স্নানানন্দরূপ
 প্রাপন্নঙ্গলপ্রদ নিখিলাভ আমার ভাগ্যে ঘটিল না। কিন্তু আপনার উদারতাগুণে
 মহাপ্রভু শ্রীগৌরানন্দের করুণাশক্তি স্বয়ং মহাযশা আপন হইতে প্রকাশিত হইয়া
 এই বিশ্বকে অহুগ্রহ দান করিলেন (অর্থাৎ বিশ্বের অন্তর্গত হওয়ায় আমি
 তাঁহার অহুগ্রহ প্রাপ্ত হইলাম) ॥২॥

হে দেব! আপনার নিখিল গুণরাশির (সুস্থভাবে) স্তব করিতে যখন সেই
 ব্রহ্মাদি দেবগণও ব্যর্থমনোরথ হন, তখন অধম মহুগুমাত্র আমাদের কা কথা।
 এই উক্তিকে পণ্ডিতগণ কখনও অতিশয়ালঙ্কার বলিবেন না। কারণ ভগবান্

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই (তোমাদের ভক্তির প্রতিদান দিতে) “আমি পারি না” বলিয়া শাস্ত্রসমূহে সেই প্রসিদ্ধ গান গাহিয়াছেন ॥৩॥

যে সময়ে ধর্ম চর্চাবিচারময়, অজ্ঞতাই সাধুতা এবং যোগ ভোগাভিসন্ধি-মূলক—যখন জ্ঞানাত্মশীলনে শূন্যমাত্র গতি এবং জপ ও তপস্কার যশঃ ও পরহিংসাই অব্বেষণের বিষয়—যখন দানে দান্তিকতার অন্তর্শীলন এবং অহুসারগ ভক্তির নামে ঘোরতর পাপাচার প্রভৃতি বিচার বুদ্ধিমান জনগণেরও বুদ্ধিভেদ ঘটাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে বিধাতাকর্তৃক আপনি প্রেরিত হইলেন ॥৪॥

এই বিশ্বে হিমকর চন্দ্র যেরূপ কিরণসমূহ দ্বারা ওষধি সকলকে সঞ্জীবিত ও তারাগণকে রঞ্জিত করিয়া নিজ জ্যোৎস্নামৃত বিস্তার করিতে করিতে শোভা পাইতে থাকেন, তদ্রূপ শুদ্ধ শাস্ত্রসমূহের (অন্তর্শীলনদ্বারা) তোষণ এবং পণ্ডিত গণের (শ্রীত সিদ্ধান্তদ্বারা) পূর্ণানন্দ বিধান করিয়া নিশ্চিতই এই পৃথিবীতে আপনার শুভোদয় । ইহাতে সাত্ত্বতগণের স্বেথের সীমা নাই ॥৫॥

লোকসমূহের কল্যাণার্থে আপনি বহু গ্রন্থের রচনা দ্বারা এবং সাধুসম্মত নানাবিধ উপায়ে শ্রীভগবন্তুক্তি প্রচার প্রদর্শন করিয়াছেন । শ্রীরামাহুজ প্রভৃতি মনীষিগণ ও অন্যান্য অনেক আচার্য্যও এই প্রকার কার্য্য পূর্ব্বকালে করিয়াছেন, এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় । কিন্তু প্রেমামৃত-মূর্ত্তিরূপ আপনার মাহাত্ম্যসীমা তাহাতেই (আবদ্ধ) নয় ॥৬॥

যাঁহার চিদ্রামের জ্যোতির্মাত্র ‘ব্রহ্ম’ সংজ্ঞায় বেদে সংজ্ঞিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশাংশের অংশমাত্র যোগেশ্বরগণ বহুদুঃখ স্বীকার করিয়া অব্বেষণ করেন, পরমমুক্তকুল যাঁহার পাদপদ্মে মধুকরস্বরূপে শোভমান, সেই পরব্যোমনাথ সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণেরও যিনি অংশী স্বয়ং ভগবান্ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহাকেই আপনি প্রদান করেন ॥৭॥

সর্ব্বপ্রকারে অচিন্ত্য গুণময় পরব্যোমের পরমোচ্চ প্রদেশে গোলোক নামক শ্রীবৃন্দাবনধামে, যেখানে সখীজনে পরিবৃত্ত হইয়া সেই চিন্ময়লীলারস-বিলাসিনী শ্রীমতী রাধিকা বাৎসল্যাদি-রসচতুষ্টয়সেবিত-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যরসময় সেবাসুখ নিত্যকাল পরমানন্দের সহিত বিস্তার করিতেছেন, আপনি সেই ধামের সেবা প্রদান করিতে পারেন ॥৮॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের অহুজ্জালক শ্রীস্বরূপ দামোদর যাহার মর্ম্মজ্ঞ, শ্রীসনাতন গোস্বামী যাহার আদরকারী, শ্রীরূপপ্রমুখ রসতত্ত্বাচার্য্যগণ যাহা পরিবেশন করিতেছেন, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রমুখ যাহা আশ্বাদন ও সমৃদ্ধ করিতেছেন,

শ্রীজীবপ্রভু প্রভৃতি যাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন এবং শ্রীশুক, দেবাদিদেব মহাদেব ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি যাহা (দূর হইতে) সম্মান করিতেছেন— অহো সেই শ্রীরাধাপদপরিচর্য্যারসামুত—তাহাও দান করিতে আপনি সমর্থ ॥৯॥

কোথায় আমি মন্দমতি, অতি পতিতজন, আর কোথায় আপনি জংগ-পাবন মহাজন ! হে প্রভো ! কৃপাপূর্ব্বক (এই স্তবকারী) আমার অপরাধ সমূহ আপনি নিশ্চিতই ক্ষমা করিবেন । হে করুণাসাগর ! আপনার পাদপদ্ম-মূলে এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীবার্হভানবীদয়িতদাস-গোষ্ঠীমধ্যে আমাকে গণনা করিয়া কৃতার্থ করুন ॥১০॥

শ্রীমধ্বমুনি চরিত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা, ৩৬৯ পৃষ্ঠার পর)

মধ্বাচার্য্য ঋতুরাজ বসন্তের অবতার নহেন

আদিত্যপুরাণ নামে এক উপপুরাণের মধ্যে ৪০ চত্বারিংশ অধ্যায়ে কোন বৈষ্ণব-বিরোধী নির্বিশেষবাদী স্বীয় ষড়্‌রিপুর চাকল্যে মধ্বাচার্য্য সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত চিত্র প্রতিকলিত করিয়া নিজ ঘৃণিত স্বার্থের পরিপোষণ করিয়াছেন । তাঁহার কল্পনা শ্রীমধ্বাচার্য্যকে ঋতুরাজ বসন্তের অবতার বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে ।

শ্রীমধ্বাচার্য্য বৈকুণ্ঠ-বায়ুর অবতার

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মপণ্ড চতুর্থ অধ্যায়ের নিদর্শন মত আমরা দেখিতে পাই যে, বৈকুণ্ঠ-ধাম এবং গোলোক-ধাম উভয় নিত্যশ্রয়ই বায়ু কর্তৃক ধৃত আছে । যেমন দেবীধামে বায়ু মরুতাথ্য দেব বলিয়া পরিচিত, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠে বায়ুদেব বৈকুণ্ঠ-ধারণ সেবায় সর্বদা নিযুক্ত আছেন । বলা বাহুল্য, জড়ের বায়ু বা দেবলোকের মরুদেব বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত বায়ুদেবের সহ তুল্য নহে ।

বৈকুণ্ঠং পদম* ধাম জরা-মৃত্যুহরং পরং ।

বায়ুনা ধার্য্যমাণঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাদৃদ্ধমুত্তমম্ ॥

ন বর্ণনীয়ঃ কবিভির্বিচিত্রঃ রত্ননির্ম্মিতম্ ।

গোলোক বিষয়ে “উক্তং বৈকুণ্ঠতোহগম্যং” এবং “বায়ুনা ধার্য্যমাণঞ্চ নির্ম্মিতং স্বেচ্ছয়া বিভোঃ” প্রভৃতি ব্রহ্মবৈবর্ত-বাক্যে বায়ুর শ্রীনারায়ণের বৈকুণ্ঠ-ধারণ-

সেবা জানা যাইতেছে। শ্রীমাক্ষগণ বলেন—তঁাহাদের আচার্য্যপাদ বায়ুর অবতার। সুতরাং শ্রীমাক্ষকে প্রাণনাথ সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

দেবগণের প্রার্থনায় শ্রীনারায়ণের আদেশে বায়ুদেব মধ্বেব্র অবির্ভাব তুলুব ও অত্মাত্ম প্রদেশে যে-কালে জৈন ও প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী শঙ্কর মতাবলম্বিগণ এবং শৈবসমূহ, ভাগবত-সম্প্রদায়ের গর্হণে ব্যস্ত ছিল, তদর্শনে বিরিক্টিপ্রমুখ দেবগণ, তাহাদের ক্রিয়া-কলাপে উপদ্রুত অধিবাসিবর্গের মঙ্গলের জন্ত শ্রীনারায়ণের সমীপবর্তী হইয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের আদেশক্রমে বৈকুণ্ঠ-ধারক প্রাণনাথ বায়ুদেব তুলুবদেশে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্যাসানুচর মক্ষ দ্বাপরে ভীম ত্রেতায় হনুমদ্বেহ-ধারী

ত্রেতাযুগে বৈকুণ্ঠপতির সহচর হইয়া বৈকুণ্ঠ-ধারক হনুমদ্বেহে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিয়াছিলেন, দ্বাপরে দ্বারকাধীশের সহচর হইয়া সেই মরুদেব ভীমরূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করেন। হনুমতের কলিতে বিকৃত আকৃতির দ্বাপরতর শ্রীবাসদেবের অনুচর হইয়া শ্রীমক্ষাচার্য্য-রূপে সেবা করিলেন।

শ্রীমক্ষাচার্য্যের উদয়কাল বিচারে বিভিন্ন মতবাদ

শ্রীমক্ষাচার্য্যের উদয়কাল বিচার সর্ববাদীসম্মত নহে। এই কাল বিষয়ক গবেষণায় আমরা সর্বাগ্রে ছয়টি মূল প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীভাগুরকার ও শ্রীপদ্মনাভাচার্য্যের মত

(১) শ্রীভাগুরকার-দৃষ্ট পূর্ব মঠ তালিকা এবং বায়ুপুরাণ প্রমাণ। ভাগুরকার বলেন—গর্হস্পত্য বর্ষ নিরূপণ বাতীত অতি প্রাচীন মঠ তালিকায় শকাব্দির উল্লেখ নাই। পর পর মঠতালিকার গণনাদ্বারা অনুমান-ক্রমে শকাব্দি নিরূপিত হইয়াছে।

অদমার মঠস্বামী মহোদয়ের সমক্ষে শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য সম্প্রতি উড়ুপীস্থ পণ্ডিতকুলকে আহ্বান পূর্বক বায়ুপুরাণ ও অত্মাত্ম অপ্রামাণিক উদ্ধৃত শ্লোকাদি হইতে জানিয়াছেন যে, বিলম্বী বর্ষে মধ্বেব্র জন্ম হয়। বায়ুপুরাণের শ্লোকার্থ—মাঘী শুক্লা সপ্তমী বিলম্বী বর্ষে আচার্য্যের জন্ম, আবার অগ্ন শ্লোকের মতে ঐ বর্ষে বিজয়াদশমীতে জন্ম হয়।

‘সংকথা’ নামক গ্রন্থের মত

(২) উড়ুপীস্থ অষ্ট মঠস্বামিগণের এবং উত্তরাঢী মূল মঠের তীর্থস্বামী মহোদয়ের মঠ-তালিকা। ‘সংকথা’ নামক কানাড়ি ভাষায় ভীমরাও স্বামিরাও-লিখিত গ্রন্থ, যাহা ধারবাড়ের প্রসাদ রাঘব যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়াছে, সেই

তালিকায় শ্রীমন্মথের অভ্যুদয় কাল বিলম্বী বর্ষে ১০৪০ শকাব্দ বলিয়া উল্লিখিত আছে। শ্রীমন্মথপণ্ডিতগণ এই তালিকাকে বিশেষ সম্মান করেন। কেহই ইহাতে সন্দেহান হইতে পারেন নাই।

মঞ্চ-প্রণীত মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়-গ্রন্থের মত

(৩) শ্রীমন্মথচার্য স্বপ্রণীত মহাভারত তাৎপর্য-নির্ণয়-গ্রন্থে কালের বিষয় দুই স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রায়শো রাক্ষসার্শ্চব হরি কৃষ্ণত্মাগতে।

শেষা যাস্তিস্তি তচ্ছেষা অষ্টাবিংশে কলৌ যুগে

গতে চতুঃসহস্রাব্দে তমোগান্ধিশতোত্তরে ॥১০০॥ (তাঃ নিঃ ২ম অধ্যায়)

চতুঃসহস্রে ত্রিশতোত্তরে গতে সম্বৎসরাণাম্ত কলৌ পৃথিব্যাং।

জাতঃ পুনর্বিপ্রতনুঃ স ভীমো দৈত্যৈনিগূঢ়ঃ হরিতত্ত্বমাহ ॥১০১॥

(তাঃ নিঃ ৩২শ অধ্যায়)

মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়ের স্থানদ্বয়ে যে-কালের উল্লেখ উদ্ধৃত হইল, তাহাতে শ্রীমন্মথমুনি ৪৩০০ কল্যাব্দ অতীত হইলে পর অর্থাৎ চতুঃসহস্রাব্দশতাব্দীতে তাঁহার উদয়কাল নিরূপণ করেন। ঠিক শতাব্দী প্রারম্ভেই তাঁহার উদয়কাল—এরূপ কথার নির্দেশ নাই। বিলম্বী বর্ষে তাঁহার জন্ম হয়—একথা ভাণ্ডারকার-দৃষ্ট পূর্বমুঠ তালিকাতে উল্লেখ আছে। আবার দেখা যায়, পরমুঠ তালিকার নিরূপিত শক ও স্বত্যর্থসাগর-লিখিত শক পরস্পর ভিন্ন হইলেও উভয়েই পরে বিলম্বীকে অংশুরপূর্বক শকে পরিণত করিয়াছেন। দক্ষিণদেশে বাইস্পত্যবর্ষের যথেষ্ট প্রচলন পূর্বে ছিল। পরে ক্রমশঃ শকাদি লিখিত হয়। সুতরাং ৪৩০০ কল্যাব্দকে শকে পরিণত করিয়াই শ্রীকৃষ্ণস্বামী আয়ার এবং দক্ষিণ-ক্যানারা-জিলা-ম্যারুয়েল-গ্রন্থে ১১২১ শকাব্দায় অর্থাৎ কল্যাব্দ ৪৩০০ বর্ষে শ্রীমন্মথের আবির্ভাব স্থির করেন। ডাক্তার বুকানন ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৭২১ শকাব্দে মহীশূর, কানাড়া ও ম্যালেকার রাজ্যের স্থানে স্থানে ভ্রমণপূর্বক উদ্ভূপীতে পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বান করিয়া আচার্যের জন্মকাল ১১২১ শকাব্দ স্থির করিয়াছেন। বুকাননের মূল প্রমাণ আর কিছুই নাই।

শ্রীগৌপীনাথরাও এবং উদ্ধবাচার্যের মত

(৪) শ্রীমচ্ছলারি স্মৃতি হইতে শ্রীগৌপীনাথরাও “দক্ষিণাপথে শ্রীবৈষ্ণব-ধর্মের লঘু ইতিবৃত্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় গবেষণাখণ্ডে” শ্রীমন্মথের উদয়কাল জ্ঞাপক এই শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন,—

রাজের অনুরোধে বিচারণ্য ও অক্ষোভের বিচার-মীমাংসক হইয়াছিলেন। বেদান্তদেশিক বৈভবপ্রকাশিকা গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। জয়তীর্থ-বিজয়ে জয়তীর্থের সহিত বিচারণ্য তীর্থের সাক্ষাৎ উল্লিখিত হইয়াছে। বিচারণ্য নিজ গ্রন্থে জয়তীর্থের ভাষ্য উদ্ধার পূর্বক বিচার করিয়াছেন। সূত্রাং বিচারণ্য জয়তীর্থ, অক্ষোভ ও বেদান্তদেশিক একই সময়ের ব্যক্তি।

উল্লিখিত ছয়টি মতের সংক্ষেপ ও সার

উপরিউক্ত প্রমাণাবলী হইতে আমরা অল্প কথায় এই বুঝি যে—

(১) শকাব্দা ১০৪০, ১১০০ বা ১১৬০ বিলম্বী বর্ষে জন্ম।

(২) শকাব্দা ১০৪০।

(৩) ১১২১ শকাব্দার পর কোন বর্ষে।

(৪) শকাব্দা ১১০০।

(৫) নরহরিতীর্থ ১২০৩ শকের পূর্বে মধ্বের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও ১২১৫ শকের পর তদীয় পীঠে অধিরোহণ করেন। প্রস্তর ফলকত্রয় প্রমাণ।

(৬) ভিন্ন ভিন্ন কাল-তালিকা হইতে জানা যায় যে, বিচারণ্য, মধ্বশিষ্য অক্ষোভ ও বেদান্তদেশিক ত্রয়োদশ শক-শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন।

উক্ত মতবাদিগণের পরস্পর বিরোধ

ইতিহাস প্রমাণ, এই প্রমাণের মধ্যে কোনটী গ্রহণ করা কর্তব্য তদ্বিষয় একটী শুদ্ধ মীমাংসা হওয়া উচিত। প্রমাণগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে:—

প্রথম প্রমাণ অল্প প্রমাণাবলীর মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও অল্প পাঁচটি প্রমাণের সকলগুলিরই পোষণ করে। প্রথম প্রমাণের সহিত অল্প প্রমাণগুলির বিরোধ নাই।

দ্বিতীয় প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না, তথাপি তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ—এই প্রমাণ চতুষ্টয়কে পরিত্যাগ করিতে হয়।

তৃতীয় প্রমাণ শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণদ্বয় ত্যাগ করিতে হয়।

চতুর্থ প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না, তথাপি দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রমাণ চতুষ্টয় ত্যাগ করিতে হয়।

পঞ্চম প্রমাণ শুদ্ধ বলিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণ ব্যতীত প্রথম, তৃতীয় ও ষষ্ঠের বিরোধ হয় না।

ষষ্ঠ প্রমাণ শুদ্ধ হইলে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম প্রমাণের সহ বিরোধ হয় না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণের সত্যতা থাকে না।

মধ্বেব আবির্ভাব সম্বন্ধে যাবতীয় মতের সমালোচনা

এই প্রমাণগুলির মধ্যে প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের বিরুদ্ধ যুক্তির বিরূপ আক্রমণযোগ্য, তাহার পর্যালোচনা করা আবশ্যক। শ্রীমধ্বেব নিজ-লিখিত গ্রন্থে, প্রস্তরফলকে বা ইতিহাসে প্রথম প্রমাণোক্ত বিলম্বী বর্ষের কথা উল্লেখ নাই।

পূর্বমঠ তালিকায় শকের উল্লেখ না থাকায়, স্মৃত্যর্থসাগর নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতিলিখিত শকের সহ পার্থক্য হওয়ায়, শ্রীমধ্বেব নিজ-লিখিত কালের সহ পার্থক্য হওয়ায়, প্রস্তরফলকের মিথ্যা প্রতাপন না হওয়ায় এবং ঐতিহ্যের বিরুদ্ধ হওয়ায় ঐ পাঁচটির প্রতিপক্ষে শক ১০৪০ নিরূপিত হইতে পারে না।

শ্রীমধ্বেব-লিখিত তাৎপর্য-নির্ণয় গ্রন্থে কাল বিষয়ক স্থানদ্বয় প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, অথবা অর্থাস্তর যোগ্যতাক্রমে ৪৩০০ কলাদ লোক-কথিত বিলম্বী বর্ষ না হওয়ায় বা লেখকের কালবিষয়ে স্মৃতিতার যথার্থোপলব্ধি না থাকিলে উহা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না।

স্মৃত্যর্থসাগর রচনাকালে লোক-মুখে বিলম্বী বর্ষে মধ্বেব জন্মাদ্ অবগণ করিয়া অল্পমানক্রমে ১১০০ শকাব্দের বিলম্বী বর্ষ মধ্বেবজন্মকাল নিরূপিত হইয়া থাকিলে, প্রস্তর ফলকের মিথ্যা প্রতাপন না হওয়ায়, মধ্বেব-লিখিত তাৎপর্য নির্ণয়ের কালের সহিত বিরোধ হওয়ায় ইতিহাসের সহ সামঞ্জস্যভাবে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

পঞ্চম প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রস্তরফলক পরে কোনও ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষতি হইবার অসম্ভাবনা না থাকায়, প্রস্তর ফলকোক্ত ভাষার প্রকৃত অর্থের বিপর্যয় হইবার সম্ভাবনা থাকায় প্রস্তর-ফলক-প্রমাণ নির্বিবাদে ঐক্য সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

ঐতিহ্য সমূহের নানাপ্রকার সুাপেক্ষতা নিবন্ধন নানাপ্রকার ভ্রম প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া উহাকেও ঐক্য সত্য বলা যাইতে পারে না।

১১৬০ শকাব্দেই মধ্বের প্রকৃত জন্ম

যাহা হউক, প্রমাণগুলি অবিশ্বাস করিবার. নানাপ্রকার যুক্তি সত্ত্বেও প্রমাণাবলী.নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীমধ্বাচার্য্য ১১৬০ শকাব্দে বিলম্বী বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্মকাল নব্য মঠ-তালিকা বা স্মৃত্যর্থসাগরের বিরোধী হইলেও অত্র চারিপ্রকারের প্রমাণের বিরোধী নহে। পক্ষান্তরে ১০৪০ এবং ১১০০ শক পক্ষদ্বয় শ্রীমধ্বাচার্য্যের নিজ লেখনীর প্রতিকূল। ১১৬০ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করিলে চারিটি প্রমাণ পক্ষাবলম্বন করে। অথচ ১০৪০ পক্ষে বা ১১০০ পক্ষে প্রথম প্রমাণ অর্থাৎ বিলম্বী বর্ষ ব্যতীত অত্র নিরপেক্ষ প্রমাণাত্মক। ১১৬০ শক বিলম্বী বর্ষ। মধ্ব-লিখিত ১১২১ শকাব্দের পর ১১৬০ শক। ১১৬০ শকে জাতব্যক্তির ১২০৩ শকের পূর্বে নরহরি তীর্থকে সন্ন্যাস দিতে বাধা নাই, ১১৬০ শকে জাতব্যক্তির নিকট গৃহীত-সন্ন্যাস অক্ষোভ্যতীর্থ, বিচারণ্য ও বেদান্ত দেশিকের সম-সাময়িক হইবার অযোগ্য নহেন। ইতিহাস ও প্রস্তর ফলকাভাবে পূর্ব পূর্ব বিলম্বী বর্ষের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক। তাঁহারাও এই দুইটির সাহায্য পাইলে ১১৬০ শকাব্দাই এক বাক্যে স্থির করিতে পারিতেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

কলি

কলি সকল উৎপাতের কারণ

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং ত্রিলোকনাতানতপাদপঙ্কজং ।

প্রায়েণ মর্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ ॥ (ভাঃ ১২।৩।৪৩)

শ্রীমদ্ভাগবতের এই গভীর অর্থপূর্ণ বচনটি পাঠ করিয়া আমাদের সমস্ত হৃৎখের কারণ আমরা বুঝিতে পারি। সম্প্রদায়-দীক্ষা লাভ করিয়া আমরা অর্চন-মার্গে প্রবেশ করিয়াও প্রেমলাভ করি না। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াও আমাদের বিগুহ কৃষ্ণমতি জন্মে না। অনেক ব্রতাদি আচরণ করিয়াও আমরা নিরর্থক ভক্তি লাভ করি না। গোস্বামি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমরা সরল গৌরভক্তি অর্জন করিতে পারি না। অভ্যাগত বৈষ্ণবের নিকট ভেক ধারণ করিয়াও আমরা কেবল সংসার উপাসনা করিতে থাকি। কলিই আমাদের সকল উৎপাতের একমাত্র কারণ হইয়া আমাদের বঞ্চনা করে।

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্তোপাসনা পাষণ্ড-মত

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত উপাশ্রু দেবতার উপাশ্রু এবং জগতের পরম গুরু। কৃষ্ণো-পাসনা সকল জীবের সার্বকালিক কর্তব্য হইলেও জীবসকল কলিকালে পাষণ্ড-মত ও পাষণ্ড-প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহাকে প্রায় ভুলিয়া থাকে এবং তৎপ্রতি অকৃত্রিম ভক্তি-ধর্ম আচরণ করে না। এই শ্লোকের অর্থ আবার আর এক শ্লোকে রূপান্তরে কথিত হইয়াছে। যথা,—

যন্মামধেয়ং ত্রিয়মাণ আতুরঃ

পতন্ স্থলন্ বা বিবশো গুণন্ পুমান্ ।

বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং

প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥ (ভাঃ ১২।৩।৪৪)

সংসারী জীব সর্বদা ত্রিয়মান ও দুঃখে আতুর। যে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নাম পতিত, স্থলিত বা বিকল হইয়া উচ্চারণ করিলে সেই ত্রিয়মান জীব সমস্ত কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ করেন, হয়! কলিকালে তাঁহার। সেই পুরুষের নাম যজ্ঞ-রূপ একমাত্র যজ্ঞে তাঁহাকে উপাসনা করেন না।

নাম-কীর্তনই কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তির হেতু

মূল তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মই জীবের বন্ধন। সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্ত নাম-সকীর্তন একমাত্র উপায়। কেবল জ্ঞানই জীবের গতি নয়, কিন্তু ভক্তিই জীবের উত্তমা গতি। কলি এরূপ অধর্ম্ম-বন্ধু ও জীব-শত্রু যে, তাহার এই নির্দিষ্ট কালে জীবকে সকীর্তনরূপ নির্মল ধর্মে স্থির হইতে দেয় না। সকীর্তনকে কলির একমাত্র ঔষধ বলিয়া বলিয়াছেন। যথা,—

কলেদৌষনিধে রাজয়ন্তি হোকো মহান্ গুণঃ ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণশ্চ মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫১)

কলি সমস্ত দৌষের সমুদ্র হইলেও কলিকালে একটা মহাগুণ আছে অর্থাৎ কৃষ্ণ-কীর্তন করিলে সহসা জীব মুক্তসঙ্গ হইয়া পরা-ভক্তিকে লাভ করেন।

এখন দেখ ভাই! শাস্ত্র বলিতেছেন যে, সকল উপায় পরিত্যাগ করিয়া জীব কলিতে কেবল কীর্তন করিবেন, আবার বলিয়াছেন যে, কলিতে জীব কৃষ্ণনাম কীর্তন করিয়া উপাসনা প্রায়ই করে না। ইহার হেতু কি?

বাসনাজাত চিন্ত-প্রবৃত্তি অপরাজিত ও কর্ম্মের বল

মনুষ্যের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন বিষয়-বিচার করিয়া কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করে, কিন্তু চিন্ত-প্রবৃত্তি অপরাজিত থাকিয়া প্রেয়ঃ বিষয়ে ধাবমান হয়, বিবেককে স্থির

হইতে দেয় না। অনেকেই বিছাভাস করিয়া এবং সুল্লোকের উপদেশ শ্রবণ করিয়া জানিতে পারেন যে, মত্তপান ও মাংস ভোজন করা মন্দ, কিন্তু লালসাক্রমে ঐ সকল কাৰ্য্য হইতে বিরত হইতে পারেন না। শাস্ত্ৰাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ সকলেই জানেন যে, হরিনাম ব্যতীত জীবের গতি নাই; তথাপি সামান্ত কৰ্ম্ম-মীমাংসার বশবৰ্ত্তী হইয়া চিত্ত-প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিয়া থাকেন। প্রাক্তনীয় ও আধুনিক বাসনা হইতেই চিত্ত-প্রবৃত্তির জন্ম হয়।

সাধুসঙ্গ ও নামে রুচি হইতেই চিত্ত-সংযম হয়, যুক্তি দ্বারা নহে

বহুতর সংসঙ্গ ও সদালোচনা ব্যতীত চিত্ত-প্রবৃত্তির বল কম হয় না। কেবল যুক্তি-জনিত বিবেক কিছুই করিতে পারে না। অতএব ভক্তি-মীমাংসকগণ লিখিয়াছেন, যে—

অস্মাপি কচিরেব ত্ৰাস্তুক্তিতদ্বাববোধিকা।

যুক্তিস্ত কেবলা নৈব যদস্তা অপ্রতিষ্ঠতা ॥ (ভঃ বঃ সিঃ ১।১।৩২)

যে জীবের হরিনামে শ্ৰদ্ধা রুচি অর্থাৎ চিত্ত-প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেই জীবের ভক্তি হয়। কেবল যুক্তি দ্বারা কখনই ভক্তি হয় না। বেদে কেবল যুক্তির অপ্রতিষ্ঠা কীৰ্ত্তন করিয়াছেন।

কলিহত-জীবের হরিনামে রুচি সহজে হয় না। বিবেক দ্বারা তাঁহারা শুনিয়া থাকেন, যে—

হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরনুথা ॥

(বৃহন্ন্যাসদীয় ৩৮।১২৬)

কলিতে ধর্ম্মের নামে পাপাচার ও কপটতা

যখন চিত্ত-প্রবৃত্তি বেঞ্চালয়ে বা মত্তে বা স্ববর্ণ প্রয়াসে টানিয়া লয়, তখন কলি-হত-জীব কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিজ চরিত্রের দোষ বাঁচাইতে গিয়া নানা পথ অবলম্বন করে। যুক্তি দ্বারা দেখাইতে থাকে যে, কিয়ৎ পরিমাণ মত্ত ও মাংস ভোজন না করিলে মত্তবোর বল রক্ষা হয় না। বেঞ্চা গমন ইত্যাদি যে মানবের আবশ্যক-পাপকাৰ্য্য, তাহা নানা ভঙ্গীতে বলিতে থাকে। কপট ভক্তি দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহ করে। হরিনাম কীৰ্ত্তন যে ভাল কৰ্ম্ম তাহা দেখাইয়া হরিসঙ্কীৰ্ত্তনের দল করিয়া প্লেগ, মহামারী ও অন্যান্য পাপনিবৃত্তির উদ্দেশে স্বার্থ-সাধক নগর-কীৰ্ত্তনাদি করিতে থাকে। কন্দিগণ অর্থপ্রদ কৰ্ম্ম করাইয়া ‘কৃষ্ণাৰ্পণমন্ত্ৰ’ বলিয়া একটি কপট পদ্ম বাহির করে। নাস্তিকগণ শূন্তের বা শূন্তপ্রায় কলিত-ব্রহ্মের

প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদিগকে ধার্মিক বলিয়া চালাইতে চায়। প্রতিদিনই জগতে এই প্রকার কপট ক্রিয়া চলিতেছে। আবার উহাদের কথা এই যে, ভাল বস্তুর ভাণ্ড ভাল। এই উপদেশ দিয়া তাঁহারা কপট বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কলির সেবা করিতেছেন।

কলির অধিকার ও স্থান-নির্ণয়

কলিই এই সমস্ত উৎপাতের মূল। কলির অধিকার বর্জন করিয়া ঈহারা চলিতে পারেন, তাঁহারাই শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেন। আমরা নিজ নিজ উপকারের জন্ত কলির অধিকার বিচার করিয়া দেখাইব।

শ্রীমদ্ভাগবতে এরূপ বর্ণনা আছে—কোন সময় মহারাজ পরীক্ষিৎ ধর্মবলে কলিকে নিগ্রহ করিলে কলি তাঁহার নিকট কোনও একটা স্থান যাজ্ঞা করিল। পরীক্ষিৎ কহিলেন—ওরে অধর্মবান্দো! তুমি মদীয় শাসনের মধ্যে অথ কোন স্থান পাইবে না। চারিটা অধর্ম স্থান তোমাকে দেওয়া গেল।

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।

দ্যুতং পানং স্ত্রিয়ঃ স্থনা যত্রাধর্মশ্চতুর্বিধঃ ॥ (ভাঃ ১।১৭।৩৮)

কলির প্রার্থনামতে তাহাকে রাজা চারিটা স্থান অর্পণ করিলেন। দ্যুতক्रीड़ा, পান, স্ত্রীসঙ্গ ও প্রাণিবধ—এই চারিটা বশ্য ঘটে, সেই স্থান কলিকে দিলেন।

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।

ততোহনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্ ॥ (ভাঃ ১।১৭।৩৯)

একত্রাবস্থান যাজ্ঞা করায় রাজা তাহাকে স্বর্ণ, পরে অসত্য ব্যবহার, মদ, কাম, রজ ও বৈর—এই কয়েকটাও দান করিলেন।

কলি-পঞ্চক ও তাহার স্থান-চতুষ্টয়

এই কথাগুলি ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখুন। যদি কলি হইতে দূরে থাকিয়া হরিভজন করিতে বাঞ্ছা থাকে, তবে দ্যুতক्रीড়া-স্থান, পান, স্ত্রীসঙ্গ ও পশুবধ হইতে নিরস্ত থাকা আবশ্যক। সর্বত্রই স্বর্ণ অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজন। সেই সেই স্থানে স্বভাবতঃ অসত্য ব্যবহার, মদ, কাম, রজ, বৈর বিরাজমান। উক্ত চারিটা স্থান পৃথক পৃথক আলোচিত হইলে বিষয়টি বিশদ হইবে।

(১) দ্যুত-ক्रीড়া—কলির স্থান

আদৌ দ্যুতক्रीড়া স্থানের বিচার হউক। অপ্রাণী বস্তুরা ক्रीড়া যেস্থলে হয়, তাহাই দ্যুতক्रीড়া স্থান। তাস, পাশা, সতরঞ্চ, দশপাঁচিশ, বাঘবন্দীরূপ যত প্রকার ক्रीড়া আছে, সে-সব স্থানকে দ্যুতক्रीড়া স্থান বলা যায়। অধুনাতন

লটারি-গৃহকেও দ্যুতক্রীড়ার স্থান বলা যায়। নলরাজা, যুদ্ধিষ্টিব, দুৰ্যোধন, শকুনি প্রভৃতি রাজত্ববর্গের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দ্যুতক্রীড়া স্থানে জুয়াচুরি, কপটতা প্রভৃতি উপায় দ্বারা অর্থলাভ জন্তু বিধম কলহ ও সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এখনও যে-সকল ক্রীড়া-মন্দির আছে, সে-সব স্থানে অনেকের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ভুজ ই নাশ হইতেছে। এই সব ক্রীড়ায় যাহারা রত হয়, তাহারা ভয়ঙ্কর আলস্য ও কলহপ্রিয়তা লাভ করে। তাহাদের দ্বারা কোন ধর্ম-কর্ম হইতে পারে না। কলি যে দ্যুতক্রীড়া স্থানে বাস করে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? পথে যাইতে যাইতে আমরা অনেক বিপণী দেখিতে পাই—যেখানে কতকগুলি মানব মিলিত হইয়া তাস, শতরঞ্চ ও পাশা ক্রীড়া করিতে থাকে। সেই সব বিপণীর অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া পড়ে। ক্রীড়াশ্রিয় বিপণীপতি ক্রেতাগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না; ক্রমে ক্রমে ক্রেতার সংখ্যা লাঘব হইয়া যায় এবং অল্প কালের মধ্যে বিপণী নষ্ট হয়। কখন কখন চৌরগণ বিপণীপতির ক্রীড়া-শক্তি দেখিয়া বিপণীর দ্রব্য অপহরণ করে। বিপণীপতির সহিত যাহারা খেলিতে আইসে, তাহারা বিপণীর দ্রব্য যোগেযোগে স্থানান্তরিত করিয়া বিপণীপতিকে উৎসন্ন করে। ভাই দেখ, দ্যুতক্রীড়া কি ভয়ানক! অনেক ত্রিলোক অসংসঙ্গে পীড়িত হইয়া ক্রীড়া-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অসং হইয়া যায়। এইজন্য দাস-গোস্বামীর খুড়া কালীদাস মহাশয় অসংজনের অনুনয়ে ক্রীড়া করিতে বসিয়া নিরন্তর হরিনামোচ্চারণ দ্বারা আপনার স্বভাবকে রক্ষা করিতেন। যিনি উত্তম, ধার্মিক বা ভক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অবশ্যই দ্যুতক্রীড়া পরিত্যাগ করিবেন।

(২) পান—কলির স্থান

এখন পানরূপ কলির স্থানটী বিচার করা যাউক। আসব মাত্রই পান। পান কোনস্থলে দ্রব জলীয়, কোনস্থানে ধূম্রাকার। তন্মত্রে বলিয়াছেন,—

পর্ণপুগৌ তাম্রকূটস্তরিতা মদিরা সুরা ।

ব্রতবিক্ষংশিনো হেতে বলিনশ্চোস্তরোত্তরাঃ ॥

নাগবল্ল্যা প্রবদ্ধন্তে বিলাসেপ্সাঃ স্তূর্জজ্জয়াঃ ।

গুবাকেন সদা চিত্তচাঞ্চল্যং পরিলক্ষ্যতে ॥

তাম্রকূটাং মতিব্রংশো জাভ্যং বৈমুখ্যমেবহি ।

তন্নিতা সেবনাদবুদ্ধিনাশঃ কিল ভবিষ্যতি ॥

অহিফেনং ধূম্রপানং মদ্রিকা চাষ্টসংখ্যাকা ।
 স্বল্পকালে প্রকূৰ্ণন্তি দ্বিপদাংশ চতুষ্পাদান্ ॥
 এতে চোপাধয়ঃ শশং বহিস্মুখৈষু কলিতাঃ ।
 দুৰ্ব্বৃত্তকলিনা সাক্ষাৎ শুদ্ধভক্তিনিবৃত্তয়ে ॥

পৰ্ণ (তামূল), গুবাক, তামাক, গাঁজা, মদিরা ও সুরা—এই সকল আসব
 ত্রতধ্বংসকারী । ইহারা উত্তরোত্তর বলবান্ । পৰ্ণ সেবনে স্নেহজয় বিলাসেন্দ্রা
 বৃদ্ধি হয় । গুবাক দ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্য উদয় হয় । তাম্বাকুটের দ্বারা মতিভ্রংশ,
 জ্ঞাত্য ও ভগবদ্বহিস্মুখতা হয় । গাঁজা সেবনে বুদ্ধি নাশ হয় । অহিফেন,
 ধূম্রপান ও অষ্টপ্রকার মদ্রিকা অল্পকালের মধ্যে দ্বিপদগণকে চতুষ্পাদ তুল্য করিয়া
 ফেলে । এই উপাধিসকল বহিস্মুখ জীবের ভক্তি খর্ব করিবার জন্য দুৰ্ব্বৃত্ত
 কলি সৃষ্টি করিয়াছে ।

অন্য তন্ত্রে যথা,—

সংবিদা কালকূটং তাম্রকূটং ধূম্রং ।
 অহিফেনং খর্জুরসং তারিকা তরিতা তথা ।
 ইত্যষ্টৌসিদ্ধিদ্রব্যানি ভক্তিব্রাহ্মসকরাণি বৈ ।
 স্বকার্যাসিদ্ধয়ে সাক্ষাৎ কলিনা কলিতানি হি ॥

ভাং, কালকূট, তামাক, ধূম্র, আফিং, খর্জুর রস, তাড়ি ও গাঁজা—এই
 আটটা সিদ্ধি দ্রব্য । স্বকার্য সিদ্ধির জন্য কলি সাক্ষাৎ কলনা করিয়াছে ।

অন্য তন্ত্রে মদিরা বিষয়ে,—

মাধ্বিকমৈক্ষবং দ্রাক্ষ্যং তালখর্জুরপানসং ।
 মৈরয়ং মাঞ্চিকং টাকং মাধুকং নারিকেলজং ।
 মুখ্যমন্নবিকারোথু মত্তং দ্বাদশধা স্মৃতম্ ॥

মাধ্বিক, ঐক্ষব, দ্রাক্ষ্য, তাল, খর্জুর, পনসজাত, মৈরয়, মাঞ্চিক, টাক,
 মাধুক, নারিকেলজলজাত ও অন্নজাত—এই প্রকার দ্বাদশ প্রকার মত্ত । মূল
 শ্লোকে পান শব্দের অর্থে আমি লিখিয়াছেন—‘পানং মত্তাদিঃ ।’ মত্তাচ্চি শব্দে
 এই সমস্ত আসবকে বুঝিতে হইবে । তাহুল হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নবিকার
 পর্যন্ত সমস্তই ব্রতনাশক মত্ত । যিনি ধর্ম্য বাসনা করেন, তিনি অবশ্য এষ্ট সকল
 আসব হইতে পৃথক থাকিবেন । আসব সেবন দ্বারা বৈরাগ্য ও ভজনের উপকার
 হয়—এরূপ কথা কেবল আসব-পরতন্ত্র লোকের আত্মবল্লা বাক্যমাত্র ।

(৩) স্ত্রী—কলির স্থান

এখন স্ত্রী শব্দের বিচার করা যাউক। স্ত্রী শব্দে ধর্ম-পত্নী এবং অধর্মপত্নী উভয়কেই বুঝায় বটে। এস্থলে ধর্ম-পত্নীর কথা নয়, কেননা শাস্ত্রমতে,—

ন গৃহং গৃহমিত্যাঙ্গং হিণী গৃহমুচ্যতে।

তয়া হি সহিতঃ সর্বান পুরুষার্থান সমশ্নুতে। (উদাহ-তত্ত্ব)

ধর্ম-পত্নীর সহিত বর্তমান হইয়া ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও পঞ্চতম পুরুষার্থ-রূপ ভক্তিকে সেবা করিবেন—ইহাই গৃহস্থ পুরুষের নিত্য বিধি। বিবাহিত পত্নীর সহায়তায় জীবন নির্বাহ করিলে কলিদোষ লাগে না। **বেশ্বলে পুরুষ জ্ঞেয়ভাবে আপনার পত্নীর বশীভূত হইয়া কর্তব্যবিমূঢ় হয়, সেইখানেই বিবাহিত পত্নীতে কলির অবস্থান।** ধর্ম-শূন্য স্ত্রীসঙ্গেই কলির বল। বৈষ্ণব ঋষিগণ, অম্বরীষাদি রাজগণ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পার্বদ শ্রীবাসাদি গৃহস্থ ভক্তগণ ইহার উদাহরণ। এই কারণেই **শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসিগণকে গৃহস্থ বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।** যথা শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ডে অষ্টম অধ্যায়,—

বৈষ্ণব তুলসী গঙ্গা প্রসাদের ভক্তি।

তিহঁ। সে জানেন, অস্ত্রে না ধরে সে শক্তি ॥

বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখান সাক্ষাত।

মহাশ্রমী বৈষ্ণবের করে দণ্ডপাত ॥

সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম তাঁর।

পিতা আসি' পুত্রেরে করেন নমস্কার ॥

অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত।

সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত ॥

তথাপি আশ্রমধর্ম ছাড়ি' বৈষ্ণবেরে ॥

শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে ॥

শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।

তাহা যে মানয়ে, সেই জন পায় রক্ষা ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ চাঃ ১৪২-১৫৩, ১৬২)

ধর্মপত্নীর আদর সর্বশাস্ত্রে আছে। অধর্ম পত্নীর তিরস্কার সকলেই গান করেন, তথাপি সহজিয়া ও বাউলগণ পরস্পর লইয়া উপাসনার ভাণে কলির কবলে নিরন্তর পড়িয়া অবশেষে মহারৌরবে পতিত হন।

বেশালয়ে যে-সমস্ত উৎপাত হয় তাহা এস্থলে বলা বাহুল্য। সুতরাং জীসঙ্গই যে কলির কার্য তাহাতে ভ্রম নাই। ধর্মপত্নীর সাহায্যে ভক্তি সাধনোপযোগী জীবন নির্বাহ করা এবং অধর্ম পত্নী বা উপপত্নীতে বর্ত্ত হওয়া—দুইটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয় জানিতে হইবে। অধর্মশ্রীত-স্রীগণ সর্বদাই কলির অধিকারে থাকে, অতএব তাহাদিগের হইতে দূরে থাকিবে।

(৪) সূনা—কলির স্থান

সূনা অর্থে প্রাণীবধ। ইচ্ছাপূর্বক প্রাণীবধ যথায় হয়, সেস্থান কলির একান্ত স্থান। অতএব নারদ বলিয়াছেন,—

নহন্তো জুষতো জোহ্যান্ বুদ্ধিবংশো রজো গুণঃ ।

শ্রীমদাদাভিজাত্যাদিবত্র স্রীদ্যুতমাসবঃ ॥

হন্তন্ত পশবো যত্র নির্দয়েরজিতাত্মিতঃ ।

মন্তমানৈরিমং দেহমজরা মৃত্যু নশ্বরম্ ॥

যে প্রেম জড়সেবা, তথায় বুদ্ধিবংশকারী অস্ত্র রজোগুণের প্রয়োজন নাই। শ্রী-মদ-রূপ রজোগুণ হইতে সংকুল জন্মাদির বৃথা অভিমান, অবৈধ জীসঙ্গ, দ্যুত-ক্রীড়া ও আসবসেবা অর্থাৎ মত্ত, ধূমাদি পান ও নরগণের পরস্পর বিষয় লইয়া যুদ্ধ, জিহ্বা-লালসায় জীববলি প্রভৃতি সর্বপ্রকার জীবহত্যা কলি বাস করেন।

কলি-পঞ্চক সর্বতোভাবে ত্যাগ্য

রজোগুণ হইতেই অর্থলোভ হয়। সুতরাং অর্থের সুব্যবহার অর্থাৎ ভগবৎসেবা ও ভাগবতসেবা এবং বিশুদ্ধরূপে জীবন নির্বাহ ব্যতীত যে সুবর্ণাশক্তি, তাহাতে কলির বাস নিত্য আছে। অনৃত্ত অর্থাৎ মিথ্যাভাষণ ও কপট ব্যবহার দ্বারা মনুষ্য-স্বভাব অত্যন্ত দূষিত হয়। তাহাও কলির বাসস্থান। মদ কলির প্রিয় স্থান। ভাগবত বলেন—

শ্রিয়া বিভৃত্যাভিজনেন বিচ্যন্ন

ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্মণা ।

জাতশ্রয়েনাক্ষয়িঃ মহেশ্বরান্

সতোহবমন্তস্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৯)

জড়ীয় শ্রী-রূপ বিভূতি, উত্তম কুলে জন্মাভিমান, জড়ীয় বিদ্যা, সম্রাস, রূপ ও বল—এই ছয় প্রকার মদ হইতে ভয়ঙ্কর বৈষম্যাপন্ন হয়। এসমস্ত কলির বাসস্থান। বৈষম্যে কলির বাসস্থান তাহাতে সন্দেহ কি?

অতএব কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অতিবাদ্যন্তিতিক্ষেত নাবমন্তেত কক্ষন।

ন চৈনং, দেহমাপ্রিত্য বৈবং কুর্ষীত কেনচিত্।

কেহ তোমাকে অতিবাদ করে, তাহা সহ করিবে। কাহাকেও অপমান করিবে না। এই দেহ আশ্রয় করিয়া কাহার প্রতি বৈরসাধন করিবে না। কাম যে কলির স্থান তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণসেবার কাম প্রাকৃত, তাহাই কলির স্থান। তাহা অবশ্য পরিত্যাগ করিবে।

কলির অধিকার ত্যাগ না করিলে কখনই হরিভজন হইবে না। এইসকল বিষয় সজ্জনতোষণী (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা) পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া সজ্জন-গণকে সন্তুষ্ট ও সতর্ক করিয়া থাকেন। পাঠক, বিশেষ মনোযোগে এই প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সজ্জনতোষণী ১ম বর্ষ ১১২ সংখ্যা)

শ্রীলপ্রভুপাদের বিরহ

(পূর্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ৩৯২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট গীতি

তুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জনের ঘরে,
তব 'হরিনাম' কেবল, 'কৈতব' ॥
জড়ের-প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা 'মায়া'র বৈষ্ণব'।
কনক-কামিনী, দিবস যামিনী,
ভাবিয়া কি.কাজ, অনিত্য সে সব ॥
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ 'মাধব'।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক—কেবল 'যাদব' ॥

প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়-মায়া-মরু,
 না পেল 'রাবণ' যুঝিয়া 'রাঘব' ।
 বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
 তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥
 হরিজন-দেষ, প্রতিষ্ঠাশা-ক্লেশ,
 কর কেন তবে তাহার গৌরব ।
 বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
 তাত, কভু নহে 'অনিত্য-বৈভব' ॥
 সে হরি-সম্বন্ধ, শূন্য-মায়াগন্ধ,
 তাহা কভু নয় 'জড়ের-কৈতব' ।
 প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী, নির্জ্ঞনতা-জালি,
 উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব ॥
 'কীর্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব'
 —কি কাজ চুড়িয়া তাদৃশ গৌরব ।
 মাধবেন্দ্র পুরী, ভাবঘরে চুরি,
 না করিল কভু সদাই জানব ॥
 তোমার প্রতিষ্ঠা,— শূকরের বিষ্ঠা,
 তার সহ সম কভু না মানব ।
 মৎসরতা-বশে, তুমি জড়-রসে,
 মজেছ ছাড়িয়া কীর্তন-সৌষ্ঠব ॥
 তাই দুষ্ট মন, 'নির্জ্ঞন-ভজন',
 প্রচারিছে ছলে 'কুযোগী-বৈভব' ।
 প্রভু-সনাতনে. পরম যতনে,
 শিক্ষা দিল যাহা চিন্ত 'সেই সব' ॥
 সেই ছ'টি কথা, ভুল'না সর্ব্বথা,
 উচ্চৈঃস্বরে কর 'হরিনাম-রব' ।
 'ফল্গু' আর 'যুক্ত', 'বদ্ধ' আর 'মুক্ত'
 কভু না ভাবিহ একাকার সব ॥

‘কনক-কামিনী’ ‘প্রতিষ্ঠা-বাধিনী’
 —ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব ।
 সেই ‘অনাসক্ত’, সেই ‘শুদ্ধ-ভক্ত’,
 সংসার তথায় পায় পরাভব ॥
 “যথাযোগ্য-ভোগ” নাহি তথা রোগ,
 ‘অনাসক্ত’ সেই কি আর কহব ।
 ‘আসক্তি-রহিত’ ‘সম্বন্ধ-সহিত’
 বিষয়-সমূহ সকল ‘মাধব’ ॥
 সে ‘যুক্তবৈরাগ্য’, তাহা ত ‘সৌভাগ্য’,
 তাহাই জড়িতে হরির বৈভব ।
 কীর্তনে যাহার, ‘প্রতিষ্ঠা-সম্ভার’
 তাহার সম্পত্তি কেবল ‘কৈতব’ ॥
 ‘বিষয়-মুমুক্ষু’, ‘ভোগের বুভুক্ষু’
 ছুয়ে তাজ মন, ছুই—অবৈষ্ণব’ ।
 ‘কৃষ্ণের সম্বন্ধ’, অপ্রাকৃত স্বন্ধ,
 কভু নহে তাহা, জড়ের সম্ভব ॥
 ‘মায়াবাদী জন’, কৃষ্ণের মন,
 ‘মুক্ত’ অভিমানে, সে—নিন্দে বৈষ্ণব ।
 বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি আশ,
 কেন বা ডাকিছ নির্জ্ঞন-আহব ॥
 যে ‘ফল-বৈরাগী’, কহে, নিজে, ‘ভাগী’
 সে না পারে কভু হইতে ‘বৈষ্ণব’ ।
 হরিপদ ছাড়ি’, নির্জ্ঞনতা বাড়ি’
 লভিয়া কি ফল ‘ফল’ সে বৈভব ॥
 রাধাদাস্যে রহি, ছাড়ি’ ‘ভোগ-অহি’
 ‘প্রতিষ্ঠাশা’ নহে ‘কীর্তন-গৌরব’ ।
 ‘রাধা-নিত্য-জন’, তাহা ছাড়ি’ মন
 কেন বা নির্জ্ঞন-ভজন-কৈতব ॥

ব্রজরাসিগণ, প্রচারক-ধন,
 প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা নহে 'শব'।
 প্রাণ আছে তাঁ'র, সে হেতু প্রচার,
 প্রতিষ্ঠাশা-হীন 'কৃষ্ণগাথা' সব ॥
 'শ্রীদয়িত দাস' কীর্তনেতে আশ,
 কর উচ্চৈঃস্বরে 'হরিনাম-রব'।
 কীর্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
 সে-কালে ভজন নিৰ্জ্জন সম্ভব ॥

শ্রীল প্রভুপাদ পরম উন্নতোজ্জ্বল-রসে শ্রীশ্রীরাধাদাস্য লাভ করিবার উদ্দেশে আমাদের শিক্ষাসার-স্বরূপ উক্ত গীতিটী স্বর্ণাক্ষরে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই বিবহ-দিবসে ইহা আমাদের একমাত্র কীর্তন-প্রভাবে স্মরণীয়।

উক্ত গীতিটির চরমে শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন—“কীর্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে, সে-কালে ভজন নিৰ্জ্জন সম্ভব।” ইহা দ্বারা কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, এমন কোন একটা কাল উপস্থিত হইতে পারে—যে সময়ে তথাকথিত নিৰ্জ্জন-ভজন সম্ভবপর। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের ‘সে-কালে ভজন নিৰ্জ্জন সম্ভব’ উক্তির দ্বারা তিনি ‘সে-কাল’টী নিরূপণ করিয়াছেন কীর্তন-প্রভাবে। অর্থাৎ কীর্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে এবং নিৰ্জ্জন-ভজনও হইবে। ‘নিৰ্জ্জন’ শব্দের অর্থ পূর্বেই জানাইয়াছি,—দুৰ্জ্জন-সঙ্গ ত্যাগ। প্রকৃত অসং সঙ্গ ত্যাগ—হরিকীর্তন ব্যতীত কোন প্রকারেই হইতে পারে না। অসংসঙ্গ ত্যাগের একমাত্র প্রণালী—হরিকীর্তন এবং ভগবল্লীলাদি স্মরণেরও একমাত্র প্রণালী—হরিকীর্তন। সুতরাং ‘সে-কালে ভজন নিৰ্জ্জন সম্ভব’ বলিলে—সংসঙ্গে থাকিয়া হরিকীর্তন করাই নিৰ্জ্জন-ভজন বুঝাইতেছে। গীতিটির উপক্রম, উপসংহারাদি বিচার করিলে উহাই একমাত্র প্রতিপন্ন হয়।

এসম্বন্ধে পূর্ব পূর্ব আচার্য্যবর্গের উপদেশ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি,—

শ্রীল প্রভুপাদ :—

১। নিৰ্জ্জন-ভজনের ছলনায় সর্বদা অলস জীবন যাপন করা, নিষ্কিন-তার ছলনায় অনর্থক দারিদ্র্য আনয়ন করা ও হরিকীর্তনে বাধা দেওয়া আবশ্যক নহে। (পত্রাবলী ২য় খণ্ড, ১০০ পৃষ্ঠা)

২। কীর্তন-মুখেই শ্রবণ হয় এবং শ্রবণের সুযোগ উপস্থিত হয়। সেই কালেই অষ্টকাল-লীলা-সেবার অনুভূতি সম্ভব। (পত্রাবলী ২য় খণ্ড ১১২ পৃষ্ঠা)

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ :—

আমায় নিকট বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কর, কৃত্রিমভাবে লীলা-শ্রবণাদি করিতে গেলে অনর্থের ভূত ও মায়াপিণ্ডাচী আরও ভাল করিয়া তোমার ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে। (গৌড়ীয় ১৪শ খণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ :—

সাধু লোকের সঙ্গ করিলে নিঃসঙ্গস্বরূপ ফলোদয় হয়।

(সজ্জনতোষণী ১৫শ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১ম পৃষ্ঠা)

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ :—

১। নির্জ্ঞান-ভজনের ছলনায় অলস হইও না।

২। অনবধানের সহিত লক্ষ লক্ষ মালা টানা অপেক্ষা বৈষ্ণব-সেবার জন্ত বাগান-চাষ ও গাছে জল দেওয়া- অধিক মঙ্গলজনক! বৈষ্ণব-সেবার ফলে নামে অকপট রুচি হইবে।

৩। বৈষ্ণবের অনুকরণ করিও না, পুড়িয়া মড়িবে; তাঁহার অকপট সেবা যাক্রা কর।

৪। সাধারণ চোরের কখনও মঙ্গল হয়, কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবের অর্থভোগ-কারীর কখনও মঙ্গল হয় না।

৫। আহুগতাই শ্রেষ্ঠ সদাচার, স্বতন্ত্রতাই দ্রষ্টাচার।

৬। কৃত্রিম শ্রবণ-পদ্ধতি রূপাহুগ পথ নহে।

৭। শ্রীনাম-কীর্তন-মুখে স্বাভাবিক শ্রবণই গৌড়ীয়গণের সিদ্ধাস্ত।

(গৌড়ীয় ১৭শ বর্ষ ৫০৪-৫ পৃষ্ঠা)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীল প্রভুপাদের ত্রয়োদশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১২ ডিসেম্বর শুক্রবার চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শুদ্ধভক্তি প্রচারের প্রধান কার্যালয় শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের ত্রয়োদশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিন

ব্রাহ্মমূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকান্তে তদ্বিবসের অমৃষ্টানের কার্য্যসূচী অমুসারে প্রাতঃকালে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব বন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, গুরুষ্টকম্, শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তুবকঃ, পঞ্চতত্ত্ব, 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর', 'গোরা পঁহ না ভজিয়া মৈলু', 'কিরূপে পাইব সেবা মুক্তি ছরাচার', 'গুরুদেব ! কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন', 'প্রভু হে, তুয়া পদে এ মিনতি মোর'—প্রভৃতি স্তবস্তোত্র, প্রার্থনামূলক ও বিরহহৃচক মহাজন পদাবলী কীর্তিত হয়। তৎপরে পূজাপাদ ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্বক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ "শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী" ২য় খণ্ড হইতে 'সর্বোত্তম শুভানুধ্যায়ী শ্রীগুরুপাদপদ্ম', 'শ্রীগৌরহৃন্দর ও শ্রীকৃষ্ণহৃন্দর', 'বিদ্বৎকোপাসনা ও শুদ্ধভক্তি', 'সাধুসঙ্গে নাম গ্রহণ' প্রভৃতি কয়েকখানি উপদেশপূর্ণ পত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারাদি সেবা-পূজা, ভোগরাগ, ভোগারতি কীর্তন প্রভৃতি বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। আরাত্রিকান্তে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবের যাবতীয় আয়োজন ব্যাপারে মঠরক্ষক শ্রীযুত পরম ধর্মেশ্বর ব্রহ্মচারীজীর সেবা চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় উক্ত বিরহোৎসব উপলক্ষে একটা সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে শ্রীল প্রভুপাদের বৃহৎ আলেখ্য পুষ্পমালাদি বিভূষিত হইয়া সুসজ্জিত সিংহাসনোপরি স্থাপিত হন। শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গ-গান্ধারিকা-গিরিধারীর জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে পঞ্চতত্ত্বের কৃপা প্রার্থনা করিয়া 'গুরুদেব ! কবে মোর সেই দিন হবে,' 'দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব', 'শ্রীকৃপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ' প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট গীতি কীর্তিত হইবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সুগায়ক শ্রীযুত গোপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয় এই সকল গীতির মূলগায়করূপে করেন। পূজাপাদ স্বামীজী সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া 'গৌড়ীয়' ১৬শ খণ্ডে প্রকাশিত শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'স্বমেধাস্তিথি', শ্রীলভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের শেষ বক্তৃতা—'দুঃসঙ্গ বর্জন ও ভক্তিবিনোদ-ধারা' এবং 'গৌড়ীয়' ১৫শ খণ্ডে প্রকাশিত 'শ্রীল প্রভুপাদের বাণী', 'শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী' প্রভৃতি ব্যাখ্যা-মুখে তাঁহার জীবোদ্ধারণ লীলায় অসমোদ্ধ কল্পণা ও মহিমার কথা কীর্তন করেন। অতঃপর স্বামীজীর নির্দেশে শ্রীযুত গোপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয় 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' ২ম সংখ্যায় প্রকাশিত পূজাপাদ শ্রীধরস্বামী-কৃত সাহুবাদ "শ্রীশ্রীদয়িতদাসদশকম্" ও

মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ কর্তৃক প্রেরিত ‘শ্রীশ্রীকৃষ্ণকৃপা-প্রার্থনা’, ‘দীনের প্রার্থনা’ প্রভৃতি অতি আবেগভরে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন এবং তাঁহার স্বরচিত ‘প্রভুপাদের বিরহ-গীতি’ খোল করতালযোগে কীর্তন করেন। অতঃপর মহামন্ত্র কীর্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। স্থানীয় শিক্ষিত গণ্যমান্ত ভক্তমহোদয়গণ ইহাতে যোগদান করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

বৃদ্ধা বাহুল্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অগ্রাঙ্ক শাখা মঠসমূহেও এই বিরহোৎসব যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুরবাসী ভক্ত মহোদয়গণের উক্ত গীতি ও কবিতাগুলি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।

ছুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেজ্ঞান কেশব মহারাজ সেবাকার্যা ব্যপদেশে মাদ্রাজ প্রভৃতি দক্ষিণ দেশে থাকায় এই শুভ তিথিতে আমরা তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশাবলী হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। তিনি উপস্থিত থাকিলে ইহা সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইত।

—প্রকাশক

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
ত্রয়োদশ-বার্ষিক বিরহোৎসব উপলক্ষে
দীনের প্রার্থনা

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্টায় ভূতলে।

শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে ॥

শ্রীবার্ধভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাক্ষয়ে।

কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥

জয়তি জয়তি প্রভু সরস্বতী

ভকতি সিদ্ধান্তবর।

পতিত তাম্বিতে গোলোক হইতে

হয়েছিলে জীবর্তার ॥১॥

গোলোকের বাণী ভুলোকেতে আনি

দানিয়া পতিত জীবের।

শোধিলে সবার চিত্ত ছুঁনিবার

উপদেশি' উচ্চ রবে ॥২॥

শ্রীচৈতন্য বাণী মূর্তিমন্ত তুমি
 রূপানুগ-প্রেমবর ।
 রূপানুগ ভক্তি দানি' জীব প্রতি
 কৃপা কৈলে সুবিস্তার ॥৩॥
 শ্রীহরি-ভজন ভুলি জীবগণ
 (ছিল) বিষয়েতে সদা মত্ত ।
 তুমি অবতরি' আচরি প্রচারি
 জানালে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ॥৪॥
 কৃষ্ণ আর মায়া, আলো আর ছায়া,
 দুই কভু এক নয় ।
 মায়াতমে অন্ধ হয়ে, স্বসম্বন্ধ
 ভুলি কৃষ্ণ না ভজয় ॥৫॥
 গুরুকৃপা-বলে কৃষ্ণালোক মিলে
 এই শাস্ত্রবাণী হয় ।
 কৃষ্ণজ্ঞান হ'লে অতি অবহেলে
 মায়া হয় পরাজয় ॥৬॥
 কৃষ্ণতত্ত্ব-জ্ঞান অতি গুহ্য জ্ঞান
 জৈব জ্ঞানে অসম্ভব ।
 গুরুরূপ ধরে জানালে সবারে
 কৃষ্ণজ্ঞান সুবৈভব ॥৭॥
 কৃষ্ণ-ইচ্ছা-পূর্তি মধুর মূর্তি
 শ্রীগৌর-বরণ শোভে ।
 আজ্ঞামূলস্থিত বাহু সুবলিত
 জগ-জন-মন লোভে ॥৮॥
 মায়াপূর ধাম অতি মনোরম
 শ্রীগৌরপ্রকট ভূমি ।
 থাকি সর্বক্ষণ করিতে কীর্তন
 শ্রীগৌর-মঙ্গল-বাণী ॥৯॥
 "গৌড়ীয়," "নদীয়া- প্রকাশ" করিয়া
 "ভাগবত," "পরমার্থী" ।

"সজ্জনতোষণী" ভক্তপ্রাণ জানি
 বিলালে স্বচিত্ত মতি' ॥১০॥
 করিয়া মোচন ওহে মহাজন
 সংশিক্ষাপ্রদর্শনী ।
 নাশিয়া কু-মত, স্থাপিয়া সু-মত
 বিলালে গৌরান্দ-বাণী ॥১১॥
 ত্রিদণ্ডীর গণে, নিজশক্তি দানে,
 প্রেরিয়া জীবের দ্বারে ।
 করিলে তারণ, পতিত-পাবন,
 বিলাইয়া গৌরবরে ॥১২॥
 তুমি গৌরশক্তি দানিতে ভক্তি
 নরোত্তম-রূপ ধরি ।
 কত শত জন করিলে মোচন
 অধম রহিল পড়ি ॥১৩॥
 তব নিজজন আসিত যখন
 আমাদের ক্ষুদ্র দেশে ।
 করিতেন গান তাঁরা অবিরাম
 মত্ত হয়ে প্রেমাবেশে ॥১৪॥
 (তখন) অতি শিশু আমি তাইত' বুঝিনি
 তোমার মহিমা-তত্ত্ব ।
 এবে কৃপা করি' এ অধম 'পরি
 আশীস্ করহ নিত্য ॥১৫॥
 (তব) ভক্ত কৃপাবলে অতি শিশুকালে
 তোমার মূর্তি খানি ।
 সাধুর কৃপায় হেরেছিহু হায়
 (কিন্তু) বুঝি নাই তত্ত্ব আমি ॥১৬॥
 দুর্ভাগ্য আমার তাই হাহাকাৰ
 করি এই দুর্দিনে ।
 তব কৃপাকণ না লভি' এজন
 নিরাশ হৃদয়ে মনে ॥১৭॥

তুমি দয়াময় হইয়া সদয়
এ অঙ্গ শিশুর প্রতি ।
করি' আশীর্বাদ নাশি' অবসাদ
ভজিবারে দেহ শক্তি ॥১৮॥
এ ঘোর সংসারে দৈবী মায়া মোরে
প্রতারিছে অবিরত ।
সাধু-গুরু-জন সেবিতে কখন
নাহি চাহে মোর চিত ॥১৯॥
(তব) বিরহ-বাসরে জুড়ি দুই করে,
আজি সারস্বতগণ ।
করিয়া ক্রন্দন বন্দিছে চরণ
ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস ঘন ॥২০॥
আমি অভাজন বিষয়ে মগন
কি দিয়ে পুজিব হায় ।

(আজি) বিরহ-বাসরে জুড়ি দুই করে
বন্দি তব রাজ্য পায় ॥২১॥
ওহে প্রভুপাদ, করহ প্রসাদ
এই দুঃজন প্রতি ।
জনমে জনমে ওরাজ্য চরণে
থাকে যেন মম মতি ॥২২॥
নিয়তই যেন “ভকতি সিদ্ধান্ত-
শ্রীবাণী মন্দিরে” বসি ।
তব গুণগান করি অবিরাম
অহৈতুকী কুপারাম ॥২৩॥
তব শ্রীচরণ অমূল্য রতন
সেবিবারে সদা আশ ।
করিয়া প্রগতি পূজিতে শক্তি
(সদা) যাছে “ভাগবত দাস” ॥২৪॥

কুপাশীর্বাদাকাজ্ঞী—

শ্রীভাগবতচন্দ্র দাস মহাপাত্র
কেশীয়াড়ী, (মেদিনীপুর)

শ্রীশ্রীমন্ত্র সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ত্রয়োদশ-বার্ষিক বিরহ-তিথিতে শ্রীশ্রীগুরু-কুপা-প্রার্থনা

জয় জয় শ্রীভকতি শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী,
জয় জয় জয় প্রভুপাদ ।
জীবের দুর্গতি হেরি, অবনীতে অবতরি',
জগতে করিলে আশীর্বাদ ॥১॥
জয় গুরু নিত্যানন্দ, তোমার চরণদ্বন্দ্ব,
শিরে ধরি করিয়ে বন্দনা ।
কর কুপা নিজ গুণে, পতিত অধম জনে,
দূর মোর হ'ক দুর্কাসনা ॥২॥

তোমার করুণা হ'লে, সর্বসিদ্ধি করতলে,
লভে জীব কৃষ্ণপদে ভক্তি ॥১০॥

বেদব্যাস ভাগবতে, বর্ণিয়াছেন পুরাণেতে,
সর্বদেবময় গুরু হন ।

ছাড় মর্ত্যবুদ্ধি দ্বেষ, অবতার শক্ত্যাবেশ,
ধর ধর শ্রীগুরুচরণ ॥১১॥

বল আমি কি করিছ, জানিয়া অজ্ঞান হ'নু,
কিবা মোর করম ছুঁদেব ।

এ দুর্দিন কবে যাবে, সুদিন উদয় হবে,
তোমার অনন্ত গুণ গাব ॥১২॥

তোমার অনন্ত কীৰ্ত্তি, বলিতে কাহার শক্তি,
আছে বল ভুবন ভিতরে ।

যদি তুমি দাও শক্তি, মূৰ্খ অভাজন প্রতি,
আনন্দে গাইব উচ্চৈঃস্বরে ॥১৩॥

গাইতে তোমার গুণ, জন্ম মোর হউ পুনঃ,
এই মোর হৃদয়ে বাসনা ।

পতিত-পাবন নাম, ঘৃষক এ ধরাধাম,
সর্বজন দেখুক করুণা ॥১৪॥

সম্পদে বিপদে ডাক, তব অনুগত থাকি,
থাকি যেন তব সেবা আশে ।

জন্ম জন্মান্তর পরে, এ দাসে শোধন ক'রে,
দাস-যোগ্য কর নিজ পাশে ॥১৫॥

জীবন স্বপ্নায়ুঃ হৈল, বৃথা কার্যো দিন গেল,
নিষ্কপটে না সেবিতু কভু ।

পৃথায় জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,
অপরাধ-কর্ম মোর প্রভু ॥১৬॥

শ্রীবার্হভানবী রাধা- অন্তরঙ্গ, তবারাধা,
এই শুধু সদা রহ' জাগি ।

‘শ্রীসত্যবিগ্রহদাস’ হ'তে তব দাসের দাস
প্রার্থনা করয়ে রূপা লাগি ॥১৭॥

—দাসভাস শ্রীসত্যবিগ্রহ দাসাধিকারী, লওগাঁ (মেদিনীপুর)

প্রভুপাদের বিরহ-গীতি

জাগিবে! জাগিবে কি আজ জাগিবে—

তোমার বিরহ জাগিবে!

রূপ-রঘু-বাণী করিতে প্রচার,

‘তৃণাদপি’ শ্লোক মিলিবে।

ব্যথিত জনের নয়ন-তারার

আকুল ব্যাকুল বরষা ধারায়

গলিয়া বরিয়া ধুইয়া মুছিয়া

(আমায়) শোধিবে কি আজ শোধিবে।

অগত-শাস্তি গোলোক-বাণী—

তোমায় ভজিতে বলিবে।

বিরহ তিরোভাবে, মিলন আবির্ভাবে—

তোমার আরতি সাজিবে।

অমর বাণ্ড খোল-করতাল

প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে বাজিবে।

‘বিনোদবাণী শঙ্খের ধারা’

ঘুচাবে মায়া-দন্ডের কারা

কৃষ্ণ-বিরহ মাথুর-বিচার,

চেতনে চেতনে কহিবে।

‘গৌর-গীতি-সার’ প্রেমের প্রাবন,

ভুবনে আবার বহিবে!

—শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী

আনন্দপুর (মেদিনীপুর)

বোস সাহেবের প্রশ্নের উত্তর

তৃতীয় প্রশ্ন :—বর্ণাশ্রম কি এযুগেও শুধু গৃহীর পক্ষেই প্রযোজ্য ? শুদ্ধ-বৈষ্ণব ও গৃহী-বৈষ্ণবের ভেদনীতি কোন সূত্রে কি বিদূরিত করা যায় না ? শুদ্ধ-বৈষ্ণব কি যজ্ঞ, যাজ্ঞ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ইত্যাদি করেন না ? আবার তাঁহারা কি রাজ্য-শাসন করিতে পারেন না ? তাঁহারা ধর্ম্যাধিকরণের সাহায্য গ্রহণ ও জমীদারী রক্ষা এবং তাহার আয় দ্বারা সেবা প্রভৃতি করেন না কি ? তাঁহারা চাষ, গোরক্ষা কি করেন না ? করিলে কি তাঁহারা অপরাধ করিবেন ? তাঁহারা কি একই জীবনে, একই অবস্থায় কখনও ব্রাহ্মণ, কখনও ক্ষত্রিয়, কখনও বা বৈশ্য ও শূদ্র হইয়া যান ? হিমাচলবাসী এক শুদ্ধ-বৈষ্ণব যদি ভিক্ষাদ্বারা উপজীবিকার্জন না করিয়া নিজের শরীর রক্ষার্থে চাষ করেন, তবে বহুদূর ভিক্ষার জন্ত যাতায়াতের সময় বাঁচাইয়া ভগবানের নাম করিতে পারেন; তিনি কি গৃহী ?

সদুত্তর :—শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—“চাতুর্কর্মাং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ” অর্থাৎ গুণ ও কর্মবিভাগক্রমে চারিটি বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে। শম, দম, তপস্তা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিষ্ণুপরহ ও সত্য—এই সকল ব্রাহ্মণবর্ণের লক্ষণ। শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য, তেজঃ, দান, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা এবং সত্য—ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। দেবতা, গুরু ও বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি, ধর্ম, অর্থ ও কাম—ত্রিভবের পোষণ, আনন্দিক্য, নিত্য উত্তম এবং নৈপুণ্য—বৈশ্যের লক্ষণ। সাধু বিপ্রগণের প্রতি প্রণাম, শৌচ, অকপটে প্রভুর সেবা, নমস্কার, অশ্বৈর্য, সত্য এবং গো-ব্রাহ্মণগণের রক্ষা—শূদ্রের লক্ষণ। সাধারণ নরমাত্রেয় ধর্ম—সত্য, দয়া, তপস্তা (একাদশাদি ব্রত উপবাস), শৌচ, হৃদয় সচ্ছিত্তা, ঈক্ষা (যুক্তাযুক্ত বিবেক), শম (মনের সংযম), দম (বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম), অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ (দান), স্বাধ্যায় (বেদ বা অধিকারানুযায়ী শাস্ত্রাদি পাঠ) ও সরলতা। অশৌচ, মিথ্যা, চৌর্য, নাস্তিক্য, অযথা কলহ, কাম, ক্রোধ ও তৃষ্ণা—অত্যজদিগের লক্ষণ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই দ্বিজগণ গর্তাধানাদি সংস্কার-ক্রমে উপনয়নরূপ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া জিতেন্দ্রিয়ভাবে গুরুকুলে বাস ও আচার্য্যসমীপে বেদ অধ্যয়ন করিবে এবং মেথলা, অজিন, দণ্ড, অক্ষমালা, ব্রহ্মসূত্র, কমণ্ডলু, জটা ও কুশ ধারণ করিবে। শুচি, সমাহিত ও মৌন হইয়া উভয় সন্ধ্যায় জপ করত অগ্নি, সূর্য, আচার্য্য, গো, বিপ্র, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবতাগণের উপাসনা করিবে। প্রাতঃকাল

ও সন্ধ্যাকালে ভিক্ষালব্ধ সকল দ্রব্য আচার্য্যকে অর্পণ করিবে। তিনি যাহা ভক্ষণ করিতে অনুমতি দিবেন, তাহাই সংযত হইয়া ভক্ষণ করিবে। ভূত্যের স্ত্রায় সর্বদা অ্যচার্য্যের সেবা করিবে। এইরূপ আচার-পরায়ণ ভোগবর্জিত ব্রহ্মচারী বিজ্ঞা-সমাপ্তি কাল পর্য্যন্ত অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করিয়া গুরুকুলে বাস করিবে। ব্রহ্মচারী স্থীলোকদিগকে নিরীক্ষণ, স্পর্শন ও তাহাদের সহিত আলাপ ও পরিহাস প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন এবং মিথুনীভূত প্রাণিমাত্রকেই দর্শন করিবে না।

এইরূপে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কার্য্য সমাপ্তি হইলে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশেচ্ছ ব্যক্তি গুরু-দক্ষিণা প্রদান করিয়া গুরুর অনুমতিক্রমে সমাবর্তন করিবে। সন্ধ্যা হইলে গৃহস্থাশ্রমে, অপর নিষ্কাম হইলে যমে প্রবেশ করিবেন; আর ভগবৎপরায়ণ দ্বিজোত্তম হইতে ইচ্ছা করিলে প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিবেন। যে কোন প্রকারেই হউক, আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিবেন, অন্যশ্রমী হইবেন না।

গৃহস্থাশ্রমী সমান-জাতীয়া, অনিন্দিতা, বয়ঃকনিষ্ঠা মহিলাকে বিবাহ করিবেন। যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও দান—এই তিনটি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সাধারণ ধর্ম্ম; আর প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যাজ্ঞ—এই তিনটি কেবল ব্রাহ্মণের বৃত্তি। যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহকে তপস্যা, তেজঃ ও যশের নাশক মনে করেন, তিনি অধ্যাপন ও যাজ্ঞদ্বারা জীবিকার্জন করিবেন, আর উভয়েতেই কার্পণ্যাदि দোষ দর্শন করিলে স্বামি-পরিত্যক্ত ক্ষেত্র-পতিত শস্যকণা আহরণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবেন অথবা আপণে পতিত শস্যকণাদি সংগ্রহ করিয়া জীবন যাপন করিবেন। অগৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীদের জন্ত ভিক্ষা বিধি। গৃহস্থগণের জন্ত শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষিকার্য্যাদির বিধান দেখা যায়। ভিক্ষাবৃত্তি গৃহস্থের বিধি নহে।

গৃহী-বৈষ্ণব ও শুদ্ধ-বৈষ্ণব বলিয়া পৃথক কথা নাই। শুদ্ধ-বৈষ্ণব গৃহেও থাকিতে পারেন, অন্য আশ্রমেও কালযাপন করিতে পারেন। ভজনের তারতম্যে বৈষ্ণবের তারতম্য। শুদ্ধভক্ত সর্বত্রই সমভাবে সম্মাননীয়। কোন বৈষ্ণব মহাজন গাতিয়াছেন—“যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে পোলোক ভায়।”

আশা করি বোস সাহেবের তৃতীয় প্রश्নের বাকী উত্তর আমার পূর্ব্বলিখিত “দীক্ষায় উপবীতের আবশ্যকতা” নামক প্রবন্ধ ও অপরাপর প্রবন্ধ মধ্যেই পাইবেন।

—ত্রিদিবস্বামী শ্রীমন্তজি ভূক্তের শ্রোতী মহারাজ

ভগবানের কথা

(পূর্ব প্রকাশিত ২৩২ পৃষ্ঠার পর)

আত্মরিক বৃত্তির বহু কারণ থাকিলেও মোটামুটি তিনটি কারণ সম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি। যথা—কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই তিনটি বৃত্তিকেই আত্মনাশক বা নরকের দ্বারস্বরূপ বলা হইয়াছে। ভগবানই জগতের একমাত্র মালিক এবং ভোক্তা—এই কথা যখন আমরা ভুলিয়া যাই, তখনই আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে ভোগ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ভোগের অতৃপ্তিতে ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং সেই প্রকার ক্রোধের বশবর্তী হইয়াই আমরা “আঙ্গুর ফল টক” বলিয়া ব্যর্থচেষ্টা শৃংগালের স্থায় ত্যাগের অভিনয় করি। এই প্রকার ত্যাগের ছলনার মূলে থাকে বৃহত্তর লোভ ও ভোগ, এবং তাহাও বাসনা ভূমিকার আর একটা স্তরমাত্র। অতএব এই প্রকার ভোগ ও ত্যাগের ভূমিকা অতিক্রম করিয়া যে আত্ম-ভূমিকা আছে, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিলে আমরা ভগবানের কথা বুঝিতে পারিব না। সুতরাং আত্মরিক ভাবাপ্রিত থাকিয়া যাইব।

সেই প্রকার আত্মরিক ভূমিকা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আত্ম-কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে হইলে শাস্ত্র-বিধি অনুযায়ী কার্য্য করাই একমাত্র উপায়। উচ্ছৃঙ্খল, অশাস্ত্রীয় ও বিধি-বহির্ভূত কার্য্যগুলি সবই কামাচার। সুতরাং সেই প্রকার কামাচারের দ্বারা ক্রোধ এবং লোভ কোনদিনই অতিক্রম করা যাইবে না এবং তদ্বারা কোন দিনই স্বখলাভ ও উৎকৃষ্ট গতি লাভও হইবে না। অতএব ‘in the dispensation of providence, mankind’ কিভাবে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে অথবা কিভাবে শান্তিলাভ করিতে পারে তাহার পথ প্রদর্শন করিবে কে? শাস্ত্রই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। শাস্ত্র-বিধানোক্ত কার্য্য করিলেই আমরা কামাচার বা যথেচ্ছাচার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি।

কিন্তু যে যুগে আমরা উপস্থিত বাস করিতেছি তাহা ঘোরতর কলিযুগ। এই যুগের লোকগুলি সকলেই প্রায় অজ্ঞায়, মন্দমতি, মন্দভাগ্য এবং সর্বদাই রোগ-শোক দ্বারা উৎপীড়িত। সুতরাং সহজেই তাহাদের শাস্ত্র-প্রীতি নাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে, সকলেই প্রায় অল্পবিস্তর শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া বাস করিতেছে। এই সকল ব্যক্তি শাস্ত্র-বিধি ত’ পালনই করে না, উপরন্তু শাস্ত্রের

কদর্থ করিয়া ক্রমেই কামোখ ভোগরূপ আশ্রয়িক বৃত্তিতে অতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই সকল কলিহত জীবগণের পরিভ্রাণের জন্ত ভগবান্ এবং ভগবন্তগণ সর্বদাই চিন্তিত। ভগবন্ত বৈষ্ণবগণ কৃপাসিন্ধু এবং বাঞ্ছাকল্পতরু। তাঁহারা কলিহত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্ত যে যাহা প্রার্থনা করে, তৎসমুদায় তাহাদের দিয়াও ভগবৎ সূক্ষ্ম যোজনা করিয়া দেন। পতিতপাবন গৌরহৃন্দর শ্রীচৈতন্যদেব এই কলিহত জীবের দুর্দশা দেখিয়া যে উপায় ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন তাহাই সর্বসাধারণের শাস্ত্রবিধি। বেদ-বেদান্ত-বেদান্ত পড়িয়া অগ্রাগ্র যুগে যে-প্রকার চিত্ত শুদ্ধির সম্ভাবনা ছিল, তাহার আর এখন সম্ভাবনা নাই; যেহেতু পূর্ব প্রণালী অল্পসারে ব্রহ্মচর্যাदि স্বল্পভাবে পালন করিয়া শাস্ত্রানুশীলন করিবার সাধারণের ক্ষমতাই নাই। বহু দোষ-দুষ্ট ব্যক্তিগণ বেদ-বেদান্ত পড়িয়া কিছুই করিতে পারিবে না। এই প্রকার সংস্কার-বজ্জিত অনধিকারী ব্যক্তিগণের নিকট বেদান্ত ব্যাখ্যা করা—কেবলমাত্র সময় নষ্ট করা মাত্র। শ্রীচৈতন্যদেবই এই প্রকার কলিহত জীবকে কৃপা করিয়াছেন। সুতরাং যাহারা শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা গ্রহণ করিতে অসমর্থ, তাহারা যে চির-বঞ্চিত হইয়া থাকিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যে সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের দয়ার কথা বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের আর 'in the dispensation of providence' অর্থাৎ মায়া দ্বারা শাসিত হইতে হয় না। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি, অনাদি কর্মফলের বশবর্তী হইয়া মায়া দ্বারা প্রলিপ্ত হইতেছেন, তাহাদিগের জন্ত ভগবান্ কর্মযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পণ্ডিতগণ বলেন যে, চৌরাশী লক্ষ যোনির পর অর্থাৎ জৈব-জগতে নব লক্ষ প্রকারের জলজন্তু যোনি, বিংশ লক্ষ বৃক্ষ পর্বতাদি স্থাবর যোনি, একাদশ লক্ষ ক্রিমি-কীট যোনি, দশ লক্ষ পক্ষী যোনি, ত্রিশ লক্ষ পশু যোনি এবং চারি লক্ষ মনুষ্য যোনির মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে চেতনের 'জড়াবস্থার ক্রমবিকাশ পদ্ধতি'তে ভারত-ভূমিতে মনুষ্য সমাজে জন্ম হয়। উপরোক্ত একটা একটা যোনির মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কত কোটি বৎসর যে চলিয়া যায়, তাহার গণনা হয় না। সুতরাং ভারত-ভূমিতে জন্ম লাভ করিবার পরও যদি আমরা মায়া বশে ভাসিয়া ভাসিয়া 'in the dispensation of providence'—এই হাবুডুবু খাই, তাহা হইলে আর আমাদের দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাই বলিয়াছেন,—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।

জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

ভারত-ভূমিতে যে মহাজনগণের পথ-নিদর্শন আছে, তাহাই অনুসরণ করিলে মনুষ্য জীবনের সার্থকতা হয়। কারণ মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত এবং ভগবানের ত্রীপাদপদ্মের রেণু হইবার জন্ত ভারতবর্ষের মনীষিগণ যেভাবে চেষ্টা করিয়াছেন, এমনটা পৃথিবীর আর কোথাপি দৃষ্ট হয় না। অতীত স্থানে বিশেষতঃ পাশ্চাত্য প্রভৃতি দেশে মায়া-সৃষ্ট শরীর ও মনকেই কেন্দ্র করিয়া জড়বিজ্ঞান-সম্মত বহু পরীক্ষণ ও উন্নতি হইয়াছে দেখা যায়। সেইজন্য তাঁহারা 'in the dispensation of providence' এর দ্বারা কোন প্রকার rest পাইতেছেন না। ভারতবাসীও তাঁহাদের অনুকরণপ্রিয় হইয়া ধ্বংসের পথে চলিতেছেন। এখন ভারতবাসী নিজের জিনিষ জলাঞ্জলি দিয়া পরের দুয়ারে ভিক্ষার্থী হইয়াছেন এবং এই প্রকার মায়ার 'dispensation'এ আসিয়াই তাঁহারা স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইতেছেন। তাহাতে কোন সুবিধা হইবে না। পাশ্চাত্য দেশসমূহে অণুচেতন জীব ও পূর্ণচেতন ভগবানের মধ্যে যে নিত্যকালীন সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-সিদ্ধির কথা আছে, সে বিষয়ে কিছুই আলোচনা করা হয় নাই। সেইজন্য তাঁহারা জড়ের বহুমুখী উন্নতি সাধন করিয়াও বিষয়-বিষয়ের জালায় ছটফট করিতেছে এবং ভারতবাসীও সেইপ্রকার জালার আসামী হইয়া নিজেকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি এখন শান্তির জন্ত ভারতবর্ষের দিকেই চাহিয়া আছেন। শান্তির কথা এই ভারতবর্ষ হইতেই তাঁহাদের কাণে পৌছিবে—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আমরা করিতে পারি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের দুর্দশা ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই বিষয়-বিষয়নে শান্তি বারিস্বরূপ তাঁহার শ্রীমুখ্যরবিন্দ হইতেই গীতাশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন।

সাধারণ কর্ম এবং শ্রীগীতাক্ত কর্মযোগ—এই দুইটিতে বহু পার্থক্য আছে, তাহা জানা প্রয়োজন। আজ তথাকথিত বহু কর্মী-সম্প্রদায় কর্মযোগী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিলেও তাঁহাদের নিজ কর্মের কল যথাযথ ভোগ করিতেছেন দেখা যায়। গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "বুদ্ধিযোগ" কথাটা বহু স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। এই বুদ্ধিযোগের অর্থ—ভগবদ্ভক্তি। কারণ তিনি বলিয়াছেন—“দদ্ধামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপস্থাস্তি তে।” অর্থাৎ তিনি বলিয়াছেন, “ভক্ত্যা মামভিক্শনাতি,” “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ” ইত্যাদি। সুতরাং যে-বুদ্ধিযোগদ্বারা

তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বুদ্ধিযোগ ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভক্তি-দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় একথা চির-প্রসিদ্ধ এবং সেইজন্য ভগবানের একটা নাম ভক্ত-বৎসল।

সেই বুদ্ধিযোগ দ্বারা যে-কর্মকৌশল অবলম্বন করা যায়, সেই কর্ম-কৌশল দ্বারাই মানুষের শাস্তি হইতে পারে। সেই প্রকার কর্ম-কৌশল দ্বারাই মানুষ 'in the dispensation of providence' এ rest পাইতে পারে। সেই বুদ্ধিযোগের কথা গীতাশাস্ত্রে আমরা এইভাবে দর্শন করি। যথা—

এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিযোগে ত্রিমাং শৃণু।

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধঃ প্রহাস্তসি।

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিঘতে।

স্বল্পমপ্যন্ত ধর্মস্তা ত্রায়তে মহতো ভয়াং ॥ (গীঃ ২।৩৯-৪০)

সাংখ্য-যোগ বিশ্লেষণ করিয়া যে শাস্তির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা আধুনিক জগতের লোকের পক্ষে অত্যন্ত দুর্লভ ব্যাপার। কিন্তু বুদ্ধিযোগ দ্বারা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির দ্বারা যে শাস্তি লাভ হয়, তাহা সর্বোচ্চ স্বলভ এবং ব্রহ্মানন্দরূপ শান্তিকেও তুচ্ছকারী। কারণ ভক্তি বিষয়িনী কর্মের প্রগতির কখনই নাশ হয় না অর্থাৎ যতটা সম্ভব করা যায়, ততটাই লাভের বিষয় এবং তাহা কোনদিনই ব্যর্থতায় পর্যাবসিত বা নাশপ্রাপ্ত হয় না। তাহার স্বল্পানুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতার সংসার বন্ধনরূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয় চরণ দে, এডিটর—ব্যাঙ্ক টু-গড্‌হেড্‌

অযোধ্যায় শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

(পূর্ব-প্রকাশিত ৩৯ পৃষ্ঠার পর)

[বিগত ১০ম সংখ্যা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় অযোধ্যায় শ্রীঅন্নকূট মহোৎসবের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাহাতে দুই শতাধিক বিচিত্র ভোগ-সামগ্রী নিবেদিত হয় তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমানে পাঠকবর্গের অবগতির জ্ঞান নিম্নে তাহার তালিকা প্রকাশিত হইল।]

নিবেদিত বিচিত্র প্রসাদের তালিকা

১। স্বতসিক্ত অম্লের স্তূপ, ২। খেচরান্ন, ৩। পুস্পান্ন, ৪। লুচি, ৫। পুরী, ৬। ভট্টনিষ্পত্র, ৭। নিষবর্তীকু, ৮। কঁকরেলার স্ফুতা,

২। পালংশাক, ১০। নটিয়া শাক, ১১। মুলা শাক, ১২। আলুসিদ্ধ, ১৩। কচুসিদ্ধ, ১৪। কাঁচকলা সিদ্ধ, ১৫। ধুন্দুলসিদ্ধ, ১৬। টেড়সিদ্ধ, ১৭। পেঁপেসিদ্ধ, ১৮। কঁরেলাসিদ্ধ, ১৯। বেগুনপোড়া, ২০। ধনেপাতা বাটা, ২১। কুমড়াবীজ বাটা, ২২। পোস্তবাটা, ২৩। উচ্ছেভাজা, ২৪। পটোলভাজা, ২৫। টেড়সভাজা, ২৬। বেগুনভাজা, ২৭। কাঁচকলাভাজা, ২৮। গোলআলু ভাজা, ২৯। বরবটীভাজা, ৩০। কুমড়াভাজা, ৩১। ফুলকপিভাজা, ৩২। লাল আলুভাজা, ৩৩। লঙ্কাভাজা, ৩৪। কঁচুভাজা, ৩৫। পাপড়ভাজা, ৩৬। বুরিভাজা, ৩৭। আরিকেলভাজা, ৩৮। বুটভাজা, ৩৯। মুগডালভাজা, ৪০। চালভাজা, ৪১। চিড়াভাজা, ৪২। আটভাজা, ৪৩। ছোলাভাজা, ৪৪। ছোলাডাল ভাজা, ৪৫। কলার ফুলুরী, ৪৬। কুমড়ার ফুলুরী, ৪৭। বেগুনী, ৪৮। লঙ্কার ফুলুরী, ৪৯। আলুর চপ, ৫০। ফুলকপির চপ, ৫১। ভাজামুগডাল, ৫২। অড়হরডাল, ৫৩। বরবটীচচ্চড়ী, ৫৪। ধুন্দুলচচ্চড়ী, ৫৫। মুলাচচ্চড়ী, ৫৬। কুম্ভুরীচচ্চড়ী, ৫৭। ছেচকী, ৫৮। আলুপোস্ত, ৫৯। পটোলপোস্ত, ৬০। বিজ্ঞাপোস্ত, ৬১। লক্ষ্মিরাব্যঞ্জন, ৬২। কুমড়ার ছক্কা, ৬৩। লিউঘণ্ট, ৬৪। আলুপটলের ডালনা, ৬৫। ফুলকপির ডালনা, ৬৬। ওলের ডালনা, ৬৭। ছানার ডালনা, ৬৮। আলু কপির দম, ৬৯। আলুপটলের দম, ৭০। আলুকাঁচকলার রসা, ৭১। ধোকা, ৭২। আমসহের চাটনি, ৭৩। আলুবোখরার চাটনি, ৭৪। পেঁপের চাটনি, ৭৫। কামরান্ধার চাটনি, ৭৬। টেড়স চাটনি, ৭৭। আমচুরের চাটনি, ৭৮। আমের আচার, ৭৯। আমলকীর আচার, ৮০। নেবুর আচার, ৮১। আমসীর আচার, ৮২। প্রাতিনেবুর আচার, ৮৩। দধিবড়া, ৮৪। কড়ি, ৮৫। রায়তা, ৮৬। দধি-পুলী, ৮৭। পেঁপের মোরঝা, ৮৮। পটোল মোরঝা, ৮৯। আমের মোরঝা, ৯০। বাতাবী নেবু, ৯১। পানিফল, ৯২। পেয়ারা, ৯৩। কামরান্ধা, ৯৪। পাকা পেঁপে, ৯৫। আপেল, ৯৬। কমলানেবু, ৯৭। জ্বাতা, ৯৮। মেণ্ডাফল, ৯৯। নারিপাতি, ১০০। পাকারস্তা, ১০১। বাদাম, ১০২। পৈস্তা, ১০৩। কিস্মিস, ১০৪। কাঁচামুগডাল ভিজা, ১০৫। সাদাখৈ, ১০৬। মুড়ি, ১০৭। খই মুড়কি, ১০৮। কুমড়াবীজের মুড়কি, ১০৯। নিমকি, ১১০। কাঁটা নিমকি, ১১১। কুচা নিমকি, ১১২। চাঁদ নিমকি, ১১৩। ফুলকচুরী, ১১৪। কচুরী, ১১৫। আলু-সিদ্ধাড়া, ১১৬। কপি সিদ্ধাড়া, ১১৭। কিস্মিস সিদ্ধাড়া, ১১৮। আলুর পুরী, ১১৯। সিদ্ধাড়ার পুরী, ১২০। বেসনের পুরী, ১২১। রুটী, ১২২। গোকুলপিষ্টক, ১২৩। বেসনের লাডু, ১২৪। মুঁগের লাডু, ১২৫। ক্ষীরপুরী, ১২৬। বালুসাহী

- ১২৭। মুগসামিল, ১২৮। পেড়াবী গজা, ১২৯। জিহ্বা গজা, ১৩০। চোকাগজা, ১৩১। রসকরা সন্দেশ, ১৩২। ছোলাডালের বরফি, ১৩৩। নারিকেলের বরফি, ১৩৪। মনোরঞ্জন, ১৩৫। চন্দ্রপুলি, ১৩৬। রাধাবল্লভী, ১৩৭। পেপের পানতুয়া, ১৩৮। আলুর পানতুয়া, ১৩৯। মোহনপুরী, ১৪০। কুমড়া নাদসা, ১৪১। মুগের বরফি, ১৪২। অমৃতি জিলিপি, ১৪৩। পাটি সাপটা, ১৪৪। পেপের হালুয়া, ১৪৫। কুমড়াবীজ হালুয়া, ১৪৬। চিড়ার হালুয়া, ১৪৭। চিড়ার মোয়া, ১৪৮। মুড়কির মোয়া, ১৪৯। পানতুয়া, ১৫০। রসগোল্লা, ১৫১। চম্চম, ১৫২। ক্ষীরের বরফি, ১৫৩। মাল্পো, ১৫৪। মুগের লাডু, ১৫৫। ছানার জিলিপি, ১৫৬। লেডিকেনী, ১৫৭। সরভাজা, ১৫৮। দরবেশ, ১৫৯। মনোহরা, ১৬০। মুড়ির মোয়া, ১৬১। ছাতুর মোয়া, ১৬২। খাজা, ১৬৩। লবঙ্গ লতিকা, ১৬৪। ক্ষীরের গজা, ১৬৫। ক্ষীর-ছাঁচ, ১৬৬। ক্ষীরের বরফি, ১৬৭। মুগচূর্ণ, ১৬৮। চুষির পায়স, ১৬৯। চাউলের পায়স, ১৭০। চিড়ার পায়স, ১৭১। পেপের পায়স, ১৭২। ছানার পায়স, ১৭৩। দুধলকলকি, ১৭৪। আস্কা পিঠা, ১৭৫। রসপুলি, ১৭৬। রাজভোগ, ১৭৭। গোপাল ভোগ, ১৭৮। পদ্মখাজা, ১৭৯। জগন্নাথ বল্লভী, ১৮০। আটার লাডু, ১৮১। বেসনের লাডু, ১৮২। নারিকেলের লাডু, ১৮৩। চন্দ্রপুলী, ১৮৪। নারিকেল তক্তী, ১৮৫। কচুর কোন্দা, ১৮৬। কুমড়া বীজের কোন্দা, ১৮৭। নারিকেলের চিড়া, ১৮৮। নারিকেলের জিরা, ১৮৯। নারিকেলের তারা, ১৯০। সিরু চাকলি, ১৯১। ঘোলের সরবৎ, ১৯২। ঢাকাই পরটা, ১৯৩। খুরমা, ১৯৪। দিধি, ১৯৫। ঘনাবর্ত দুধ, ১৯৬। ক্ষীর, ১৯৭। সর, ১৯৮। ছানা, ১৯৯। ননী, ২০০। রুত, ২০১। মাখন, ২০২। মিশ্রী, ২০৩। মধু, ২০৪। রাবড়ী, ২০৫। কালাকান্দ, ২০৬। ত্রীলাটীদানা, ২০৭। পেড়া, ২০৮। কাচাগোল্লা, ২০৯। ক্ষীরমোহন, ২১০। সরপুরী ইত্যাদি বহুবিধ ভোগসামগ্রী। এসম্পর্কে ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্রুত্তি কুশল নারসিংহ মহারাজের চেষ্টাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

—প্রকাশক

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১০ম সংখ্যা ৩৯০ পৃষ্ঠায় ১৭শ পংক্তিতে 'শান্তিময়' স্থলে 'অশান্তিময়', ৩৯৭ পৃষ্ঠায় ১৮শ পংক্তিতে 'দুরবস্থা' স্থলে 'দুরবস্থা দেখিয়া' এবং ১৯শ পংক্তিতে 'শিক্ষাভিমানিকে' স্থলে 'শিষ্টাভিমানিকে' হইবে।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,

চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ,

জেলা হুগলী (পশ্চিম বঙ্গ)

২২শে পৌষ, ১৩৫৬ সাল।

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রমণসম্ভারাদ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ২৪শে মাঘ, ১৩৫৬, ইং ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০, মঙ্গলবার, ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমন্ত্ৰী সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরোক্ত মঠে আগামী ২২শে মাঘ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার হইতে ২৪শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার পর্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, শ্রীত্রৈলোক্য আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদিপঞ্চক, শ্রীগুরুপঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজা ও হোম প্রভৃতি বিরাট ভাবে অস্থাপিত হইবেন। প্রত্যহ মনোহরসাহী কীর্তন, ভাগবতপাঠ, বক্তৃতা, স্তবপাঠ, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সংশন ও অঙ্কলিপ্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান অঙ্গ।

ধর্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যুৎসাহে সবাঙ্কব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদুৎসাহে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহায়ত্ব প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে।

বৈদ্যাসক্যাত্মগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—রবিবার পূর্বাঙ্কে শ্রীপূজাপঞ্চকাদি, সোমবার অপরাঙ্কে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। মঙ্গলবার পূর্বাঙ্কে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঙ্কলি প্রদান, অপরাঙ্কে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস তালিকা

১১ নারায়ণ, ১ পৌষ, ১৬ ডিসেম্বর, শুক্রবার—সফলা একাদশীর উপবাস। শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব; নবদ্বীপ সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিরহ-মহোৎসব।

১২ নারায়ণ, ২ পৌষ, ১৭ ডিসেম্বর, শনিবার—দিবা ৬।২৭ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব।

১৩ নারায়ণ, ৩ পৌষ, ১৮ ডিসেম্বর, রবিবার—শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব। চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বিরহ-মহোৎসব।

১৭ নারায়ণ, ৭ পৌষ, ২২ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার—শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব।

২৬ নারায়ণ, ১৬ পৌষ, ৩১ ডিসেম্বর, শনিবার—পুত্রদা একাদশীর উপবাস।

২৭ নারায়ণ, ১৭ পৌষ, ১ জানুয়ারী, রবিবার—পূর্বাহ্ন ৯।৫১ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

২৯ নারায়ণ, ১৯ পৌষ, ৩ জানুয়ারী, মঙ্গলবার—শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর তিরোভাব। কলিকাতাস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে বিরহ-মহোৎসব।

৪ মাঘ, ২৪ পৌষ, ৮ জানুয়ারী, রবিবার—শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব।

৫ মাঘ, ২৫ পৌষ, ৯ জানুয়ারী, সোমবার—শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর তিরোভাব। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখা মঠসমূহে বিরহ-মহোৎসব।

৭ মাঘ, ২৭ পৌষ, ১১ জানুয়ারী, বুধবার—শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১০ মাঘ, ৩০ পৌষ, ১৪ জানুয়ারী, শনিবার—ষট্ তিলা একাদশীর উপবাস। তৎপরদিবস পূর্বাহ্ন ৯।৫৮ মধ্যে একাদশীর পারণ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশূণ্ণ ॥

অত্ম ধর্ম সুষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১ম বর্ষ

বাসুদেব, ১০ গোবিন্দ, ৪৬৩ গৌরান্দ
রবিবার, ২৯ মাঘ, ১৩৫৬ ; ইং ১২।২।৫০

১২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল-জগন্নাথাস্টকম্

রূপানুগানাং প্রবরং সুদান্তং
শ্রীগৌরচন্দ্রপ্রিয়ভক্তরাজম্ ।
শ্রীরাধিকামাধবচিন্তরামং
বন্দে জগন্নাথবিভূং বরেন্যম্ ॥১॥

শ্রীসূর্য্যকুণ্ডাশ্রয়িনঃ কৃপালো-
বিদ্বদ্বর শ্রীমধুসূদনশ্চ ।
শ্রেষ্ঠস্বরূপেণ বিরাজমানং
বন্দে জগন্নাথবিভূং বরেন্যম্ ॥২॥

শ্রীধামবৃন্দাবনবাসিভক্ত-
নক্ষত্ররাজিস্থিতসোমতুল্যম্ ।
একান্তনামাশ্রিতসজ্জপালং
বন্দে জগন্নাথবিভূং বরেণ্যম্ ॥৩॥

বৈরাগ্যবিছাহরিভক্তিদীপ্তং
দৌর্জ্ঞান-কাপট্যবিভেদবজ্রম্ ।
শ্রদ্ধাযুতেষাদরবৃত্তিমন্তং
বন্দে জগন্নাথবিভূং বরেণ্যম্ ॥৪॥

সংপ্রেরিতো গৌরমুখাংশুনা য-
শচক্রে হি তজ্জন্মগৃহপ্রকাশম্ ।
দেবৈর্নৃতং বৈষ্ণবসার্বভৌমং
বন্দে জগন্নাথবিভূং বরেণ্যম্ ॥৫॥

সঞ্চার্য্য সর্বং নিজশক্তিরশিঃ
যো ভক্তিপূর্ব্বে চ বিনোদদেবে ।
তেনে জগত্যাং হরিনামবন্তাং
বন্দে জগন্নাথবিভূং বরেণ্যম্ ॥৬॥

শ্রীনামধাম্নোঃ প্রবলপ্রচারে
ঈহাপরং প্রেমরসাক্রিমগ্নম্ ।
শ্রীযোগপীঠে কৃতনৃত্যভঙ্গং
বন্দে জগন্নাথবিভূং বরেণ্যম্ ॥৭॥

মায়াপুরে ধামনি সক্তচিত্তং
গৌরপ্রকাশেন চ মোদযুক্তম্ ।
শ্রীনামগানৈর্গলদশ্রবনেত্রং
বন্দে জগন্নাথবিভূং বরেণ্যম্ ॥৮॥

হে দেব ! হে বৈষ্ণবসার্বভৌম ! ভক্ত্যা পরাভূত-মহেন্দ্রধিষ্য !
ত্বদগোত্রবিস্তারকৃতিং সুপুণ্যাং বন্দে মুহূর্ত্ত্তি-বিনোদধারাম্ ॥

বর্ষশেষ

আমাদের পরমোপাশ্রয় শ্রীগৌরমুন্দরের এবং তাঁহার নিজজন শ্রীঠাকুর
ভক্তিবিনোদের অসীম করুণাবলে আজ শ্রীপত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যায় বর্ষ সমাপ্ত
হইল ।

*

*

*

*

পাঞ্চরাত্রিক অধিকার, বৈষ্ণবস্মৃতি, অভক্তিমার্গ, প্রতিকূল মতবাদ, গুরু-
স্বরূপ, ভক্তিমার্গ, অর্থ ও অনর্থ, বন্ধ-তটস্থ ও মুক্ত, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত শীর্ষক
প্রবন্ধগুলি তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকবর্গের পরমানন্দ বিধান করিয়াছে ।

*

*

*

*

শ্রীপত্রিকার প্রকাশ সন্দর্শনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ গৌরভক্তগণ হৃদয়ে সমধিক বল
লাভ করিয়াছেন । বিষয়-মিশ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব-পরিচয়াকাক্ষী ব্যক্তিগণের

নিজ নিজ বিষয় সমৃদ্ধি করিবার বাসনাও এই সংসর্গে প্রবল দেখা যায়। অনেক উচ্চ-শিক্ষিত পাঠকবর্গ শ্রীপত্রিকার প্রবন্ধসমূহ পাঠ করিয়া পত্রিকার সমৃদ্ধিবর্দ্ধনে স্ব স্ব প্রয়াস প্রদর্শন করিয়া আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। সকল শুদ্ধ হরিজনবর্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু ময়্যাপুরচন্দ্রের অপ্রাকৃত কৰুণামৃত বর্ধিত হউক, আমরা এইরূপ প্রার্থনা করি।

স্বতন্ত্রভাবে শ্রীনবদ্বীপ-পত্রিকা প্রচারের পরিবর্তে শুদ্ধ হরিজনবর্গের বিশেষ প্রয়োজনীয় জানিয়া শ্রীপত্রিকাতেই শ্রীচৈতন্যদ ৪৬৩ (?) বর্ষের কাল নির্ণয় হইয়াছে। শ্রীপত্রিকা পাঠান্তে (ইহা) দ্রব্য বাধিবার কাগজমাত্র নহে। ইহার মধ্যস্থিত প্রবন্ধগুলি শুদ্ধভক্তের নিত্যপাঠ্যরূপে বিরাজ করিবে এবং ভাবীকালের তত্ত্বগণের শুদ্ধভক্তির নিদর্শন-স্বরূপে কার্য্য করিবে জানিয়া সাময়িক পত্রিকা হইলেও গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া সংরক্ষিত হইবে আমরা জানি।

নমো মহাবদান্তায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্ত্যনাম্নে গৌরস্বিবে নমঃ ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় মচ্চিদানন্দ-নাম্বিনে।

গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীধামনবদ্বীপের পুরাতনগঞ্জ

যে স্থান হইতে কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীবাসঅঙ্গন উঠিয়া গিয়া কুলিয়ার চরে স্থাপিত হইয়াছিল, সেই স্থানকে লোকে পুরাতনগঞ্জ বলে। সম্প্রতি পুরাতনগঞ্জ গঙ্গার পশ্চিম পারে পড়িয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে পুরাতনগঞ্জের ডুমিটা গঙ্গার পূর্বপারে ছিল। সার্ভে-ম্যাপে গঙ্গাদেবীর প্রাচীন ধারার চিহ্ন দেখিয়া আছে। সেই চিহ্নের অপর পারে মাতাপুর, মাউগাছি, জামগর, বিদ্যানগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থান লক্ষিত হয়। সেই পূর্বধারা অবলম্বন করিয়া পুরাতনগঞ্জ ও বর্তমান নবদ্বীপের নহলাপাড়া এই দুই স্থানের মধ্য দিয়া যে গঙ্গাভরাটা বালুকা দেখা যায়, তাহাই তাৎকালিক গঙ্গাগর্ভ বলিয়া স্থির করিয়া লইলে আর কিছুই বুঝিতে কষ্ট থাকে না। সেই ধারাচিহ্ন মাতাপুর হইতে অঙ্কিত করিয়া আনিলে এখনকার গঙ্গাধারায় সংলগ্ন করত গঙ্গানগর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে হইবে।

আবার গঙ্গানগর হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ববাহিনী হইয়া তখনকার গঙ্গা মায়াপুর স্পর্শ করত একটু ঘুরিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম গতিদ্বারা গাদিগাছার নীচে দক্ষিণ দিকে চলিলেন। এইরূপ গঙ্গার গতি বিচার করিয়া লইলে প্রাচীন নবদ্বীপের আকৃতি স্থির হয়। নক্সায় এইরূপ গঙ্গার গতি অঙ্কিত করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে প্রাচীন নবদ্বীপ কুর্খাকৃতি ভূমি। তাহারই উত্তর ভাগে শ্রীমায়াপুর বল্লালদিঘী, ব্রাহ্মণপুষ্করিণী ও প্রাচীন বিষ্ণুপুষ্করিণী ও তারনবাস (যাহা তখন সিমুলিয়া ছিল)— এই সকল পল্লী দেখা যাইবে। দক্ষিণাংশে বেঙ্কল্পর, আতপপুর, ভাৰুইডেঙ্গা, নিদয়া, গঙ্গানগর, পুরাতনগঞ্জ, দেওয়ানেরগঞ্জ এই সকল বসতি ছিল। গঙ্গাদেবী ভাস্কিতে ভাস্কিতে ক্রমশঃ দক্ষিণস্থিত কয়েকটা পল্লী উৎসন্ন করিয়া গঙ্গানগর পর্য্যন্ত আসিবার সময় দক্ষিণ অংশের ভূমিটা গঙ্গাভরাটী বালুময় হইয়া গেল এবং তাৎকালিক গঙ্গার পশ্চিমতীর-স্থিত গ্রামগুলির সহিত মিলিত হইয়া পড়িল। ঐসব পল্লীস্থিত ব্যক্তিগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে নিজ-নবদ্বীপের প্রজা ছিলেন। তাঁহারা অনেকেই সংলগ্ন পশ্চিমতীরস্থ গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইলেন। সেই অবসরে কুলিয়াগ্রামের অনেকাংশ ভূমি নিজ-নবদ্বীপবাসীর বাসভূমি হওয়ায় নবদ্বীপ নামে বিখ্যাত হইতে লাগিল। গঙ্গাভরাটী নিজ-নবদ্বীপের ভূমি ক্রমশঃ বসতিযোগ্য হইলে তথায় স্থলপয়বস্তুরূপে পুরাতনগঞ্জের উদয় হইল। পুরাতনগঞ্জে নবদ্বীপবাসিগণ আসিয়া পুনরায় ঘর ও দ্বার, দোকানাди বসাইতে লাগিলেন। সেই সময়ে বৈষ্ণবগণ তথায় শ্রীবাসঅঙ্গন সৃজন করিলেন। সেই শ্রীবাসঅঙ্গন ক্রমশঃ গঙ্গা হইতে অতিদূর হওয়ায় ত্রিশ চল্লিশ বৎসর হইল কুলিয়ারচরে গিয়াছে। কুলিয়ারচরে গঙ্গার স্রোত নিকটবর্তী থাকায় পুরাতনগঙ্গবাসিগণ জলকষ্টে ক্রমশঃ পুনরায় কুলিয়া নবদ্বীপ আশ্রয় করিতে লাগিলেন।

পুরাতন যে শ্রীবাসঅঙ্গন হইয়াছিল তাহা কোথা হইতে আসিয়াছিল, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। শ্রীমায়াপুরে খোলভাঙ্গা ডেঙ্গার সমীপে আদি শ্রীবাসঅঙ্গন ছিল। একথা আমরা অনেক প্রমাণের সহিত পরে দেখাইব। শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভুর সন্ন্যাসের কিছু দিবস পরেই শ্রীবাসপণ্ডিত নিজের নবদ্বীপস্থ-বাটী পরিত্যাগপূর্বক কুমারহাটে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহার বহুতর প্রমাণ আছে। আবার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ামাতার অদর্শনে শ্রীমায়াপুরের শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভিটা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভু বংশীবদনানন্দ ঠাকুর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্তি কুলিয়াগ্রামে নিজ বাটীতে লইয়া যান, তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। শ্রীমায়াপুরে যে-সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত বাস করিতেন, তাঁহারা কয়েকটা

কারণবশতঃ স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। সে সমস্ত কারণ আমরা ক্রমশঃ সপ্রমাণ আলোচনা করিব। লীলাস্থানসকল এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া বহুদিন থাকিলে পর বৈষ্ণবদিগের চিত্তে দুঃখের উদয় হইল। তাঁহারা নিজ-নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে কোম অংশে বাস করিয়া সুখলাভ করিবেন এই আশয়ে স্থানে স্থানে বৈরাগীভেঙ্গা, শ্রীবাসঅঙ্গন প্রভৃতি পত্তন করিয়াছিলেন। দেওস্নান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সময় অনেকেই পুরাতনগঙ্গ ও কুলিয়া হইতে আসিয়া তাঁহার নিশ্চিত রামচন্দ্রপুর গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। সে-সময়ে গঙ্গাদেবী ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে যতদূর পূর্বে আসিয়াছিলেন, সেই জলধারার পূর্বতীরে রামচন্দ্রপুর পত্তন হইয়াছিল। এখন সেই ভূমিটা গঙ্গার পশ্চিমপারে বালুকামধ্যে পড়িয়াছে। সিংহ মহাশয়ের কৃত মন্দিরাদির চিহ্ন সেই সব বালুর মধ্যে এখনও দেখা যায়। রামচন্দ্রপুর ভাঙ্গিয়া গেলে গঙ্গার পশ্চিমতীরে স্বস্থল-পয়বস্তি-ভূমিতে বৈরাগিগণ গিয়া শ্রীবাসঅঙ্গনাদি পত্তন করেন। পুরাতনগঙ্গ হইতে গঙ্গা অধিক দূরে পড়িলে বৈরাগিগণ কুলিয়া আশ্রয় করিয়াছেন। এই সকল কথা আমরা এই প্রবন্ধে লিখিলাম। আমাদের হস্তে এ-সমস্ত বিষয়ের প্রমাণ সংগৃহীত আছে। আবশ্যকমতে প্রকাশ করিব। আমরা পূর্বপ্রবন্ধে শ্রীপাটকুলিয়ার ভূমি নিরূপণ করিয়াছি। এ-প্রবন্ধে পুরাতনগঙ্গ সম্বন্ধে যাহা ব্যক্তব্য তাহাই বলিলাম। নিজনবদ্বীপ-সংস্থাপন বিষয়ে আগামী প্রবন্ধে অনেক কথা বলিব। পাঠকবৃন্দের নিকট আমরা এই অনুরণ করি যে, তাঁহারা * * * * স্বচক্ষে কুলিয়া গ্রামের সকলাংশ এবং প্রাচীন গঙ্গাধারা অবলম্বনপূর্বক পুরাতনগঙ্গ পর্য্যন্ত পৌছিয়া শ্রীনবদ্বীপধামের রহস্য দৃষ্টি করিবেন। তাহা দৃষ্টি করিয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরান্ধ-বিষ্ণুপ্রিয়া দর্শন করুন। নিরপেক্ষভাবে এই সকল স্থান দর্শন করত * * ভালরূপে বিচার করিতে করিতে স্থান সকল নিদ্রিষ্ট করিবেন। এবার স্থানাভাবে অধিক বলিতে পারিলাম না।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সজ্জনতোষণী ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১০২ পৃষ্ঠা)

সনাতনাভিন্ন শ্রীগুরুদেব

বৈরাগ্য-যুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-

রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমক্ৰম্ ।

কৃপাস্বধির্ষঃ পর-দুঃখ-দুঃখী

সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥

(পর) দুঃখেতে কাতর, দয়ার সাগর,

গুরুদেব মহাশয় ।

করিতে শোধন, মোর ছষ্ট মন,

গুরুরূপে প্রকটয় ॥১॥

চাহেনা ভজিতে মোর ছষ্ট চিত্তে,

বিষয় ভোগেতে রত ।

তবু কৃপা করি এ' অধম পরি

কহেন শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ॥২॥

অজ্ঞান আধারে বহুজন্ম ধ'রে,

পড়েছিলা আমি হায় !

শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ভজিতে কখন

মোর চিত্ত নাহি চায় ॥৩॥

করিয়া যতন যেই মহাজন,

মো'হেন অজ্ঞান জনে ।

বৈরাগ্য-যুক্ত ভক্তি-রস পূত

সচেষ্ট করাতে পানে ॥৪॥

সম্বন্ধ প্রদাতা, গুরুদেব ত্রাতা

সনাতনাভিন্ন হ'ন ।

সে গুরু চরণে, এই মূঢ় জনে,

(যেন) থাকে নত সর্কক্ষণ ॥৫॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিকুয়ুদ সম্ভ

বোস সাহেবের প্রশ্নের উত্তর

—চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর—

আমরা শ্রীমদ্ভগবদগীতায় দেখিতে পাই—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ প্রিয়ভক্ত অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া সর্বজীবকেই উপদেশ করিয়াছেন যে, জীব ক্ষণমাত্র কালও কৰ্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। স্ব-স্ব-প্রকৃতিবশে অবশভাবেও কৰ্ম করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু কৰ্ম করিতে হইলে কৰ্ম, অকৰ্ম ও বিকৰ্ম বিচার করিয়া প্রকৃত কৰ্ম নির্ণয়পূর্বক কৰ্ম অহুষ্ঠান করা কর্তব্য। আবার কৰ্ম বলিতে কেবল ভগবৎকৰ্মই করা উচিত, অথবা কৰ্মের বন্ধন হইয়া থাকে ;—

যজ্ঞার্থং কৰ্মণোহহুত্ব লোকোহয়ং কৰ্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কৰ্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ (গীতা—৩৯)

অর্থাৎ হরিতোষণার্থ নিষ্কামকৰ্মকে ‘যজ্ঞ’ বলে। সেই যজ্ঞের উদ্দেশে যে কৰ্ম করা যায়, তদ্ব্যতীত অহুত কৰ্ম, সে সমুদয়ই ‘কৰ্মবন্ধন’ বলিয়া জানিবে। তুমি যজ্ঞার্থ সমুদয় আচরণ কর। কামনার উদ্দেশে হরিতোষণার্থ কৰ্মও বন্ধন-হেতু হয়, অতএব ফলাকাঙ্ক্ষারিত হইয়া ভগবন্তুষ্টির জগ্ন কৰ্ম কর।

ভগবন্তোষণপর কৰ্মকে ভক্তিরই অন্তর্গত বলিয়া জানিতে হইবে। গীতার কৰ্মযোগের তাৎপর্য ভগবদ্ভক্তিতে পর্যাবসিত। তদ্ব্যতীত সমস্ত গীতার সারমর্ম অবগত হইলে বুঝিতে পারা যায় যে, একমাত্র ভগবদ্ভক্তির অহুষ্ঠান করাই জীব মাত্রেরই কর্তব্য। তাহা শেষ অধ্যায়ে পরিস্ফুট হইয়াছে ; যথা—

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥

মন্যনা ভব মন্ত্রকো মদধাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥ (গীতা ১৮।৬৪-৬৫)

গুহ্য—‘ব্রহ্ম-জ্ঞান’ ও গুহ্যতর—‘ঐশ্বর-জ্ঞান’ তোমাকে বলিলাম। এক্ষণে গুহ্যতম—ভগবজ্জ্ঞান উপদেশ করিতেছি শ্রবণ কর। আমি এই গীতাশাস্ত্রের মধ্যে যত উপদেশ দিয়াছি, সে সমুদায় অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমার হিতের জগ্নই আমি বলিতেছি। ভগবদ্ভক্ত হইয়া তুমি আমাকে চিত্ত অর্পণ কর। কৰ্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ধ্যানযোগিগণ বৈরূপ চিন্তা করেন, সেরূপ করিবে না। সমস্ত কৰ্মেই আমার ভগবৎস্বরূপের যজ্ঞ কর। তাহা হইলে তুমি আমার এই সচ্চিদানন্দস্বরূপের নিত্য সেবক লাভ করিবে—

ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াই এই নিগুণভক্তির উপদেশ করিলাম।

আবার সর্বশেষে বলিলেন,—

সর্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং হ্যং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িত্বামি মা শুচঃ ॥ (গীতা ১৮।৬৬)

ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ঈশ্বর-জ্ঞান-লাভের উপদেশস্থলে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম, যতিধর্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদিধর্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম বলিয়াছি, সে সমুদায় পরিত্যাগপূর্বক ভগবৎস্বরূপ আমার একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর; তাহা হইলেই আমি তোমাকে সংসার-দশার সমস্ত পাপ তথা পূর্বোক্ত ধর্ম পরিত্যাগের যে-সকল পাপ, সে সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব। তুমি অকৃতকর্ম্য বলিয়া শোক করিবে না। আমাতে নিগুণভক্তি আচরণ করিলে জীবের চিৎস্বভাব সহজেই স্বাস্থ্যলাভ করে। ধর্ম্মাচরণ, কর্তব্যাচরণ ও প্রায়শ্চিত্তাদি তথা জ্ঞানাভ্যাস, যোগাভ্যাস ও ধ্যানাভ্যাস কিছুই আবশ্যক হয় না। বন্ধাবস্থায় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত কর্ম করিবে। কিন্তু সেই কর্মে ব্রহ্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরনিষ্ঠা ত্যাগপূর্বক ভগবৎ সৌন্দর্য-মাধুর্য্যাক্রুষ্ট হইয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপত্তি অবলম্বন কর। তাৎপর্য্য এই যে, শরীরি-জীব জীবন নির্বাহের জন্ত যত প্রকার কর্ম করে, সে সমুদায়ই উক্ত তিন প্রকার নিষ্ঠা হইতে অথবা ইন্দ্রিয়-স্থ-নিষ্ঠারূপ অধম নিষ্ঠা হইতে অহুষ্ঠান করে। অধম নিষ্ঠা হইতেই অকর্ম ও বিকর্ম। তাহা অনর্থ-জনক। তিনপ্রকার উত্তম নিষ্ঠার নাম—ব্রহ্মনিষ্ঠা, ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ভগবন্নিষ্ঠা। বর্ণাশ্রম ও বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত কর্মই এক এক প্রকার নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া এক এক ভাব প্রাপ্ত হয়। তাহারা যখন ব্রহ্মনিষ্ঠার অধীন হয়, তখন কর্ম ও জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়; যখন ঈশ্বরনিষ্ঠার অধীন হয়, তখন ঈশ্বরার্পিত কর্ম ও ধ্যানযোগাদিরূপ ভাবের উদয় হয়; যখন ভগবন্নিষ্ঠার অধীন হয়, তখন শুদ্ধা বা কেবলাভক্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব এই ভক্তিই গুহ্যতম তত্ত্ব এবং প্রেমই জীবের চরম প্রয়োজন। (গীতার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিদ্বদ্বঙ্গন-ভাষ্য)

নানা প্রতিবন্ধে বিক্ষিপ্তচিত্ত আমি কি প্রকারে তদগতচিত্ত হইব, এই আশঙ্কার সমাধানার্থ “সর্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য” শ্লোকের অবতারণা। নিত্যধর্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ জন্ত ‘সর্ব’-শব্দ-প্রয়োগ। ‘পরি’ উপসর্গ দ্বারা ধর্ম সকলের স্বরূপতঃ ত্যাগ সমর্থন করিলেন। ধর্ম্মত্যাগ দুই প্রকারে সম্ভব হয়—স্বরূপতঃ ও

ফলতঃ ত্যাগ। অনুষ্ঠান পরিত্যাগ স্বরূপতঃ ত্যাগ, আর ফলাকাজ্ঞাশূন্য হইয়া ধর্ম্যানুষ্ঠান করিলে ফলতঃ ত্যাগ হয়। সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণ-শরণাপত্তির জ্ঞান বর্ণাশ্রম ধর্ম ও ত্যাগ করা উচিত। ‘বর্ণাশ্রম’ ধর্মশাস্ত্র বিহিত; তাহা ত্যাগ করিলে প্রত্যাবায় ঘটে। এই আশঙ্কার নিরসনার্থ “অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ” বাক্যের উল্লেখ। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা-পালনই ধর্ম, আর তাহা লঙ্ঘন করাই অধর্ম। একবার দৃঢ়তা সম্পাদন নিষেধ-বাক্য দ্বারা বলিলেন— “মা শুচঃ” অর্থাৎ তুমি নিশ্চিন্তমনে আমার ভজন কর।

বহুবিধ বাক্যের পর মহোপসংহার বাক্যে ‘সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য’ বাক্যদ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া সেই উপদেশ গ্রহণ কর—এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই অনুরূপ শ্লোকের উল্লেখ দেখা যায়—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ (ভাঃ—১১।২।৬)

অর্থাৎ যে ধর্মের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রিয়াতোত ভগবানে অহৈতুকী ও প্রতিবন্ধক রহিতা ভক্তি জন্মে, তাহাই জীবমাত্রের পরম ধর্ম; তাহার দ্বারা আত্মা সুপ্রসন্ন হয়। পুনশ্চ বলিতেছেন,—

কর্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিক্যাদমঙ্গলম্।

বিপশ্চিন্নস্বরং পশ্চাদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥ (ভাঃ ১১।১২।১৮)

কর্মকাণ্ডনিরত জনগণের উপাশ্রু আধিকারিক দেবতা বিরিকি হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ত্রিগুণতাড়িত অধিষ্ঠানগুলিই অমঙ্গলের আকর। কেননা, উহার বিকারি জগতে আবদ্ধ। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহ জগতে লৌকিক ক্ষণভঙ্গুরতা ও দোষপ্রবণতা লক্ষ্য করিয়া পরোক্ষবাদীর পরজগতের নশ্বরতা ও অমঙ্গল দর্শন করেন। কর্মপথপ্রাপ্য ব্যাপার আত্মবিদের অপ্রয়োজনীয়। ইহা বুঝিতে না পারিলেই নশ্বর কর্মকাণ্ড জীবকে আবদ্ধ করে।

অতএব কলিযুগে ভক্তিযোগই সর্বব্যক্তির পক্ষে একমাত্র মূখ্য ধর্ম। তদ্ব্যতীত অত্র ধর্মে বাস্তবিক মঙ্গলের আশা নাই। এজন্তই এযুগের বৈষ্ণব মহাজনগণ নির্ভীকভাবে ভক্তিযোগেরই প্রচার করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া অত্র ধর্মের বা অত্র কথার প্রচার তাঁহাদের নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিছুদেব শ্রোতী মহারাজ

ভগবানের কথা

(পূর্ব প্রকাশিত ৪৩৬ পৃষ্ঠার পর)

শুদ্ধ ভক্তিব্যোগ একটিই মাত্র। কিন্তু বুদ্ধিব্যোগ কোণে কৰ্ম ও জ্ঞানে নিয়োজিত করিবার উপায়—এই গীতাশাস্ত্রেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বুদ্ধিব্যোগ যখন কৰ্মের সীমাকে লক্ষ্য করিয়া কৰ্মমিশ্র হয়, তখনই তাহাকে ‘কৰ্মব্যোগ’ আখ্যা দেওয়া হয়। আবার জ্ঞানের সীমাকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানমিশ্র হইলে তাহা ‘জ্ঞানব্যোগ’ নামে অভিহিত হয়। কিন্তু তদুভয় সীমাকে অতিক্রম করিয়া যখন কেবল-ভক্তি জ্ঞান-কৰ্মাদির দ্বারা অনাবৃত হয়, তখনই তাহা বিশুদ্ধ ‘ভক্তিব্যোগ’ নামে অভিহিত হয়।

ইহজগতে লৌকিক বা বৈদিক যে-সকল কৰ্মের আমরা অহুষ্ঠান করি তাহা সমস্তই পৃথক্ পৃথক্ ফল প্রসব করে। সেই সকল বহুধা ফল ভোগ করিবার সময়ে আবার নূতন নূতন কৰ্ম এবং কৰ্মফলের সৃষ্টি হয়; সেগুলিও আবার পৃথক্ পৃথক্ ফল প্রসব করে বলিয়া সেই সমস্ত কৰ্মগুলি কৰ্মব্যোগ আখ্যা পাইতে পারে না। সুতরাং কৰ্ম ও কৰ্মফলরূপ একটি বৃহৎ বৃক্ষ বিরাট শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। কৰ্মফলভোগী সেই বৃহৎ বৃক্ষের ফল ভোগ করিতে করিতে যে সংসার-দশা লাভ করে তাহাই ‘in the dispensation of providence’ এর দুঃখালয়রূপ অশান্ত অশান্তির আকর। জন্মজন্মান্তরেও সেই সংসার-বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কৰ্ম ও কৰ্মফলের বশবর্তী হইয়া যায়। ফলে চৌরাশীলক্ষ নানা যোনিতে উপর্যধো ভ্রমণ করিতে করিতে ত্রিতাপ যন্ত্রণায় দগ্ধভূত হইয়া কোনমতেই rest বা শান্তি পায় না। অথচ সেই প্রকার কৰ্ম ত্যাগ করিবারও আমাদের উপায় নাই। সমস্ত কৰ্মত্যাগ করিবার অভিনয় করিয়া তথাকথিত সন্ন্যাসীর বেশ লইয়াও উদরপূর্তির জন্য বহু প্রকার কৰ্ম করিতে হয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অধস্তন সন্ন্যাসীবর্গের অবস্থা চিন্তা করিয়াই বলিয়াছিলেন, “উদর-নিমিত্তঃ বহুকৃত-বেশম্”। সুতরাং কৰ্মত্যাগ করিবার উপায় মোটেই নাই। সেইজন্য অর্জুন মহাশয় তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত কৰ্ম—যুদ্ধ ত্যাগ করিবার অভিনয় করিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই উপদেশ করিয়াছিলেন, যথা—

নিয়তং কুরু কৰ্ম ত্বং কৰ্ম জ্যায়ো হ্যকৰ্মণঃ ।

শরীরযাত্ৰাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকৰ্মণঃ ॥ (গী: ৩।৮)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুন মহাশয়কে উপদেশ করিলেন, তুমি সৰ্বদাই শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম করিতে থাক। কৰ্ম ত্যাগ করিলে তোমার শরীর যাত্ৰাও নির্বাহ হইবে না। অনধিকারী ব্যক্তি নিজ কৰ্ম ত্যাগ করিলে জগজ্জ্ঞান উপস্থিত হয়। শরীর যাত্ৰাই যখন কৰ্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত সাধিত হয় না, তখন কৰ্ম্মত্যাগও সম্ভব নহে। অথচ কৰ্ম ও কৰ্ম্মফলরূপ যে সংসার-বৃক্ষ গড়িয়া উঠে, তদ্বারা জীবের কোন প্রকারই শাস্তির আশা নাই। সেই জন্তই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৰ্ম্ম কিভাবে করিতে হইবে তাহার উপদেশ করিলেন, যথা—

যজ্ঞার্থাৎ কৰ্ম্মণোহন্তাত্ত লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কৰ্ম্ম কোন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ (গীঃ ৩।৯)

কৰ্ম্ম করিয়াও যে-কৰ্ম্মফল বন্ধন না করিয়া মুক্ত করিয়া দেয়, তাহা 'Providence' এর আর একপ্রকার 'dispensation'। সমস্ত কৰ্ম্মই যজ্ঞার্থে অর্থাৎ বিষ্ণু-প্রীত্যর্থ্যে করাই মুক্তসঙ্গ-কৰ্ম্ম-পদ্ধতি বা কৰ্ম্ম-যোগ-কৌশল। এই প্রকার কৰ্ম্ম-যোগ-কৌশলদ্বারা কৰ্ম্মবন্ধন মুক্ত হইয়া জীবের নিত্য-সিদ্ধ ভগবদ্-ভক্তি ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হয়। সেইজন্ত এই কৰ্ম্মযোগকে নিকাম কৰ্ম্মযোগও বলা যায়। নিকাম বলিতে—যে কৰ্ম্মে নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক কোন কামনা নাই। অর্থাৎ সমস্ত কৰ্ম্মফলই নিজে ভোগ না করিয়া ভগবানকে সেই ফল প্রদান করা।

আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে সকলকেই সামর্থ্যানুযায়ী অর্থাদি সংগ্রহ করিতে হয়। অর্থাদির বিনিময়ে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে হয় এবং সেই দ্রব্যাদিই ভোজ্যরূপে পরিণত হইলে আমাদের শরীরযাত্রা নির্বাহ হয়। যথাযথ ভোজন না করিলে শরীর রক্ষা হয় না এবং শরীর রক্ষা না হইলে আবার ভোজ্য বস্তুও সংগ্রহ হয় না। কোনটি কারণ এবং কোনটি কার্য তাহা নির্ধারণ করা দুৰূহ ব্যাপার। সুতরাং উভয়ই উভয়ের কার্য-কারণ বলিয়া ইহাকে এককথায় কৰ্ম্মচক্র বলা যাইতে পারে। এইপ্রকার কৰ্ম্মচক্রে জন্মজন্মান্তর ঘুরপাক খাওয়াই আমাদের ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ। সেই প্রকার ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণশীল কোন ভাগ্যবান্ জীব ভগবানের এবং সাধুগুরুর রূপায় নিজের দুর্ববস্থার কথা বুঝিতে পারে এবং তদনুরূপ কার্য করিয়া মুক্তসঙ্গ হইবার চেষ্টা করে।

জড়জগতের যে একটা তাৎকালিক স্থখ শাস্তি আছে তাহাই আমাদের প্রাপ্য বস্তু নহে। যেহেতু আমরা সকলেই নিত্য শাস্ত বস্তু, সেহেতু আমাদের নিত্য স্থখের জন্ত আবাহমানকাল চেষ্টা। কিন্তু আমরা আলেয়ার স্থখ-শাস্তির জন্ত

জন্মজন্মান্তর কেবল শরীর পান্টাইয়া পান্টাইয়া চতুর্দশ ভুবন ভ্রমণ করিতেছি। ইহার কোন হিসাবই আমরা করি না। অথচ ১০।২০ বৎসরের স্থখ-শান্তির জন্ত আমরা কি ভাবেই রক্তপাত করিতেছি। আমরা আশ্চর্যিক বৃত্তিতে যে স্থখ বা রসের অন্বেষণ করি, তদ্বারা আমাদের শান্তি লাভ হয় না; কারণ আমরা জানি না যে স্থখশান্তি কোথায়। প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদের বলিয়াছেন, “ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং”।

আমরা কিন্তু স্বার্থান্বেষণ করিতে করিতে উদ্দেশ্যহীন হইয়া জড় শরীর ও মনরূপ জাহাজে বসিয়া সংসার সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন কূল না পাইয়া কেবল ধাক্কাই খাইতে থাকি ও মনে করি “in the dispensation of providence man cannot have any rest.” আমরা যদি জানিতাম যে আমাদের ভবসিন্ধুর কূল বা আমাদের চরম-স্বার্থ “বিষ্ণু,” তাহা হইলে আর আমাদের দুঃখ থাকিত না। সেই কথা আমাদের জানা নাই বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জানাইলেন যে যজ্ঞার্থে বা বিষ্ণু-প্রীত্যর্থ্যেই কৰ্ম করা আবশ্যক। স্বক্মম্ভেও আমাদের এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যথা—“তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ” ইত্যাদি। অতএব যাহারা সুরয়ঃ অর্থাৎ দেবতাপর্যায়ভুক্ত তাঁহারা সর্বদা বিষ্ণুপাদপদ্মকেই স্বার্থগতি বলিয়া জানেন। স্ততরাং তদর্থ্যে অর্থাৎ সেই বিষ্ণুরই প্রীত্যর্থ্যে কৰ্ম করাই আমাদের মুক্তসঙ্কের সমাচরণ। যদি কৰ্মচক্র হইতে পরিত্রাণ পাইতে হয় তাহা হইলে মনুষ্যজাতিকে বিষ্ণুর পাদপদ্ম লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে। তাহা না করিলে অম্বর হইয়া যাইতে হইবে।

বর্ণাশ্রম ধর্মাবলম্বিগণ বা সনাতনধর্মাবলম্বিগণ যাহারা হিন্দু নামে অভিহিত হইতেছেন, তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ বিশেষ করিয়া যাহারা উচ্চবর্ণে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুকেই কেন্দ্র করিয়া শরীরষাত্রা নির্বাহ করিতেন। সকল আশ্রমেই বিশেষ করিয়া গৃহস্থাশ্রমিগণ প্রত্যেকেই গৃহে বিষ্ণুসেবারূপ নিত্য যজ্ঞ করিতেন বা এখনও বহু নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ তাহা করেন।

সেই বিষ্ণুসেবার জন্তই অর্থ সংগ্রহ করা, অর্থের বিনিময়ে ভোজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করা এবং সেই সকল ভোজ্যদ্রব্য বিষ্ণুরই ভোগের জন্ত রন্ধন করা এবং পশ্ছে সেই বিষ্ণুর্নৈবেদ্য প্রসাদরূপে সম্মান করা ইত্যাদি সমস্ত কার্যের ভিতর বিষ্ণুপ্রীতি বা যজ্ঞ সাধিত হইত। তাহা পূর্বে সম্ভব ছিল বা এখনও কোথাও কোথাও প্রকটিত আছে। সেই পদ্ধতি সার্বজনীনভাবে সর্বত্র এবং সকল বিষয়েই

প্রযোজ্য হইতে পারে। অতএব সেই স্বার্থগতি বিষ্ণু যিনি সর্বৈশ্বর ভগবান্ তাঁহারই প্রীত্যর্থ সমস্ত কৰ্ম্মের অহুষ্ঠান করিলেই আমরা কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি পাইব। প্রগতিশীল কৰ্ম্মের প্রতিরোধ না করিয়া সমস্ত কৰ্ম্মই ‘তদর্থ’ কৰ্ম্ম অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ সম্পাদন করাই বিধেয়। পণ্ডিতগণ বলেন, বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভই মুক্তি, “মুক্তিঃ বিষ্ণুজিহ্নলাভঃ”, বিষ্ণুর স্বার্থেই নিজের স্বার্থ পরিপূর্ণ হয়, ইহাই কৰ্ম্মযোগের ক্রমপন্থা। এবং সেই কৰ্ম্মের ফল কি সে-বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—যজ্ঞ বা ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে কার্য্য না করিলে সমস্ত কার্য্যেই গরল বা পাপ উৎপত্তি হইয়া জগদ্বিপ্লব উপস্থিত হয়।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সৰ্ব্বকিৰ্ব্বিধৈঃ ।

ভুঞ্জতে তে ত্বং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাং ॥ (গীঃ ৩।১৩)

শরীরষাত্রা নির্বাহ করিবার জন্য উল্লিখিত যে বিষ্ণুসেবার পদ্ধতি কথিত হইল, তদ্বারা কোনপ্রকার আপাতদৃষ্টিতে পাপ কার্য্যের উদ্ভব হইলেও, তাহা হইতে যজ্ঞাবশিষ্ট ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণ করিলে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। আমরা অত্যন্ত সাবধানে থাকিলেও এবং খুব দৃঢ়ভাবে অহিংস-নীতি অবলম্বন করিলেও আমরা যে কৰ্ম্মচক্রে মধ্য ভ্রমণ করিতেছি, তাহাতে অজ্ঞাতসারে বহুপ্রকার পাপই সাধিত হইয়া যাইতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, সাধারণ লোকাচার এবং ব্যবহারিক কার্য্যে বিশেষ করিয়া রাজনীতি কার্য্যে প্রায়ই পাপ করিতে হয়। মুখে অহিংসার কথা বলিয়া কার্য্যে হিংসা করা ব্যতীত বাঁচিবারই উপায় নাই। সৰ্ব্বপ্রকার পাপ কার্য্য হইতে বিরত হইলেও অন্ততঃ ‘পঞ্চসূনা’ নামক পাপ-কার্য্য হইতে কিছুতেই বাঁচিবার উপায় নাই। রাস্তায় চলিবার সময় অনিচ্ছায় বহু পিপীলিকার প্রাণ নাশ করিতে বাধ্য হই। গৃহাদি মার্জনকালে বহু ক্ষুদ্র প্রাণীর হিংসা হইয়া যায়। ‘পেষণী’ কার্য্যে, জলকুন্তের নিকট এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার সময়ও বহু প্রাণীর হিংসা হইয়া যায়। এইপ্রকার আহাৰ-বিহার কার্য্যে অনেক সময় বাধ্য হইয়া অনাচার করিয়া কিল্বিষ বা পাপ ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় হইয়া যায়। মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যে অহিংস-নীতি অবলম্বন করি, তদ্বারা একজনের স্ববিধা, অত্রের অস্ববিধা অবশ্যস্তাবী। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয় চরণ দে,

সম্পাদক, ব্যাক-টু-গড্ হেড্

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-চরণে আস্তি-নিবেদন

দয়ার ঠাকুর মোর,

নমো নমঃ শ্রীভকতিবিনোদ
শুদ্ধভক্তি প্রচারে যাহার আমোদ
কর কৃপা দীনহীনে অজ্ঞ অবোধ
দুর্দৈব অতি ঘোর ।
দয়ার ঠাকুর মোর ॥

হে পতিত-পাবন,

পতিত তারিতে এ মর-জগতে
শ্রীগৌরশক্তি প্রেম প্রদানিতে
চির বহিস্মুখে চির স্মৃথ দিতে
আর কে আছে এমন ?
হে পতিত-পাবন ॥

হে আচার্য্যবর,

আপনি আচরি করিলে প্রচার
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন সর্বধর্ম্ম-সার
নাম বিনা জীবের গতি নাহি আর
জানাইলে চরাচর ।
হে আচার্য্যবর !!

হে জগৎ-তারণ,

বিশ্ব যখন হইল মগন
আহার-নিদ্রা-ভয় ও মৈথুন
পাশ্চাত্য শ্রোতে ভাসে জীবগণ
এলে তুমি তখন ।
হে জগৎ-তারণ !!

আমিত আত্মঘাতী,

মৃত্যুসঞ্জীবনী বৈকুণ্ঠ অপগা
বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি শ্রীরূপাহুগা
পান করিল যাহারা স্তম্ভগা
তুমিত ভূরিদ স্মৃতি,
আমিত আত্মঘাতী ॥

হৃদয় পাষণ মোর,

ভক্তগণ আজি তোমার বিরহে
মুহমান সব চক্ষে ধারা বহে
কাতর কণ্ঠে আজি তব গুণ গাহে
অভাগ্যের নাহি ওর,
হৃদয় পাষণ মোর ॥

বিচ্ছেদব্যথা তরঙ্গে,

তোমার বিরহ তীব্র যাহার
ভাগ্যবান্ তিনি কি বলিব আর
সর্বক্ষণ তুমি হৃদয় তাঁহার
গৌর-পরিকর সঙ্গে ।
বিচ্ছেদব্যথা তরঙ্গে ॥

এসেছিলে গোড়ভূমি,

মহাপ্রভু যবে লীলা সম্বরিল
যড়্গোশ্বামী ক্রমে অদর্শন হৈলা
গৌড়ীয়গণ ঘনঘটা আচ্ছাদিলা
এহেন সময়ে তুমি
এসেছিলে গোড়ভূমি ॥

হে আচার্য্য-ভাস্কর,

গৌরজন্মস্থান মায়াপুর ধাম
কাল-প্রভাবে কেহ না জানিত নাম
গৌরাক্ষ আদেশে সেই লীলাস্থান
প্রচারিলে প্রভুবর
হে আচার্য্য ভাস্কর !!

তুমিত পণ্ডিতবর,

জৈবধর্ম আর শিক্ষামৃত,
কল্যাণকল্পতরু যাতে সর্বহিত,
শতাধিক গ্রন্থ করিয়া নিশ্চিত
কৃষ্ণভক্তি সাধ্যসার,
তুমিত পণ্ডিতবর ॥

হে ভক্তিবিনোদ,

ভক্তবিরহ দুঃখ শ্রেষ্ঠতম
সে দুঃখ কিন্তু হয় পূজ্যতম
কৃষ্ণ কাঞ্চের যুগপৎ দর্শন
বিরহে হয় প্রমোদ ।
হে ভক্তিবিনোদ !!

হে বিনোদ বিভূ,

শ্রীনামহট্ট করিয়া স্থাপন
স্বহস্তে তুমি করিলে মার্জন
সেই শতমুখীর একটা কণ
হ'তে পারিব কি কভু ?
হে বিনোদ বিভূ !!

অপ্রাকৃত সাহিত্যিক,

হিতের সহিত যাহা বর্তমান
সে পুস্তক পায় সাহিত্য সম্মান,
যে-শাস্ত্রে হয় কৃষ্ণ বিশ্বরণ
কাক-কোলাহল ধিক,
অপ্রাকৃত সাহিত্যিক ॥

বুঝিব কি সেই ব্যথা,

বিরহ-গাথার তীব্র বেদন
গাহিয়াছেন তাহা ঠাকুর নরোত্তম,
অশ্রুসার আমি অতি অভাজন
পাষণে-কুটিলে মাথা
বুঝিব কি সেই ব্যথা ?

অকিঞ্চনবর,

প্রতিষ্ঠাশা সম শত্রু নাহি আর
সাধকের যাহা অতি দুর্নিবার
কত না যত্নে জানালে বারবার
না হইল কর্ণগোচর,
অকিঞ্চনবর ॥

কি বর্ণিব গুণ,

বান্ধালা-ইংরাজী-উড়িয়া-সংস্কৃত
উর্দু-পার্সী-ভাষায় গ্রন্থ অলঙ্কৃত
সুপাণ্ডিত্য তোমার হৈল ঘোষিত
সর্বশাস্ত্রে সুনিপুণ,
কি বর্ণিব গুণ ॥

অবিদ্যা-পীড়িত আমি,

ভব-ঔষধি শ্রীনাম মহামন্ত্র
স্থাপিয়াছ বিচারি বেদাগম তন্ত্র
হরিনাম চিন্তামণি পান-পাত্র
সাধুবেত্তরাজ তুমি
অবিদ্যাপীড়িত আমি ॥

সকলিত জান তুমি,

মহিমা তোমার করিতে কীৰ্ত্তন
অক্ষম সতত শ্রাসী অগণন
সারদা সারঙ্গে করেন কীৰ্ত্তন—
কি জানি বর্ণিতে আমি
সকলিত জান তুমি ॥

কি বলিব আমি,

জগতে প্রকট ছিলেন যখন
ভাগ্যদোষে না জানিছু তখন
সেং দুঃখ আর না হইবে মোচন
জান তুমি অন্তর্যামী
কি বলিব আমি ॥

পাইব কি আর কভু ?

অমন্দউদয়া দয়া বিতরিয়া
নিজ নিকেতনে গিয়াছ চলিয়া
তোমার বৈভব সরস্বতী দিয়া
হারাইয়াছি সে প্রভু
পাইব কি আর কভু ?

কোথা গেলে প্রভুবর,

তোমা রত্নহারা হইয়া ধরণী
অত্যন্ত দুঃখিত অধীর গুর্জিণী
শোক-সন্তপ্ত শূন্য মেদিনী
দেখিব কি আর ?
কোথা গেলে প্রভুবর ॥

গৌরশক্তি দুইজন,

গদাধর গোলোক-বিজয় দিনে
সেই বিচ্ছেদে অতি ব্যাকুল মনে
প্রপঞ্চ লীলা ত্যজিলে তখনে
একচিত্ত একমন
গৌরশক্তি দুইজন ॥

পূজিতে শ্রীচরণ,

মঠ মন্দির গোপুর প্রাঙ্গন
পত্র পুষ্পমালায় হয় স্বেশোভন
দ্বারে দ্বারে শোভে বিচিত্র তোরণ
সব মঙ্গল আচরণ
পূজিতে শ্রীচরণ ॥

তব অদর্শনে,

ভক্তগণ সব সজল-নয়নে
করিছে অর্চন অগুরু চন্দনে
অন্তরীক্ষে পুষ্প বর্ষে দেবগণে
হর্ষ-বিষাদ মনে ।
তব অদর্শনে ॥

করহ অভয়,

জয় তিথিবরা নিত্য তব জয়
তব রূপা হ'লে প্রভুর রূপা হয়,
দুরিত দুষ্ট আমি দুরাশয়
পুনঃ গাই জয় জয় ।
করহ অভয় ॥

কোটি কোটি নমস্কার,

হে স্বমেধা তিথি ! নাহি জানি স্তুতি
ভক্তিগন্ধহীন আমি মৃচ্ছমতি
নিজগুণে রূপা কর দাস প্রতি
বার বার এইবার,
কোটি কোটি নমস্কার ॥

দেহ দীনে আশ্রয়,

পতিত-পাবন তুমি দয়াময়
মো সম পতিত পাবে না ধরায়
বিরহ-তিথির বেদনা জাগায়
না ঠেলিও রাঙ্গা পায়,
দেহ দীনে আশ্রয় ॥

বহু জন্মের অপরাধী জান প্রভু তুমি ।

প্রতি জন্মে চরণ-রেণু মাগে তুর্ধ্যাশ্রমী ॥

—ত্রিদণ্ডিআম্রী

শ্রীমদভক্তিসম্বন্ধ তুর্ধ্যাশ্রমী মহারাজ

বর্ষান্তে নিবেদন

শ্রীগোবিন্দের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা রক্ষিতা

আমরা ক্রমে ক্রমে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১ম বর্ষের শেষ ১২শ সংখ্যায় উপনীত হইয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমেই শ্রীপত্রিকার আত্মত্ব শ্রীগোবিন্দের দ্বারাই স্বরক্ষিত হইতেছেন। পারমার্থিক কাল-বিচারের বর্ষ গণনায় শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া ‘গোবিন্দ’-মাসেই তাঁহার সম্পাদন কার্য আরম্ভ করিয়া ‘গোবিন্দ’-মাসেই তাঁহার অন্ত দর্শন করিতেছি। জগৎপাতা শ্রীগোবিন্দদেব চিরদিনই তাঁহার নিজ জনগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। গোবিন্দভূজগুপ্তায়াং দ্বারাবত্যাং কুরুদ্বহ—বাক্যটি এস্থলে স্মৃতিপটে আসিতেছে। ভগবান্ যেরূপ তাঁহার সেবকগণকে রক্ষা করিবার জন্ত দ্বারকাপুরী সর্বতোভাবে শ্রীভূজের দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ অধোক্ষত্র শ্রীগোবিন্দদেবও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আত্মত্ব স্বীয় ভূজের দ্বারা আবৃত করিয়া প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। বর্ষান্তে ইহা আমরা স্মরণ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেছি।

শ্রীপত্রিকা রূপানুগ অভিধেয়-তত্ত্বের প্রকাশিকা

উপাস্ত-বিচারে শ্রীগোবিন্দদেবই অভিধেয় তত্ত্বের অধিদেবতা। যেহেতু অভিধেয়-তত্ত্বের আচার্য্য-কুল-মুকুটমণি শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীগোবিন্দেরই প্রকাশক এবং শ্রীগোবিন্দই শ্রীপত্রিকার সংরক্ষক হওয়ায় ইহা শ্রীল রূপপাদেরই অত্যন্ত প্রিয় আদরের ধন। যিনি নির্জন-ভজন-রোধিকা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনে অনন্তকোটি লেখনী প্রদার করিয়াছেন, যাহার প্রভাবে আমাদের হৃদয় ধুটমতি অনভিজ্ঞ-চিত্ত গুরুদাস্যাকাজ্জী ব্যক্তিসকলও রূপানুগ কীর্ত্তনীয় বলিয়া পরিচয় দিতে প্রস্তুত—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া কৃষ্ণ-প্রেম-প্রয়োজন লাভের অভিধেয় প্রকাশিকা রূপানুগাংগণের অগ্রগণ্য হইয়াছেন। চিরদিনই শ্রীপত্রিকা রূপানুগা ভক্তিবিনোদ-ধারায় সকলকে স্নান করাইয়া শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের ও তাঁহার অভিন্ন বিগ্রহ গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহাশীর্ষাদ লাভের অধিকার দিবেন। আমরা ইহার আকার ও ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি।

শ্রীপত্রিকা সকলের শিক্ষাগুরু

কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীল রূপপাদের এই শিক্ষা-বাক্য লক্ষ্য করিলে শ্রবণ যে কীর্ত্তনের একান্ত অচ্ছেদ্য ও নিত্য সঙ্গী, তদ্বিষয়ে সমাগ উপলব্ধি

করিতে পারা যায়। কীর্তন হইলেই শ্রবণ হইবে; কীর্তনকারী কীর্তন করিলেই শ্রবণকারী তাহা শ্রবণ করিবেন। উভয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আমি উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিলাম, কেহই শ্রবণ করিল না—এরূপ ক্ষেত্র অসম্ভব। অন্ততঃ স্বয়ংই তাহার শ্রোতা হইতে হয়। কীর্তনকারীই একাধারে কীর্তনীয় ও শ্রোতা। কীর্তনীয় ও শ্রোতা উভয়েই চেতন। চেতনই চেতনের নিকট কীর্তন করিয়া থাকেন। যাহারা শ্রোতা, তাহারা কীর্তনকারীকে শিক্ষক বলিয়া অভিমান করেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা বিবিধ প্রবন্ধাদিতে শ্রীরূপশিক্ষা প্রকাশ করিয়া কীর্তনকারীর স্নায় শিক্ষা-গুরুর আসন অধিকার করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তজ্জন্ত তাহার সে-প্রকার অভিমানের ধৃষ্টতা প্রকাশ করা হইতেছে না। তথাপি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর সর্বোত্তমা প্রকাশিকা হইবার অভিমান ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষক কীর্তন করেন এবং ছাত্র তাহা শ্রবণ করিয়া থাকেন। আরও দেখা যায়, শিক্ষকের ইচ্ছাক্রমে ছাত্রই কীর্তন করেন এবং শিক্ষক স্বয়ং তাহা শ্রবণ করেন। বিদ্যার্থীর অধিগত বিদ্যা সম্ভবত কি অসম্ভব হইয়াছে, তাহার পরীক্ষাই সে-স্থলে উদ্দেশ্য। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কীর্তনকারীরূপে আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে কাহারও নিকট শিক্ষক-স্বরূপ এবং কাহারও নিকট ছাত্র-স্বরূপ প্রতিভাত হইলে ভক্তির ব্যাঘাত ঘটিবে।

শ্রীপত্রিকার স্বজন, আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব

আমরা শ্রীপত্রিকার বক্তা ও শ্রোতাগণকে বিশেষ আনন্দের সহিত, প্রাণের সহিত কৃতজ্ঞতাময় ধন্যবাদ জানাইতেছি। যাহারা বিবিধ পত্র, প্রবন্ধ ও সমালোচনাদির দ্বারা শ্রীপত্রিকার সেবা ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহারাই আমাদের প্রকৃত স্বজন। যাহারা শ্রীপত্রিকা পাঠ করিয়া পরম সন্তোষের সহিত ইহার প্রশংসাসূচক পত্রাদির দ্বারা আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন, তাহারা আমাদের পরম আত্মীয়। যাহারা অন্তঃসন্ধিহীন হইয়া বিবিধ প্রশ্নের দ্বারা সর্ব-সাধারণকে ভগবৎ কথা আলোচনা করিবার সুযোগ দিয়াছেন, তাহারা আমাদের একান্ত বান্ধব। যাহারা শ্রীপত্রিকা নিয়মিতভাবে গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতেছেন, আমরা সেই গ্রাহকবর্গ ও তাহাদের উৎসাহদাতা বন্ধুবর্গের নিকট সর্বতোভাবে কৃতজ্ঞ। যাহারা শ্রীপত্রিকার সম্পাদন, সংকলন ও প্রকাশ প্রভৃতি যাবতীয় কার্যে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া স্বজন, আত্মীয়, বান্ধবাদি সর্বসাধারণের আনন্দ ও প্রীতিবিধান করিয়াছেন, তাহারাই আমাদের আন্তরিক বন্ধু।

তাহাদের এই প্রকার সেবা-চেষ্টা দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ও তাহার নিজ-জনগণ পর জগৎ হইতে নিশ্চয়ই প্রচুর আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন।

শ্রীপত্রিকায় মঙ্গলাচরণ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সঙ্কলন ব্যাপারে আমরা সর্বপ্রথমেই মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ গুরুবর্গের বন্দনামূলক স্তোত্রাদি প্রকাশ করিয়াছি। বৈষ্ণব-জগতের ইহা প্রাচীনতম ধারা। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাদেবের আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা—সর্বপ্রথমে শ্রীগুরুপাদপদেরই বন্দনা বিধেয়। আমরা সে পদ্ধতি গোবিন্দের রূপায় সংরক্ষণ করিতে পারিয়াছি। এ সম্বন্ধে গুরুষ্টক, শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ-স্তবকঃ, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরহদশকম্, শ্রীশ্রীপ্রভুপাদাষ্টকম্ প্রভৃতি স্থূললিত স্তম্ভুর কবিত্বপূর্ণ স্তোত্রগুলির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীপত্রিকার গৌরব-প্রবন্ধ ও তাহার ভাষা

প্রতি সংখ্যার প্রথমেই শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটা করিয়া প্রবন্ধ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সর্বোত্তম গৌরব উপাস্তরূপে সংরক্ষিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, সর্বপ্রথমে দার্শনিক জগতের সর্বোচ্চতম বিষয়সমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণমূলক শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রবন্ধ-গুলি সাধারণ পাঠকবর্গের পক্ষে অতীব দুর্লভ ও দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সাধারণের নিকট সরল করিবার জন্ত প্রত্যেকটা প্রবন্ধের প্রত্যেক অঙ্কুশেদের কথাসার-স্বরূপ সংক্ষেপ শিরোনামা লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও সাধারণের নিকট উহা দুর্বোধ্য হইয়াছে। গভীর তত্ত্বমূলক প্রবন্ধের ভাষায় যতই সারল্য থাকুক না কেন, ভাবের গাভীর্ঘ্যাহতু তাহা সাধারণের নিকট স্বভাবতঃই দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। আমরা ইহার পরিবর্তন করিতে অপারক বিধায় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। গুরুবর্গের প্রবন্ধের ব্যাখ্যা রচনা করিবার অধিকার আমাদের আছে; কিন্তু তাহার ভাব ও ভাষার পরিবর্তন ঘটাইবে কে? বহু উচ্চ সুশিক্ষিত পাঠকবর্গই আমাদের পত্রদ্বারা এবং সাক্ষাতে ও প্রচারকবর্গের সমক্ষে বিভিন্ন প্রকারে জানাইয়াছেন যে, শ্রীপত্রিকার ভাষা স্বকঠিন ও সুখবোধ্য নহে।

শ্রীপত্রিকার অগ্গাণ্ড প্রবন্ধ

উক্ত অতিমর্ত্য মহাজনদ্বয়ের প্রবন্ধ ব্যতীত ত্যক্তগৃহ ও আশ্রমশ্রেষ্ঠ ত্রিদিগ্-পাদগণের ও অগ্গাণ্ড আচারবান্ পণ্ডিত উপদেশকগণের বিচারপূর্ণ দার্শনিক

প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধেও এই প্রকার অভিমত প্রবণ করিয়া আসিতেছি এবং তাঁহারা শ্রীপত্রিকার গৌরবের প্রতি ও সর্বসাধারণের সর্বোত্তম মঙ্গলদায়কত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সরল ভাষায় প্রবন্ধাদির আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের প্রার্থনামুসারে এ-বিষয়ে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়া কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, সহৃদয় পাঠকবর্গই তাহার বিচার করিবেন।

শ্রীপত্রিকার আলোচিত বিষয়সমূহ

আমরা বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, ইতিহাস, ভূগোল, ছন্দ, জ্যোতিষ, দর্শন, বর্ণাশ্রম ধর্ম, বিরহ, উৎসব, স্তোত্র প্রভৃতি ও বিবিধ সমালোচনামূলক প্রবন্ধাদি, সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিচারের উপরে নির্ভর করিয়া সিদ্ধ ও সাধনমার্গের অতীব উপাদেয় প্রবন্ধসমূহ প্রকাশ করিয়াছি। শ্রীপত্রিকায় সর্বসম্মত একশত পঁচিশটির অধিক বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়গুলি কোন্ কোন্ প্রবন্ধে কি-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমাদের সুধী পাঠকবর্গকে বিশেষ করিয়া জানাইয়া দিতে হইবে না, তাঁহারা স্বয়ংই উহা বাছিয়া লইতে পারিবেন। আমাদের উল্লেখ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও স্থানাভাববশতঃ আমরা এখানে বিবিধ শ্রেণীর বিভাগমূলে প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করিলাম না। বৈষ্ণব-জগতে ভগবৎপ্রীতি লাভোপযোগী সাধনমার্গের যাবতীয় ব্রত-ধর্মাদির অল্পশীলনীয় সেবা পদ্ধতির সমস্ত কথাই সংক্ষেপে এই বৎসরে বর্ণিত হইয়াছে।

আগামী বর্ষের শ্রীগৌড়ীয়ের পরিচয়

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি—আগামী বর্ষে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সর্বতোভাবে সৌন্দর্য্যমণ্ডিতা হইয়া প্রকাশিতা হইবেন। নানাপ্রকার ত্রৈবর্ণ-চিত্র-সম্বলিত উপাস্ত্র ও উপাসকগণের আলেখ্য-মুষ্টিসমূহ শ্রীপত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। প্রবন্ধাদিও যথাসম্ভব সহজ ও সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে যত্নের বিন্দুমাত্রও ত্রুটি হইবে না। প্রত্যেক সাধকবর্গের ভজনোন্মুখী শিক্ষাপ্রণালী, দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে রীতিমত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে। এবৎসর আমরা সত্যামুসন্ধিৎসু বহু সজ্জন বান্ধবগণের নিরুদয় হইতে বহু প্রশ্ন পাইয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু হৃৎখের বিষয়, পত্রিকায় কলেবর-সংকীর্ণতাহেতু আরও বহু প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রকাশ করিতে পারি নাই। তজ্জন্য আমরা দিগকে নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। আগামী বর্ষে প্রত্যেকটি প্রশ্নের শাস্ত্রযুক্তিমূলে ধারাবাহিকভাবে সহুত্তর প্রকাশিত হইবে। পরিপ্রশ্নকারী বান্ধব-বর্গকে আমরা আগামী বর্ষের শ্রীগৌড়ীয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীপত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীপত্রিকা এত অল্প সময়ের মধ্যেই এত অধিক সংখ্যক লোকের আদরের বস্তু হইবেন, তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। বর্তমান কালের গতি, তাহাতে এই কলির প্রথম পাদে ধর্ম-কথার বিশেষতঃ পারমার্থিক বৈকুণ্ঠ জগতের কথার প্রতি তত অধিক আদর হইবে না বলিয়াই অধিক সংখ্যক পত্রিকা মুদ্রিত হয় নাই। ফলে এরূপ ঋণবিধায় পড়িতে হইয়াছে যে, নূতন গ্রাহকগণকে আমরা আর প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি নাই; তজ্জন্ত বিশেষ দুঃখ অনুভব করিতেছি। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, আমাদের গ্রাহকবর্গ প্রায় সকলেই ষথারীতি তাঁহাদের দেয় ভিক্ষা সমুদায় পত্রিকা পাইবার পূর্বেই আমাদের প্রদান করিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। আমরা তজ্জন্ত তাঁহাদের নিকট সর্বতোভাবে কৃতজ্ঞ। আমাদের বিশেষ প্রার্থনা—আগামী বর্ষের জ্যেষ্ঠ মাসে তাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত থাকিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীপত্রিকা পুনঃ প্রকাশিত হইবার আবশ্যকতা

বর্তমানযুগে দিনের পর দিন ধর্ম-জগতে যেরূপ বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, তজ্জন্ত আমাদের প্রায় সকলেই সাবধান হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এই দুর্দিনে ধর্মকথার বড়ই দুর্ভিক্ষ। ক্রমশঃ ভারত হইতে ধর্মের উৎসাদনের যে অপচেষ্টা চলিতেছে, তাহার সর্বতোভাবে ধ্বংস হওয়াই প্রয়োজন। ভারতের প্রতি অণু-পরমাণু ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত। ইহার পরিবর্তন ঘটাইবার আত্মরিক চিন্তাসমূহকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্তই শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আগামী বর্ষে অভিনব ভাবধারা লইয়া প্রকাশিত হইবেন। আপনারা প্রত্যেকেই আগামী বর্ষের জ্যেষ্ঠ মাসে গ্রাহক হউন এবং আপনারা আত্মীয়বর্গকে শ্রীপত্রিকা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করুন।

কৃপা প্রার্থনা ও ক্ষমা ভিক্ষা

পরিশেষে আমরা সকল শুদ্ধবৈষ্ণবগণের কৃপা প্রার্থনা করিতেছি—গুরুসেবক-গণের আশীর্বাদ আকাজক্ষা করিতেছি। তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রায় সকলকে আগামী বর্ষের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সেবায় বল সঞ্চারিত করুন। আমরা শ্রীপত্রিকা সকলেরই প্রীতিবিধানের জন্ত প্রকাশ করিতেছি এবং ভবিষ্যতেও করিব। কাহারও অন্তঃকরণে আঘাত দেওয়া শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য নহে। যদি কেহ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তজ্জন্ত আমরা তাঁহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছি।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সর্বদা নির্ভীক সত্যকথা প্রচার করিবেন। সত্য অপ্রিয় হইলেও তাহা হইতে বিরত হওয়া কর্তব্য নহে। অল্প বর্ষান্তে শ্রীগুরু-গৌরাক্ষের জয়গান করিয়া পাঠকবর্গের নিকট হইতে আগামী বর্ষের জন্ম বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

জয় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কী জয়।

জয় শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ কী জয়।

জয় শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কী জয়।

জয় শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ কী জয়।

জয় পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীশ্রীগৌরহৃন্দর কী জয়।

শ্রীঅযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য-ধাম পরিক্রমা ও শ্রীউর্জব্রত

শ্রীধাম অযোধ্যায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অল্পকূট মহোৎসবের বিবরণ গত ১০ম ও ১১শ সংখ্যা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার যথাক্রমে ৩৯৩ ও ৪৩৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। পরিক্রমা প্রভৃতির ইতিবৃত্ত জানিবার জন্ম অনেকেই আমাদের নিকট কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছেন। তজ্জন্ম এবং অযোধ্যা ও নৈমিষারণ্যের ভৌগোলিক বিবরণ বহু তীর্থযাত্রিগণের পক্ষে ভবিষ্যতে বিশেষ উপকারে আসিবে মনে করিয়া পরিক্রমা-বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে নিম্নে বর্ণনা করিলাম।

গত ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, বুধবার উক্ত সমিতি যাত্রিগণকে সঙ্গে লইয়া হাওড়া স্টেশন হইতে ১৭নং আপ দিল্লী এক্সপ্রেসে ২ খানি বগী (৭খানা কামরা) রিজার্ভ করিয়া শ্রীঅযোধ্যা যাত্রা করেন। ১৯শে আশ্বিন, ৬ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিয়া একটু বিলম্বে সকালে ৬টার সময় তাঁহারা অযোধ্যা স্টেশনে পৌঁছেন। প্রারম্ভিক বন্দোবস্তের জন্ম পূর্ব হইতেই সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণকারণ্য ব্রহ্মচারী, শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনদয়াল ব্রহ্মবাসী প্রভৃতি কয়েকজন সেবক অযোধ্যায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। অযোধ্যার স্নপ্রসিদ্ধ লছমন্-কিলার পরিক্রমা-সঙ্ঘের থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হয়। এই কিলার মোহাস্ত মহারাজের ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সরল অমায়িক ব্যবহারে ও সাদর আহ্বানে তাঁহারা ইহা ব্রত পালনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দেশ করেন।

১৯শে আশ্বিন সকালে পরিক্রমা-সঙ্ঘ অযোধ্যা স্টেশনে অবতরণ করিলে পূর্ব-প্রেরিত সেবকগণের সহিত লছমন্-কিলার মোহাস্ত মহারাজের পক্ষ হইতে

তঁাহার ম্যানেজার উক্ত সজ্জকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীবিগ্রহ ও পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন। সজ্জের ও যাত্রীদের মালপত্রাদি স্থানান্তরিত করিবার জন্ত পূর্ব হইতেই যানবাহনাদির স্বেচ্ছাস্বাধীন করা হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত “শ্রীশ্রীদ্বারকাধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীউর্জ্জ্বত” প্রবন্ধে আপনারা পরিক্রমার যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছেন, এবারেও তদনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। পরিক্রমাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিজয়-বিগ্রহ একটা সুসজ্জিত সুন্দর শিবিকায় সমিতির সন্মাসী-ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক বাহিত হইতেন এবং পরিক্রমাকারী ভক্তগণ মৃদঙ্গ, করতাল, কঁাসর, শঙ্খ, ঘণ্টা বিবিধ বর্ণের পতাকা প্রভৃতি হস্তে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতে করিতে তঁাহার অনুগমন করিতেন। সুতরাং তদনুসারে ষ্টেশন হইতে পরিক্রমা-সজ্জ শিবিকারূঢ় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমনে পূর্ব-বর্ণিত লছমন-কিলায় যাত্রা করেন। সঙ্কীর্তন শোভাযাত্রাকালে এতদ্দেশীয় ভক্তগণ শিবিকারূঢ় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া বিশেষ চমৎকৃত ও মুগ্ধ হন। এতদ্দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা বিশেষভাবে প্রচার না থাকিলেও তখনকার অবস্থা দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, “পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥”—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সাক্ষাদ বাণীর সত্যতা নিরূপনার্থ ও এতদ্দেশবাসী জনগণকে তঁাহার তত্ত্ব অবগত করাইবার জগুই ‘তিনি’ যেন রূপাপূর্বক স্বয়ং অর্চামূর্তিতে অযোধ্যায় পদার্পণ করিয়াছেন। যথাসময়ে উক্ত সজ্জ লছমন-কিলায় উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীরামসীতা-লক্ষ্মণজীর মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং তথায় শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিবিকা স্থাপিত হইলে পরিক্রমা-সজ্জ উদ্দণ্ড নৃত্য ও কীর্তন সহযোগে তঁাহাকে প্রদক্ষিণ করেন। এই সময়ে মন্দিরের পূজারী ভক্তবর শ্রীলক্ষ্মণ শরণজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিজয়-বিগ্রহের অর্চন ও ধূপ-দীপাদি দ্বারা তঁাহার আরতি করেন। শ্রীমন্দিরের পার্শ্ববর্তী সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরাজিত হন এবং অযোধ্যায় থাকাকালে এস্থানে অবস্থান করিয়া পরিক্রমাকারী ভক্তগণের নিত্য সেবাপূজা গ্রহণ করেন। কিলায় মোহান্ত মহারাজের পক্ষ হইতে ম্যানেজার শ্রীসিয়ামোহন শরণজী, মন্দিরের পূজারীজী ও অপরাপর সকলে পরিক্রমা-সজ্জের নিয়ামক পূজাপাদ স্বামীজী মহারাজকে অভ্যর্থনা ও আদর যত্ন দ্বারা আপ্যায়িত করেন। পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে সকলের থাকিবার স্থান অতি সুন্দর ও রমণীয় হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে বিপুল সমারোহে ভোগার্চি কীর্তন ও আরতি

সমাপ্ত হইলে যাত্রিগণ প্রসাদাদি পাইয়া বিশ্রাম লাভ করেন। এইস্থান প্রাচীন ইতিহাস-বিজড়িত। স্মতরাং ইহার অবস্থিতি ও ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি শ্রীঅযোধ্যা-ধাম কালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ভক্ত রাজা বিক্রমাদিত্য বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুর রূপায় এই তীর্থ বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া পুনরায় লোক-লোচনের গোচরীভূত করেন। অযোধ্যার ভৌগোলিক মানচিত্র লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, শ্রীগোবিন্দের ভূজের দ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকাপুরীর ত্রায় এই অযোধ্যাধামও প্রায় চতুর্দিকেই সরযুদ্বারা পরিবেষ্টিত। রাজা ইক্ষাকু রাজগুরু বশিষ্ঠের দ্বারা এই সরযুজীকে মানস-সরোবর হইতে আবাহন করাইয়া-ছিলেন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া এই সরযু জগৎকে পবিত্র করিতেছেন। আমাদের আলোচ্য লছমন-কিলাও অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিম কোণে এই সরযুর তীরেই অবস্থিত। সরযুর গর্ভ হইতেই এই বিরাটু কিলা নির্মিত হইয়া আজও প্রাচীন যুগের ঐতিহ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহাই বলদেবাভিন্ন রামচন্দ্রাঙ্কুর শ্রীলক্ষ্মণজীর কেল্লা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইস্থানের দৃশ্য অতীব মনোরম ও চিত্তাকর্ষক। কিলার সম্মুখেই শ্রোতস্বিনী সরযু অতিবেগে প্রবাহিতা। দেখিয়া মনে হয়, যেন শ্রীসরযুমাতা শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম স্পর্শ লালসায় দ্রুত গতিতে ধাবমানা হইয়াছেন। সূর্যোদয়ের পর সরযুর মধ্যে মধ্যে শুভ্র সৈকতপূর্ণ স্থানগুলি দেখিয়া দূর হইতে প্রবাল-দ্বীপ বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই স্থানের চতুর্দিকস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক বিবরণ অতীব চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী।

গত ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, শুক্রবার হইতে পৌর্ণমাসারম্ভ-পক্ষে উজ্জ্বলব্রত, কার্তিক ব্রত, দামোদর ব্রত বা নিয়মসেবা আরম্ভ হয়। এইদিন ব্রাহ্মমূহুর্তে মঙ্গলারাত্রিকান্তে “শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা” “শ্রীশ্রীভাগবত-গুরু-পরম্পরা,” “শ্রীগুরুষ্টকম্,” “পঞ্চতত্ত্ব,” “শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্,” “উদিল অরুণ পূর্ব-ভাগে” প্রভৃতি উষঃকীর্তন হইবার পর পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন শিক্ষা ব্যাখ্যামুখে অযোধ্যা পরিক্রমার উদ্দেশ্য এবং শ্রীদামোদর-ব্রত পালনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্মৃষ্ট ও দৃঢ়ভাবে উক্ত ব্রত-পালনে অনুরোধ করেন। আলোচনামুখে তিনি আরও বলেন যে, “এই ব্রত স্মৃষ্টভাবে পালন করিলে ভগবান্ দামোদর শ্রীহরি তাঁহার প্রিয়া শ্রীরাধারাবীণীর সহিত পরম প্রীত হন।

দামোদর-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে স্ব স্ব গৃহ হইতে কোন তীর্থস্থানে যাইয়া উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করাই সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক। বৈষ্ণবস্বৃতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাস এ-সম্বন্ধে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। তজ্জগৎ প্রতিবৎসর উর্জ্জ্বল উপলক্ষে আপনাদিগকে নিত্য-নূতন তীর্থস্থানে উক্ত ব্রত পালনের জগৎ আহ্বান করা হয়।" তিনি পাঠের মুখে শ্রোতৃমণ্ডলীকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সুযোগ সুবিধা হইলে অল্প সময়ে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। সভাপতি মহারাজ উক্ত ব্রত উদ্‌যাপন-কালে কয়েক দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও পরিক্রমা-দিবস ব্যতীত প্রত্যহ সকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর পারমার্থিক মঙ্গল বিধান করেন। তাঁহার পাঠের অন্তে 'রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা,' 'রাধে জয় জয় মাধব-দয়িতে' প্রভৃতি কীর্তিত হইবার পর 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ' ও মহামন্ত্র কীর্তন সহযোগে শ্রীতুলসী ও শ্রীমন্নহাপ্রভুর বাণী-বিগ্রহ শ্রীচরিতামৃত পরিক্রমা করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীতুলসী-অরতি—'নমো নমঃ তুলসী মহারাগি' ও অগ্ন্যগ্ন মহাজন পদাবলী কীর্তনের পর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিকমল ঐত্ব শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা পাঠ করেন। পণ্ডিতজীও উক্ত ব্রত উদ্‌যাপন-কালে কয়েকদিন ছায়াচিত্রে হিন্দীভাষায় বক্তৃতা প্রদান ব্যতীত প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাদি ও সময়োচিত স্থান-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিবিধ প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে শ্রবণের সুযোগ প্রদান করত বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেন। দামোদর-ব্রতকালে বিশেষ বিশেষ পরিক্রমা-দিবস ব্যতীত উক্ত দৈনন্দিন সেবা-পঞ্জী প্রত্যহ যথারীতি পালিত ও অমুষ্ঠিত হয়। পরিক্রমা-সম্বন্ধে যাত্রিগণকে নগর-সঙ্কীৰ্তনযোগে অযোধ্যা-ধামস্থ শ্রীরাম-চন্দ্রের বিভিন্ন লীলাস্থলী ও শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন এবং তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য শ্রবণের সুযোগ দান করিয়া তাঁহাদের নিত্য কল্যাণ লাভের সহায়তা করেন। পরিক্রমার ও অগ্ন্যগ্ন বিশেষ দিবসের বিবরণও নিম্নে যথাসম্ভব ধারাবাহিকভাবে প্রদত্ত হইল।

গত ২৩শে আশ্বিন, ১০ই অক্টোবর, সোমবার—পরিক্রমার নিয়ামক-মহারাজের অনুগত্যে যাত্রিগণ প্রাতঃকালে নগর-সঙ্কীৰ্তন শোভাযাত্রাযোগে শিবিকাক্রুত শ্রীমন্নহাপ্রভুকে অগ্রণী করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমিতে (মূল আবির্ভাব-ক্ষেত্র—মসজিদের বহির্ভাগে) কোশল্যা মাতার কোলে শিশু শ্রীরামচন্দ্র, জন্মস্থানে সীতার রন্ধনশালা—সীতা-রসুই, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা-ভবন—ভরত ও

লক্ষ্মণ, শক্রবৈর জন্ম-স্থান, শ্রীরাম-দরবারে শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভা, কনকশুবনে (এই স্থানে সখীগণ পরিবৃত্তা হইয়া সীতা সর্বদা বিরাজমানা) শ্রীশ্রীরামসীতাজীউ ও পরে হনুমান-গঢ়ীতে হনুমান্জী প্রভৃতি দর্শন করেন। ইহা পবন-নন্দন শ্রীহনুমানাদি বীর কর্তৃক সুরক্ষিত গড় বা দুর্গ। এখানে রামচন্দ্রের সীতাসহিত নিত্য অবস্থান-লীলা, লক্ষ্মণ বীরাসনে সেবা করিতে-ছেন এবং ভরত, শক্রবৈর, হনুমান্, সুগ্রীব, জাম্ববান্, সুশেণ, বিভীষণ, নীল, নল, অঙ্গদ, বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, মার্কণ্ডেয়, মোক্ষলা প্রভৃতি পার্শ্বদ-বীর ও দেবর্ষিগণ শ্রীরামসীতার শ্রীচরণে অর্ঘ্য প্রদানে নিযুক্ত। এস্থান হইতে যাত্রিগণ দ্বাদশমন্দিরে (আশ্মা-মা ও টিকারীরাজ-প্রতিষ্ঠিত “শ্রীভুবনেশ্বরী-হরহরেশ-মণি-মন্দির”) বামদিক হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণদিকের প্রকোষ্ঠে অবস্থিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, হনুমান্জী (জন্মস্বরূপ, ভক্তস্বরূপ, বীরস্বরূপ ও রাজস্বরূপে), নব দুর্গা, দশ মহাবিদ্যা, দশ দিকপাল, মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহা-সরস্বতী, কাল-ভৈরব, পঞ্চমুখী মহাদেব, সপ্তর্ষি-ভবন, ত্র্যম্বকেশ্বরনাথ মহাদেব, শ্রীরাম-মহাল, শ্রীরাম-দরবার, সরযুগঙ্গা এবং মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত শেষশায়ী বিষ্ণু, সূর্য্য-নারায়ণ, গণপতি, দুর্গা, পঞ্চম-শিব বা অর্দ্ধনারীশ্বর প্রভৃতি দর্শন করেন। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত পঞ্চোপাসনার নিদর্শন-স্বরূপ এই অর্দ্ধনারীশ্বরই মূল দেবতা। এই শ্রীমূর্তির দক্ষিণ অর্দ্ধাঙ্গ শিব এবং বাম অর্দ্ধাংশে পার্বতীর অবস্থান। অর্দ্ধাংশ কৃষ্ণ ও অর্দ্ধাংশ শুভ্র। পার্বতীর হস্তে পরশু এবং শিব ত্রিশূল ও ভিক্ষাপাত্রধারী। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বিচারে সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, রুদ্র ও কর্মফলবাধ্য কাল্পনিক বিষ্ণুর উপাসনা বা পঞ্চোপাসনার কোনরূপ প্রশ্রয় দেন না, বা ঐরূপ ভ্রান্তিমূলক বিচারকে গর্হণই করিয়া থাকেন। কিন্তু এস্থলে পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ শত্ৰুকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জানিয়া এইরূপ শক্তি ও শক্তিমানের একত্রাবস্থান ও অঙ্গাঙ্গীর একত্র সমাবেশ দর্শন করিয়া বেদান্ত-দর্শনের “শক্তিঃ শক্তিমতোরভেদঃ” সিদ্ধান্ত স্বরণ করেন। অতঃপর যাত্রিগণ দর্শন সমাপনাতে লছমন-কিলায় উপনীত হন।

তৎপরদিবস ২৪শে আশ্বিন, ১১ই অক্টোবর, মঙ্গলবার—যাত্রিগণ পূর্ব্বং বৈষ্ণবগণের আত্মগত্যে দর্শনেশ্বরনাথ মন্দিরে রাজা দর্শনেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত নরদেবের দ্বারপাল শিব, মূল-মন্দিরের বায়ু-কোণে শ্রীপার্বতী, ঈশান-কোণে বিষ্ণু ও শ্রীরামেশ্বর শিব, অগ্নি-কোণে শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ও নৈঋৎকোণে শ্রীগণেশের দর্শন লাভ করেন। পরিক্রমা-সজ্জ্ব সুসজ্জিত শিবিকায় শ্রীমন্নহাপ্রভুর বিজয়-

বিগ্রহকে লইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে মন্দিরের পূজারী তাঁহাকে ধূপ-দীপাদি দ্বারা আরতি করেন। তৎকালে অবস্থা দেখিয়া মনে হইয়াছিল—প্রাণপ্রিয় বৈষ্ণবরাজ শঙ্কুকে দর্শন দান ও তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্মই শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলার অভিনয়। এইস্থানে শিব বৈষ্ণব-বিচারে পূজিত হইয়া থাকেন।

২৮শে আশ্বিন, ১৫ই অক্টোবর, শনিবার—পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ লছমন-কিলা হইতে নগর-সঙ্কীৰ্ত্তনযোগে প্রথমতঃ সরযু-তীরস্থ পাপমোচন ঘাট, গৌঘাট, সরযুঘাট, সরযুমাতা, স্বর্গদ্বার প্রভৃতি দর্শন ও স্পর্শন করেন। এইস্থানে পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজ স্থান-মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তনমুখে সংক্ষেপে জানানাইয়াছেন—“পাপমোচন ঘাটে পাপ-প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত ও গৌঘাটে জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিষ্কপটে বৈষ্ণব-সেবাপর হইলে ত্রিলোক-পাবনৌ সরযু-মাতা ও বৈষ্ণবোত্তম শঙ্কুর কৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহাতে স্বর্গদ্বার অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ প্রবেশের অধিকার লাভ হয়। এই স্বর্গদ্বারই বৈকুণ্ঠের দ্বার অর্থাৎ প্রবেশ-পথ।” এই স্থান হইতে যাত্রিগণ নাগেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাম-জন্মস্থানের আদি বিগ্রহ শ্রীরামসীতা, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন প্রভৃতি দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। তৎপরে তাঁহারা সরযু তীরে তীরে পরিক্রমা করিয়া ক্রমশঃ সীতাঘাট ও রামঘাট দর্শন করিয়া লছমন-কিলায় পৌছেন।

১লা কার্তিক, ১৮ই অক্টোবর, মঙ্গলবার—পরিক্রমা-সজ্জা শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল সহযোগে নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চা-বিগ্রহের অল্পগমনে অযোধ্যার পঞ্চকোশী পরিক্রমায় বহির্গত হন। এই পঞ্চকোশী পরিক্রমায় এতদ্দেশীয় বহু পুরুষ ও মহিলা ভক্ত যোগদান করেন। যাত্রিগণ পরিক্রমার নিয়মিত্বায়ী গৌঘাট, সরযু ঘাট, স্বর্গদ্বার প্রভৃতি দর্শনান্তে সীতাঘাট, রামঘাট প্রভৃতির উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া ব্রহ্মঘাট, ব্রহ্মকুণ্ড, ব্রহ্মাজী, কৌশল্যা-ঘাট, কৈকেয়ী-ঘাট, সুমিত্রাঘাট, রাজঘাট, পাপমোচন ঘাট, লছমন ঘাট প্রভৃতি দর্শন ও স্পর্শন করিয়া যথাসময়ে লছমন-কিলায় উপনীত হইয়া পরিক্রমা সমাপন করেন।

২৮শে আশ্বিন, ১৫ই অক্টোবর শনিবার হইতে ৩রা কার্তিক, ২০শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ছয় দিবস ব্যাপী প্রত্যাহ সঙ্ঘ্যারাত্রিকের পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে ধারাবাহিকভাবে

হিন্দীতে বক্তৃতা প্রদান করেন।

৬ই কার্তিক, ২৩শে অক্টোবর, রবিবার—যাত্রিগণ সঙ্কীৰ্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে পরিক্রমা-সজ্জের আনুগত্যে অযোধ্যা হইতে ৬ মাইল দূরবর্তী **শ্রীসূর্য্যকুণ্ড** ও **শ্রীসূর্য্যানারায়ণ** দর্শন ও পরিক্রমা করেন। এইস্থানে সূর্য্যদেব শ্রীরাম-চন্দ্রের আরাধনা করেন। এইস্থান হনুমান্ গটীর মোহাস্ত মহারাজের পরিচালনাধীন। ইহা দর্শন-নগর রেলওয়ে ষ্টেশনের অতি নিকটবর্তী। যাত্রিগণের সুবিধার্থ পরিক্রমা-সজ্জের সভাপতি মহারাজের আদেশ ও ব্যবস্থানুযায়ী এখানে জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সকলেই দধি-চিড়া প্রসাদ পান এবং পথচারী সাধারণকেও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এইরূপ এক প্রকার পুলিন-ভোজনের আয়োজন লক্ষ্য করিয়া যাত্রিগণ সকলেই বিশেষ আনন্দিত হন। কাহারও কাহারও ইহাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত্তে বর্ণিত শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রদত্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দধিচিড়া মহোৎসবের কথা স্মৃতিপটে জাগরিত হয়।

পন্থদিবস ৭ই কার্তিক ২৪শে অক্টোবর, সোমবার—পরিক্রমা-সজ্জা অতি প্রত্যাষে শিবিকা-বাহিত শ্রীমন্নহাপ্রভুকে অগ্রণী করিয়া নগর-সঙ্কীৰ্ত্তনযোগে অযোধ্যা হইতে ফয়জাবাদ সহর হইয়া ৮ মাইল দূরবর্তী **গোস্তারঘাট** নামক স্থানে উপনীত হন এবং শ্রীমন্দিরে শ্রীরামসীতা ও লক্ষ্মণজীকে দর্শন করেন। এইস্থলে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র লীলা সংগোপন করেন। এই স্থানের সম্বন্ধে সজ্জের স্বামীজী মহারাজ বলেন—“ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব নিত্য। তিনি মানুষের গ্রায় দেহ ধারণ করিয়া এ-জগতে লীলা করিলেও তাহা মায়িক বা অনিত্য নহে। সূর্য্যের উদয়াস্তের গ্রায় তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব। চিঞ্জগতে সৰ্বক্ষণই তাঁহার নিত্যলীলা চলিতেছে। একই উদ্দেশ্যে জীবের মঙ্গলের নিমিত্তই তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব-লীলা। তবে ভক্তের পক্ষে ইহা বিরহ-ক্ষেত্র।” পূৰ্ব্বে ব্যবস্থানুযায়ী এস্থলেও যাত্রিগণের জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং তাঁহারা সকলেই দধিচিড়া প্রসাদ পান। দর্শন সমাপন করিয়া যাত্রিগণ নির্দিষ্ট সময়ে লছমন-কিলায় পৌছেন।

উর্জ্জব্রত বা দামোদর-ব্রত উদ্‌যাপনকালের মধ্যে পরিক্রমা-সজ্জা অযোধ্যায় মোট বিংশতি দিবস অবস্থান করেন। সুতরাং তাঁহারা ৮ই কার্তিক মঙ্গলবার পরিক্রমাকারী যাত্রিগণকে লইয়া ভোর ৪-৪৭ মিনিটে ১৭নং আপ দিল্লী এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়া বালামৌ জং হইয়া পরদিবস বৈকাল ৪ টার সময় নৈমিষারণ্য ষ্টেশনে উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য, বালামৌ জংএ যাত্রিগণের জগ্নু দ্বিপ্রহরে প্রসাদের

সংক্ষেপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। পরিক্রমা-সভ্য নৈমিষারণ্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে নৈমিষারণ্যস্থিত প্রথমহংস মঠের প্রবীণ সেবক শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রজবাসী, শ্রীশঙ্ক-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীমন্নহাপ্রভুর অর্চা-বিগ্রহকে ও পরিক্রমার নিয়ন্ত্রক মহারাজকে মাল্যভষিত করেন। অতঃপর ষ্টেশন হইতে সঙ্কীর্ণনযোগে যাত্রিগণ প্রথমহংস মঠ দর্শনান্তে সন্ধ্যার প্রাকালে তাঁহাদের থাকিবার নির্দিষ্ট স্থান বড় ধর্মশালায় উপনীত হন এবং যথাসময়ে প্রসাদাদি পাইয়া বিশ্রাম গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, এস্থলেও পূর্ব-বর্ণিত উজ্জ্বলত পালনের দৈনন্দিন সেবা-পঞ্জী যথারীতি সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়।

১১ই কার্তিক, ২৮শে অক্টোবর, শুক্রবার দিবসে সজ্জের সভাপতি-মহারাজ প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা আলোচনাকালে প্রসঙ্গ-ক্রমে নির্জন ভজনের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং বহিস্মৃখ জনসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে অবস্থান করত ভজনকেই নির্জন ভজন বলিয়া লক্ষ্য করেন। ব্যাখ্যামুখে তিনি আমাদের গায় বদ্ধজীবের কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব-সজ্জের আহুগতো থাকিয়া ভজনের প্রয়োজন ও অনধিকারীর পক্ষে নির্জন ভজনের অপকারিতা সম্বন্ধেও আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন—গোষ্ঠানন্দী ও বিবিক্তানন্দী কেহই নির্জন ভজন করেন না। বিবিক্তানন্দীকে আপাতঃদৃষ্টিতে একান্তে নির্জন ভজন করিতে দেখা গেলেও তিনি গোষ্ঠানন্দীর শ্রীনাম-প্রেম-প্রচারের সহায়ক-রূপে অহুকুলভাব পোষণ করেন ও তাঁহার সহায়তাই করিয়া থাকেন। শ্রীমন্নহাপ্রভুর আদেশ ও নির্দেশ—লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ, ভক্তিশাস্ত্র-প্রণয়ন ও শ্রীনামপ্রেম-প্রচারোদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা পরস্পর ইষ্ট-গোষ্ঠীতে মিলিত হইয়াছেন দেখা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। ইহা ব্যতীত তিনি এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাসার তাঁহার মনোহরীষ্ট-গীতি হইতে “কীর্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জন সম্ভব” ও অনধিকারীর প্রতি নির্জন-ভজন সম্বন্ধে পূর্ব পূর্ব মহাজনবর্গের নির্দেশ ও শিক্ষাগুলিও অতি সরল প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। পর পর দিবসত্রয় স্বামীজী এবিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। প্রবন্ধ বিস্তার-বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাহা প্রকাশিত হইল না।

১৫ই কার্তিক, ১লা নভেম্বর, মঙ্গলবার—যাত্রিগণ সকাল ৭টার সময় নগর সঙ্কীর্ণনযোগে শিবিরাক্রান্ত শ্রীগৌরহৃদয়ের অর্চা-বিগ্রহের অহুগমনে শ্রীনৈমিষারণ্য পরিক্রমা ও শ্রীবিগ্রহাদি দর্শনে বহির্গত হন। সর্বপ্রথম যাত্রিগণ পরিক্রমা-সজ্জের

আত্মগত্যে জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত পরমহংস মঠ প্রদক্ষিণান্তে **শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দ-গান্ধার্বিকা-গিরিধারীজীউ** দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজ বিশেষ করিয়া এস্থলে যাত্রী সাধারণকে তাঁহাদের সাধার্মত মঠ সেবার আত্মকূল্য করিবার জ্ঞাত আহ্বান জানান এবং তাহাতে যাত্রিগণ যথাসাধ্য সাহায্য করেন। তথা হইতে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে **ললিতা মন্দির, লোমহর্ষণ সূতগাদী, বালাজী মন্দিরে শ্রীবলদেবজী** প্রভৃতি দর্শন করেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই মন্দিরের পূজারী **শ্রীহনুমান দাসজী** শিবিকা-বাহিত শ্রীমন্নাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহের অর্চনান্তে ভোগ প্রদান করেন ও আরতি করেন। যাত্রিগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া **কাশীকুণ্ড, যমরাজ ও চিত্রগুপ্ত, কাশীর ললার কূপ** (৬০ হাজার তীর্থের সঙ্কমস্থল), **শ্রীভৈরবনাথ, শ্রীতুলসীদাসজীর ভজন-স্থান, শ্রীহনুমানজী** এবং পরে **শ্রীব্যাসগাদীতে** পরাশর ঋষি, শ্রীমদ্ভাগবত-কর্তা কৃষ্ণদৈপায়ন **শ্রীবৈদ্যব্যাস, শ্রীশুকদেব গোস্বামী ও শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে** দর্শন করেন। ইহা পূর্বগুরুর স্থান জানিয়া ভক্তগণ আনন্দোন্মাদে উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করেন এবং মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিয়া ‘শ্রীশ্রীভাগবত-গুরু-পরম্পরা’ কীর্তন করেন। এখানে সজ্জের সভাপতি স্বামীজী মহারাজ বক্তৃতামুখে বাহা বলিয়াছেন তাহার সার-সংক্ষেপ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

“বর্তমানে আমরা যে-স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, ইহা **শ্রীব্যাসগাদী** নামে পরিচিত। উক্ত নামে পরিচিত হইলেও ইহা প্রকৃত **লোমহর্ষণ-নন্দন** প্রসিদ্ধ পুরাণবক্তা **উগ্রশ্রবাঃ সূতগাদী**। নিগমকল্পতরুর প্রপঞ্চফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে ও অত্যন্ত পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে যে সূতগোস্বামীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—তাঁহারই এই স্থান। সূতগোস্বামী নিজ পরমগুরু **শ্রীব্যাসদেবের** সন্মানার্থ ও জগতে তাঁহার মহিমা প্রচারার্থ দৈন্ত্যবশে এই স্থানের ঐক্য নামকরণ করিয়াছেন। সূতরাং এই স্থান আমাদের পূর্বগুরুর পীঠস্থান ও পরম পবিত্র। এই স্থানই আমাদের একমাত্র আদরণীয়। পূর্বে আমরা যে সূতগাদী দর্শন করিয়াছি, উহা **লোমহর্ষণ সূতগাদী**। সন্ধিনী-শক্তিমন্দিরগ্রহ **শ্রীবলদেবের** অবজ্ঞাকারী **লোমহর্ষণ, তাঁহারই** হস্তে নিহত হয় এবং **শ্রীবলদেব** উগ্রশ্রবাঃ সূতগোস্বামিকে শৌনকাদি ৬০ হাজার ঋষিবর্গের কাতর অত্মরোধে পুরাণ বক্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহান্ত-গুরুর চরণে অপরাধী, তাঁহার অবমাননা ও অবজ্ঞাকারীকে **শ্রীবলদেব** দণ্ড দান করিয়া তাহার মঙ্গল বিধান করেন। **বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবও জীবের অজ্ঞানান্ধকার**

বিদূরিত করিয়া তাহাকে দিব্য জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন। স্মৃতরাং আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীশুকদেবে মর্ত্যবুদ্ধি, তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা ও তচ্চরণে অপরাধ ঘটিলে জীবের ভক্তিলতা-বীজের অঙ্কুর সমূলেই বিনষ্ট হয় এবং তখন সে পাষণ্ডতা-ক্রমে গুরুদ্রোহী হইয়া তাঁহার আচার-প্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। অতএব লোমহর্ষণ স্মৃতির গাদীতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই বা ঐস্থানে শ্রদ্ধা প্রদর্শনেরও কোন হেতু নাই। শাস্ত্রের “অম্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাম” বাণী অনুসারে ভগবত্ত্ব অম্বয় ও ব্যতিরেকমুখে আলোচনাদ্বারা অভিজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য লইয়াই তথায় আমরা গিয়াছিলাম। শৌনকাদি ৮০ হাজার ঋষি এখানে স্মৃতগোস্বামীর নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন—এখানকার তীর্থ পাণ্ডাগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। তবে আমরা সর্বপ্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে পাই যে, শৌনকাদি ৬০ হাজার ঋষিকুলই নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এ-বিষয়ে মতদ্বৈত থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত সংখ্যা সন্দেহে কাহারও কোন মতান্তর নাই।” স্বামীজী আরও বলেন, “বেদব্যাচ্য ঋষি শ্রীকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগবত-গুরুপরম্পরায় চতুর্থ অধস্তন; তাঁহার অধস্তন শ্রীশুকদেব গোস্বামী এবং স্মৃতগোস্বামী তাঁহার যোগ্যতম শিষ্য। স্মৃতরাং শ্রীব্যাসের বাণী ও শিক্ষাই শ্রীশুকমুখে অমৃত সংযুক্ত হইয়া শ্রীস্মৃতগোস্বামীর মধ্যে সঞ্চারিত ও প্রবাহিত। আমরা বৈয়াসিক সম্প্রদায়-ভুক্ত। অতএব শ্রীব্যাসদেব ও তদীয় ধারায় স্নাত তদনুগত শ্রীজগন্নাথ-ভক্তি-বিনোদ-গৌর-সরস্বতী—অধস্তনগণের বাণীই আমাদের একমাত্র জীবাত্ম ও আশ্রয়স্থল। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তই সাক্ষাৎ সেই বাণীরূপা সরস্বতী।” স্বামীজী আরও বলেন, “এই নৈমিষারণ্যক্ষেত্রেই ব্রহ্মসূত্র ও গায়ত্রীর অর্থনির্ণায়ক ও অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ পারমহংস-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় ও সর্বশেষ অধিবেশন হয়। ভারতের অধিকাংশ ধর্মসম্প্রদায়ই শ্রীব্যাসদেবকে তাঁহাদের পূর্বাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন। এমন কি, মায়াবাদী অদ্বৈতপন্থীগণও তাঁহাকে পূর্বগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অথচ তাঁহারা শ্রীব্যাসদেবের রচিত নিখিল শাস্ত্রসার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের উপযুক্ত মর্যাদা প্রদানে কুণ্ঠিত। তবে আজকাল মায়াবাদিদিগের মধ্যে কথঞ্চিৎ শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনার আগ্রহ ও প্রয়াস লক্ষিত হইলেও তাহা কপটতা ও অজ্ঞাভিলাষমূলে জাত এবং সম্প্রদায়-দোষভূষ্ট। ঐহারা ব্যাস ভাস্ত বলিয়া ব্যাসের বাণীতে—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীতে ভ্রম প্রদর্শন-পূর্বক নিজ-কল্পিত মতবাদ প্রচার করিয়া উৎকট গুরুভক্তি(?)

দেখাইতে চান, তাহারা শ্রীব্যাসচরণে—শ্রীগুরুচরণে অপরাধী। স্বপ্নেও কখন তাহাদের সঙ্গ যেন আমাদের না ঘটে। শ্রীব্যাসের সম্বন্ধে ইহা আমাদের গুরু-পীঠ ও পরম আদরের স্থান। শ্রীব্যাসদেব ও তদীয় অল্পগত জনগণের শিক্ষা ও বাণী যাহাতে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি—ইহাই তাহাদের শ্রীচরণে আমাদের একান্ত সকাতির প্রার্থনা।”

অতঃপর তথা হইতে যাত্রিগণ ব্রহ্মকুণ্ড (ব্রহ্মাবর্ত), গঙ্গোত্তরী, শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণজী, শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণজী, নাগেশ্বর শিব, দশাশ্বমেধ ঘাট, গোমতী-গঙ্গা, যজ্ঞবরাহ কুপ, বড় হনুমান্জী, পঞ্চপাণ্ডব, প্রাচীন পাণ্ডব-কেল্লার সিংহদ্বারের ভগ্নাবশেষ, শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহদেব, ভূতেশ্বর নাথ ও পরে চক্রতীর্থ দর্শন করেন। এইস্থানে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ব্রহ্মার মনোময় চক্র কিরূপে এস্থলে স্তম্ভীভূত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে এবং চক্রতীর্থের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য-বিষয় যাত্রিগণের নিকট বহুতামুখে বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন—“কেবল-কর্মের হেয়ত্ব প্রদর্শন, নির্বিশেষ ব্রহ্মাত্মসন্ধানপর জ্ঞানের নিরাকরণ এবং ভক্তিধর্মের—প্রেম-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যেই এই স্থানে ব্রহ্মার মনোময় চক্র স্তম্ভীভূত হয়। পরমহংসগণের উপাসনাস্থলে কর্ম ও জ্ঞানের কোন আবরণ নাই বা তাহার কোন প্রভাব থাকিতে পারে না। কর্ম ও জ্ঞান, পরমহংস মুক্তকুলের সেবা প্রতীক্ষায় সর্বদা করষোড়ে অবস্থিত। মুক্তকুলের উপাসনাস্থল এই নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্র কর্ম ও জ্ঞান হইতে অনাবৃত ও প্রেমাকরুণ ভক্তগণের পরম আদরের স্থান।” অতঃ শ্রীশ্রীউপাধীন একাদশী ব্রতোপ-বাস ও নিতালীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-তিথিতে পণ্ডিতজী সন্ধ্যার পর বাবাজী মহারাজের পূত চরিতাবলী কীর্তন করিয়া দৈন্যমুখে তাহার কৃপা প্রার্থনা করেন এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নৈমিষারণ্য তীর্থের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া যাত্রিগণকে অবহিত করান।

পরদিবস ১৬ই কার্তিক, ২রা নভেম্বর, বুধবার হইতে ১৮ই কার্তিক, ৪ঠা নভেম্বর, শুক্রবার পর্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ সকালে পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদ বা নারদ-বহুদেব সংবাদ পাঠ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। তন্মধ্যে ১৬ই কার্তিক, তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের প্রারম্ভেই শ্রীল বাবাজী মহারাজের কঠোর বৈরাগ্য, দুঃসঙ্গ-বর্জন-শিক্ষায়

দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠা, অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিরন্তর অভীষ্টদেবের সহিত নিত্য-লীলায় মগ্ন থাকিয়াও প্রাকৃত জগতের অন্ধের ত্রায় অভিনয়, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রার্থবিৎ হইয়াও নিরক্ষর অন্ধের ভাণ করিয়া বহিস্মুখ জনগণের প্রতি বঞ্চনা-লীলা, নিজজনের প্রতি স্নেহ-বাৎসল্য ও অমায়ায় রূপা প্রভৃতি তাঁহার অতিমর্ত্য চরিত্রাবলী কীর্তন করেন। দ্বিপ্রহরে শ্রীল বাবাজী মহারাজের তিরোভাব উপলক্ষে মহোৎসবের অয়োজন করা হইয়াছিল এবং স্থানীয় গণ্যমান্য বহু ভ্রমহোদয়গণকে ও দেশবাসী জনসাধারণকে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে পণ্ডিতজী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১৭ই কার্তিক, ৩রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার, পরিক্রমা-সজ্জ বড় ধর্মশালা হইতে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, খোল-করতালযোগে ধ্বজ-পতাকাদি পরিশোভিত হইয়া নগর-সঙ্কীর্তন শোভাযাত্রা সহকারে নৈমিষারণ্যে রেলওয়ে ষ্টেশনে উপনীত হন। পরে তাঁহারা ট্রেনযোগে মিশ্রীক রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌছেন। তথা হইতে যাত্রিগণ নগর-সঙ্কীর্তন সহযোগে সীতাকুপ, সীতাকুণ্ড ও বাল্মীকি-আশ্রম-স্থিত লব, কুশ, সীতাঠাকুরাণী, বাল্মীকি মুনি প্রভৃতির দর্শন লাভ করেন। এই স্থানেই জগন্ময়ী শ্রীসীতাদেবী পাতাল প্রবেশ করিয়া তাঁহার ভৌম চিহ্নজগতের প্রকট-লীলা সংগোপন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এস্থলে সীতাকুণ্ডের তীরে অবস্থিত বাল্মীকি আশ্রমের মোহাস্ত শ্রীগোবর্দ্ধনদাসজীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডীর প্রতি মর্যাদাবোধ ও তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহারে পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ বিশেষ মুগ্ধ হন। তথা হইতে যাত্রিগণ দধীচিকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া কুণ্ড-তীরস্থ মন্দিরে দধীচি মুনি, নরনারায়ণ, পৃথক্ মন্দিরে অষ্টভুজা মহামায়া, পরে দধীচি মুনির গাদি বা তপস্তা-স্থান প্রভৃতির দর্শন লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হন। এইস্থানে পূজাপাদ শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিকমল প্রভৃ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত বৃত্তাস্ত্রের জন্ম ও দধীচি মুনির অস্থি-নির্ম্মিত বজ্রে ইন্দ্রের বৃত্তাস্ত্রর বধ উপাখ্যান বক্তৃতামুখে আলোচনা করেন। যাত্রিগণ যথাসময়ে নৈমিষারণ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। সন্ধ্যারতির পর কীর্তনান্তে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শিত হয়। শ্রীগৌরাজপদ ব্রহ্মচারী প্রভৃ হিন্দীতে বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেন।

শ্রীনৈমিষারণ্যে পরিক্রমা-সজ্জ সর্বসমেত দশ দিবস অবস্থান করেন। ১৯শে কার্তিক, ৫ই নভেম্বর শনিবার, পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ উজ্জ্বল সমাপনান্তে সন্ধ্যার

গাড়ীতে নৈমিষারণ্য হইতে বালামৌ জংএ পৌছেন এবং তৎপরদিবস সকাল ৫-৩০ মিনিটে ১০নং ডাউন ট্রান্স এক্সপ্রেসের রিজার্ভ গাড়ীতে ২১শে কার্তিক, ১৩৫৬, ইং ৭ই নভেম্বর, ১৯৪৯ সোমবার হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিয়া স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

পরিক্রমাকারী যাত্রিগণের সুযোগ-সুবিধার যথোপযুক্ত সুবন্দোবস্ত থাকিলেও সর্বদা সকলের অভাব-অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখা সম্ভবপর হয় নাই। আমরা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইকে পরিক্রমাকারী স্মৃতিবান্ শ্রদ্ধালু সজ্জন-গণকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। তাঁহারা পরিক্রমাকালের যাবতীয় অভাব-অসুবিধা ও ক্লেশের বিষয় বিস্মৃত হইয়া মাসাধিক কাল শুদ্ধ বৈষ্ণব-সংজ্ঞের আনুগত্যে থাকিয়া স্থান-মাহাত্ম্য শ্রবণমুখে তীর্থস্থানাদি দর্শন ও শ্রীহরিকথা শ্রবণে যে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, তাহাতেই উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে শ্রীগুরু-গৌরাক্ষের নিত্য সেবানন্দে মগ্ন থাকিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

—প্রকাশক

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে চুঁচুড়া মহরস্ব শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে আগামী ২৪শে মাঘ, ১৩৫৬, ইং ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০,



মঙ্গলবার, শ্রীব্যাসাভিন্ন জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমন্তক্ৰী সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি-পূজা উপলক্ষে আগামী ২২শে মাঘ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার হইতে ২৪শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার পর্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজা-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা বিরাট-

ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। সতীর্থ ও ধর্মপ্রাণ সজ্জনবৃন্দের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার নিমন্ত্রণপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাস্তো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ,
(নদীয়া)

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

আগামী ২০শে ফাল্গুন, ১৩৫৬, ইং ৪ঠা মার্চ, ১৯৫০ শনিবার, কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাবতিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরোক্ত ঠিকানায় আগামী ১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে ২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ, রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহসেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণ, শ্রীধাম-নবদ্বীপাস্তর্গত ৯টা দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থানমাহাত্ম্য-কীর্তনমুখে ষোলকোশ পরিক্রমা প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনদ্বারা বিরাট-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঙ্কব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ পরিক্রমা-পঞ্জী পয় পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

সত্যবুদ্ধ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিয়ামী শ্রীমন্তকি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় অথবা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)—ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসবপঞ্জী

- ১। ১৫ই ফাল্গুন, সোমবার—(১) শ্রীগৌড়মদ্বীপ (কীর্তনাখ্য)—
গঙ্গা স্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে
দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-
সুখদকুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহর ক্ষেত্র, নৃসিংহদেব পল্লী এবং
(প্রসাদ-সেবান্তে)
(২) শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য)—মাজিদা,
হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামণপুরা ও হংসবাহন।
- ২। ১৬ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার—(৩) শ্রীকোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য)—গদ-
খালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ,
কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি (শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর মন্দির)
এবং
(৪) ঋতুদ্বীপ (অর্চনাখ্য)—রাহতপুর
বা রাতুপুর।
- ৩। ১৭ই ফাল্গুন, বুধবার—(৫) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য)—জান্নগর
(জহ্নুমুনি-স্থান), বিজ্ঞানগর (শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের পাট)।
(৬) শ্রীমোদক্রমদ্বীপ (দাস্তাখ্য)—মামগাছি
(শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা,
মাতাপুর বা মহৎপুর (পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।
- ৪। ১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার—(৭) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য)—
পোড়ামাতলা ও শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি
দর্শনান্তে রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা।
- ৫। ১৯শে ফাল্গুন, শুক্রবার—(৮) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য)—
সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর এবং
(৯) শ্রীঅন্তদ্বীপ (আত্মনিবেদনাখ্য)—
শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন,
শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ভবন), জগদগুরু শ্রীল
প্রভুপাদের সমাধি, চাঁদকাজীর সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং
(প্রসাদ-সেবান্তে) মুরারি গুপ্তের পাট।
- ৬। ২০শে ফাল্গুন, শনিবার—শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব।
- ৭। ২১শে ফাল্গুন, রবিবার—সাধারণ মহামহোৎসব (সর্বসুধারণে
মহাপ্রসাদ বিতরণ)।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

১৯ মাঘ, ৯ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী, সোমবার—শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ও শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের তিরোভাব।
শ্রীপঞ্চমী।

২১ মাঘ, ১১ মাঘ, ২৫ জানুয়ারী, বুধবার—মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর আবির্ভাব।

২৩ মাঘ, ১৩ মাঘ, ২৭ জানুয়ারী, শুক্রবার—শ্রীমন্ মধ্বাচার্যের তিরোভাব।

২৪ মাঘ, ১৪ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী, শনিবার—শ্রীমদ্ রামানুজ আচার্যের তিরোভাব।

২৫ মাঘ, ১৫ মাঘ, ২৯ জানুয়ারী, রবিবার—ভৈরবী একাদশীর ও শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে উপবাস।

২৬ মাঘ, ১৬ মাঘ, ৩০ জানুয়ারী, সোমবার—পূর্বাহ্ন ৯৪৫ মধ্যে শ্রীবরাহদেবের অর্চনান্তে ৯৪৫ গতে ১০১০ মধ্যে ভৈরবী একাদশীর পারণ। শ্রীবরাহ দ্বাদশী।

২৭ মাঘ, ১৭ মাঘ, ৩১ জানুয়ারী, মঙ্গলবার—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব ও শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশীর উপবাস। চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ও সমিতির অগ্রাহ্য শাখামঠসমূহে সঙ্কীর্্তন মহোৎসব।

২৮ মাঘ, ১৮ মাঘ, ১ ফেব্রুয়ারী, বুধবার—পূর্বাহ্ন ১০১০ মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশীর পারণ।

২৯ মাঘ, ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার—শ্রীকৃষ্ণের মধুরোৎসব।

৫ গোবিন্দ, ২৪ মাঘ, ৭ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার—জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমন্ত্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের আবির্ভাব ও শ্রীশ্রীব্যাসপূজা। চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ২২শে মাঘ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার হইতে অষ্ট পর্য্যন্ত শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে মহোৎসব।

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীভগবৎ-রূপায় আমাদের প্রথম বর্ষের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সূক্ষ্মে প্রকাশিত হইয়াছেন। বর্তমান ১২শ সংখ্যায় মঙ্গলাচরণের পরেই শ্রীল প্রভু-পাদের “বর্ষশেষ”-শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র আশীর্বাদী প্রবন্ধ শ্রীপত্রিকার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। তাহাতে তিনি উপদেশ করিয়াছেন—শ্রীপত্রিকা সাধারণ সংবাদ-পত্রের ন্যায় ব্যবহৃত হইবে না। ইহাতে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-বাণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা যত্নসহকারে গ্রন্থাকারে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। গুরুবর্গের এইরূপ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমরা আমাদের পাঠকবর্গের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১ম হইতে ১২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত পুস্তকাকারে বাঁধিয়া রাখিবেন। তজ্জন্তু আমরা এই সংখ্যার শেষভাগে আভ্যন্তরীণ প্রচ্ছদপট ও “প্রথম বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রবন্ধ-সূচী” মুদ্রিত করিয়াছি। উহা এই সংখ্যা হইতে পৃথক্ করিয়া কাটিয়া লইয়া ১ম সংখ্যার প্রথমেই সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থাকারে বাঁধিয়া লইবেন।

এই বর্ষে আমাদের বিশেষ যত্ন লওয়াসত্ত্বেও স্থানে স্থানে ভুল-ভ্রান্তি, মুদ্রাকর প্রমাদাদি রহিয়াছে। তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ নিজগুণে সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। আগামী বর্ষের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা নানাপ্রকার রঙ্গীন চিত্র-বিচিত্র আলেখ্য-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইবেন এবং তাহাতে যথাসম্ভব সহজ ও সরল ভাষায় প্রবন্ধাদি থাকিবে। আগামী ভৈষ্মী একাদশী-তিথির পারণ সম্বন্ধে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠ হইতে প্রকাশিত “শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা”য় ভুল লিখা হইয়াছে। আপনাদের অবধানের জন্ত জানাইতেছি যে, বর্তমান ‘ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যান্ডার্ড টাইমের’ ২৪৫ মিনিটের পর ১০টার মধ্যে উক্ত পারণ সম্পন্ন করিতে হইবে। পারণের দিন উক্ত পঞ্জিকায় ঠিক লিখা আছে। ‘শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকায়’ বহু স্থানে ভ্রান্তিমূলক তিথি-উপবাসাদির বিচার মুদ্রিত হইয়াছে। তজ্জন্তু আমরা ভগ্নন-পথের পথিকগণের সুবিধার জন্ত প্রতি মাসের পালনীয় তিথি-দিবসাদির পঞ্জী শ্রীপত্রিকার প্রতি সংখ্যায় প্রকাশ করিব। একাদশী-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি প্রশ্ন সত্যাত্মসন্ধিস্থ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। আগামী বর্ষে শাস্ত্র-বিচারমূলে সে-বিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে এবং রথযাত্রা সম্বন্ধেও অজ্ঞাত জাতব্য বিষয় আলোচিত হইবে। ভবিষ্যতে যাহাতে মুদ্রাকর প্রমাদাদি না থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া গ্রাহকগণের আনন্দ বিধান করিতে চেষ্টা করিব।



শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবেন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সড়াক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৮ টাকা, যাপ্যাসিক ২০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১০ আনা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি, পি-তে লইলে খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। শ্রীপত্রিকার প্রচলিত বর্ষের যে কোনও সময়ে প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণের ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে অতি সত্ত্বর তাহা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জানাইতে হইবে। সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন।
- ৫। শ্রীমন্নহাপ্রভুর আচরিত প্রচারিত ও শিক্ষা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না।
- ৬। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে “কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)” এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।
- ৭। এজেন্টদিগকে শতকরা ২৫ টাকা কমিশন দেওয়া হয়। দশখানির কমে এজেন্ট নিযুক্ত করা হয় না। অবিক্রীত সংখ্যা ফেরত লওয়া হয় না এবং মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে নিয়মাবলী

- ১। বিজ্ঞাপনের জ্ঞাপন আবশ্যক হইলে ব্লক প্রভৃতি বিজ্ঞাপনদাতাকে দিতে হইবে এবং বিজ্ঞাপনের কাল অতীত হইলে উহা তাঁহারা নিজ ব্যয়ে ফেরত লইবেন।
- ২। এক মাসের জ্ঞাপন দিলে তাহার টাকা অগ্রিম দিতে হইবে।
- ৩। যাপ্যাসিক বা ততোধিক সময়ের জ্ঞাপন দিলে সিকি টাকা অগ্রিম দেয়, বাকী টাকা বর্ষান্তে অথবা বিজ্ঞাপনের কাল-শেষ হইবামাত্র দিতে হইবে।
- ৪। বিজ্ঞাপনের কিছু পরিবর্তন করিতে হইলে অন্ততঃ ১৫ পনের দিন পূর্বে কার্য্যাধ্যক্ষকে পরিষ্কার করিয়া জানাইতে হইবে।
- ৫। আবরণ পৃষ্ঠায়ও বিজ্ঞাপন দিতে পারিবেন। উহার হার স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনের হার পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধভক্তিকেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

ভেঘড়িপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীত্রিগুণাতীত ব্রহ্মচারী।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (ভগলী)

রক্ষক—শ্রীপরমধর্মেশ্বর ব্রহ্মচারী।

৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

৩৩/২ বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা-৩)

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ

সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ (বর্ধমান)

রক্ষক—শ্রীঅনঙ্গ মোহন ব্রহ্মচারী।

৫। শ্রীপিছলদা পাদপীঠ

পিছলদা, ঈশ্বরপুর পোঃ (মেদিনীপুর)

শ্রীভক্তি রসায়নত সিন্ধু গ্রন্থ

ভগবান শ্রীগৌরানন্দমন্ডরের পরমপ্রিয় পার্শ্বদ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু প্রেম-ভক্তি লাভের উপায়স্বরূপ **শ্রীভক্তি রসায়নত সিন্ধু** নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ বিস্তৃতভাবে রচনা করিয়াছেন। ইহা ভক্তিতত্ত্বের বিশুদ্ধ বিজ্ঞান গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের অপূর্ণ রসময় লীলামাধুরী আশ্বাদন করিতে করিতে শ্রীরাধাগোবিন্দের সর্বপ্রকার রসসেবার উপযোগিতা নিঃসন্দেহে লাভ করিতে পারা যায়। পাঠকগণ! এই অপূর্ণ গ্রন্থ সত্তর সংগ্রহপূর্বক আচার মুখে অধ্যয়ন করিয়া গুণাতীত রসতত্ত্ব সাগরে অবগাহন করিয়া ধন্য হউন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ কর্তৃক বিশেষ যত্নে এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে। ইহা যথাসম্ভব বড় বড় সুস্পষ্ট অক্ষরে উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। সাধারণ পাঠকের শ্রোকার্থ বোধের জন্ত এই সংস্করণে সরল ও সুবিস্তৃত অঙ্কুর, বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রতিশব্দ, অর্থবিবরণ এবং শ্রীল ভীষ্ম গোস্বামী প্রভুর দুর্গম সঙ্গমনী নামী সুপ্রসিদ্ধ টীকা ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৪ টাকা মাত্র। ডাক মাণ্ডল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

চৌমাথা,

পোঃ চুঁচুড়া, (ভগলী)।

(২) প্রকাশক—শ্রীসখীচরণ রায়

১৪০-এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রিট,

কলিকাতা—৪